প্লেটোর রিপাবলিক

সরদার ফজলুল করিম

প্লেটোর রিপাবলিক

সরদার ফজলুল করিম

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

ত্রয়োদশ মুদ্রণ
সেপ্টেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৭৪

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড ঢাকা ১১০০

দাম
চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 120 4

PLATOR REPUBLIC : Bengali translation of Plato's Republic with introduction, discussion and explanatory notes by Sardar Fazlul Karim based on English translation by Benjamin Jowett, F. M. Cornford and H. D. P. Lee. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Qayyum Chowdhury. Price : Taka Four Hundred and Fifty only.

উৎসর্গপত্র

১৯৯৯কে অতিক্রম করে ২০০০ সালে
অভাবিতরূপে নতুনতর যে-বিশ্বে মনুষ্যজাতি
পদার্পণ করছে, তাদের মহত্তর
এক মনুষ্যসমাজ তৈরির প্রয়াসের ক্রম সার্থকতার
প্রত্যাশায়—

মুখবন্ধ : সপ্তম সংস্করণ

মাওলা ব্রাদার্স থেকে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর বর্তমান সপ্তম সংস্করণটি আমার মনে একটি সার্থকতাবোধের সৃষ্টি করেছে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে 'প্লেটোর রিপাবলিক' আজ আর কোনো অপরিচিত গ্রন্থ নয়। 'প্লেটোর সংলাপ' 'প্লেটোর রিপাবলিক' 'এ্যারিস্টট্‌ল-এর পলিটিক্স' প্রাচীন দর্শন, রাষ্ট্রতত্ত্বসাহিত্যে এবং সমাজতত্ত্বের আকর-গ্রন্থরূপে বাংলাভাষার পাঠকসমাজে আজ সম্যকরূপে সমাদৃত।

একজন মানুষের যেমন জীবনকাল থাকে, একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থেরও তেমনি জীবনকাল থাকে। ব্যক্তির জীবনের সঙ্গে গ্রন্থের জীবনের একটি পার্থক্য এই যে, ব্যক্তির মৃত্যু অনিবার্য হলেও, একখানি মূল্যবান গ্রন্থের জীবনকালের বৃদ্ধি বৈ কোনো মৃত্যু ঘটে না। আমার ব্যক্তিগতজীবন যদি তার পঁচাত্তর পেরিয়ে প্রয়াণের মুহূর্তে এসে পৌঁছে থাকে, তবে 'প্লেটোর রিপাবলিক' ১৯৭৪ সনে তার প্রথম প্রকাশের পরে ১৯৯৯-এর শেষে তাঁর পঁচিশ বৎসরের বয়স অতিক্রম করে আমার মনে এমন একটি প্রত্যয়ের সৃষ্টি করছে যে, তার জীবনকাল বাংলাভাষার পাঠক এবং জ্ঞানার্থীদের সমাদরে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

মানুষের যে-কোনো সৃষ্টিই যৌথ সৃষ্টি। একখানি গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ কথাটি সবিশেষ সত্য। 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর একটি আত্মকাহিনী আছে : সে আত্মকাহিনী কেবল তার অনুবাদক হিসেবে আমার নিজের শ্রমের কাহিনী নয়। সংস্করণ থেকে সংস্করণে এই গ্রন্থের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সংযুক্ত প্রকাশক, মুদ্রক, প্রুফ সংশোধক এবং পাঠকবর্গের কাহিনী। আমার বোধ এরূপ যে, একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত গ্রন্থের অন্তরালে অপর একখানি অপ্রকাশিত কিন্তু অধিকতর একনিষ্ঠ গ্রন্থ যুক্ত থাকে। একজন পাঠক কেবল তার পঠিত গ্রন্থখানিকে দেখেন এবং পাঠ করেন। অন্তরালের গ্রন্থখানিকে নয়। 'প্লেটোর রিপাবলিক'ও এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়। তথাপি এ গ্রন্থের সহৃদয় পাঠক যদি গ্রন্থখানির ভূমিকা এবং তার উৎসর্গপত্রসমূহকে সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবনের প্রয়াস পান, তবে এই গ্রন্থের অন্তরালের গ্রন্থখানিরও একটি আভাস তিনি লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর আগ্রহী পাঠকবর্গকে এবং তার প্রকাশককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং তার অধিকতর জীবন কামনা করছি।

ডিসেম্বর ১৯৯৯, ঢাকা **সরদার ফজলুল করিম**

মুখবন্ধ : ষষ্ঠ সংস্করণ

মাওলা ব্রাদার্স-এর আগ্রহ এবং উদ্যোগে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর বর্তমান সংস্করণটি এই গ্রন্থের ষষ্ঠ সংস্করণ। মাওলা ব্রাদার্সকে এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৭৪ সনে এই অনুবাদের প্রথম সংস্করণটি প্রকাশিত হয়। ২৪ বৎসরের অধিককাল যাবৎ গ্রন্থখানি বাংলাদেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বৃহত্তর সংখ্যক পাঠক বর্গের নিকট থেকে যে-সমাদর লাভ করে এসেছে তার অভিজ্ঞতাতে একটি সার্থকতার বোধে আমি উদ্দীপিত।

এতদিনে 'প্লেটোর রিপাবলিক' একটি নিজস্ব অস্তিত্ব এবং পরিচয় লাভ করেছে। ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত প্লেটোর 'রিপাবলিকের' আন্তর্জাতিক অবয়বটি অনুসরণ করেই আমি এর বাংলা সংস্করণটি তৈরী করেছিলাম। সেই অবয়বটির কোন পরিবর্তনকে আমি উচিত বলে মনে করিনি। মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত বর্তমান সংস্করণটি সেই মূল সংস্করণ অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণটির প্রকাশোপলক্ষে নিজের মনের দিকে তাকিয়ে কেবল যে এই শতকের সবচাইতে প্রলয়ঙ্করী বন্যার অভিজ্ঞতাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে নিজেকেও প্রকৃতির শক্তির কাছে এক অসহায় প্রাণী বলে মনে হচ্ছে, তাই নয়। পৃথিবীর মানুষকে আজ প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্কের পারস্পরিকতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।

প্রকৃতি এবং মানুষ কি পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিকূল শক্তি? সামগ্রিকভাবে স্বল্প দৃষ্টির মানুষ এতকাল এই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে এসেছে। এমন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই কথা তৈরী হয়েছে : 'প্রকৃতিকে জয় করতে হবে মানুষকে।' মানুষকে চেতনাসম্পন্ন প্রাণী বলা হয়। প্রকৃতিকে তেমন বলা হয় না। তথাপি বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং যুগে যুগে হয়েছে তাতে মানুষের পক্ষ থেকে প্রকৃতিকে সহমর্মিতার ভিত্তিতে না দেখে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভিত্তিতে দেখা হয়েছে। এ আমার অনুভূতি। প্রকৃতির উপর চেতনা এবং উদ্দেশ্য আরোপ না করেও ভাষার সীমাবদ্ধতার কারণে বলতে হয় : প্রকৃতি তারই অবুঝ সন্তান মনুষ্য নামক প্রাণীর উপর অকরুণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের মূর্তিতে যেন প্রকাশিত হচ্ছে। তার এক প্রকাশ থেকে আর এক ভয়াবহ প্রকাশের কাল-ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, এবং প্রতিটি প্রকাশ যে পূর্ববর্তী

প্রকাশের চাইতে ভয়ঙ্কর থেকে অতীব ভয়ঙ্কর হচ্ছে এবং হবে, আতঙ্কিত অবস্থায় আজ আমার তাই মনে হচ্ছে।

ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর প্রকাশের দিনে অপর সাথীদের সঙ্গে আমিও থাকব না। তা নিশ্চিত। তবু মরণশীল হয়েও যে-মানুষকে অমর বলে আমি মনে করি, তার চিহ্নহীন বিলুপ্তির আশঙ্কা নিয়ে আমরা মরতে চাইনে। আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই যে, আজকের অবুঝের মধ্যে কিছু বুঝমানেরও জন্ম ঘটবে। তারা তাদের সামাজিক-রাষ্ট্রীয়-বৈশ্বিক জীবনের সংকট ও সমস্যায় সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টটল-বুদ্ধ এবং অন্যসকল চিন্তাশীল প্রাজ্ঞের স্মরণে মনুষ্য সমাজের মূল সমস্যা সম্পর্কে এঁদের চিন্তার পরিচয় দ্বারা হতাশার মধ্যেও জীবনের জয়ের আশা পোষণ করবে।

জীবন এবং মৃত্যু পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সম্পর্কিত। তবু মৃত্যুহীন আশাবাদী প্রাণী হিসাবে আমাদের এই প্রত্যয়টিকে ধারণ করতে হবে : জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বে জীবনের জয় হয়। মৃত্যুর নয়। জীবনের নবজন্ম লাভ হয়। মৃত্যুর মৃত্যু ঘটে।

প্রীতিভাজন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরীকে আমার আবার আন্তরিক ধন্যবাদ। যেমন এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদটি তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তা এবং বৈশিষ্ট্য দিয়ে তৈরী করেছিলেন তেমনি এই সংস্করণটির প্রচ্ছদও তিনি তৈরী করে দিয়েছেন।

নভেম্বর ১৯৯৮, ঢাকা **সরদার ফজলুল করিম**

মুখবন্ধ : পঞ্চম সংস্করণ

যেমন মুখবন্ধ, তেমনি উৎসর্গপত্র ঃ একখানি গ্রন্থের এ-দুটি বিষয় লেখকের বা অনুবাদকের একটি আবেগের বিষয়।

ব্যক্তিগত জীবনে নানা বিপর্যয়। সেখানে নানা অসহায়তা এবং হতাশার উচ্চারণ। সে অনিবার্য। তাকে স্বীকার না করে পারিনে। বয়সের বার্ধক্যও মনের অনেক মহৎ ইচ্ছাকেও কার্যে পরিণত করতে দেয় না। ইচ্ছামাত্রই কাজ হয় না। কাজমাত্রেরই সমাজ, পরিবার, অর্থ ইত্যাদিগত নানা বাধাবিপত্তি। এইসব মোকাবেলা করে যদি একটি সাধারণ কার্যও আমি সাধন করতে পারি, তার সকল অসম্পূর্ণতাসহ ঃ তবে তাতেই জীবনের কিছুটা সার্থকতাবোধ।

'প্লেটোর রিপাবলিক' গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদের বর্তমান পঞ্চম সংস্করণের প্রকাশ আমার জীবনে তেমনি একটি আবেগ এবং সার্থকতাবোধের ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবনে হতাশার কথা দু'এক সময়ে প্রকাশ করলেও 'মানবজাতি' হিসাবে, বর্তমানের সব সংকট ও জটিলতা সত্ত্বেও মানুষ সম্পর্কে আমি আশাবাদী।

একটা তত্ত্ব ঃ 'মানুষ' এক সময়ে এই প্রকৃতিজগতে বর্তমান আকারে অস্তিত্বময় ছিল না। তার পরে বস্তুজগতের কোটি কিংবা লক্ষ বছরের বিরামহীন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের অস্তিত্বলাভ এবং সে অস্তিত্বের হাত, পা, মাথার অব্যাহত পরিবর্তন। এ নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক। আমি এ-মুখবন্ধে তার আলোচনায় যাচ্ছিনে।

কিন্তু চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ যদি এসব তত্ত্বের 'হাঁ' এবং 'না' নিয়ে চিন্তা না করে, তা হলে তার আর 'মানুষ' নামধারণের কোনো অর্থ থাকে না। যে-সমাজে মনুষ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের মানুষের ইতিহাসের পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে যত অধিক তর্ক এবং বিতর্ক, সেই মনুষ্যসমাজ তত ঋদ্ধ, তত অধিক সে মনুষ্যসমাজ। মানুষ নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকে এবং থেকেছে। সেক্ষেত্রেও নিরন্তর পরিবর্তন। আজ রাষ্ট্রের এক সীমারেখা, তো কাল আর এক সীমারেখা।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন গ্রীসের সক্রেটিস, প্লেটো, এ্যারিস্টটল ঃ এই মহৎ মানুষেরা মানুষের মনে মানুষের নিজের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য, তার সমাজ ও রাষ্ট্রগত সমস্যার নানা মৌলিক প্রশ্নের উদ্রেক করেছেন। সমাধানের কথাও হয়তো বলেছেন। কিন্তু সমাধানের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমস্যার কথা জানা, সমস্যাকে অনুধাবন করা। কেবল যে গ্রীসের এই ধীমানরা আমাদের জীবনকে প্রশ্নময় করে তুলতে চেয়েছেন, তাই নয়। ভারত, চীন ঃ প্রাচীন কালের সব সমাজের গুরু, ঋষি, ধীমানরা মানুষের জন্য এই কাজ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের নানা পরিবর্তনের অন্যতম মূল কারণ মানুষের চিন্তা। সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট হওয়া। হাজার হাজার বছরেরও পূর্বের, দেশ নির্বিশেষে মহৎ মানুষদের এই অবদানের জন্য বর্তমান কালের মানুষ হিসাবে আমরা তাঁদের কাছে ঋণ এবং কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। এই ধারাতেই আরো মনীষীর আগমন। সে প্রক্রিয়া অব্যাহত।

আমার স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রী, আমার প্রীতিভাজন সুহৃদবর্গ যদি এই দৃষ্টিভঙ্গীটি গ্রহণ করে বাংলাদেশে বাংলাভাষায় "প্লেটোর রিপাবলিক' : সংলাপ মূলক গ্রন্থখানার পুনঃসংস্করণের দাবী না করতেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রীতিভাজন উপাচার্য, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ, প্রকাশণা সংস্থার অন্যতম কবি ও সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ যদি আগ্রহের সঙ্গে প্লেটোর রিপাবলিক-এর পঞ্চম সংস্করণটি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করতেন, তাহলে গ্রন্থখানির বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশিত হতে পারত না। এখন আর এ অনুবাদ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের জ্ঞান ভান্ডারের একটি স্বীকৃত সম্পদ। যতক্ষুদ্র পরিমাণেই হোক, এ গ্রন্থ আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠক সাধারণের চিন্তাকে আলোড়িত করার ভূমিকা পালন করছে। এ গ্রন্থের শুধু বর্তমান নয়,

ভবিষ্যৎকেও আমি আনন্দ এবং আশার সঙ্গে তাদের হাতে সমর্পণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মহোদয় এবং তাঁর প্রকাশনা সংস্থার সদস্যবৃন্দের নিকট ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলা বানান কিংবা বাক্যগত ভুলত্রুটি আমি যথাসাধ্য সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোন বাংলা বইকেই ভুল-ত্রুটি শূন্য বলে দাবী করার দুঃসাহস খুব কম লেখকই দেখাতে পারেন। আমার সে সাহস নেই। তবে এ চেষ্টায় আমার আন্তরিকতার কোন অভাব ঘটেনি, একথা আমি বলতে পারি।

উপসর্গ পত্রে একটি আবেগ থাকে। সে কথা আমি প্রথমেই বলেছি। চতুর্থ সংস্করণের উপসর্গ পত্রটিতে যে অনুভূতিটুকু '১৯৯২' সনের উল্লেখ করে প্রকাশ করেছিলাম, এই সংস্করণটিতে সেই অনুভূতিটিই '১৯৯২' এর স্থানে '১৯৯৭' সনটি উল্লেখ করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। 'প্লেটোর রিপাবলিক-এর প্রথম সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন ১৯৭৪ সনে তৎকালীন অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা 'বর্ণমিছিল'-এর বন্ধুবর তাজুল ইসলাম। সম্প্রতি অকালে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। এ এক মর্মান্তিক ঘটনা। বর্তমান সংস্করনের প্রকাশ উপলক্ষে প্রয়াত সুহৃদ তাজুল ইসলামকে পরম প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আর একটি কথা। 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর বর্তমান পঞ্চম সংস্করণের প্রুফ সংশোধনের কাজ যখন যথাসাধ্য ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছি, তখন ২৭শে অক্টোবর, '৯৬ তারিকে সোনারগাঁও হোটেলের কাছে একটি বেবিট্যাক্সি আমার রিকসাটাকে উল্টে দিয়ে আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। মেরে ফেললে জাগতিক অন্যসব বিষয় থেকে মুক্তি পেতাম। কিন্তু 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর প্রুপ সংশোধনের কাজ বাকি থাকত। এই কারণে পঙ্গু অবস্থায় পঙ্গু হাসপাতালে শুয়ে বড় অসহায় লাগছিল। সেই করুণ অসহায় অবস্থায় এগিয়ে এসেছিলেন অনুজ প্রতিম সহকর্মী অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন। কাজটি যে শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হতে পেরেছে তার জন্য আমি তাঁর কাছে একটি অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। এ ঋণ আনন্দের ঋণ। কৃতজ্ঞতার ঋণ।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ — **সরদার ফজলুল করিম**

মুখবন্ধ : চতুর্থ সংস্করণ

'প্লেটোর রিপাবলিক' মানুষের জীবনের সমাজের ক্ষেত্রে একখানি চিরায়ত জীবনকোষ বিশেষ। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি দার্শনিক ও চিন্তাবিদ প্লেটো তাঁর অনবদ্য সংলাপের রীতিতে লিপিবদ্ধ করে

গিয়েছেন। তাঁর লিপিবদ্ধ সমস্যা প্রায় আড়াই হাজার বছর পরের বর্তমানের যে-পৃথিবী এবং তার অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ ঃ সেই পৃথিবী ও রাষ্ট্রসমূহের মানুষের জীবনেরও মৌলিক সমস্যা।

আমাদের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা সমস্যার আমরা সমাধান অন্বেষণ করি। সমস্যার সমাধানের জন্য যে-প্রয়োজনটি সবার আগে আসে সে হচ্ছে, সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান। সমস্যার চরিত্র সম্পর্কে ধারণা। মানুষের সামাজিক জীবনের মৌলিক কোনো সমস্যারই চূড়ান্ত সমাধান আজও সাধিত হয়নি। সমস্যাহীন সামাজিক জীবন কল্পনা করা সম্ভব নয়। মানুষের জীবনে আদিকাল থেকে যা চলে এসেছে, তা তার জীবনের সমস্যার চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা এবং সমাধানের প্রয়াস। সমস্যা অনুধাবনের এ-চেষ্টা এবং সমাধানের প্রয়াস অনন্তকাল ধরেই চলবে। 'মানুষ' শব্দের অর্থই তাই ঃ সমাধানে সচেষ্ট সমস্যাপূর্ণ এক জীবন।

মনুষ্যজীবনের এই অশেষ অভিযাত্রায় 'প্লেটোর রিপাবলিক' এক অনন্য সাথি এবং পথপ্রদর্শক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের উচ্চতর শিক্ষা এবং ব্যাপকতর সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রন্থখানির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ জন্য তাঁরা অনুবাদক হিসাবে আমার এবং পাঠক হিসাবে ছাত্র-ছাত্রী এবং জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র।

'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর বাংলা অনুবাদের তৃতীয় সংস্করণটি নিবেদিত হয়েছিল প্রকাশকালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের জীবন ও জ্ঞানসাধনার অনিবার প্রয়াসের উদ্দেশে। গ্রন্থের বর্তমান চতুর্থ সংস্করণটি নিবেদিত হল বিংশ শতাব্দীর যবনিকা-মুহূর্তের বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মহত্তর জীবনসৃষ্টির সংগ্রামে নিরত মানুষের উদ্দেশে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **সরদার ফজলুল করিম**
অক্টোবর ১৯৯২

মুখবন্ধ : তৃতীয় সংস্করণ

'প্লেটোর রিপাবলিক' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম এক চিরায়ত সৃষ্টি। চিরায়ত সৃষ্টির এই বৈশিষ্ট্য যে, তার মধ্যে মানুষের জীবনের মৌলিক সত্যগুলির যে-প্রকাশ ঘটে সেই সত্যগুলি কাল থেকে কালে মানুষের সংকটে এবং সমস্যায় মানুষের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। সে-কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৮৮ সালে মহাপ্লাবনের ন্যায় যে বন্যার আঘাত এসেছে

এবং তার জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, সে সংকটেও মানুষের সমাজিক রাষ্ট্রীয় জীবনযাপনের মৌলিক সমস্যার চিন্তায় 'প্লেটোর রিপাবলিক' আবার আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। এমন দুর্যোগের সময়ে জ্ঞানের সাধনায় যে-শিক্ষার্থীরা নিরত আছেন তাঁদের কাছে 'প্লেটোর রিপাবলিক'কে পুনরায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব থেকে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হল।

'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর তৃতীয় সংস্করণটিও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় সংস্করণও তাঁরাই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি।

'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সকল কপি নিঃশেষিত। পাঠকবর্গ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে' প্লেটোর রিপাবলিক' বেশ কিছুদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য হয়ে রয়েছে। অষ্টআশির প্লাবনের বিপর্যয়ের কারণে গ্রন্থের মুদ্রণে বিলম্ব ঘটেছে। কিন্তু সে-বিলম্ব ছিল অনিবার্য। প্রাকৃতিক সে-দুর্যোগের দাগ আমাদের ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবন থেকে এখনও মুছে যায়নি। তবু এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং মুদ্রণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউটের প্রেসকর্মীবৃন্দ গ্রন্থখানির মুদ্রণকার্য যে সম্পন্ন করেছেন, তাতে তাঁরা সকলেই যেমন আমার, তেমনি পাঠকবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদের পাত্র হবেন।

'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর বর্তমান সংস্করণটি মূলত ইতিপূর্বকার দ্বিতীয় সংস্করণের ফটো-কম্পোজিশনের প্রক্রিয়ায় মুদ্রিত। সে-কারণে এবং সময়ের স্পল্পতার জন্য পূর্বতন সংস্করণের কোনো সংশোধন করা সম্ভব হয়নি।

পূর্বতন সংস্করণে কোনো গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদ ছিল না। বর্তমান মুদ্রণও কিছুটা ক্রটিযুক্ত থাকলেও, বড় রকমের কোনো প্রমাদ এতে নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তথাপি অনুবাদসহ অপর কোনো ভুলক্রটি যদি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী এবং পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয় তবে তা অনুবাদককে অবগত করলে, আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

'প্লোটোর রিপাবলিক'-এর বাংলা অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণটি নিবেদিত হয়েছিল প্রয়াত ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং কবি হাবিবুর রহমান ঃ এই মহৎপ্রাণ স্মরণীয়দের স্মৃতির উদ্দেশে। 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর অনুবাদের তৃতীয় সংস্করণটি নিবেদিত হল '৮৮ সালের মহাপ্লাবনের মধ্যেও জীবনকে নতুন করে এবং সংগতিময় করে গঠন করার জন্য জ্ঞানের সাধনায় ও সংগ্রামে নিরত মানুষের উদ্দেশে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **সরদার ফজলুল করিম**

৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৮।

মুখবন্ধ : দ্বিতীয় সংস্করণ

প্লেটোর রিপাবলিক ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল আগস্ট, ১৯৭৪ সনে। বইখানি তখন প্রকাশ করেছিল ঢাকার বর্ণমিছিল প্রকাশনা। ১৫ই নভেম্বর '৭৪ তারিখে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক সরদার জয়েনউদ্দীনের আমন্ত্রণে গ্রন্থখানির প্রকাশনা উপলক্ষে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজ ১৯৮২ সনের নভেম্বর মাসের শেষের দিকে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সেই প্রকাশনা অনুষ্ঠানের উপর রক্ষিত আমার ক্ষুদ্র রোজনামচাটি এখানে তুলে দেওয়ার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করছি।

"১৫.১১.৭৪"। ... আজ কিছুক্ষণ আগে এলাম জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর প্রকাশনার উপর একটি আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। আলোচনাটিতে বেশ সুধী সমাবেশ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বেশকিছু ছাত্রও এসেছিলেন। সভাপতিত্ব করলেন ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী সাহেব। আমার অনুবাদ প্রসঙ্গে প্রবন্ধ পড়লেন কবি হাবিবুর রহমান এবং অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। এরূপ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান অনুবাদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করলেন ডঃ রওনক জাহান, অধ্যাপক সা'দউদ্দীন এবং ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক। ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন সাহেবও এসে কিছুক্ষণের জন্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। আলোচনায় ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং অপর সকলে বর্তমান অনুবাদখানির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। এরূপ গ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশক তাজুল ইসলাম যে আগ্রহ এবং উদ্যোগ দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁকেও তাঁরা প্রশংসা করেছেন। প্রবন্ধকার এবং আলোচকদের এরূপ অকুণ্ঠ প্রশংসায় আমি একদিকে সংকুচিত, অপরদিকে আনন্দিত বোধ করেছি। আমার এ অনুবাদের সীমাবদ্ধতার কথা আমি জানি। বৃহৎ পুস্তক। দীর্ঘকাল ধরে এর অনুবাদে আমাকে নিযুক্ত থাকতে হয়েছে। আমার নিজের প্রকাশক্ষমতারও সীমাবদ্ধতা আছে। গ্রন্থের অনুবাদ এবং মুদ্রণকালে একাধিকবার আমার পাণ্ডুলিপি আমি পড়েছি। যথাসাধ্য তাকে উন্নত করার চেষ্টা করেছি। যেন সাহিত্যানুরাগী ও ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বসাহিত্যের এই চিরায়ত সম্পদের স্বাদ অন্ততঃ কিছুটা অনুভূত হয় তার জন্য অনুবাদে স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করেছি। একে আরো উন্নত করা নিশ্চয়ই যায়। এক্ষেত্রে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ঠিকই বলেছেন। অধ্যাপক সা'দউদ্দীন প্লেটো-বিচারে নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। বেনজামিন ফ্যারিংটন যেরূপ

সক্রেটিস-প্লেটো-পূর্বযুগের গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের বস্তুবাদী বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে তার পটভূমিতে প্লেটো-এ্যারিস্টটলের দর্শনের সামাজিক ভূমিকার নতুন ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করেছেন সে দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের দেশের শিক্ষা-আলোচনার ক্ষেত্রে আনা প্রয়োজন। 'রিপাবলিক'-এর ভূমিকায় তার কিছুটা আভাস দিলেও এ মূল্যায়ন অধিকতর বিস্তারিত ভাবে করা আবশ্যক। ডঃ রওনক জাহান সংক্ষেপে বেশ সুন্দরভাবে অনুবাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে 'রিপাবলিক'-এর সংলাপ মূলক পদ্ধতি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ যে বাঞ্ছনীয় তার কথাও বললেন। ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক তাঁর এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার অনুবাদখানি পাওয়ামাত্র বিরতিহীনভাবে পাঠ করে শেষ করেছেন। তিনি বললেন, অনুবাদের সাবলীলতা দশম পুস্তকে এসে যেন একটু শিথিল হয়ে পড়েছে। তাঁর মন্তব্যটি খেয়াল রাখার বিষয়। এদিকে খেয়াল রেখে আমি আবার দশম পুস্তকখানা পাঠ করব। ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এরূপ কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং এ্যারিস্টটলের 'পলিটিকস' গ্রন্থের অনুবাদেরও দাবী জানালেন।[১] অনুষ্ঠানের সংগঠকগণ আমাকেও কিছু বলতে বললেন। আলোচনাকারীদের এমন অকৃপণ প্রশংসায় আমি এরূপ বিব্রত বোধ করেছিলাম যে ঠিক গুছিয়ে কিছু বলতে পারলাম না। বর্তমান অনুবাদ প্রসঙ্গে বাংলাভাষায় গুরত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি অনুবাদের সমস্যা এবং অবস্থা নিয়ে আলোচনা হলে ভাল হত। তাহলে আজকের আলোচনা এত ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমবদ্ধ থাকত না। কিন্তু কোনো সৃজনকর্মের প্রশংসা প্রশংসাকারীদের চরিত্রের উদারতার লক্ষণ। যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা উদার-হৃদয় বলেই দ্বিধাহীনভাবে অনুবাদককে উৎসাহদান করতে চেয়েছেন। আর সে উৎসাহদানের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর ন্যায় চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদের প্রচেষ্টাকে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষার বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা বিশেষ মূল্যবান বলে গণ্য করেন। বর্তমানে যে হতাশাজনক পরিস্থিতি সর্বত্র বিদ্যামান . . . তাতে যদি আমরা শিক্ষা ও সাহিত্যের কিছু মহৎ সৃষ্টি ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তার কিছু পরিচয় সৃষ্টি করতে পারি, তবে সে সৃষ্টি নির্যাতিত মানুষের ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য মহৎ ঐতিহ্যের সঞ্চয় হবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক এবং আর্থিক জীবন অসহায় বলে মানসিক ক্ষেত্রেও যদি নিরন্ধ্র অন্ধকারকেই আমরা লালন করি তবে তা জীবনের চারিপাশের আশাহীনতাকে অধিকতর অনিবার্য করে তুলবে। আজকের আলোচনার সার্থকতার এই একটি দিক নিশ্চয়ই আছে।

১. এ্যারিস্টট্‌ল-এর পলিটিক্‌স গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে মাওলা ব্রাদার্স থেকে ১৯৯৯ সনে।

এদিকটির বোধও নিশ্চয়ই সমাগত শ্রোতাসুধীদের মধ্যে রয়েছে। নইলে প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর অনুবাদ প্রকাশের আলোচনায় এরূপ আগ্রহের সাক্ষাৎ পাওয়া সম্ভব হত না। এই মনোভাবটিই আমি প্রকাশ করে বলার চেষ্টা করলাম।" . . .

জ্ঞানান্বেষী ও সাহিত্যানুরাগী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং পাঠকবৃন্দ যাঁরা সেদিন এই অনুবাদকর্মকে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদেরই আগ্রহে 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ আজ সম্ভব হচ্ছে। বেশ কিছুদিন হল গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কপি নিঃশেষিত হয়ে গেছে। বাজারে কোথাও গ্রন্থের কপি পাওয়া যায় না। এজন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা আমার নিকট গ্রন্থখানির জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু পুস্তক প্রকাশনা শিল্পে যে-সংকট বিরাজ করছে তাতে এমন বৃহৎ আকারের গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে অগ্রসর হয়ে আসার মতো প্রকাশনা সংস্থা আমাদের এখানে বিশেষ দুর্লভ। যে প্রকাশনা সংস্থা প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে তাঁদের পক্ষেও এ পুস্তক দ্বিতীয় বার প্রকাশ করার সাহস করা সম্ভব হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য এবং দর্শনের এমন চিরায়ত গ্রন্থের প্রয়োজন উপলব্ধি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ-সিদ্ধান্তের উদ্যোগ এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী সাহেবের নিকট থেকে। তিনি আগ্রহসহকারে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলে এ-গ্রন্থকে পুনরায় প্রকাশ করা সম্ভব হত না। আমি ব্যক্তিগতভাবে এজন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করি। ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দও নিশ্চয়ই তাঁর এ-সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন এবং তাঁরাও এজন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করবেন।

আমাদের দেশে কোনো গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরিতেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। প্রেস থেকে শেষ পৃষ্ঠাটি বার করে নিয়ে আসা পর্যন্ত তাঁকে প্রায় ক্ষেত্রে পুস্তকের মুদ্রণের সঙ্গে উদ্বেগসহকারে যুক্ত থাকতে হয়। প্রথম সংস্করণের মুদ্রণকালে অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকেই আমি প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে ঐকান্তিকতার সঙ্গে বলেছিলাম ঃ "যে-কোনো সৃষ্টির চেয়ে একখানি পুস্তক অধিকতর রূপে একটি সাগ্রহ যৌথ সৃষ্টি।" বর্তমান প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমার সেই একই অনুভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের প্রকাশনা কমিটির সদস্য সচিব ও জনসংযোগ অফিসার জবাব নুরল ইসলাম গ্রন্থখানি প্রকাশের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি তদারক করেছেন। প্রকাশনা শাখার ভারপ্রাপ্ত সহকারী জনাব এফ্রানউদ্দীন আহমদ-এর সহযোগিতাও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তাঁদের নিকট এজন্য আমি বৃকজ্ঞ। বাংলা একাডেমী প্রেস পুস্তকখানি মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়েছে। সেখানেও বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা মুদ্রণকার্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, মহাব্যবস্থাপক

থেকে প্রেসের অফিসার জনাব আফজাল হোসেন পর্যন্ত ঃ তাঁদের সকলের সানন্দ সহযোগিতা ব্যতীত 'প্লেটোর রিপাবলিক'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশে অধিকতর বিলম্ব ঘটত। আমি তাঁদের সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদখানিও তৈরি করেছেন শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। তিনি এজন্য আমাদের সকলের ধন্যবাদার্হ। প্রেসকর্মীরা যেমন, আমিও তেমনি প্রুফ সংশোধনের সময়ে গ্রন্থকে বানানবিভ্রাট থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখার চেষ্টা করেছি। হয়তো গুরুতর ভুল কোথাও হয়নি। কিন্তু একেবারে যে ত্রুটিমুক্ত করা গেছে তা সত্য নয়।

কোনো গ্রন্থকে কারুর উদ্দেশে উৎসর্গ করার ব্যাপারটি কেবল আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার নয়। লেখকের একটি আবেগ বা অনুভূতির কিছু উপাদানও এর সঙ্গে জড়িত থাকে। হয়তো লেখক এর মাধ্যমে তাঁর কোনো অনুভবকে প্রকাশ করতে চান।

১৯৭৪-এর মধ্যভাগে 'প্লেটোর রিপাবলিক' যখন প্রকাশিত হয় তখন আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনে, বিশেষ করে জ্ঞানপরিচর্যার ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল গ্রন্থখানির উৎসর্গপত্রে নিম্নের বাক্যটির উৎকিরণে ঃ

> "১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ—
> তবু যাঁরা জ্ঞানের চর্চা করেন,
> এবং যুক্তিকে শ্রেয় জ্ঞান করেন
> তাঁদের উদ্দেশে।"

বর্তমানে আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি পেয়েছে বই হ্রাস পায়নি। সে কারণে বাক্যটির তাৎপর্য আজও অব্যাহত। কিন্তু বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণটিকে আমার উৎসর্গ করার ইচ্ছা হচ্ছে প্রথম সংস্করণের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অনুবাদককে উৎসাহিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যকার জ্ঞানতাপস ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং কবি ও সাহিত্যিক হাবিবুর রহমান, যে মহৎপ্রাণ ব্যক্তিরা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **সরদার ফজলুল করিম**
৩০শে অক্টোবর, ১৯৮২

মুখবন্ধ : প্রথম সংস্করণ

ইংরেজী ভাষায়'রিপাবলিক'-এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক বেনজামিন জোয়েটের অনুবাদ ব্যতীত কর্ণফোর্ড, এইচ. ডি. পি. লী এবং রিচার্ডস-এর অনুবাদও আমাদের নিকট পরিচিত। জোয়েটের অনুবাদের ভাষা-মাধুর্য সুবিদিত। সাম্প্রতিককালে অনেক অনুবাদক প্লেটোর ভাষার মাধুর্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ না করে 'রিপাবলিক'-এর বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাতে মানুষের দৈনন্দিন সংলাপ যেরূপ সাধারণ ভাষায় সংঘটিত হয়, এই ভাষ্যকারগণ তাঁদের অনুবাদে সেরূপ ভাষা ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছেন। এর ফলে এ সমস্ত অনুবাদে সাহিত্য-স্বাদের অভাব অনুভূত হয়। অথচ প্লেটো পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। গবেষকগণ এ ক্ষেত্রে একমত যে, প্লেটোর ভাষাশৈলী ছিল বিস্ময়কর। তাঁর বিপুল সংলাপরাজি ব্যঞ্জনার দিক থেকে গদ্যকাব্যের ঝঙ্কারময় সৃষ্টি। প্রাচীন গ্রীক ভাষার সঙ্গে আমরা অপরিচিত। কিন্তু জোয়েটের অনুবাদের ভাষার মাধুর্য আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য বর্তমান অনুবাদে আমি কেবল যে জোয়েটের উপর নির্ভর করেছি, এ কথা বলা যায় না। বাংলা ভাষায় প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষার সাবলীলতার দিকে আমি যথাসাধ্য দৃষ্টি দিয়েছি। কিন্তু জোয়েটের অনুবাদ যদি কোথাও দুর্বোধ্য বোধ হয়েছে তবে সেক্ষেত্রে কর্ণফোর্ড, লী এবং জোয়েট ঃ সকলের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করে সম্ভাব্য অর্থকে আমি গ্রহণ করেছি।

'রিপাবলিক' অনুবাদের কাজটি অল্প সময়ের কোনো কাজ নয়। বস্তুতঃ এ কাজটি আমি প্রায় দশ বৎসর পূর্বে শুরু করি। প্লেটোর রচনার কোনো অনুবাদ বাংলাতে না থাকাতে আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে দৈন্য হিসাবে বিবেচনা করে আমি একদিন প্লেটের কিছু কিছু রচনা ইংরেজী থেকে বাংলাতে পেশ করার কাজ শুরু করি। এর ফলশ্রুতি হিসাবে 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' 'ক্রিটো' 'ফিডো', 'চারমিডিস', 'লীসিস' এবং 'ল্যাচেস'—এই ছ'টি সংলাপের সংকলন হিসাবে আমার 'প্লেটোর সংলাপ' গ্রন্থখানি ১৯৬৫ সনে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। অনুবাদখানি সাহিত্যানুরাগী এবং পাঠক সাধারণের নিকট থেকে বিশেষ সমাদর এবং প্রশংসা লাভ করে। ১৯৭৩ সনে এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত অনুবাদ ব্যতীত ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম' সংলাপখানি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। 'সিম্পাজিয়াম' নামে তাঁর সে অনুবাদও বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'রিপাবলিক' অনুবাদের কাজ দীর্ঘকাল পূর্বে শুরু করলেও ব্যক্তিগত

জীবনের নানা প্রতিকূল অবস্থা এবং বিপর্যয়ের কারণে ধারাবাহিকভাবে এবং দ্রুততার সঙ্গে এর অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মাঝে মাঝে অনুবাদে বিরাম ঘটেছে। কিন্তু 'রিপাবলিক'-এর প্রথম পুস্তকখানি কয়েক বছর পূর্বে, অধুনালুপ্ত 'পরিক্রম' পত্রিকাতে প্রকাশিত হলে সাহিত্যানুরাগী এবং ছাত্রসমাজের তরুণ বন্ধুদের নিকট থেকে অনুবাদটি সম্পূর্ণ করার তাগিদ আসে। সে অনুরোধে উৎসাহিত হয়ে আমি কাজটি নিয়ে আবার অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে বাংলা একাডেমী থেকে অধ্যাপক সৈয়দ মকসুদ আলী সাহেব অনূদিত 'প্লেটোর রিপাবলিক' প্রকাশিত হয়।

চিরায়ত সাহিত্যভাণ্ডারের যে-কোনো সম্পদের অনুবাদ, প্রকাশ ও পরিবেশন যতো অধিক হাতে ঘটে ততো সেই সম্পদের উপলব্ধিতে যে সাহায্য হয় তাই নয়, তাতে আমাদের নিজেদের ভাষা এবং সাহিত্যেরও যে সমৃদ্ধি ঘটে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

'রিপাবলিক'-এর বর্তমান অনুবাদ জোয়েট, কর্ণফোর্ড এবং এইচ. ডি. পি. লী'র ইংরেজী অনুবাদের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। 'রিপাবলিক'কে সাহিত্যানুরাগী এবং আগ্রহী ছাত্র-সাধারণের নিকট সহজবোধ্য এবং অনুধাবনযোগ্য করার জন্য অধ্যায়ক্রম, টীকা, ব্যাখ্যা এবং আলোচনার যে চেষ্টা বর্তমান পুস্তকে করা হয়েছে তার উল্লেখ ভূমিকাতে আছে। গ্রন্থমধ্যে আলোচিত বিষয়সমূহকে সহজে নির্দিষ্ট করার জন পুস্তক শেষে একটি নির্ঘণ্টও সংযোজিত হয়েছে। এরূপ পূর্ণাঙ্গ এবং ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ বাংলা ভাষাতে নেই বলেই এ জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও পরিশ্রম সত্ত্বেও কাজটি সম্পন্ন করার তাগিদ আমি অনুভব করেছি।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গ্রন্থ হিসাবে 'রিপাবলিক' আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য পুস্তক। আমাদের শিক্ষার মাধ্যম দ্রুত বাংলায় রূপান্তরিত হচ্ছে। বৈদেশিক কোনো ভাষা কোনো দেশেরই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চিরকাল বজায় থাকতে পারে না। ইংরেজীর শিক্ষণ এবং চর্চা অধিকতর সুনির্দিষ্ট, লক্ষ্যসম্পন্ন, উন্নত এবং সুসংগঠিত হবে—এটাই আমরা আশা করি। কিন্তু বাংলা মাধ্যমের ঔচিত্যের কারণেই যে 'রিপাবলিক'-এর মতো পুস্তকের বাংলা অনুবাদ আবশ্যক, তা নয়। বাস্তব কারণে আমাদের দেশে শিক্ষার মান যেমন বিনষ্ট হয়েছে, তেমনি ইংরেজী শিক্ষার মানের অধিকতর অবনয়ন ঘটেছে। ফলে, আমাদের কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ডিগ্রী এবং ডিগ্রী-উত্তর পর্যায়ের ছাত্র-সাধারণের ইংরেজী পুস্তকসমূহ অনুধাবনের ক্ষমতা খুবই কম। শিক্ষার মান উন্নত করার

একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতৃভাষায় জ্ঞানের ভাণ্ডারকে দ্রুত সমৃদ্ধ করে তোলা। 'রিপাবলিক'-এর ন্যায় গন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের ছাত্র সমাজের পরিচয় শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু সে কাজ এ সমস্ত পুস্তকের উন্নতমানের অনুবাদের মাধ্যমেই মাত্র সম্ভব। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের মনে বর্তমান অনুবাদ যদি প্লেটো এবং 'রিপাবলিক' সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়, তাহলে আমি আমার পরিশ্রমকে সার্থক বিবেচনা করব।

যাঁদের আগ্রহ এবং অনুরোধ আমাকে এই কাজে উৎসাহিত করেছে তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক সাহেবের অকৃপণ উৎসাহদান আমার মনে সর্বদা জাগরিত থাকবে। বর্তমান পাণ্ডুলিপিখানা যখন আমি সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে দেখাই, তখন তিনি এর যথাশীঘ্র প্রকাশের জন্য তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করার কথা তিনি বলেন। ছাত্র-সাধারণের জন্য বাংলাতে এরূপ পুস্তকের অনুবাদ এবং বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতমানের পুস্তক রচনাকে তিনি যে আন্তরিকভাবে কতো জরুরী বিবেচনা করেন তা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র-শিক্ষক মাত্রই জ্ঞাত আছেন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদেরও আমার আন্তরিক সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁদের সঙ্গে দর্শন এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান পাণ্ডুলিপির প্রেস কপি ব্যবহার করতে দেখে তাঁরা এ পুস্তকের দ্রুত প্রকাশের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন।

বাংলাদেশে কাগজ এবং মুদ্রণ শিল্পে যে অবিশ্বাস্য সংকট বিরাজমান তাতে এরূপ পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের কথা আজকাল একেবারেই অচিন্তনীয়। উনসত্তর-সত্তর সালের তুলনায় মুদ্রণ খরচের বহুগুণ বৃদ্ধি ব্যতীত মুদ্রণের কাগজ কেবল যে দুর্মূল্য তাই নয়, সে কাগজ এখন দুষ্প্রাপ্য। এরূপ অবস্থায় 'বর্ণমিছিলের' প্রকাশক-বন্ধু তাজুল ইসলাম সাহেব কোনো ব্যবসায়-লাভের কারণে নয়, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের কারণেই প্লেটোর 'রিপাবলিক' মুদ্রণ এবং প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর এই আগ্রহ ব্যতীত এ গ্রন্থ প্রকাশ হয়তো সম্ভব হত না। বস্তুতঃ, কোনো পুস্তকই কারো একার সৃষ্টি নয়। না লেখকের কিংবা অনুবাদকের। এ সত্যের প্রত্যয় বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে আমার অধিকতর দৃঢ় হয়েছে। অপর যে-কোনো সৃষ্টির চেয়ে একখানি পুস্তক অধিকতর রূপে একটি সাগ্রহ-যৌথ সৃষ্টি। 'রিপাবলিক'-এর বর্তমান প্রকাশও একটি যৌথ সৃষ্টি। এতে আমার চেয়ে 'বর্ণমিছিলের' মালিক, তাঁর প্রেসের ম্যানেজার, কম্পোজিটারবৃন্দ, মেশিনম্যান, প্রুফ সংশোধক এবং

বার্তাবাহক কর্মীদের ইচ্ছা এবং পরিশ্রমের যোগান কম ঘটেনি। তাঁদের সকলের নিকটই আমি কৃতজ্ঞ। প্রখ্যাত শিল্পী কাইয়ূম চৌধুরী সাহেবের নিকটও বর্তমান পুস্তকের প্রচ্ছদের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শিল্পী, বিশেষ করে কাইয়ূম সাহেব কেবল যে একখানি পুস্তকের একটি উজ্জ্বল প্রচ্ছদ তৈরী করে পুস্তকের বহিঃসৌকর্য বৃদ্ধি করেন, তাই নয়; তিনি তাঁর অক্ষর, বর্ণ এবং পারিপাট্যের কল্পনার মাধ্যমে পুস্তকের অন্তর্নিহিত ভাবটি পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান। এটি তাঁর বৈশিষ্ট্য।

মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই পুস্তকটিকে ত্রুটিশূন্য, বিশেষ করে বাংলা বানানের বিভ্রাট থেকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটি খুব দুরূহ কাজ। তাঁদের সকলের চেষ্টা সত্ত্বেও হয়তো ভুল-ত্রুটি কিছু কিছু রয়ে গেছে। অনুবাদের চতুর্থ পৃষ্ঠার একটি ভুলের কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। আমার মনোযোগের অভাবে উক্ত পৃষ্ঠায় একটি ভুল রয়ে গেছে। 'রিপাবলিক' প্রসঙ্গে 'দৃশ্য' শিরোনামের নিম্নে মুদ্রিত পরিচয়টির শেষ বাক্য দু'টির সংশোধিত পাঠ হবে ঃ "টিমিউস, হারমোক্রাটিস, ক্রিটিয়াস এবং অপর এক ব্যক্তি যার নাম জানা যায়নি—এদের নিকট সক্রেটিস আজ সমগ্র কাহিনীটির বর্ণনা দিচ্ছেন।' এছাড়া কোনো মারাত্মক ভুল গ্রন্থের মধ্যে যে নেই, এটি আনন্দের কথা। তথাপি অনুবাদের ক্ষেত্রে কিংবা অপর কোথাও গুরুতর কোনো ভুল দৃষ্টিতে এলে তা বর্তমান অনুবাদকের গোচরে আনার জন্য সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৫শে আগস্ট, ১৯৭৪

সরদার ফজলুল করিম

সূচিপত্র

মুখবন্ধ (পাঁচ)

ভূমিকা (তেইশ)

রিপাবলিকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ১

সংলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ ৪

প্রথম পুস্তক

অধ্যায় ১ [৩২৭-৩৩১]

ন্যায়ের সংজ্ঞা ঃ আলোচনার সূত্রপাত। সিফালাসের
অভিমত ঃ কথায় ও কাজে সততাই হচ্ছে ন্যায় ৭

অধ্যায় ঃ ২ [৩৩২-৩৩৮]

পলিমারকাস ঃ ন্যায় হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব, শত্রুর প্রতি শত্রুতা ১৬

অধ্যায় ঃ ৩ [৩৩৮-৩৪৮]

থ্রাসিমেকাস ঃ ন্যায় হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ ৩২

অধ্যায় ঃ ৪ [৩৪৮-৩৫৪]

থ্রাসিমেকাস ঃ অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে অধিক লাভজনক ৫৩

দ্বিতীয় পুস্তক

অধ্যায় ঃ ৫ [৩৫৭-৩৬৭] ৭১

ন্যায়ের সংজ্ঞা এখনও স্থির হয়নি

অধ্যায় ঃ ৬ [৩৬৮-৩৭২]

রাষ্ট্র গঠনের উপাদান ৮৯

অধ্যায় ঃ ৭ [৩৭২-৩৭৪]

সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ১০০

অধ্যায় ঃ ৮ [৩৭৫-৩৮৩]

অভিভাবকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১০৬

তৃতীয় পুস্তক

অধ্যায় ঃ ৯ [৩৮৬-৪১২]

অভিভাবকদের শিক্ষা ১২৫

অধ্যায় ঃ ১০ [৪১৩-৪১৭]
শাসক বাছাই ঃ তিন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ১৬৮

চতুর্থ পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১১ [৪১৩-৪৪৫]
ন্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে ঃ রাষ্ট্রে ন্যায়ের অবস্থান ঃ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ ১৭৯

পঞ্চম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১২ [৪৪৯-৪৫৭]
মেয়ে এবং পুরুষের সমতা ২২৫
অধ্যায় ঃ ১৩ [৪৫৮-৪৬৬]
যৌথ পরিবার ও বিবাহ ২৪১
অধ্যায় ঃ ১৪ [৪৬৭-৪৭৩]
আদর্শ এবং বাস্তবের প্রশ্ন ২৫৭
অধ্যায় ঃ ১৫ [৪৭৩-৪৮০]
দার্শনিক শাসক ঃ দার্শনিকের সংজ্ঞা ২৬৯

ষষ্ঠ পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১৬ [৪৮৪-৪৯৭]
দর্শনের দুর্নামের কারণ ২৮৫
অধ্যায় ঃ ১৭ [৪৯৭-৫০২]
'দার্শনিক শাসক' কেবল কল্পনা নয় ৩০৫
অধ্যায় ঃ ১৮ [৫০৩-৫১১]
দার্শনিক-শাসকের শিক্ষা ৩১৪

সপ্তম পুস্তক

অধ্যায় ঃ [৫১৪-৫৪১]
জ্ঞানের চারটি স্তর ৩৩১

অষ্টম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ২০ [৫৪৩-৫৫০]
আদর্শ রাষ্ট্রের পতন ৩৭৫

অধ্যায় ঃ ২১ [৫৫০-৫৫৫]
কতিপয়তন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রী চরিত্র ৩৮৮
অধ্যায় ঃ ২২ [৫৫৫-৫৬২]
গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রী চরিত্র ৩৯৮
অধ্যায় ঃ ২৩ [৫৬২-৫৬৯]
স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র ৪১১

নবম পুস্তক

অধ্যায় ২৪ [৫৭১-৫৯১]
কে সুখী? ন্যায়বান, বা অন্যায়কারী? ৪২৯

দশম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ২৫ [৫৯৫-৬২১]
দর্শন এবং কাব্যের বিরোধ ৪৬৭
নির্ঘন্ট ৫০৯

ভূমিকা

গত শতকের ইংল্যান্ডের সাহিত্য ও শিক্ষার জগতে বেনজামিন জোয়েট (১৮১৭-১৮৯৩) একটি বিখ্যাত নাম। সাহিত্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের মধ্যে সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এ্যারিস্টটলের রচনাসমূহের অনুবাদ। বস্তুত, একথা বলা চলে জোয়েট ইংরেজি ভাষার জন্য গ্রীক দার্শনিকদের নূতন করে আবিষ্কার করেন।[১] ১৮৭১ সালে তাঁর প্লেটোর সংলাপসমূহের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সালে তিনি গ্রীক ঐতিহাসিক থুসিডাইডিসের 'গ্রীসের ইতিহাস' অনুবাদ করেন এবং ১৮৮৫ সালে এ্যারিস্টটলের 'পলিটিক্‌স্‌' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য জগতের, বিশেষ করে আমাদের দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত জনাংশের নিকট প্লেটোর সংলাপরাজি বেনজামিন জোয়েটের অনুবাদের মাধ্যমেই পরিচিত হয়। ইংরেজি ভাষায় প্লেটোর রচনাসমূহের, বিশেষ করে 'রিপাবলিক' গ্রন্থের একাধিক এবং নূতনতর অনুবাদ পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে। মূল গ্রীক ভাষায় পাঠের সঙ্গে কোন্‌ ইংরেজি অনুবাদের কতখানি মিল কিংবা পার্থক্য সে-বিচার গ্রীক ভাষাজ্ঞাত পণ্ডিতগণই করতে পারেন। সে-বিচার আমাদের নয়। তার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জন্য তত অধিক নয়। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রন্থের সুপরিচিত ইংরেজি অনুবাদসমূহের মধ্যে গুরুতর কোনো পার্থক্য নেই। সাম্প্রতিক এবং নূতন একাধিক অনুবাদ সত্ত্বেও অধ্যাপক জোয়েটের অনুবাদ—তাঁর অনুবাদের ভাষা-মাধুর্য এবং সাবলীলতার কারণে আজও সাহিত্যানুরাগীর নিকট আদরণীয়। প্রকৃতপক্ষে জোয়েট-কৃত প্লেটোর 'রিপাবলিক' এবং অন্যান্য সংলাপের পাঁচ ভল্যুমের অনুবাদ ইংরেজি সাহিত্যে একটি স্থায়ী আসন দখল করে আছে।

অধ্যাপক বেনজামিন জোয়েট 'রিপাবলিক' অনুবাদের দীর্ঘ ভূমিকায় 'রিপাবলিক'-এর মূল্যায়ন করতে যেয়ে বলেছেন ঃ

> প্লেটোর সংলাপসমূহের মধ্যে বিধান বা 'লজ' গ্রন্থকে ছেড়ে দিলে 'রিপাবলিক' কেবল যে বৃহত্তম সংলাপ-গ্রন্থ, তা-ই নয়; 'রিপাবলিক' অবশ্যই প্লেটোর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। উচ্চতর দর্শন বা তত্ত্ববিদ্যার সাক্ষাৎ আমরা 'ফিলেবাস' এবং 'সফিস্ট'-এ পাই। তাঁর 'স্টেটসম্যান' 'রিপাবলিক'-এর চেয়ে অধিকতর আদর্শমূলক। 'লজ'-এর মধ্যে রাষ্ট্রের কাঠামো এবং

---

১. Everyman's Encyclopaedia.

রাষ্ট্র প্রকারের আলোচনা 'রিপাবলিক'-এর চেয়ে অধিকতর স্পষ্ট। শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে 'সিম্পোজিয়াম' এবং 'প্রোটাগোরাস'-এর স্থান অবশ্যই 'রিপাবলিক'-এর চেয়ে ঊর্ধ্বে। তথাপি 'রিপাবলিক'-এর মধ্যে আমরা প্লেটোর দৃষ্টির যে বিস্তার দেখতে পাই এবং সংলাপরীতির উৎকর্ষের যে চরম সাফল্য 'রিপাবলিক'-এ অর্জিত হয়েছে তার নিদর্শন অপর কোনো সংলাপে নেই। জগৎ এবং জীবনের জ্ঞানের এমন ব্যাপ্তি, চিন্তার ক্ষেত্রে শুধু এক যুগের নয়, সকল যুগের নূতন এবং পুরাতনের এই সম্মিলন অপর কোনো সংলাপে আমরা দেখিনে। কেবল তা-ই নয়, ব্যঙ্গ, পরিহাস, উপমা এবং নাটকীয় ক্ষমতার এমন পরাকাষ্ঠাও অন্যত্র বিরল। জীবন এবং কল্পনার মধ্যে, রাষ্ট্রনীতি এবং দর্শনের মধ্যে গভীর সম্পর্কস্থাপনের যে-প্রয়াস প্লেটো 'রিপাবলিক'-এ প্রদর্শন করেছেন, এমন প্রয়াসের সাক্ষাৎ অপর কোনো সংলাপে দেখা যায় না। এদিক থেকে বলা চলে ঃ 'রিপাবলিক' হচ্ছে প্লেটোর সকল সংলাপের কেন্দ্রবিশেষ। 'রিপাবলিক'-কে কেন্দ্র করেই অপর সকল সংলাপ গ্রথিত হয়েছে। 'রিপাবলিক'-এ, বিশেষ করে 'রিপাবলিক'-এর পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুস্তকে প্রাচীন দর্শনের সাফল্যের চরমবিন্দু যেন অর্জিত হয়েছে।[১]

জোয়েট অকৃপণভাবে প্লেটোর দর্শনের, প্লেটোর দার্শনিক চিন্তার প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, যুক্তিবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের পরবর্তীকালের পদক্ষেপগুলো মানুষের পক্ষে সক্রেটিস এবং প্লেটোর বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই মাত্র সম্ভব হয়েছে।

কোনো বিষয়ের সংজ্ঞাদানের নীতি, বিরোধিতার বিধান কিংবা চক্রাকারে যুক্তিদানের ভ্রান্তি, পরিহার্য এবং অপরিহার্যের ব্যবধান, উদ্দেশ্য এবং উপায়ের পার্থক্য, এবং মনকে তার প্রজ্ঞা, প্রবৃত্তি এবং আবেগের বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্টকরণ কিংবা প্রবৃত্তি এবং ভোগকে পরিহার্য এবং অপরিহার্যে বিভাগকরণ এবং চিন্তার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার সুসংবদ্ধ প্রয়াস প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটোর রচনাতেই আমরা প্রথম দেখি। বস্তু এবং মানুষের ভাষায় বস্তুর প্রকাশকারী শব্দের মধ্যে যে একটা ব্যবধান রয়েছে এবং সে-ব্যবধান জীবনের ক্ষেত্রে যে একটি গুরুতর সমস্যা—এর প্রতি প্লেটোই জ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। অনেক দার্শনিক একে বিস্মৃত হলেও প্লেটোর এ-অবদান নিঃসন্দেহে এক বিরাট অবদান। [রিপাবলিক ঃ ৪৫৪ দ্রষ্টব্য] ...

আবার ইউটোপিয়া বা কল্পলোক সৃষ্টির ক্ষেত্র যদি ধরা যায়, তবে প্লেটোকে আমরা এ-ক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শক বলে গণ্য করতে পারি। ... পুনর্জাগরণের

১. Dialogues of Plato : B. Jowett, Vol. III, 3rd Edn. Introduction.

যুগে ইউরোপে জ্ঞানের আলোর উদ্ভাসনে যে-সমস্ত চিন্তাবিদের দান রয়েছে, তাঁদের মধ্যেও প্লেটোর প্রভাবই সর্বাধিক। শিক্ষার ক্ষেত্রে 'রিপাবলিক' অবশ্যই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মিল্টন, রুশো, গ্যেটে ঃ এঁরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্লেটোর উত্তর-পথিক। ... ... দর্শন, রাষ্ট্রনীতি এবং সাহিত্যে ভাববাদের জনক হচ্ছেন প্লেটো।[১]

সুপরিচিত লেখক উইল ডুরান্টও প্লেটোকে পাঠকসাধারণের নিকট উপস্থিত করতে গিয়ে বলেছেন ঃ

প্লেটোর বিরুদ্ধে সমালোচনা যা-ই থাকুক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, প্লেটোর সংলাপ বিশ্বে জ্ঞানভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ এবং সমস্ত সংলাপের মধ্যে 'রিপাবলিক' হচ্ছে সর্বোত্তম। 'রিপাবলিক' একখানি সামগ্রিক তত্ত্বগ্রন্থ। বলা চলে এ-গ্রন্থে সমগ্র প্লেটো একখানি গ্রন্থের আকার লাভ করেছেন। এই সংলাপে আমরা যেমন তাঁর অধিবিদ্যা (দর্শন), তাঁর ধর্মতত্ত্ব, তাঁর নীতিতত্ত্ব, তাঁর মনোবিদ্যার ধারণা পাই, তেমনি পাই তাঁর শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি এবং শিল্পতত্ত্বেরও। এই গ্রন্থে যে-সমস্যাসমূহের আমরা সাক্ষাৎ পাই, সে-সমস্যা আধুনিককালের জন্য অপরিচিত কোনো সমস্যা নয়। আধুনিকতার স্পষ্ট আভাস আমরা প্লেটোর সাম্যবাদ এবং সমাজতত্ত্ব, তার নারীতত্ত্ব এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সুপ্রজনন তত্ত্বের মধ্যে দেখতে পাই। এখানে নীৎসের নীতিদর্শন এবং অভিজাততন্ত্রের যেমন প্রকাশ রয়েছে, তেমনি প্রকাশ রয়েছে রুশোর শিক্ষানীতির এবং তাঁর প্রাকৃতিক রাজ্যের উত্তমতার চিন্তার, বার্গসঁর জীবনশক্তির এবং ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষার। এক কথায় ঃ 'রিপাবলিক'-এর মধ্যে কী নেই? সবকিছুই 'রিপাবলিক-এর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এ যেন বিদ্বজ্জনের ভোজসভায় অতিথিপরায়ণউদারহৃদয় গৃহস্বামী প্লেটোর অকৃপণ আপ্যায়ন।[২]

জোয়েট কিংবা ডুরান্টের এই মূল্যায়নে যেমন প্লেটোর অতুলনীয় প্রজ্ঞার যথার্থ স্বীকৃতি রয়েছে, তেমনি এ-মূল্যায়ন এরূপ একটি ধারণারও সৃষ্টি করে, যেন প্লেটোর মধ্যেই প্রাচীন গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানের, চিন্তা-মনীষার চরম প্রকাশ ঘটেছে। এরূপ ধারণা যথার্থ নয়। সময়ের গতিতে পর্যায় থেকে পর্যায়ন্তর অবশ্যই মানুষের অভিজ্ঞতার সম্ভারে সমৃদ্ধতর। কিন্তু তাই বলে কোনো পর্যায়ের কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তিকে বিকাশের চরম বলে ব্যাখ্যাদান পরিপূর্ণ যথার্থতা বহন করে না।

---

১. Dialogues of Plato : B. Jowett. Vol III, Introduction.
২. The Story of Philosophy : Will Durant, Pocket Library Edn. 1954, p. 15.

প্লেটো এবং এ্যারিষ্টটল গ্রীকসভ্যতার অত্যুজ্জ্বল রত্ন। তাঁদের ব্যক্তিগত ধীশক্তি এবং সৃজনক্ষমতা কালজয়ী হয়ে পৃথিবীর মানুষের চিন্তাভাবনাকে আজও প্রভাবিত করে চলেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লেটোর যুগ কিংবা প্লেটোর দর্শন যে সর্বতোভাবেই তাঁর সমসাময়িক কিংবা পূর্বগামী জ্ঞানী এবং দার্শনিকদের চেয়ে উৎকৃষ্টতার উত্তুঙ্গতা অর্জন করেছে—এরূপ দাবি সকল চিন্তাবিদ করেন না। বেনজামিন ফ্যারিংটন ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে বলেছেন ঃ

> প্লেটো, বিকশিত গ্রীক মননের দায়িত্বপূর্ণতা এবং বিজ্ঞতার যথার্থ প্রতিনিধি—এমন কথা বলা চলে না। প্লেটো অবশ্যই বিরাট ধীশক্তি এবং সৃজনক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের এসকাইলাস, হিপোক্রাটিস এবং থুসিডাইডিসের ন্যায় বিরাট ব্যক্তিদের মননের উচ্চস্তরে প্লেটোর স্থান নির্দিষ্ট করা চলে না। গ্রীক দর্শন, তথা গ্রীক মননের ক্ষেত্রে প্লেটোকে আমরা আয়োনীয় মুক্তবুদ্ধির বিরুদ্ধে দাসদের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সঙ্কীর্ণতাবাদী ধ্বংসোন্মুখ নগররাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর স্বার্থে একটি রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। হোমারের কাব্য, আয়োনীয় প্রকৃতি-দর্শন এবং এথেন্সের নাট্যকলা, অর্থাৎ গ্রীক সংস্কৃতির সবচেয়ে মূল্যবান যে-সম্পদ, প্লেটো আমরণ সংগ্রাম করেছেন তার বিরুদ্ধে, তার পূর্ণতর বিকাশের জন্য নয়।[১] " ...
>
> এর চাইতেও গুরুতর এমন উক্তি আছে যে "... প্লেটোর দর্শন হচ্ছে সবরকম উদারনীতির ভাবধারার উপর ইতিহাসে দৃষ্ট সবচাইতে নির্মম এবং সবচাইতে গভীর আক্রমণ। প্রগতিশীল ভাবনাসূত্র বলতে যা-কিছুই বোঝাক-না কেন এবং আদর্শ হিসাবে এমন চিন্তার আরাধ্য যা-ই হোক না কেন সব কিছুই প্লেটো-দর্শন নস্যাৎ করার লক্ষ্যে উদ্যত। প্লেটোর নিকট সাম্য, স্বাধীনতা, স্ব-শাসন—সবই আবেগতাড়িত আদর্শবাদী অবাস্তব মরিচীকা বই আরকিছু নয়।[২] "

প্লেটোর মূল্যায়নে এই মতপার্থক্য থেকে একথা স্পষ্ট যে, প্লেটো আজও একটি বিতর্কিত প্রতিভা। প্লেটো আজও প্রভাবশালী এবং ক্রিয়াশীল।

ইতিহাসের যে-কোনো চিন্তাবিদ এবং লেখককে কেবলমাত্র তাঁর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই যথার্থরূপে বোঝা সম্ভব। তাঁর মূল্যায়নের জন্য আমাদের একটি ইতিহাস-বোধের আবশ্যক। প্লেটোর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্লেটো কোন সমাজে কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঃ বিকাশের কোন্ পর্যায়ে সে-সমাজ

---

১. Science and Politics in the Ancient World : Benjamin Farrington, p. 119.

২. Plato Today : R. H. S. Crossman, p. 84.

তখন পৌঁছেছিল, সমাজের অর্থনীতিক শ্রেণীবিন্যাস কী ছিল এবং সেক্ষেত্রে এই বিশেষ চিন্তাবিদের অবস্থান কোন্ শ্রেণীতে ঘটেছিল, কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ-পরিপোষক ছিল তাঁর চিন্তা এবং কর্ম, সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই চিন্তাবিদের চিন্তা এবং কর্ম সহায়ক কিংবা প্রতিরোধী ভূমিকা পালন করেছিল—এ-সমস্ত প্রশ্নের বিবেচনা আবশ্যক।

আমাদের বর্তমান আলোচনা গ্রীক-ইতিহাস নিয়ে নয়। তবু প্লেটোকে অনুধাবনের জন্য গ্রীক-ইতিহাসের বিকাশের বহিঃরেখাটি আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক। আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক, প্লেটো গ্রীক-ইতিহাসের বিকাশের কোন্ স্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? তাঁর পূর্বে গ্রীক-রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষ করে এথেন্সে জ্ঞানবিজ্ঞানের, তার অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রনীতির কী বিকাশ সাধিত হয়েছিল? সমসাময়িক সমাজব্যবস্থার মূল সংকট কী ছিল এবং প্লেটোর সঙ্গে এ-সংকটের সম্পর্ক কীরূপ ছিল?

প্লেটোর 'রিপাবলিক' একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা, একটি ইউটোপিয়া বা কল্প-চিত্র। এ-কারণে প্লেটোকে ইউটোপিয়ার অন্যতম জনক বলে অভিহিত করা হয়। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র কাল্পনিক হলেও প্লেটো সমাজের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কল্পনাবিলাসী সন্ন্যাসী ছিলেন না। প্লেটোর জীবনকাহিনী থেকে দেখা যায়, প্লেটো এথেন্স নগররাষ্ট্র তথা সমগ্র গ্রীকজগতের সামাজিক রাজনীতিক ঘটনাবলী এবং সমস্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। প্লেটো সমস্যাকণ্টকিত জীবনের মধ্যে বাস করেছেন, সমস্যার তীব্রতা তিনি বোধ করেছেন এবং তার সমাধানের তিনি প্রয়াস পেয়েছেন। সে-প্রয়াসের বহুমুখীতা তাঁর জীবনকাহিনীতে বিধৃত রয়েছে।

প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৮ কিংবা ৪২৭ সনে প্লেটো গ্রীসের এথেন্স নগরীতে একটি অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (প্লেটোর জীবনকাল ঃ ৪২৮—৩৪৭ খ্রিঃ পূঃ)। প্লেটোর পিতা এরিষ্টন প্লেটোর অল্পবয়সেই মারা যান। কেবল পিতার সূত্রে নয়, প্লেটোর মাতা পেরিকটিয়নও অভিজাত বংশীয়া ছিলেন। 'রিপাবলিক'-এর সংলাপে অংশগ্রহণকারী অ্যাডিম্যান্টাস এবং গ্লকন প্লেটোর সহোদর ছিলেন। এরিস্টনের মৃত্যুর পরে প্লেটোর মাতা দ্বিতীয় বিবাহ করেন। পেরিকটিয়নের দ্বিতীয় স্বামী পাইরিল্যামপিস যেমন রাষ্ট্রনেতা পেরিক্লিসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও এথেন্সের রাজনীতিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য নাগরিক ছিলেন।[১]

১. The Republic : H. D. P. Lee : Introduction. P. 9.

পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাসে গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহের অভ্যুদয় বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। প্রাচীনকালের সভ্যতাসমূহের বিকাশ ঘটেছিল সমুদ্র এবং নদীতীরে। সেদিক থেকে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল এবং দ্বীপের ন্যায় তার উত্তর উপকূলের গ্রীক-উপদ্বীপে বহু প্রাচীনকালেই জনবসতি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই জনসবতি পাহাড়-পর্বত-অধ্যুষিত এই উপদ্বীপের প্রাকৃতিক চরিত্রের কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের রূপ লাভ করে। গ্রীকসভ্যতার বিকাশের সময়ে এবং তারও পূর্বে মিশর, সিরিয়া এবং প্রাচ্যে ঃ ভারতবর্ষ এবং চীনে সভ্যতা বিকাশলাভ করে। কিন্তু উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা প্রাচ্য অঞ্চলের রাষ্ট্রের রূপ সমতটের বিস্তারের কারণে ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের পরিবর্তে বৃহদায়তন রাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করে। বৃহদাকার এবং ক্ষুদ্রাকার রাষ্ট্রের পার্থক্য কেবল আয়তনের পার্থক্য নয়। ক্ষুদ্রতরসংখ্যক মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা অধিকতর সংখ্যক মানুষ এবং বৃহদায়তন সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বহুলাংশে পৃথক হতে বাধ্য। ক্ষুদ্রায়তন গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের তুলনায় এক-একটি ক্ষুদ্র শহর-প্রায় ছিল, একথা বলা চলে। এথেন্স নগররাষ্ট্রের মোট অধিবাসীর মধ্যে আড়াই লক্ষ ছিল দাস এবং দাসদের কোনো রাজনীতিক অধিকার ছিল না।"[১] অবশিষ্ট দেড় লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যতীত অপর সকলেই যে নাগরিক বলে গণ্য হত তা নয়। অপর দ্বীপ বা নগররাষ্ট্র থেকে যারা ব্যবসায়কর্মে কিংবা অপর কারণে এথেন্সে এসে বসবাস করত তারাও নাগরিক বলে গণ্য হত না। ফলে যথার্থভাবে যারা এথেন্সের নাগরিক ছিল তাদের সংখ্যা খুব কম। এই অল্পসংখ্যক নাগরিকগণ প্রায় গোষ্ঠীগতভাবে বাস করত। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ এবং প্রত্যক্ষ। প্রাচীন এথেন্সে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র-বিকাশের এটাই ছিল পটভূমি। এই গণতন্ত্র সম্পর্কে দুটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক ঃ ১. এ-গণতন্ত্র নগরের সকল অধিবাসীর উপর বিস্তারিত ছিল না। ২. যারা নাগরিক ছিল তারাও অর্থনীতিকভাবে কেবলমাত্র একটি শ্রেণীভুক্ত ছিল না। নাগরিকদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ এবং রাজনীতিক দ্বন্দ্ব ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্স রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অভিজাত (পুরনো পরিবার এবং প্রচুর জমির মালিক), ব্যবসায়ী, কৃষক এবং নিঃস্ব—এরূপ কয়েকটি অর্থনীতিক শ্রেণীর সাক্ষাৎ মেলে। এদের সকলকে নিয়েই এথেন্সের শাসকশ্রেণী গঠিত ছিল। এদের রাজনীতিক দ্বন্দ্ব অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র বলে অভিহিত হত। গণতন্ত্রীগণ শাসনব্যবস্থায় অধিকতর-সংখ্যক নাগরিকদের অংশগ্রহণে বিশ্বাসী ছিল। অভিজাততন্ত্রীগণ অর্থ, বুদ্ধি এবং শিক্ষার যোগ্যতার ভিত্তিতে

১. The Story of Philosophy : Will Durant. P. 4.

শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টা করত। গণতন্ত্রীদলের মধ্যেই গ্রীসে, বিশেষ করে এথেন্সে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ অধিকতর হত।

গ্রীসের রাজনীতিক ইতিহাসে বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে রাজনীতিক দ্বন্দ্ব প্রধানত এই অভিজাততন্ত্রী এবং গণতন্ত্রীদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। কখনো নগরশাসনের ক্ষমতা অভিজাতদের হাতে রক্ষিত হয়েছে, কখনো গণতন্ত্রী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অভিজাতদের হাত থেকে ক্ষমতা দখল করেছে। শাসনের এই রকমফের গ্রীক-ইতিহাসে অভিজাততন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র (অলিগার্কি) স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্ররূপে পরিচিত এবং প্লেটো-এ্যারিস্টটলের রচনায় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

গ্রীকদের বসতি এবং সভ্যতা ক্রমান্বয়ে গ্রীক উপদ্বীপ অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি একদিকে যেরূপ ক্ষুদ্রকায় ছিল তেমনি এই নগররাষ্ট্রগুলি এবং বিভিন্ন দ্বীপের গ্রীক বসতি আফ্রিকা এবং এশিয়ার সভ্যতা থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা গ্রীকদের মনে একটি সংকীর্ণ গর্ববোধের সৃষ্টি করে। খ্রিষ্টপূর্ব নবম এবং অষ্টম শতকের অন্ধ গ্রীক কবি হোমারের কাব্যগাথাই গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষ্য। এই সময়েই দেখা যায় যে, গ্রীকগণ নিজেদেরকে সভ্য এবং অগ্রীসবাসীদের বর্বর বলে আখ্যায়িত করছে।

কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে অতীতের দৈহিক বিচ্ছিন্নতার স্থলে গ্রীস এবং এশিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০ এবং ৪৮০ সনে পরপর দুবার পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট দারায়ুস (Darius) এবং জারাক্সিস গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিকে বিরাট বাহিনীসহ আক্রমণ করেন। কিন্তু উভয় আক্রমণেই গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রধান দুটি নগররাষ্ট্র এথেন্স এবং স্পার্টা ঐক্যবদ্ধভাবে পারসিক সম্রাটের বাহিনীকে প্রতিরোধ করে এবং আক্রমণকারী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। পারস্যের বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এশিয়ায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয়। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির এই যুদ্ধ ছিল স্বাধীনতারক্ষার যুদ্ধ। এর সাফল্য গ্রীকদের গৌরববোধ পূর্বের চেয়েও বৃদ্ধি করে দেয়। এই যুদ্ধে গ্রীক নগররাষ্ট্রের 'নাগরিকদের' সকল শ্রেণীকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফলে গ্রীস-পারস্য যুদ্ধের পরবর্তীকালে গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করে এথেন্সের শাসনপদ্ধতি অধিকতর সার্বজনীন এবং গণতান্ত্রিক রূপ গ্রহণ করে। (দাসরা অবশ্য এই গণতন্ত্রের আওতার বহির্ভূত ছিল)। এথেন্সের অর্থনীতি গ্রীস-পারস্য যুদ্ধের বিজয়ের ফলে অধিকতর শক্তিশালী হয়। যুদ্ধবন্দি

থেকে দাসের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে। প্রায় দুইশত দ্বীপীয় বসতি বা নগররাষ্ট্রের উপর এথেন্সের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এথেন্স প্রায় একটি সাম্রাজ্যের অধিনায়ক হয়ে দাঁড়ায়। নাগরিকদের জীবনে শিল্প-দর্শন-সংস্কৃতিরও বিকাশ ঘটতে থাকে। এই পর্যায়ের মধ্যভাগে এথেন্সের রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে পেরিক্লিসের নাম (খ্রিঃ পূঃ ৪৯০-৪২৯) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পেরিক্লিস খ্রিঃ পূঃ ৪৪৩ সনে এথেন্সের রাষ্ট্রনেতা নির্বাচিত হন। তিনি অভিজাত পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক ছিল। পেরিক্লিসের যুগকে প্রাচীন গ্রীক-গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা হয়।

কিন্তু কালক্রমে গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এথেন্স ক্ষমতার ক্ষেত্রে যেমন সর্বপ্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি অপর নগররাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপ ধারণ করেছিল। ফলে অনেক নগররাষ্ট্র দ্বিতীয় প্রধান নগররাষ্ট্র স্পার্টার নেতৃত্বে এথেন্সের বিরুদ্ধবাদী হয়ে ওঠে। এক সময়ে সমগ্র গ্রীক অঞ্চল এথেন্স এবং স্পার্টার নেতৃত্বে পরস্পরবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের শেষার্ধে ৪৩১ সনে দুই পক্ষের মধ্যে মারাত্মক এবং দীর্ঘস্থায়ী আত্মঘাতী এক যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই যুদ্ধ ইতিহাসে পিলোপনেশীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। প্রায় ত্রিশ বৎসরকাল এই যুদ্ধ চলতে থাকে।

এবং এই যুদ্ধেই এথেন্সের সংকট এবং বিপর্যয়ের শুরু। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরবর্তী বৎসরে ৪৩০ সনে এক ভয়াবহ প্লেগ মহামারি আকারে এথেন্সকে আক্রমণ করে। ত্রিশ হাজারের অধিকসংখ্যক অধিবাসী এই ভয়ঙ্কর মহামারিতে প্রাণ হারায়। সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে এক মর্মান্তিক অসহায়তা এবং অরাজকতা গ্রাস করে। ঐতিহাসিক থুসিডাইডিস তাঁর 'পিলোপনেসীয় যুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে এই মহামারির এক গভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক বর্ণনা দিয়েছেন।[১] যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে প্লেগের এই মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে ৪২৯ সনে এথেন্সের শ্রেষ্ঠ নেতা পেরিক্লিস মারা যান। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলির এই পারস্পরিক আত্মঘাতী যুদ্ধে পক্ষ, প্রতিপক্ষ নির্মমনীতি অনুসরণ করে। বিজয়ী নগর বিজিত নগরকে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করে ফেলে। স্পার্টার শাসনব্যবস্থা সামরিক ধরনের ছিল। যুদ্ধে স্পার্টা এথেন্সকে একাধিক সংঘর্ষে বিপর্যস্ত করে ফেলে। যুদ্ধের ধারাবাহিক বিপর্যয় এথেন্সের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবনের সংকটকে তীব্র করে তোলে।

---

১. The Peloponnesian War : Thucydides. Translated by R. Crawley. Eyeryman's Library, pp 100-102 : A History of Creece : J. B. Bury. p. 402.

এথেন্সের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক থাকায় যুদ্ধের ব্যর্থতার কারণ প্রতিপক্ষীয়, বিশেষ করে অভিজাত মহল গনতন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত করতে থাকে। ক্ষমতাদখলের চেষ্টা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং গুপ্তহত্যার রূপ ধারণ করে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪১১ সনে অভিজাতদের তরফ থেকে ক্ষমতা দখল করা হয় এবং ৪০০ নেতার শাসন বলে এক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ-শাসন বৎসরকালের অধিক স্থায়ী হয় না। পুনরায় গণতন্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ওদিকে স্পার্টার সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। খ্রিঃ পূঃ ৪০৪ সনে স্পার্টার হাতে এথেন্স চরম পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় এবং নগরের এই সংকট-মুহূর্তকে উত্তম সময় বিবেচনা করে অভিজাত দল পুনরায় অভ্যুত্থানের চেষ্টা করে। খ্রিঃ পূঃ ৪০৪ সনেই 'ত্রিশের শাসন' নামে এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়। কিন্তু পরবর্তী বছরে গণতন্ত্রীগণ পুনরায় 'ত্রিশের শাসনকে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হয়। কিন্তু নগরের অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ে। দাসদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নাগরিকদের মধ্যে আন্তঃনগর যুদ্ধের কারণে, ভূস্বামীদের ভূমি এবং দাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

প্লোটোর সংলাপরাজির অবিস্মরণীয় নায়ক 'সক্রেটিস' এই সংকটকালীন এথেন্সের কোনো বিখ্যাত রাষ্ট্রীয় নেতা না হলেও সক্রেটিস ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। সক্রেটিসের জন্ম হয় ৪৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।[১] একজন বিবেকবান, সৎ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সাহসী এবং কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসাবে সক্রেটিস এথেন্সের সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন। পারিবারিকভাবে সক্রেটিস কোনো ভুস্বামী বা অভিজাত ছিলেন না। এক ভাস্করশিল্পীর সন্তান ছিলেন তিনি। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। নগরের সংকট তাঁকে চিন্তান্বিত করে তুলত এবং তিনি বাজার ও জনসম্মেলনে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে মানুষের জীবনের করণীয়-অকরণীয়, সৎ-অসৎ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা পাপ-পুণ্য—সর্ব বিষয় নিয়ে আলোচনা তুলতেন; রাজনীতিক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন মতামত তিনি বজায় রাখতেন। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক নগর কমিটিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং সভাপতি হিসাবেও নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনকালে যেমন তিনি শাসকদের অন্যায় সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন তেমনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের অন্যায় হুকুমকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন—এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসকারগণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে, ব্যক্তি হিসাবে তিনি কোনো শাসকদলেরই বিশ্বাসভাজন না হলেও, তরুণদের মধ্যে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। এবং এ-কারণেই খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৩ সনে গণতন্ত্রীগণ শাসনক্ষমতা দখল করে তাদের প্রতিপক্ষীয়দের বিনাশ

১. A History of Greece : J. B. Bury, pp 76-81.

করার যে-ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তার মধ্যে সক্রেটিসকেও অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে এথেন্সের ধর্ম না মানা এবং তরুণদের মনকে বিদ্রোহী করার অভিযোগ তুলে তাকে বিচারে সোপর্দ করে। এ-বিচারে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৯৯ সনে সক্রেটিস হেমলক পান করে কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।

সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডের সময়ে প্লেটোর বয়স ২৮ বৎসর। প্লেটো সক্রেটিসের হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে আলোড়িত হন। প্লেটোর কৈশোর এবং যৌবন কাটে এথেন্স নগরীর এই সংকটের মধ্যে। অভিজাত অন্যান্য তরুণের ন্যায় কিশোর বয়সেই প্লেটো সক্রেটিসের মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞান, পরিহাসক্ষমতা এবং বিচারমূলক চরিত্র দ্বারা আকৃষ্ট হন। প্লেটোর শৈশব এবং কৈশোর সম্পর্কে তেমন কিছু বিস্তারিতভাবে জানা না গেলেও একথা নিশ্চিত যে, এথেন্সের অভিজাত শ্রেণীর এবং রাজনীতিকভাবে নেতৃস্থানীয় পরিবারের সন্তান হিসাবে প্লেটো সকলরকম শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার সুযোগ লাভ করেন। যৌবনে স্বাভাবিকভাবে প্লেটো এথেন্সের রাজনীতিক জীবনে অংশগ্রহণের আগ্রহ পোষণ করতে থাকেন। রাষ্ট্রের সামাজিক এবং রাজনীতিক সংকট তাঁর সংবেদনশীল তরুণ-মনকে আলোড়িত করে। পারিবারিক এবং শ্রেণীগতভাবে গণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে মনোভাব তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। অধিকন্তু এথেন্সের সংকটকালে গণতান্ত্রিক শাসনের ব্যর্থতা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাবকে দৃঢ়তর করে তোলে। কিন্তু সাধারণ দলীয় নেতার ন্যায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যর্থ বলে অভিজাত সম্প্রদায়ের উপদলীয় শাসনও তিনি আন্তরিকভাবে সমর্থন করতে পারেননি। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪-এর অভ্যুত্থানে প্লেটোর আত্মীয়বর্গ জড়িত থাকলেও, প্লেটো নিজে তাতে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু তাঁর আশা ছিল অভিজাতদের শাসনে রাষ্ট্রের উন্নতি ঘটবে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের শাসনপ্রণালী এবং প্রতিপক্ষের উপর তাদের প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ড তাঁকে 'ত্রিশের শাসন' সম্পর্কে মোহমুক্ত করে। বস্তুত, রাষ্ট্রের সংকট প্রচলিত অভিজাত বা গণতন্ত্রী—কোনো শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই নিরসন করা সম্ভব নয় বলে তাঁর বিশ্বাস দৃঢ় হতে থাকে। প্লেটো এই সংকটের মূল কারণ সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করেন। প্লেটো যাঁকে গুরু বলে মনে করতেন, যিনি ছিলেন এথেন্সের বিবেকের প্রতিভূস্বরূপ, গণতন্ত্রী শাসকদের হাতে সেই সক্রেটিসের বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড প্লেটোর মনকে যেরূপ গভীরভাবে আলোড়িত করে তার চিরায়ত চিত্র প্লেটো তাঁর 'সক্রেটিসের জবানবন্দি' এবং অপর কয়েকটি সংলাপে অবিস্মরণীয়ভাবে অঙ্কন করেছেন।[১] এ

১. প্লেটোর সংলাপ ঃ সরদার ফজলুল করিম ঃ সক্রেটিসের জবানবন্দী, ক্রিটো, ফিডো চারমিডিস, লীসিস এবং ল্যাচেস—ছয়টি সংলাপের অনুবাদ। প্রথম তিনটি সংলাপ সক্রেটিসের বিচার, কারাগারে সক্রেটিসের আলাপ এবং মৃত্যুর উপর রচিত।

ছাড়া প্লেটোর যৌবনকালের মনোভাবের স্মৃতিচারণের পরিচয় পাওয়া যায় বৃদ্ধ বয়সে লিখিত তাঁর একটি পত্রে। এই পত্রকে প্লেটোর 'সপ্তম পত্র' বলে গবেষকগণ চিহ্নিত করেছেন। তাঁর এই স্মৃতিচারণে প্লেটো বলেন ঃ

> তরুণ বয়সে অপর তরুণদের যেমন আশা থাকে, আমারও তেমনি আশা ছিল, যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হব, যখন আমি নিজেই নিজের প্রভুতে পরিণত হব, তখন আমি রাজনীতিক জীবনে প্রবেশ করব। এথেন্সের রাজনীতিক অবস্থায় কতকগুলি ঘটনা আমার এই আকাঙ্ক্ষার অনুকূলেই সংঘটিত হয়েছিল। প্রচলিত শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সংঘবদ্ধ হচ্ছিল এবং পরিশেষে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়। ... এই অভ্যুত্থানের কতিপয় নেতা আমার আত্মীয় এবং সুহৃদ ছিলেন।[১] এঁরা আমাকে তাঁদের সঙ্গে তাঁদের শাসনে যোগদানের আহ্বান জানান। তাঁরা একে স্বাভাবিকই ভেবেছিলেন। আমার নিজেরও প্রত্যাশা ছিল ত্রিশের শাসন রাষ্ট্রে সুস্থতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি তাই তাঁদের কার্যাবলি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। কিন্তু সময়ের স্রোত অধিককাল প্রবাহিত হওয়ার প্রয়োজন পড়ল না। অচিরকাল মধ্যেই দেখা গেল, ত্রিশের শাসন তাদের পূর্ববর্তী শাসনকে স্বর্গরাজ্য বলে প্রতিভাত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে আমার প্রবীণ সুহৃদ সক্রেটিসের ক্ষেত্রে তাদের আচরণ আমাকে বিস্মিত করে দিল। সক্রেটিস ছিলেন সমগ্র এথেন্সের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। একথা বলতে আমার কোনো দ্বিধার কারণ নেই। ত্রিশের শাসন নিজেদের অপকর্মের সঙ্গে সক্রেটিসকে জড়িত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁকে অন্যায়ভাবে হুকুম করল একজন নাগরিককে বধ্যভূমিতে বেঁধে আনতে।[২] সক্রেটিস তাদের এই অন্যায় হুকুমকে পালন করতে অস্বীকার করলেন। তাদের অপকর্মের শরিক হওয়ার চেয়ে সক্রেটিস অপর যে-কোনো পরিণতিকেই শ্রেয় বলে গণ্য করলেন। রাজনীতিক জীবনের এই দৃশ্যাবলী আমার মনকে ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলল এবং আমি প্রচলিত কালের এই কোলাহল থেকে সরে দাঁড়ানোকে উত্তম বলে বিবেচনা করলাম। ... কিছুকালের মধ্যে ত্রিশের পতন ঘটল। শাসনপদ্ধতি আবার পুরোপুরি পালটে

---

১. এখানে খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪-এ সংঘটিত অভিজাতদের অভ্যুত্থানের কথা উল্লেখিত হচ্ছে। প্লেটোর বয়স তখন ২৩। কিন্তু ক্লিয়েসথেনিসের আইন অনুযায়ী শাসনে অংশগ্রহণের বয়স তখনও প্লেটোর হয়নি। এই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে 'ত্রিশের শাসন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ত্রিশের মধ্যে প্লেটোর পিতৃব্য চারমিডিস এবং ভ্রাতৃত্বসম্পর্কিত ক্রিটিয়াস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দ্রষ্টব্য ঃ Republic of Plato : Cornford : Introduction. p. XV.

২. প্লেটোর সংলাপ ঃ সক্রেটিসের জবানবন্দী পৃঃ ২৯-৩০ (২য় সংস্করণ)।

গেল।[১] আবার আমার আশা হল, হয়তো অবস্থার উন্নতি ঘটবে, হয়তো আমি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হব। নির্বাসিত গণতন্ত্রী নেতারা নির্বাসন থেকে প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আর প্রতিহিংসার আবহাওয়া তখন বিরাজমান। প্রতিপক্ষ তার শত্রুর বিরুদ্ধে বর্বর প্রতিশোধের পন্থা গ্রহণ করেছে। এগুলো অস্বাভাবিক ছিল না। বরঞ্চ আমি বলব, সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রী শাসন নমনীয়তারই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু যেটা মর্মান্তিক, সে হল আমার সুহৃদ সক্রেটিসের বিচার। শাসকগোষ্ঠীর কতিপয় নেতা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁকে বিচারে সোপর্দ করল। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপিত হল। দোষী সাব্যস্ত করে বিচারসভা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। এই শাসকদল হত্যা করল সক্রেটিসকে—হত্যা করল এমন এক বিবেকবান ব্যক্তিকে যিনি নিজে একদিন এই নির্বাসিত গণতান্ত্রিক নেতাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ত্রিশের হুকুম পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন। এ সবই আমার চোখের সামনে ঘটল। আমি রাষ্ট্রের সংকট সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলাম। বয়স আমার এতদিনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রের কারা পরিচালক, তা আমি অবলোকন করলাম। যে-বিধি, বিধান, আচারে রাষ্ট্র চলে তার সম্পর্কে আমি সম্যকভাবে ভাবতে লাগলাম। আমি যত চিন্তা করলাম তত দেখতে পেলাম একটা রাষ্ট্রকে উত্তমভাবে শাসন করা দুরূহ ব্যাপার। সুহৃদ এবং বিশ্বস্ত সঙ্গীহীন ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে অক্ষম। তার পক্ষে সংকটে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ অসম্ভব। কিন্তু এই এথেন্সে আমার সুহৃদ কোথায়? এ-এথেন্স আর পুরাতন এথেন্স নয়। পুরাতন এথেন্সের, আমাদের পূর্বপুরুষদের আচার, আচরণ, প্রতিষ্ঠান আজ পরিত্যক্ত। এখানে নূতন সুহৃদ সংগ্রহ আমার পক্ষে সহজ নয়। রাষ্ট্রের সমগ্র আচার, আচরণ, প্রথা, বিশ্বাস, বিধানের দ্রুত এবং ভয়ংকর অবনতি ঘটছে। এই চিন্তার ফলে, আমার এই অভিজ্ঞতার ফলে, আমি যখন দেখলাম, চারদিকে সবকিছু ভেঙে পড়ছে, তখন আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। একথা ঠিক যে, রাষ্ট্রের সংকট সম্পর্কে আমি চিন্তা করা থেকে বিরত হলাম না। আমার চিন্তা হল, কীভাবে এই সংকট থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটতে পারে, বিশেষ করে

---

১. খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৩-এ গণতন্ত্রী শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত শাসনের অন্যতম নেতা অ্যানিটাস সক্রেটিসের বিরুদ্ধে দেবতায় অবিশ্বাস এবং তরুণদের বিভ্রান্ত করার অভিযোগ উত্থাপন করেন।

সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থার সংশোধন কিসে সম্ভব। এ-চিন্তা আমার সর্বক্ষণের চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম সেই উত্তম মুহূর্তের যখন আমার পক্ষে সম্ভব হবে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কোনো সক্রিয় ভূমিকা পালন করার।[১]

সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে প্লেটোর এই মানসিক অবস্থাতেই হয়তো তাঁর রচনার গোড়ার দিকের সংলাপগুলি রচিত হয়েছিল। কিন্তু এর পরবর্তীকালে প্লেটোর জীবনে একটি পর্যটনের পর্যায় দেখা যায়। গবেষকগণ মনে করেন, প্লেটো এর পর এথেন্স পরিত্যাগ করে মিশর, সিরিয়া, দক্ষিণ ইতালি এবং সিসিলি ভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ইতালিতে তখন পাইথাগোরাসের অনুসারীদের একটি বসতি ছিল। তাদের মধ্যে প্লেটো গণিত এবং সংখ্যাশাস্ত্রের সর্বশেষ চর্চার সাক্ষাৎ পান। মিশরে প্লেটো শাসনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গোষ্ঠী, অর্থাৎ ধর্মীয় পুরোহিতগোষ্ঠীর অবস্থান দেখেন। প্লেটোর মনে ইতিমধ্যে এরূপ ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে যে, রাষ্ট্রের এই সামগ্রিক সংকট কেবলমাত্র দার্শনিক অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তিই দূর করতে পারে। সক্রেটিস বলেছিলেন ঃ জ্ঞানেই ধর্ম, জ্ঞানেই মুক্তি। তার ভিত্তিতে প্লেটোও মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা অজ্ঞদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে যতক্ষণ না দার্শনিক অর্থাৎ জ্ঞানীর হস্তে ন্যস্ত হবে, ততক্ষণ মানুষের মুক্তি নেই। রাষ্ট্রীয় শাসন দার্শনিকদের হাতে ন্যস্ত করার দুটি পথ ঃ হয় শাসক দার্শনিক হবে, নয়তো দার্শনিককে শাসক হতে হবে। সিসিলি দ্বীপে সাইরাক্যুজ নগর নামে একটি নগররাষ্ট্র ছিল। প্লেটো দক্ষিণ ইতালি থেকে সাইরাক্যুজ নগরে এসে সাইরাক্যুজের একনায়ক ডায়োনিসাসকে দর্শনপাঠের মাধ্যমে দার্শনিক করার প্রয়াস পান। কিন্তু মনে হয়, তাঁর এ-চেষ্টা একনায়ক ডায়োনিসাস খুব প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে না। এবং দর্শনচর্চার দুরূহতায় রুষ্ট হয়ে প্লেটোকে সে দাস হিসাবে বিক্রি করে দেয়।

সাইরাক্যুজের শাসককে দার্শনিক করার প্রয়াস তাঁর প্রথম ব্যর্থতায় শেষ হয় না। পরবর্তীকালে তরুণ দ্বিতীয় ডায়োনিসাসকে তিনি পুনরায় দার্শনিকে পরিণত করার প্রয়াস পান। সে-কাহিনীতে না গিয়ে আমরা বলতে পারি, প্রাথমিক ব্যর্থতার পরে প্লেটো এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এই পর্যায়ে খ্রিঃ পূঃ ৩৮৬ সনে তিনি এথেন্সে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা এ্যাকাডেমী (প্লেটোর এ্যাকাডেমী) স্থাপন করেন এবং প্রত্যক্ষভাবে এথেন্সকে তাঁর কল্পনানুযায়ী আদর্শ রাষ্ট্রে পরিবর্তিত করতে সক্ষম না হলেও প্লেটো তাঁর এ্যাকাডেমীতে দর্শন,

---

১. প্লেটোর সপ্তম পত্র। এ-পত্র রচনার সময় ৩৭৩ খ্রিঃ পূঃ। দ্রষ্টব্য—কর্নফোর্ড ঃ The Republic of Plato : Introduction এবং George Sabine : A History of Political Theory, p. 37.

গণিত এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার উপর তাঁর মতামত তাঁর শিষ্য এবং ছাত্রদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। তাঁর এরূপ আশা ছিল, তাঁর এ্যাকাডেমীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণরা রাষ্ট্রের কর্ণধার হলে গ্রীসের সমাজ ও সভ্যতার সংকট দূরীভূত হবে। প্লেটোর এই তত্ত্বের এবং চিন্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় 'রিপাবলিক' গ্রন্থে। 'রিপাবলিক' গ্রন্থ সম্ভবত তাঁর এ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালেই রচিত হয়।

গ্রীসীয় রাষ্ট্রীয় জীবনের সংকট ইতিমধ্যে তীব্রতর হয়েছে। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে এথেন্সের চরম পরাজয় এথেন্সের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটকে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এই অবস্থায় কেবল যে দাসশ্রেণী শোষিত হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে, তা-ই নয়; নাগরিকদের মধ্যেও জমি এবং জীবিকাহীন নিঃস্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এথেন্স সকলের নেতা, এথেন্স সবার শ্রেষ্ঠ বলে এতদিন এথেন্সের শাসকশ্রেণীর যে গর্ববোধ ছিল সে গর্ব অসার বলে প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক জীবনে নানা প্রশ্নের উদয় হতে থাকে। দাসপ্রথা যে অস্বাভাবিক এবং অমানবিক—একথা স্বাধীন শিক্ষক সম্প্রদায়, সফিস্টদের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে। সফিস্টগণ পুরাতন কোনো নীতিকেই অলংঘনীয় বলে বিবেচনা করত না। বাস্তবজীবনে ব্যক্তির বাঁচার জন্য যা প্রয়োজন তাকে সঙ্গত এবং সত্য বলে প্রমাণের প্রবণতা সফিস্টদের শিক্ষার মধ্যে প্রকশিত হতে থাকে। প্রখ্যাত সফিস্ট প্রোটাগোরাস বলেন ঃ মানুষই সত্যের নিয়ামক। অনন্যনির্ভর সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই।[১]

'রিপাবলিক' বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী গ্রন্থ। গ্রীকসভ্যতার এক ক্রান্তিকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি যখন ক্ষয়গ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, যখন তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা সমাজের একটা বৃহৎ অংশ দাসের শোষণে আর পরিপোষিত এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারছিল না, তখনই প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর রচনা। অভিজাত এবং গণতন্ত্রী নিয়ে গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলিতে যারা শাসক শ্রেণী, তারা সকলেই এই সংকটে জড়িত হয়ে পড়েছিল। শাসকশ্রেণীর চিন্তাবিদ মাত্রই এই সংকট থেকে মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। খ্রিঃ পূঃ ৩৬৭ সনে প্লেটোর এ্যাকাডেমিতে অ্যারিস্টটল এসে যোগদান করেন। অ্যারিস্টটল তখন সতেরো বছরের যুবক।[২] প্লেটোর বয়স ঃ ষাট কিংবা একষট্টি। পক্ককেশ বৃদ্ধ।

প্লেটোর রাষ্ট্রচিন্তা এবং দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ-দর্শন সংকটগ্রস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর সংকটমুক্তির দর্শন। কিন্তু এ-সংকটমুক্তির জন্য প্লেটো ইতিহাসের পরবর্তী বিকাশকে চিহ্নিত করতে

১. 'Man is the measure of all things'.
২. এ্যারিস্টটলের জীবনকাল ৩৮৪—৩২২ খ্রিঃ পূঃ।

পারেননি। তাঁর শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতাই তাঁর মতো ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টিকে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার বদলে অতীতের বিলুপ্ত অবস্থা এবং ব্যবস্থার প্রতি নিবদ্ধ রাখে। প্লেটো এ সত্য অনুধাবনে ব্যর্থ হন যে, গ্রীসের নগররাষ্ট্রগুলি তাদের অর্থনীতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় বিকাশের এক ক্রান্তিমুহূর্তে উপস্থিত হয়েছে। পরবর্তী সুস্থ বিকাশের জন্য প্রয়োজন, নূতনকে অস্বীকার করা নয়, নূতনকে স্বাগত জানানো। এই নূতনের দাবি হচ্ছে একথা স্বীকার করা যে, কোনো মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দাস নয়, গ্রীকরা সভ্য এবং অপর জাতি বর্বর, একথা সত্য নয়। গ্রীস পৃথিবীর কেন্দ্র নয়। প্রয়োজন হচ্ছে, মানুষে মানুষে মৌলিক কোনো ভেদ নেই, এ-সত্য ঘোষণা করা এবং সংকীর্ণ নগররাষ্ট্রের প্রাকারকে ভেঙে ফেলে বৃহত্তর জগৎ এবং মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিকে প্রসারিত করা। দৃষ্টির দিগন্তকে অবারিত করে দেওয়া। এ-দৃষ্টিভঙ্গি প্লেটোর মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাঁর শিষ্য এ্যারিস্টটলের মধ্যে অধিকতর বাস্তবতার পরিচয় মিললেও এ্যারিস্টটলও তাঁর ইতিহাস-সমীক্ষাকে গ্রীক নগররাষ্ট্রের বাইরে প্রসারিত করতে পারেননি। এ্যারিস্টটলের নিকটও গ্রীক নগররাষ্ট্রই আদর্শ রাষ্ট্র।

কিন্তু কোনো জ্ঞানীর চিন্তার সীমাবদ্ধতা বা তাঁর আপন অর্থনৈতিক অবস্থানের স্বার্থ ইতিহাসের গতিকে রোধ করতে পারে না। একদিক থেকে দেখলে প্লেটোর এই চিন্তাধারা প্লেটো-পূর্ব যুগের প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের বিকাশের এবং তার অধিকতর অগ্রগতির বিরুদ্ধে অভিজাত শ্রেণীর প্রতিরোধমূলক প্রতিক্রিয়া-বিশেষ।

প্লেটোর কাল যদি রাষ্ট্র এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এক সংকটের কাল, তবে তাঁর পূর্ববর্তী যুগ গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের সূচনা এবং বিকাশের যুগ। এই যুগেই ধর্মীয় কোনো বিশ্বাস বা কাল্পনিক কোনো ভাবের ভিত্তিতে নয়, বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যার প্রয়াস দেখা গেছে। থেলিস, এ্যানাকসিমেনিস, এ্যানাকসিমেন্ডার, ডিমোক্রিটাস এবং হিরাক্লিটাস, এ্যানাকসাগোরাস, পাইথাগোরাস, থুসিডাইডিস, হিপোক্রাটিস, এসকাইলাস, ইউরিপাইডিস এবং সফোক্লিস[১] কেবল গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-নাট্যের পথিকৃৎ এবং স্রষ্টাই নন; এই পর্যায়ের জ্ঞানীদের মধ্যে বস্তুবাদী দর্শনের বোধই প্রবল। এই বস্তুবাদী বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের অধিকতর বিকাশের প্রতিবন্ধক শক্তি হিসাবে প্লেটো, এমনকি এ্যারিস্টটলের ভূমিকা।[২]

১. উল্লিখিত জ্ঞানীদের খ্রিষ্টপূর্ব জীবনকাল ঃ থেলিস (৬৪০–৫৫০), এ্যানাকসিমেনিস (৫৮৫-৫২৫), এ্যানাকসিমেন্ডার (৬১০–৫৪৬), ডিমোক্রিটাস (৪৬০–৩৭০), হিরাক্লিটাস (৫৩৫–৪৭৫), এ্যানাকসাগোরাস (৫০০–৪২৮), পাইথাগোরাস (৫৮০–৫০০), থুসিডাইডিস (৪৭১–৪০০), হিপোক্রাটিস (৪৬০–৩৭৫), এসকাইলাস (৫২৫–৪৫৬), ইউরিপাইডিস (৪৮০–৪০৭) এবং সফোক্লিস (৪৯০–৪০৬)।

২. দর্শনকোষ ঃ সরদার ফজলুল করিম। প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, Science and Politics in the Ancient World এবং Greek Science : Benjamin Farrington.

ইতিহাসের মূল নিয়ামক কোনো আদর্শ সসমাধানের কল্পনা নয়, কোনো ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষের অভিনব কোনো ভাব নয়। ইতিহাসকে মূলত নিয়ন্ত্রণ করে এবং অগ্রসর করে নিয়ে চলে মানুষের বাস্তব অর্থনীতিক, সামাজিক পরিবেশ ঃ এই পরিবেশে মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিরোধাত্মক সম্পর্ক। ভাব এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই এক চালকশক্তির কাজ করে। ভাব দ্বারাই মানুষ চালিত হয়। কিন্তু মানুষের সব ভাব বাস্তবকে নিজের স্বার্থে পরিবর্তিত করার জন্যই উদ্ভূত হয় এবং বাস্তব অবস্থাই মানুষের ভাবের স্রষ্টা।

প্লেটো যখন আদর্শ নগররাষ্ট্রের কল্পনা করছিলেন তখন গ্রীক উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলে মেসিডোনিয়ায় এমন এক নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটছিল, যে-শক্তি বৃহত্তর জগতের আভাসে যেমন চমকিত হয়েছে, তেমনি তাকে জয় করার সংকল্পে সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্লেটোর মৃত্যু ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭ সনে এবং তাঁর মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৮ সনে মেসিডোনিয়ার সম্রাট ফিলিপ এথেন্সসহ নগররাষ্ট্রগুলি দখল করে নেন এবং চোদ্দ বৎসরের মধ্যেই সম্রাট ফিলিপের পুত্র এবং এ্যারিস্টটলের ছাত্র আলেকজান্ডার পৃথিবীবিজয়ের অভিযানে প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন।

'রিপাবলিক' গ্রন্থের সীমাবদ্ধতা যা-ই থাকুক না কেন, 'রিপাবলিক' এক কালজয়ী সৃষ্টি। রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, সাহিত্য, সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে 'রিপাবলিক' এক মৌলিক গ্রন্থ। 'রিপাবলিক' বিচারের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে আমাদের একটি ইতিহাস-বোধ থাকা আবশ্যক, 'রিপাবলিক'-এর সমকালীন এবং পূর্বকালীন সমাজকে জানা দরকার, তেমনি এ-বোধও আবশ্যক যে, কোনো চিন্তাবিদের কাছে মানুষের দাবি তার জীবনের সমস্যার চিরন্তন কোনো সমধান নয়। মানুষের জীবন প্রবহমান। মানুষের জীবনই সমস্যা এবং সমস্যাই জীবন। সমস্যার কোনো চিরন্তন সমাধান নেই। প্রতি যুগ এবং সমাজব্যবস্থার মানুষকে তার আপন সমস্যার সমাধানের সন্ধান করতে হবে। তার এই প্রচেষ্টায় কোন যুগের চিন্তাবিদের অবদান সমাধানদানে তত নয়, যত মানুষের সমস্যার পর্যবেক্ষণে, তার অনুধাবনে এবং তাকে চিহ্নিতকরণে। মানুষের জীবনের সমস্যার সামগ্রিক বিশ্লেষণেই 'রিপাবলিক' অতুলনীয়, অনন্য। আধুনিক বাংলাদেশ, আধুনিক ভারত বা আধুনিক আমেরিকার মানুষকে অনুসন্ধান করতে হবে তাদের আজকের জীবনের সমস্যার সমাধান। ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রে এথেন্সের অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র আজকের মানুষের সমস্যার সমাধান হয়তো নয়। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এই ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলির ন্যায় জীবনময়, সংকট ও সংঘাতময় এবং ক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় জীবনের দৃষ্টান্তও ইতিহাসে খুব কম আছে। এই ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলি জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবেষণাগার হিসাবে যেন এককালে ক্রিয়াশীল ছিল। জীবনের সে-গবেষণাগারে আধুনিক জীবনের সমস্যারও প্রায় সবগুলিরই

পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। প্লেটোর 'রিপাবলিকে'ও আমরা উল্লেখিত এবং আলোচিত হতে দেখি আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রায় সকল সমস্যা। এখানেই 'রিপাবলিক'-এর চিরন্তনতা এবং প্লেটোর কালজয়ী শক্তির পরিচয়। এ-কারণেই 'রিপাবলিক' আজও অপরিসীম বিস্ময়-উদ্রেককারী গ্রন্থ।

'রিপাবলিক' একটি নাটক। ঘটনার নয়, যুক্তির নাটক। গ্রন্থের মধ্যে যুক্তি হচ্ছে চরিত্র। সক্রেটিসকে বলা চলে যুক্তির কথক, যুক্তির উপস্থাপক। এ-নাটকের শুরু কোনো নাটকীয় বিস্ফোরণ, দৃশ্য-উন্মোচন বা ঘণ্টাধ্বনিতে নয়। সক্রেটিস তাঁর সহচর গ্লকনকে সঙ্গে নিয়ে পাইরিউস বন্দরের অশ্বদৌড় দেখে এথেন্স প্রত্যাবর্তন করছেন। এমন সময়ে সিফালাসপুত্র পলিমারকাস তাঁদের প্রত্যাবর্তনের পথরোধ করে তাঁদের গৃহে রাত্রি যাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর নিরতিশয় অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সক্রেটিস সঙ্গী সমভিব্যাহারে সিফালাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেই গৃহে বৃদ্ধ সিফালাসের সঙ্গে আলোচনাক্রমে বার্ধক্যের লাভালাভের প্রশ্ন ওঠে। এ-সমস্যার প্রশ্নোত্তর থেকে 'ন্যায় কী' এ-প্রশ্নও এক পর্যায়ে স্বাভাবিকভাবে উত্থাপিত হয়। ... এমনি অ-নাটকীয়ভাবে 'রিপাবলিক' নাটকের উন্মোচন ঘটেছে। এমন বৈশিষ্ট্যহীন সূচনা যেন আমাদের এই কথাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জীবনের সমস্যা এবং তা নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের যুক্তিভিত্তিক আলোচনা কোনো নাটকীয় আকস্মিক ব্যাপার নয়। সংলাপের মাধ্যমে এর পরে আলোচনাটি অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এ-আলোচনা সূত্র, সঙ্গতি এবং পরিকল্পনাশূন্য নয়। কথার টানে কথা আসছে বা যুক্তির সান্নিধ্যে যুক্তি আসছে—'রিপাবলিক'-এর আলোচনা এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। 'রিপাবলিক' পাঠ করতে গিয়ে যেখানে মনে হয়, যেন কথার টানে কথা আসছে, যুক্তির টানে যুক্তি আসছে, সেখানে আসলে একটি মূল পরিকল্পনার ভিত্তিতেই সমস্যার পর সমস্যা উত্থাপিত হচ্ছে এবং সে-সমস্যার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শিত হচ্ছে। একথাটি আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। 'রিপাবলিক'-এর অন্তর্গত যুক্তির এই প্রাসঙ্গিকতা এবং ধারাবাহিকতা সহজে পাঠকের চোখে ধরা পড়ে না বলে বর্তমান অনুবাদগ্রন্থখানিকে তার সমস্যাসমূহের দিকে দৃষ্টি রেখে পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের একটি উপযুক্ত নামসহ অধ্যায়ের প্রথমে অধ্যায়ের অন্তর্গত বিষয়ের একটি ব্যাখ্যামূলক চুম্বক দেওয়া হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য, পাঠককে যুক্তির পর্যায়গুলিকে কেবল ধরিয়ে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে 'রিপাবলিক'-এর সামগ্রিক অনুধাবনে যথাসাধ্য সাহায্য করা। 'রিপাবলিক'-এর বিশ্লেষণমূলক উপলব্ধি পাঠকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অনুবাদক এটুকু বোধ করেছেন যে, গ্রন্থের সমস্যাসমূহ উল্লেখের মাধ্যমে তাদের অন্তর্নিহিত সম্পর্কটি ধরিয়ে দিলে পাঠকের পক্ষে 'রিপাবলিক'-এর বিশ্লেষণ এবং বিচারমূলক অনুধাবন সহজ

হবে। এ ছাড়া প্রতি অন্তর-পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে ঐ স্থলে কিংবা নিকটবর্তী স্থলে আলোচিত বিষয়ের একটি উপযুক্ত শিরোনাম মুদ্রিত হয়েছে। পাঠক পৃষ্ঠা শীর্ষের এই এই শিরোনামগুলির ওপর দৃষ্টিক্ষেপ করেও 'রিপাবলিক'-এর যুক্তির অগ্রগতিকে লক্ষ করতে পারবেন। পৃষ্ঠাশীর্ষে প্রচলিত সকল ইংরেজি অনুবাদে উদ্ধৃত মূল গ্রীক গ্রন্থের বিষয়সূচক পুস্তক এবং পৃষ্ঠাসংখ্যাও মুদ্রিত হয়েছে। এর ফলে অধিকতর অনুসন্ধিৎসু পাঠক বর্তমান অনুবাদের যে-কোনো পৃষ্ঠার বিষয়কে ইংরেজি যে-কোনো অনুবাদের মধ্যে সহজেই নির্দিষ্ট করতে পারবেন।

প্লেটো শক্তিশালী সাহিত্যিক ছিলেন। কিন্তু প্লেটো সাহিত্যসৃষ্টির জন্য তাঁর গ্রন্থরাজি রচনা করেননি। একথা সত্য, সংলাপ বা নাটক আকারে তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন। কিন্তু তারও প্রধান উদ্দেশ্য নাটক সৃষ্টি করা নয়। প্লেটো নাটক লিখেছেন। কিন্তু প্লেটো 'নাট্যকার' ছিলেন না। প্লেটো সংলাপের মাধ্যমে জগৎ, জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর দর্শন এবং অভিমতসমূহ ব্যক্ত করেছেন। নিবন্ধমূলক রচনাই আজকাল আমাদের নিকট দর্শন এবং অভিমত প্রকাশের স্বাভাবিক রীতি বলে বোধ হয়। কেবল আধুনিককালেই নয়। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল তাঁর দর্শন এবং অভিমত প্রকাশের জন্য সংলাপের বদলে নিবন্ধ বা আলোচনামূলক রচনাকে গ্রহণ করেছেন। এ-কারণে প্লেটোর রচনার ক্ষেত্রে সংলাপের প্রাধান্য একটি প্রশ্ন হিসাবে আমাদের চোখে ধরা পড়ে এবং বিষয়টি কিছুটা আলোচনার দাবি রাখে। গবেষকগণ এরূপ মনে করেন না যে, প্লেটো আদৌ কোনো নিবন্ধ রচনা করেননি। কালের হাতে অবশ্য তাঁর সেই রীতির রচনা রক্ষিত হয়নি। কাল রক্ষা করেছে তাঁর সংলাপরাজিকে। কালই মানুষের সৃষ্টির মূল্যায়নে প্রধান বিচারক। প্লেটোর সৃজনক্ষমতার শ্রেষ্ঠ ফসলকেই হয়তো কাল মানুষের সভ্যতার জন্য রক্ষা করেছে। এ্যারিস্টটলও হয়তো সংলাপ রচনা করেছিলেন। কিন্তু কাল সংলাপের বদলে তাঁর নিবন্ধ এবং আলোচনামূলক বিশ্বকোষিক সৃষ্টিকে সভ্যতার জন্য বহন করেছে। প্লেটোর সংলাপ থেকে এ্যারিস্টটলের নিবন্ধ—এটা চিন্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি বিকাশের সূচক নিশ্চয়ই। এ বিকাশে প্লেটো পূর্ববর্তী, এ্যারিস্টটল পরবর্তী। কিন্তু কেবল কালের ব্যবধানই প্লেটোর রচনার রীতি সংলাপমূলক হওয়ার কারণ নয়। এ্যারিস্টটল প্লেটোর শিষ্য। তাই তাঁর সমকালীনও। তা ছাড়া প্লেটোর সমকালীন বা পূর্ববর্তী অন্যান্য গ্রীক চিন্তাবিদের সকলে যে প্লেটোর ন্যায় সংলাপ রচনা করেছেন, এমন নয়। 'সংলাপে'র ওপর প্লেটোর আকর্ষণের কারণ হিসাবে বলা যায় ঃ ১. সক্রেটিস প্লেটোর জীবনের পরম শ্রদ্ধেয় এবং আরাধ্য গুরু ছিলেন। গুরুকে অমর করার বাসনা নিয়ে তাঁকে নায়ক হিসাবে চিত্রিত করে প্লেটো নিজের দর্শন প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এজন্য নাটকের প্রয়োজন ছিল। ২. সক্রেটিসের নিজের অভিমত-প্রকাশের মাধ্যম ছিল সংলাপ

অর্থাৎ সাথিদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তরের পদ্ধতি। সক্রেটিসের নিজের কোনো লিখিত রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সক্রেটিস এথেন্সের পথে-ঘাটে, বাজারে-বন্দরে, জনসম্মেলনে সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করা পছন্দ করতেন। তাঁর নিজের অভিমতকে সরাসরি শ্রোতার উপর চাপিয়ে দেবার বদলে সক্রেটিস ক্রমান্বয়ে শ্রোতাকে সেই অভিমতের বিন্দুটিতে যুক্তির ক্রমগতির মাধ্যমে পৌঁছে দিতেন। শ্রোতার তখন উপলব্ধি হত, যে-সত্যে সে পৌঁছেছে সে-সত্য তারই আহৃত সত্য, তার নিজের আত্মায় উপলব্ধ সত্য। অপর কারও আরোপিত সত্য নয়। সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানকে বাইরে থেকে দান করা যায় না। শিক্ষকের দায়িত্ব জ্ঞানকে দান করা নয়। শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর আত্মাকে জ্ঞানের অভিমুখী করে দেওয়া, যেন আত্মা নিজেই তার জ্ঞান অবলোকন করতে পারে। সক্রেটিসের এই অভিমতকে প্লেটো সঠিক বলে বিবেচনা করতেন। এ-কারণেও প্লেটো সক্রেটিসকে নায়ক করে যখন গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন তাঁর রীতি স্বাভাবিকভাবে সংলাপের আকার গ্রহণ করেছে, নিবন্ধের নয়। ৩. প্লেটো নিজেও বিশ্বাস করতেন, অভিমত আরোপের চেয়ে আলাপের মাধ্যমে অভিমতে আরোহণ জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর উত্তম পদ্ধতি। এ-কারণে প্লেটোর একাডেমিতে অধ্যাপকের বক্তৃতার চেয়ে গুরু-শিষ্য কিংবা জ্ঞানের অন্বেষণে সহযাত্রীদের মধ্যে 'প্রশ্ন এবং উত্তর, পুনরায় প্রশ্ন এবং পুনরায় উত্তর'—আলাপের এরূপ আবহাওয়া বিরাজ করত। বস্তুত, সংলাপের এই রীতির পক্ষে প্লেটো তাঁর অপর একটি বিখ্যাত সংলাপ 'ফিডরাস'-এ যুক্তি উপস্থিত করে বলেছেন যে, কোনো সত্যকে উন্মোচিত করার জন্য পারস্পরিক সংলাপই হচ্ছে উত্তম উপায়। তাঁর মতে নিবন্ধে আমরা সরাসরি একটি সিদ্ধান্তকে লাভ করি—কিন্তু সিদ্ধান্তে পৌঁছার প্রক্রিয়াকে আমরা প্রত্যক্ষ করিনে। এর ফলে নিবন্ধমূলক গ্রন্থের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান অলীক জ্ঞান। উপলব্ধি এবং প্রত্যয়হীন জ্ঞান। কিন্তু সংলাপের বৈশিষ্ট্য এই যে, সংলাপ যদি লিখিত হয় তথাপি তার মধ্যে চিন্তার ক্রমগতির একটি আভাস থাকে। সংলাপের মধ্যে সত্যের জন্য আমাদের মনের প্রয়াস এবং অপর মনের সঙ্গে তার আলাপ ও দ্বন্দ্বের প্রক্রিয়াটি প্রকাশিত হয়। এর উত্তম ফল এই যে, সংলাপের শ্রোতা বা পাঠকও সরাসরি কোনো সিদ্ধান্তের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে সত্যে আরোহণের উপলব্ধি বোধ করে।[১]

'রিপাবলিক' গ্রন্থকে প্রাচীনকালে 'রিপাবলিক' নামে আখ্যায়িত করা হত না। এর দ্বিতীয় নাম ছিল ঃ 'ন্যায় সম্পর্কে আলোচনা'। 'রিপাবলিক' বলতে আধুনিককালে একটি বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থার কথা মনে আসে ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। কিন্তু গ্রীক ভাষায় 'রিপাবলিক' শব্দের অর্থ অধিকতর ব্যাপক ছিল। রিপাবলিক বলতে সাধারণভাবে শাসনতন্ত্র, রাষ্ট্র বা সমাজকে

১. An Introduction to the Republic of Plato : William Boyd.

বোঝাত।[১] প্লেটো সাধারণভাবে রাষ্ট্র এবং সমাজের সমস্যাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হয়তো সে-কারণেই 'রিপাবলিক' নামটি অধিক ব্যবহৃত হয়েছে এবং বর্তমানে 'রিপাবলিক' নামেই এই সংলাপ সর্বভাষায় পরিচিত।

কিন্তু সাধারণভাবে 'রাষ্ট্র' কথাটির উপর জোর দিয়ে অগ্রসর হলে পাঠকের মনে একটি আশা থাকবে যে, এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের সংবিধান কী, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কে, আইন প্রণয়নকারী সংস্থা কী, শাসন, আইন ও বিচার—এদের কোনটি কে কীভাবে সম্পাদন করছে—ইত্যাদির আলোচনা পাওয়া যাবে। কিন্তু 'রিপাবলিক'-এর মধ্যে প্রবেশ করে এ-সকল বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোনো আলাপের সাক্ষাৎ আমরা পাইনে। 'রিপাবলিক'-এ সামাজিক এবং রাজনীতিক বিষয়ে অবশ্য আলোচনা আছে। 'রিপাবলিক' দশটি পুস্তকে বিভক্ত। এই গ্রন্থের অষ্টম এবং নবম পুস্তকের একাংশে আদর্শ রাষ্ট্রের বিচ্যুতি হিসাবে যেসব রাষ্ট্রের আলোচনা প্লেটো করেছেন সেসব রাষ্ট্র গ্রীক রাষ্ট্রীয় জগতেরই দৃষ্টান্ত। [কেবল প্রাচীন গ্রীক জগতের নয়, এই আলোচনায় আধুনিক রাষ্ট্রপ্রকারেরও আভাস মেলে।] আবার দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পুস্তকে রাজনীতিক এবং সামাজিক বিষয়সমূহের আলোচনা করা হয়েছে। [রাষ্ট্রের প্রাথমিক গঠন, সমৃদ্ধতর রাষ্ট্র, শাসকের আবশ্যকীয় গুণ, রাষ্ট্রের নাগরিকদের শ্রেণীবিভাগ ও শসকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদি।] কিন্তু এ-আলোচনাতেও প্লেটোর জোর এ-সমস্ত বিষয়ের অন্তর্গত নীতির উপর, এর কোনো দৃষ্টান্তের বিস্তারিত বর্ণনার ওপর নয়। গ্রন্থের বাকি অংশ প্রধানত ন্যায়, শিক্ষা, দর্শন, কাব্য এবং আত্মার অমরতাসংক্রান্ত আলোচনা।

ন্যায় সম্পর্কে প্লেটোর বক্তব্য 'রিপাবলিক'-এর কোনো একটি অংশে কেন্দ্রীভূত নয়। 'রিপাবলিক'-এর সমগ্র আলোচনার মধ্য থেকে ন্যায়ের ধারণাটি আমাদের তৈরি করতে হবে। প্লেটোর নিকট 'ন্যায়' দয়া, মহত্ত্ব, সাহস কিংবা জ্ঞানের মতো রাষ্ট্র বা ব্যক্তির কোনো বিশিষ্ট গুণ নয়। ন্যায় হচ্ছে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কর্ম, উপাদান বা গুণ, অঙ্গ, অংশ বা শ্রেণীর মধ্যে সঙ্গতির সম্পর্ক। এ-সম্পর্কে বর্তমান পুস্তকের সূচনাতে একটি আলোচনা রয়েছে। এ ছাড়া অধ্যায় ঃ ১১-এর মুখবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রীক নগররাষ্ট্রগুলি আয়তনে এবং লোকসংখ্যায় আধুনিক রাষ্ট্রের তুলনায় খুবই ক্ষুদ্রাকারের ছিল। এ কারণে নাগরিকে নাগরিকে ঘনিষ্ঠতা ছিল স্বাভাবিক এবং তাদের আচরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় আচরণের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। জীবনে আমাদের আচরণের একটা দিক হচ্ছে ব্যক্তিগত আচরণ, যেখানে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে আমরা অনভিপ্রেত বলে মনে করি। কিন্তু গ্রীক নগররাষ্ট্রে ব্যঁক্তির জীবনে ব্যক্তিগত এবং

১. The Republic : H. D. P. Lee : Introduction, p. 26.

সমাজগত আচরণে কোন পার্থক্যের সুযোগ ছিল না। গ্রীক নাগরিকগণ রাষ্ট্রকেই তাদের একমাত্র মূল সংস্থা বলে বিবেচনা করত। রাষ্ট্রের বাইরে ব্যক্তির জীবনের কোন অস্তিত্বের কথা তারা চিন্তা করতে পারত না।

'রিপাবলিক' একাডেমী প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। একাডেমীর উদ্দেশ্য ছিল দার্শনিক-শাসকদের শিক্ষাদান—অর্থাৎ শিক্ষাদানের মাধ্যমে দার্শনিক-শাসক তৈরি করা। 'রিপাবলিক'-এ প্লেটো তাঁর সেই শিক্ষা-নীতির বিস্তারিত আলোচনা করবেন—এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত, আদর্শ রাষ্ট্রের শাসকদের প্রয়োজনীয় গুণ নির্দিষ্ট করার পরে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন আসে ঃ এই গুণ অনুযায়ী শাসক কেমন করে পাওয়া যাবে? এর সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে প্লেটো বলেছেন, শিক্ষাই হচ্ছে এর উপায়। শিক্ষার মাধ্যমেই নাগরিকদের প্রকৃতিদত্ত গুণের পরিস্ফুটন এবং বৃদ্ধি ঘটবে। উত্তম রাষ্ট্র শাসনের মূল সমস্যা হচ্ছে শাসকদের শিক্ষা। শাসকদের শিক্ষিত করা গেলে শাসনের বিষয়ে, আইন বা বিচারের বিষয়ে আর চিন্তার কারণ থাকবে না। কারণ, উত্তম শিক্ষা যে লাভ করেছে সে আইন, শাসন বা বিচার কোথাও উত্তম বই অধমের কোন উৎস হতে পারে না। তার দ্বারা কোনো অধম কার্য সাধিত হতে পারে না। এ জন্যই 'রিপাবলিক'-এ শিক্ষার বিস্তারিত আলোচনা এবং এ-কারণেই সমাজ সংগঠনের খুঁটিনাটির চেয়ে তার মৌলনীতির ব্যাখ্যাতেই প্লেটোর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ। তা ছাড়া সর্বোত্তম জ্ঞান যার অর্জিত হয়েছে, খুঁটিনাটি আইন তার শৃঙ্খলবিশেষ। দার্শনিক শাসক তার উত্তমের জ্ঞান দ্বারা রাষ্ট্রের জন্য উত্তম বিধান তৈরি করবে। সাধারণ নাগরিকের কিংবা আইনসভার আইনের বাধন তার উত্তম শাসনের ক্ষমতাকে ব্যাহত করবে। এই তত্ত্বের মধ্যেই 'রিপাবলিক'-এ আইন প্রণয়নের বিস্তারিত বিবরণ না থাকার কারণ নিহিত।

দার্শনিক শাসককে শিক্ষিত করতে হবে। কিংবা বলা চলে শিক্ষার মাধ্যমে দার্শনিক শাসক তৈরি করতে হবে। কিন্তু দর্শন ব্যতীত দার্শনিক শাসক তৈরি হতে পারে না। তাই প্লেটোর শিক্ষাসূচির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে দর্শন-শিক্ষা। কিন্তু 'রিপাবলিক'-এ আমরা প্লেটোর দর্শনকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করিনে। শিক্ষার আলোচনায় প্লেটো দর্শনের গুরুত্বের কথা যত বলেছেন, দর্শন কাকে বলে, দর্শন কি তা তত ব্যাখ্যা করেননি। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, প্লেটো দর্শনকে সহজে ব্যাখ্যাযোগ্য ভাবতেন না। তাঁর সপ্তম পত্রে প্লেটো এ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

> অপরাপর বিষয়ের মতো দর্শনের সত্যকে আমরা সহজে প্রকাশ করতে পারিনে। দর্শনের সত্য প্রকাশযোগ্য নয়। কিন্তু দক্ষ অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থী যদি দীর্ঘদিন দর্শনের শিক্ষা ও আলোচনায় অতিবাহিত করে, তাহলে তার অন্তরে হয়তো সত্যের আলো আকস্মিকভাবেই উদ্ভাসিত

হয়ে উঠবে এবং একবার উদ্ভাসিত হলে অন্তর থেকে অন্তরে সে আলো বিস্তার লাভ করবে। জ্ঞানের আলো একবার প্রজ্জ্বলিত হলে আলোই আলোর ইন্ধন যোগাবে, তাকে প্রজ্জ্বলিত রাখবে।[১]

তথাপি 'রিপাবলিক'-এ প্লেটোর মূল দর্শনের যে আভাস আমরা পাই তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তার 'দুই সত্য' বা 'দুই জগতের' তত্ত্ব। এই দুই জগতের এক জগৎ হচ্ছে আমাদের নিত্যকার দৃশ্য, পরিবর্তমান জগৎ; দ্বিতীয় জগৎ হচ্ছে এই দৃশ্য জগতের উৎস বা চিরন্তন, অদৃশ্য এবং অপরিবর্তনের জগৎ। প্লেটোর মতে এই দ্বিতীয় অদৃশ্য জগতই চরম সত্য; এই অদৃশ্য জগতই চরম ভাব।

'রিপাবলিক'-এ সমাজ রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে প্লেটো কর্তৃক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শ্রেণীকরণ। প্লেটো রাষ্ট্রের মানুষকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ উৎপাদক, দেশরক্ষক এবং শাসক। উৎপাদক বলতে তিনি কৃষক, কারিগর এবং ব্যবসায়ী-এদের সকলকে বুঝিয়েছেন। এদের কাজ হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা। 'রিপাবলিক'-এর গোড়াতে প্লেটো রাষ্ট্রকে দুটো শ্রেণী, অর্থাৎ উৎপাদক এবং অভিভাবকে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর রাষ্ট্রের সমৃদ্ধির ফলে অভিভাবককে প্লেটো দেশরক্ষক এবং শাসক হিসাবে পুনরায় বিভক্ত করেছেন। এই পরিবর্তনের কারণ হয়তো এই যে, কেবল কল্পনায় নয়, বাস্তব রাষ্ট্রের বিকাশেও পূর্বে শাসক এবং দেশরক্ষকে কোন পার্থক্য ছিল না। পূর্বে, যারা নাগরিক এবং শাসক—তারাই দেশকে প্রয়োজন হলে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে রক্ষা করত। কিন্তু পরবর্তীকালে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বিগ্রহ যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত যুদ্ধকলার প্রশিক্ষণের আবশ্যক হয়েছে এবং নাগরিক মাত্রের পক্ষেই বিনা প্রশিক্ষণে উপযুক্ত যোদ্ধা হওয়া সম্ভব হয়নি। পেশাদার সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হয়েছে। বিকাশের এই পর্যায়ের পরিচয় ঘটেছে প্লেটোর সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের বর্ণনায়।

কর্মের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ সংঘটিত হলেও কর্মে কর্মে গুরুত্বের পার্থক্য রয়েছে। সেদিক থেকে প্লেটো রাষ্ট্রশাসনকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম বলেছেন। তার পরে দেশরক্ষা। এবং সর্বনিম্নে উৎপাদন। ফলে তাঁর শ্রেণীবিভাগ পর্যায়ক্রমিক তিনটি উঁচু নিচু স্তরের রূপ লাভ করেছে। যদিও প্লেটো এই বিভাগকে অনড় বলে মনে করেননি এবং তাঁর শিক্ষাব্যবস্থায় নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে গুণের সাক্ষাতে তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে কিংবা উচ্চতরের গুণহীনকে নিম্নতর শ্রেণীতে স্থাপনের কথা তিনি বলেছেন, তবু প্লেটোর এই শ্রেণীবিভাগ যে কালক্রমে অনড় শ্রেণীভেদে পর্যবসিত হতে

---

১. The Republic : H. D. P. Lee : Introduction, p. 35.

পারে—এ-কথাকে অস্বীকার করা চলে না। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা চাহিদা। তাই তার নানা কর্ম। মানুষের মধ্যে কর্মের ক্ষেত্রে দক্ষতারও পার্থক্য আছে। 'রিপাবলিক'-এ এই কর্মের বিভাগ এবং দক্ষতার পার্থক্যের উল্লেখ আছে। এটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। "আমাদের সকলের প্রকৃতি এক নয়।" একথা সত্য। কিন্তু এ-পার্থক্য মানুষকে গোষ্ঠীগতভাব অপরিবর্তনীয় উচ্চতর এবং নিম্নতর শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে না। 'রিপাবলিক'-এ অভিভাবক তথা শাসক ও সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে যেরূপ বিস্তারিত আলোচনা আছে, তৃতীয়, অর্থাৎ উৎপাদকশ্রেণী সম্পর্কে সেরূপ কোনো আলোচনা নেই। এ থেকেও এটি ানুমিত হয় যে, প্লেটো উৎপাদকশ্রেণীকে নিম্নতর পর্যায়ের বলে বিবেচনা করেছেন। 'রিপাবলিক'-এ আলোচিত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সাম্যবাদ। শাসকশ্রেণীর শাসনের দায়িত্বপালনকে নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্য নিয়ে প্লেটো অভিভাবক তথা শাসক ও সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত পরিবার বিলোপের প্রস্তাব করেছেন। এই প্রস্তাবই 'প্লেটোর সাম্যবাদ' নামে অভিহিত হয়েছে। প্লেটোর প্রস্তাবে তৃতীয় অর্থাৎ উৎপাদকশ্রেণীর উপর এই সাম্যবাদ প্রযোজ্য নয়। উৎপাদকশ্রেণীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত পরিবারে প্লেটোর কোনো আপত্তি থাকেনি। আধুনিককালে সাম্যবাদ কথাটি বিশেষ প্রচলিত। এ-কারণে প্লেটোর সাম্যবাদের সঙ্গে আধুনিক সাম্যবাদী তত্ত্বের তুলনার প্রশ্ন এসে পড়ে। প্লেটোর সাম্যবাদের প্রস্তাবটিকে আজ বিস্ময়কর বোধ হতে পারে। কিন্তু প্লেটোর ন্যায় প্রাচীন লেখকের রচনায় সাম্যবাদের প্রস্তাব থেকে বুঝতে পারা যায়, সমাজ-সংগঠনে সাম্যবাদী চিন্তা কেবল আধুনিক কালের চিন্তা নয়। মানুষের সমাজ সংখ্যা, সম্পর্ক, সংগঠন এবং সম্পদের ক্ষেত্রে সহজ থেকে জটিল হয়েছে। তার বিকাশের ধারাটি এরূপ এবং সেদিক থেকে কল্পনা করা চলে, আদিমকালে শক্তি, সংখ্যা এবং সম্পদের দুর্বল অবস্থায় মানুষকে যূথবদ্ধ হয়ে একপ্রকার সাম্যবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতেই বসবাস করতে হয়েছে এবং এ-অনুমান যে নিছক কল্পনা নয় তা আদিম মানুষের সভ্যতার বিশ্লেষণ এবং নৃতাত্ত্বিক গবেষণার মাধমে গবেষকগণ স্থির করেছেন। প্লেটো-এ্যারিস্টটলের রচনায় বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবেই এরূপ সাম্যবাদী সমাজসংস্থার উল্লেখ দেখা যায়। কাজেই প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ সাম্যবাদের প্রস্তাব আধুনিক পাঠকের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করলেও এ-প্রস্তাব পেশ করতে প্লেটোর খুব অভিনবত্ব বা সাহস প্রদর্শন করতে হয়েছে, এরূপ বলা চলে না। কিন্তু তা হলেও আদিম সাম্যবাদের সঙ্গে যেমন, আধুনিক সাম্যবাদী পরিকল্পনার সঙ্গেও তেমনি প্লেটোর সাম্যবাদের যথার্থ কোনো সাদৃশ্য নেই। আদিম সাম্যবাদে কোনো শ্রেণী ছিল না। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব সে-সমাজে ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সম্পদ সৃষ্টি হওয়ার স্তরে সমাজ

তখনও পৌঁছেনি। এ কারণে সে-সমাজে সাম্যবাদী সম্পর্ক সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল, প্লেটোর সাম্যবাদের ন্যায় কোনো অংশ সে-সম্পর্কের বাইরে ছিল না। আধুনিক সাম্যবাদী চিন্তাও কোনো বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়। আধুনিক সাম্যবাদী তত্ত্বের মূল কথা, আর্থিক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত পার্থক্য বিলোপ করা। সকলকেই উৎপাদকে পরিণত করা, কাউকে কেবলমাত্র শাসক করা নয়। প্লেটোর সাম্যবাদে অর্থ উৎপাদনের কাজ প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উত্তম বা সম্মানের কোনো কাজ তা নয়। এজন্য উচ্চতর শ্রেণীকে (শাসক ও সৈন্যবাহিনী) অর্থোৎপাদনের কাজ থেকে তিনি অব্যাহতি দিয়েছেন। আধুনিক সাম্যবাদে অর্থের উৎপাদনই মূল কাজ। অর্থের উৎপাদনের ভিত্তিতেই সমাজ এবং রাষ্ট্র চলে। আর তাই অর্থের উৎপাদকশ্রেণীই সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল শ্রেণী। আর সে-উৎপাদকশ্রেণীরও মূল শক্তি শ্রমিক। সাম্যবাদী তত্ত্বে এই মূল শক্তিই রাষ্ট্রের নিয়ামক হবে। অর্থের ক্ষেত্রে শোষণের বিলোপ ঘটবে এবং তার সঙ্গে 'শোষক-শোষিত' সমাজের এরূপ বৈষম্যেরও অবসান হবে। একটা শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত তবে। প্লেটোর সাম্যবাদে শ্রেণীবৈষম্যের বিলোপের কল্পনা করা হয়নি। শ্রেণীপার্থক্যকে স্থায়ী করার কথাই প্লেটো চিন্তা করেছেন। শাসকের সাম্যবাদকে তিনি সমাজের প্রচলিত শ্রেণীবিন্যাসকে বজায় রাখার মাধ্যম হিসাবেই দেখেছেন। তা ছাড়া, প্লেটোর সাম্যবাদে ব্যক্তিগত পরিবারকে শাসকের উত্তম শাসনের প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করা হয়েছে। সে-কারণে ব্যক্তিগত পরিবারের বিলোপের প্রস্তাব প্লেটো উত্থাপন করেছেন। আধুনিক সাম্যবাদে ব্যক্তিগত পরিবারের বিলোপ নয়, পরিবারের সন্তানপালন এবং অন্যান্য কাজকে রাষ্ট্রীয় করার মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীর অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের পথ মুক্ত করার কথা চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু এ-তুলনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্লেটো এবং আধুনিক সাম্যবাদের রাষ্ট্র সম্পর্কে দর্শনের পার্থক্য। প্লেটো সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য স্থির করেননি। তিনি রাষ্ট্রকে মানুষের স্থায়ী, অপরিহার্য এবং ব্যক্তির মুক্তির একমাত্র সংস্থা বলে গণ্য করেছেন। তাই ব্যক্তির সকল মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা রাষ্ট্রের উপর সমর্পিত। প্লেটো তাঁর রাষ্ট্রের নিয়ামক শক্তি করেছেন কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিকে যাঁরা চরম উত্তমকে জ্ঞাত হয়েছেন। এই জ্ঞানীরাই সকল চিন্তার এবং জ্ঞানের অধিকারী। সাধারণ মানুষ জ্ঞানী শাসককে রাষ্ট্রের সর্বরোগ নিরাময়ের ধন্বন্তরি চিকিৎসক মনে করে বাধ্য রোগীর ন্যায় তাকে কেবল মান্য করবে, তার অনুশাসনকে পালন করবে। এ ছাড়া তার স্বাধীন চিন্তা বা অপর কোনো দায়িত্বপালন বা সিদ্ধান্তগ্রহণের কোনো আবশ্যকতা নেই। প্লেটোর রাষ্ট্র তাই কেবল যে ব্যক্তির জীবনের সর্বগ্রাসী সংস্থা তা-ই নয়, 'কতিপয় জ্ঞানীর' ইচ্ছার ক্রীড়নক। আধুনিক সাম্যবাদের ব্যাখ্যায়, অর্থনৈতিক শ্রেণীবৈষম্যে বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র হচ্ছে শাসকশ্রেণীর হাতে শোষিতশ্রেণীকে অবদমনের যন্ত্রবিশেষ। আধুনিক

সাম্যবাদীদের কল্পনা, মানুষের আদিম সাম্যবাদী অবস্থায় এরূপ দমনমূলক কোনো সংস্থার যেমন অস্তিত্ব ছিল না, তেমনি ভবিষ্যৎকালে আর্থিক ক্ষেত্রে শোষক এবং শোষিত-রূপ বৈষম্যের পরিপূর্ণ বিলুপ্তির পরে রাষ্ট্রের বর্তমান রূপ আর ক্রিয়াশীল থাকবে না। তখন রাষ্ট্র মানুষের স্বেচ্ছাভিত্তিক দায়িত্ব পালনের সংস্থায় পরিণত হবে। তার নির্যাতনমূলক কোনো ভূমিকা থাকবে না। বস্তুত প্রাচীন ইতিহাসে সাম্যবাদের চিন্তা (সীমাবদ্ধভাবে হলেও) প্লেটোর মধ্যে অভিনব নয়। বরঞ্চ, গ্রীক রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যখন পিতৃতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীকে সধারণভাবে যেখানে পুরুষের চেয়ে হীন এবং অক্ষম বলে গণ্য করা হয়, সেখানে নারীও পুরুষের ন্যায় সমপরিমাণেই রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার উপযুক্ত, প্লেটোর এই প্রস্তাবটিকেই সময়ের প্রেক্ষিতে অধিকতর অভিনব এবং প্রগতিমূলক বলে বিবেচনা করা আবশ্যক।

কাজেই আমাদেরও সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন রাষ্ট্রের নাগরিকদের চেয়ে সশস্ত্র এবং শক্তিশালী যে-রক্ষিবাহিনী তারা যেন নাগরিকদের সুহৃদ এবং মিত্রের পরিবর্তে বর্বর স্বেচ্ছাচারী বাহিনীতে পরিণত হয়ে নাগরিকদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। রিপাবলিক ঃ ৩ ঃ ৪১৬

আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কারোর পক্ষে বিপদকে এড়িয়ে ন্যায়পথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যথার্থই অলৌকিক ঘটনা। রিপাবলিক ঃ ৬ ঃ ৪৯৩

জ্ঞান, নীতি এবং সত্য—এই হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম রক্ষক।

রিপাবলিক ঃ ৮ ঃ ৫৬০

অধম প্রবৃত্তির দল এবার তাদের হাতে বন্দি আত্মাকে তার সকল মহৎ গুণ থেকে শোধন করতে শুরু করে। এবার তারা দম্ভ, অনাচার, অমিতব্যয় এবং নির্লজ্জতাকে মশাল শোভাযাত্রা সহকারে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে এবং প্রশংসার মধুর বাণী উচ্চারণ করে বরণ করে এনে আত্মাশূন্য ঘরে তাদের প্রতিষ্ঠা করে। এবার তারা ঔদ্ধত্যকে অভিহিত করে আভিজাত্য বলে, অরাজকতাকে বলে স্বাধীনতা এবং অপব্যয়কে মহানুভবতা আর মূর্খতাকে বলে বিক্রম।

রিপাবলিক ঃ ৮ ঃ ৫৬০

রিপাবলিকের প্রধান আলোচ্য বিষয়

'রিপাবলিক' সংলাপের প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ঃ ন্যায়। ন্যায় কাকে বলে? মানুষের সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা কেমন করে সম্ভব হতে পারে?

'ন্যায়' একটি বিশ্লিষ্ট নীতিবোধক কথা। প্রত্যেক ভাষা এবং সমাজের মতো প্রাচীন গ্রীসের ভাষা এবং সমাজে 'ন্যায়' একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হত। ন্যায় বলতে সব যুগে সব সমাজে সাধারণতঃ দায়িত্ব পালন করা, অপরের ঋণ পরিশোধ করা, সৎভাবে চলা, দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করা, অন্যের ক্ষতিসাধন না করা প্রভৃতি গুণকে বোঝায়। মোট কথা, 'ন্যায়' হচ্ছে ব্যক্তির সামাজিক ব্যবহারের ঔচিত্য-অনৌচিত্যবোধক কথা। সমস্ত মহৎ গুণের সমন্বয়ে ন্যায়ের সৃষ্টি। তাই সব দেশেই সাধারণভাবে 'ন্যায়' মানেই যা-কিছু মহৎ এবং উত্তম।

রিপাবলিক বা 'ন্যায়বিষয়ক আলোচনা' (এই দ্বিতীয় শিরোনামেও রিপাবলিক পরিচিত হত) শুরু হয়েছে ন্যায়ের সংজ্ঞা-নির্ধারণের প্রয়াসে ঃ

". . . কিন্তু তোমার নিকট আমার আর একটি প্রশ্ন রয়েছে, সিফালাস। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পদ থেকে কী শান্তি তুমি লাভ করেছ?"

সিফালাস বললেন ঃ ... সম্পদের যেটা বড় আশীর্বাদ সে হচ্ছে উত্তম এবং সৎকে এই অভয়দান যে, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কাউকে প্রতারণা কিংবা বঞ্চিত করার কোনো কারণ তার ঘটেনি।

আমি বললাম ঃ তুমি ঠিকই বলেছ সিফালাস, এর চেয়ে সম্পদের বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তা হলে ন্যায় সম্পর্কে আমরা কী বলব?" (৩৩০-৩৩১ রিপাবলিক]

অন্য সব গুণ বাদ দিয়ে 'ন্যায়ের' সংজ্ঞা দাবি করার তাৎপর্য কী? এর তিনটি কারণের কথা চিন্তা করা চলে।

১. সমস্ত মহৎ গুণের সমন্বিত আধার হচ্ছে ন্যায়। কাজেই নীতি অর্থাৎ মানুষের সামাজিক ব্যবহারের আদর্শ নির্ধারণে ন্যায়ের সংজ্ঞা সর্বপ্রথম আবশ্যক। এবং ন্যায়ের সংজ্ঞাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

২. গ্রীকসমাজের যে-বিকাশ খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতক পর্যন্ত ঘটেছিল তাতে মানুষের ধ্যানধারণার কতকগুলি মূল সূত্রকে চিহ্নিত করা যায়।

সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রনীতিক এই ধারণাগুলি সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এগুলিকে প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত ধারণা বলা চলে। জনসমাজে এবং চিন্তাবিদদের মধ্যে এর যে কোনো প্রতিবাদী অর্থাৎ বিরোধী চিন্তা ছিল না এমন নয়। কিন্তু এরাই প্রধান ছিল। এই প্রধান চিন্তাসমূহের মধ্যে গ্রীক নীতিশাস্ত্রবিদগণ মনে করতেন যে, ন্যায় কোনো বিশ্লিষ্ট কথামাত্র নয়। ন্যায়ের অস্তিত্ব এবং সত্তা কোথাও আছে। ন্যায়ের সে-ভাবমূর্তি মানুষের জীবনের আকর্ষণীয় বা পরিচালক শক্তি হিসাবে কাজ করে। মানুষের সর্বসময়ের চেষ্টা হবে ন্যায়ের সেই অবিচল সত্তাকে অনুধাবন করা, ন্যায়কে জানার চেষ্টা করা, তাকে সংজ্ঞার মধ্যে প্রকাশ করা এবং সেই আদর্শে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন ক্রমাধিক পরিমাণে পরিচালিত করা। সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শনের মূল সুর এটি। এ-দর্শন কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত রচনা নয়। এ তাঁদের চিন্তায় প্রচলিত এবং প্রধান সামাজিক দর্শনের প্রতিফলন। মোট কথা ঃ 'ন্যায়' একটি সত্তাবান অবিচল অস্তিত্ব। তাকে জানা যায়। তাকে জানার মাধ্যমেই মাত্র মানুষ ক্রমান্বয়ে মহৎ জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।

৩. খ্রিষ্টপূর্ব ৪৪০ থেকে ৪০০ পর্যন্ত এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে পিলোপনেশীয় যুদ্ধ বলে পরিচিত। এই যুদ্ধে এথেন্স স্পার্টার নিকট পরাজিত হয়। দাস এবং শ্রমজীবী মানুষের শোষণের ভিত্তিতে বৃহৎ সামুদ্রিক এবং উপদ্বীপীয় গ্রীক বসতি ও সাম্রাজ্যের নেতা হিসাবে এতকাল এথেন্সের যে আর্থিক ও রাজনীতিক শৌর্যবীর্য ছিল তা এই যুদ্ধে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আইন, শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধা, সম্মান, রাষ্ট্রীয় ভয়, দায়িত্ববোধ ইত্যাদির ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। গুপ্তহত্যা, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র, দেশদ্রোহ, দলীয় প্রভুত্বের অদলবদল এথেন্সীয় রাষ্ট্র এবং সমাজের সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সক্রেটিস এবং প্লেটোর ধারণায় ঃ ন্যায়ের সার্বিক সংকট দেখা দেয়। সংকটগ্রস্ত এথেন্সের (তথা সমগ্র গ্রীক রাষ্ট্রব্যবস্থার) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুস্থ করার দায়িত্ব চিন্তাবিদগণ, বিশেষ করে সক্রেটিস এবং প্লেটো গভীরভাবে বোধ করতে থাকেন। তাঁদের বিশ্বাস, পুরাতন প্রতিষ্ঠিত নীতি বর্তমানের অরাজকতায় বিপদগ্রস্ত হয়েছে বলেই এথেন্স সর্বদিকে হীনশক্তি হয়ে পড়েছে। পুরনো নীতি বিভিন্ন প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই সমস্ত মৌলিক নীতিকে যুক্তির ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই মাত্র সমাজে আবার সুস্থতা ফিরিয়ে আনা যাবে। এক কথায় 'ন্যায়কে' সমাজের সর্বক্ষেত্রে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সুতরাং সমাজ ও

রাষ্ট্রের সমস্যার আলোচনায় ন্যায়ের প্রশ্নই প্রধান এবং ন্যায়ের সংজ্ঞাই সর্বপ্রথমে আবশ্যক।

ন্যায়ের এই অত্যাবশ্যক সংজ্ঞা-নির্ধারণের প্রয়াসে অর্থাৎ ন্যায়ের অন্বেষণেই রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রশ্ন এসেছে। সক্রেটিসের যুক্তির ধারাটি এরূপ ঃ ন্যায় অবশ্যই সূক্ষ্ম ব্যাপার। চোখের শক্তিপরীক্ষার মতো ন্যায়কে বৃহৎ অবয়বে প্রত্যক্ষ করতে পারলে পরবর্তীকালে তাকে ব্যক্তির ক্ষুদ্র অবয়বে প্রত্যক্ষ করা সহজতর হবে। রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির চেয়ে বৃহৎ। রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তিরই বৃহদাকার সংগঠন। সুতরাং রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়কে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলে ব্যক্তির মধ্যে তাকে নির্দিষ্ট করা সহজে সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তব রাষ্ট্রে ন্যায়কে পাওয়া যেতে পারে না। কেননা বাস্তব রাষ্ট্রে অন্যায়ের প্রতিপত্তি। অন্যায়ের শাসন। ন্যায়কে পাওয়া যাবে আদর্শ রাষ্ট্রে; উত্তম রাষ্ট্রে। সুতরাং উত্তম রাষ্ট্র বাস্তবে না থাক, কল্পনায় গঠন করে তার মধ্যে ন্যায়কে অন্বেষণ করা আবশ্যক। এই পর্যায়ে 'রিপাবলিক' সংলাপে আদর্শ রাষ্ট্র রচনা শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সক্রেটিস এই আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনাক্রমে বাস্তব রাষ্ট্রের ত্রুটির স্বরূপ নির্ধারণ করেন। আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যেই ন্যায়ের মূলনীতি (যার যা করণীয় তা সম্পাদন করাই হচ্ছে ন্যায়) সক্রেটিস নির্ধারণ করেন এবং এই নীতির ভিত্তিতে শুধু রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্থির করেন এবং পরিশেষে ন্যায়বান ব্যক্তিই যে সুখী ব্যক্তি এবং অন্যায়কারী স্বৈরাচারী ব্যক্তি বা শাসক অসুখী তা প্রমাণ করেন। ব্যক্তির সামগ্রিক শিক্ষা, শাসকের গুণ-নির্ধারণ, পরিবার এবং সম্পত্তির ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত স্বত্বের বিলোপ, মানুষের জ্ঞানের প্রকারভেদ প্রভৃতি অন্যান্য সব প্রশ্নই সংলাপের উল্লিখিত মূল প্রশ্নের সমাধান-নির্ধারণে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। 'রিপাবলিক' বিপুলাকার সংলাপগ্রন্থ। কিন্তু এর কোনো প্রশ্ন বা আলোচনাই অপর প্রশ্ন বা আলোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন এবং সূত্রহীন নয়। বস্তুত, একথা যথার্থ যে, 'রিপাবলিকের' মতো যুক্তিপরম্পরায় ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত এবং সুসমন্বিত গ্রন্থ খুব কমই আছে।[১]

---

১. জি. এইচ. স্যাবাইন ঃ হিস্টরী অব পলিটিক্যাল থিওরী ঃ পৃঃ ৬৩

সংলাপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ

সক্রেটিস ঃ সূত্রকার

গ্লকন ও অ্যাডিম্যান্টাস ঃ প্লেটোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয়

সিফালাস

থ্র্যাসিমেকাস

ক্লিটোফন

পলিমারকাস

এবং

নির্বাক দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দ

দৃশ্য

পাইরিউস বন্দরে সিফালাসের গৃহ। সম্পূর্ণ সংলাপটি ঘটেছে একদিন পূর্বে। তাতে প্রধান অংশগ্রহণকারী ছিলেন সক্রেটিস, টিমিউস, হারমোক্রাটিস, ক্রিটিয়াস এবং অপর এক ব্যক্তি যাঁর নাম জানা যায়নি। এঁদের নিকট সক্রেটিস আজ সমগ্র কাহিনীটির বর্ণনা দিচ্ছেন।

প্রথম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১

[৩২৭—৩৩১]

ন্যায়ের সংজ্ঞা ঃ আলোচনার সূত্রপাত

সিফালাসের অভিমত ঃ কথায় ও কাজে সততাই হচ্ছে ন্যায়

'রিপাবলিক' সংলাপের প্রধান কথক সক্রেটিস। ইতিপূর্বে সংঘটিত ঘটনার বর্ণনা হিসাবে সক্রেটিস তাঁর নিজের আলাপ এবং অন্যান্য চরিত্রের অংশগ্রহণকে এখানে পেশ করছেন। কল্পনা করা যেতে পারে যে, সংলাপের নীরব শ্রোতাও আছেন। তাঁদের সংখ্যা কিংবা অংশগ্রহণের কোনো উল্লেখ নেই। সক্রেটিসের সঙ্গে প্রশ্ন এবং জবাব কিংবা টিপ্পনী কাটার মাধ্যমে যেসব চরিত্র সংলাপে অংশগ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে আছেন ঃ গ্লকন এবং অ্যাডিম্যান্টাস (প্লেটোর দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর), সিফালাস, সিফালাসের দুই পুত্র পলিমারকাস এবং লিসিয়াস, ইউথিডেমাস, ক্লিটোফন এবং চ্যালসেডনের থ্র্যাসিমেকাস। ইনি একজন প্রখ্যাত শিক্ষক বা সফিষ্ট। এ ছাড়া সক্রেটিসের তরুণ শিষ্যরাও আছে। সংলাপটির স্থান ছিল এথেন্সের নিকটবর্তী পাইরিউস বন্দরে প্রবীণ বণিক সিফালাসের গৃহ। বেন্দি দেবীর উদ্দেশে অনুষ্ঠিত বলিদান উপলক্ষে একটি সমাবেশ ঘটেছিল। সে-সমাবেশের উল্লেখ সংলাপের শুরুতে পাওয়া যায়। সিফালাস ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধন লাভ করেছেন যথেষ্ট। কিন্তু তিনি অর্থসম্পদকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে গণ্য করেন না। অর্থ ও সম্পদ জীবনের প্রয়োজন মাত্র। তাঁর মতে অর্থ ও সম্পদের মূল্য হচ্ছে এই যে, অর্থ ও সম্পদ ব্যক্তির মনে শান্তির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু শান্তির মূল উৎস সততা এবং দেবতা কিংবা মানুষ যার যা প্রাপ্য তা পরিশোধের দায়িত্ববোধ। তাঁর মতে "সম্পদের যেটা বড় আশীর্বাদ সে হচ্ছে উত্তম ও সৎ-কে এই অভয়দান যে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় কাউকে প্রতারণা কিংবা বঞ্চিত করার কোনো কারণ তার ঘটেনি।" কিন্তু আলোচনাটি সম্পদের লাভালাভে সীমাবদ্ধ থাকল না। সক্রেটিসের কথায় ঃ "তুমি ঠিকই বলেছ, সিফালাস। এর চেয়ে সম্পদের

বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তা হলে ন্যায় সম্পর্কে আমরা কী বলব? সত্যকথন কিংবা ঋণ-পরিশোধকে কি আমরা ন্যায় কিংবা ধর্মের সংজ্ঞা বলে নির্দিষ্ট করতে পারি?" কাজেই বর্তমান সংলাপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়। এবং সক্রেটিস অধিক বিলম্ব না করে তাকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করে তুললেন।

এরিসটনের পুত্র গ্লকনকে সঙ্গী করে গতকাল আমি পাইরিউস গিয়েছিলাম। পাইরিউস যাবার আমার দুটো উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, পাইরিউস মন্দিরের অধিশ্বরীকে[১] আমার পূজার্চনা পেশ করা; দ্বিতীয়ত এখানকার উৎসবটি কী করে অনুষ্ঠিত হয় সেটি দেখা। এই উৎসবটির প্রচলন এখানে নূতন। এজন্য এর অনুষ্ঠানটি দেখার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। স্থানীয় অধিবাসীগণের শোভাযাত্রাটি আমার মনে প্রকৃতই আনন্দের সঞ্চার করেছে। থ্রেসবাসীদের ক্রীড়াকৌশল দেখেও আমি চমৎকৃত হয়েছি। বস্তুত ক্রেসবাসীদের প্রদর্শনী অন্যান্যদের চেয়ে অধিকতর চিত্তাকর্ষক না হলেও অপর কারু চেয়ে তারা কিছুতেই কম ছিল না। আর সবার মতই তারাও সুন্দর ক্রীড়াকৌশল দেখিয়েছে।

আমাদের পূজার্চনা তখন শেষ করেছি; অনুষ্ঠান দর্শনও তখন সমাপ্ত হয়েছে; নগরী লক্ষ্য করে আমাদের বাড়ির পথে আমরা সবেমাত্র চলতে শুরু করেছি—ঠিক সেই মুহূর্তে সিফালাস-পুত্র পলিমারকাস দূর থেকে আমাদের দু'জনকে দেখে ফেললেন। আমাদের দেখতে পেয়েই তিনি তাঁর ভৃত্যকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, আমরা যেন তাঁর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। ভৃত্যটি দৌড়াতে দৌড়াতে পিছন থেকে আমার জোব্বাটির নাগাল পেয়ে তাকে টেনে ধরেই বলে উঠল ঃ হুজুর, প্রভু পলিমারকাস আপনাদের খানিকটা অপেক্ষা করতে বলেছেন।

প্রতি পৃষ্ঠার শীর্ষে মূল গ্রন্থের পুস্তক এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা উদ্ধৃত হয়েছে। এই পৃষ্ঠাসংখ্যার বিষয়ে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "Modern editions of Plato refer to the Pagination of the edition by J. Serranus and H. Stephanus 3 vols. with Latin translation (Paris. 1578)"—Encyclopeadia Britannica.

১. দেবী বেন্দিস

আমি পেছনে ফিরে বললাম ঃ কই হে! তোমার মনিব কোথায়?

বেচারি অনুনয়ের সুরে বলল ঃ এই যে হুজুর তিনি আসছেন। আপনারা একটু অপেক্ষা করলেই তিনি এসে পৌঁছে যাবেন।

গ্লকন বললেন ঃ বেশ বেশ, আমরা অপেক্ষা করছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা পলিমারকাসকে দেখতে পেলাম। শুধু পলিমারকাস নয়, পলিমারকাসের সঙ্গে গ্লকনের ভ্রাতা এ্যাডিম্যান্টাসকে এবং নিসিয়াস-পুত্র নিকারাটাসসহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী আরও অনেককেই দেখা গেল।

আমার নিকটবর্তী হয়ে পলিমারকাস বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার সঙ্গীকে নিয়ে তুমি ইতিমধ্যেই শহরে ফিরে চলেছ?

আমি বললাম ঃ তোমার অনুমান খুব মিথ্যা নয় পলিমারকাস।

পলিমারকাস আমার কথার জবাবে বলে উঠলেন ঃ কিন্তু সক্রেটিস, আমাদের সংখ্যাটি নিশ্চয়ই তুমি দেখতে পাচ্ছ।

আমি বললাম ঃ নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু তোমার শক্তি কি আমাদের সবার চাইতে বেশি? যদি তা না হয় তা হলে তুমি একথা ঠিক জেনো যে, তুমি যেখানে রয়েছ সেখানেই তোমাকে থাকতে হবে।

আমি বললাম ঃ এমন চরম কথা কেন? আমরাও তো আমাদের অবস্থাটি তোমাদের এমনভাবে বুঝিয়ে বলতে পারি যাতে তোমরা অবশ্যই আমাদের চলে যাওয়ার অনুমতি দেবে।

পলিমারকাস দুষ্টামির ভঙ্গিতে বললেন ঃ কিন্তু বুঝতে আমরা যদি না চাই, বোঝাতে পারবে আমাদের? এমন সাধ্য আছে তোমাদের?

গ্লকন হাল ছেড়ে বললেন ঃ না না, সে-সাধ্য আমাদের আদৌ নেই!

ঃ বেশ তা হলে জেনে রাখো, তোমাদের কোনো কথা আমরা আদপেই শুনছিনে।

এ্যাডিম্যানটাস বললেন ঃ তোমরা কি শোননি রাত্রিবেলা দেবীর উদ্দেশে অশ্বপৃষ্ঠে এক মশাল-মিছিলের অনুষ্ঠান ঘটবে?

আমি একটু অবাক হলাম ঃ কী বলছ— অশ্বপৃষ্ঠে মশালযাত্রা! এ তো অবশ্যই এক নূতন দৃশ্য। ব্যাপারটি কীরূপ? অশ্বারোহী কি তা হলে মশালসহ দৌড়ে গিয়ে নিজের মশালটি অপর অশ্বারোহীর হাতে পৌঁছে দেবে?

পলিমারকাস জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই; তা ছাড়া রাত্রে আরও একটি উৎসবের আয়োজন হয়েছে। এটি তোমাদের অবশ্যই দেখা আবশ্যক। এসো আমরা সকলে অপেক্ষা করি। রাত্রির ভোজনের পরেই আমরা উৎসবে যোগদান করব। উৎসব ক্ষেত্রে বিরাট এক তরুণদলও সমবেত হবে। আমাদের সবার মধ্যে তখন একটি উত্তম আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। কাজেই আমাদের অনুরোধ, তোমরা অরসিক হয়ো না। তার বদলে খুশি মনে রাত্রির অনুষ্ঠানের জন্য এখানে অবস্থান করো।

গ্লকন দেখলেন উপায়ান্তর নেই। তিনি বললেন ঃ তোমরা যখন এত করে বলছ, তখন আমাদের অবস্থান করতেই হয়।

আমি বললাম, উত্তম গ্লকন। তবে তা-ই হোক।

এই পরিকল্পনানুযায়ী আমরা সদলবলে পলিমারকাসের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে আমরা লীসিয়াস এবং ইউথিডেমাস ভ্রাতৃদ্বয়কে যেমন দেখতে পেলাম, তেমনি তাদের সঙ্গে উপস্থিত দেখলাম চালসিডোনবাসী থ্র্যাসিমেকাসকে, পিনিয়াবাসী চারমানটাইডিসকে এবং এ্যারিসটোনেমাস পুত্র ক্লিটোফনকেও। পলিমারকাসের পিতা সিফালাসও উপস্থিত ছিলেন। অনেক দিন পরে আজ তাঁকে এই প্রথম দেখলাম। মনে হল সিফালাস ইতিমধ্যে যেন অনেকখানি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। গদিসজ্জিত একটি আরামকেদারায় সিফালাস তখন উপবিষ্ট। তাঁর মস্তক ঘিরে একটি পুষ্পমাল্য শোভা পাচ্ছিল। বুঝতে পারলাম উৎসব-প্রাঙ্গণে তিনি বলিদানকার্যে নিরত ছিলেন। তাঁর পাশে অর্ধবৃত্তাকারে আরও অনেকগুলি আসনের আয়োজন ছিল। আমরা তাঁর দুপাশে সবাই মিলে আসন গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে সাগ্রহে সম্বোধন করে বললেন ঃ

সক্রেটিস, তুমি তো আমাকে আর তেমন দেখতে আসো না। দ্যাখো, আমার যদি চলৎশক্তি থাকত এবং নিজেই তোমার কাছে যেতে পারতাম তা হলে আর তোমাকে আসতে বলতাম না। কিন্তু বুঝতেই পারছ আমার এই বয়সে আর আমার পক্ষে শহর পর্যন্ত ধাওয়া করা সম্ভব নয়। তাই বলছি, পাইরিউসে তোমারই আরও বেশি করে আসা উচিত। কারণ, সত্যি করে বলতে কী সক্রেটিস! দেহের শক্তি আর উচ্ছলতা যতই ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছে, ততই আমি যেন তোমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অধিকতর আনন্দ এবং আকর্ষণ বোধ করছি। কাজেই আমার এ-অনুরোধটি তুমি প্রত্যাখ্যান কোরো না। আমার এ-গৃহ তোমার বিশ্রামনিবাস হোক, এই আমার অনুরোধ। চারপাশে এই তরুণদল

রয়েছে। তাদের তুমি সঙ্গদান কোরো। তোমার আমার পারস্পরিক বন্ধুত্বের বন্ধন তো শুধুমাত্র আজকের কথা নয়। পুরাতন আমাদের বন্ধুত্ব। আমার গৃহে তোমার সঙ্কোচের কোনো কারণ কি থাকতে পারে?

আমি বললাম ঃ সিফালাস, প্রিয়বরেষু! আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, বয়সে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাতেই আমার সর্বাধিক আনন্দ। কেননা আমি মনে করি, বয়সে যাঁরা আমার অগ্রজ তাঁরা জীবনের দীর্ঘতর পথ অতিক্রম করে এসেছেন। সে-পথ হয়তো-বা আমাকেও অতিক্রম করতে হবে। কাজেই আমার প্রয়োজন সেই অগ্রপথিকদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া তাঁদের অতিক্রান্ত সে-পথ সহজ, নিরঙ্কুশ অথবা সে দুর্গম কঠিন। তোমার কাছেও আমার সেই জিজ্ঞাসা সিফালাস। কবিরা যাকে বলেন 'বার্ধক্যের বেলাভূমি' তুমি আজ সেখানে উপস্থিত হয়েছ। তুমি আমায় বলো, প্রবুদ্ধ! জীবনের দিগন্ত কি সত্যিই দুর্গম?

ঃ সক্রেটিস, এ-ব্যাপারে আমার নিজের মনোভাবটি তোমায় বলছি। আমার বয়সী যারা—অর্থাৎ আমরা যারা বৃদ্ধ তারা অনেক সময়েই এক ঝাঁকে সমবেত হই। কারণ, প্রবাদের কথায়, আমরা একই পালের পাখি। আমাদের এরূপ সমাবেশে আমি আমার বন্ধুদের নিকট থেকে অভিযোগের সুরে শুনতে পাই, কেউ বলছে, 'ভাই! আর খেতে পারছিনে', কেউ বলছে, 'কোথায় আর জীবনের সেই পানোৎসব; যৌবনের তারুণ্য আর প্রেমের জোয়ার আজ ভাটার টানে পলাতক, বিশুষ্ক। জীবনে একটা দিন এসেছিল বটে, আনন্দের আর প্রেমের। কিন্তু সে আজ অন্তর্হিত, জীবনআজ মৃত।' কেউ অভিযোগ করে, আত্মজনেরা আজ তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে, কেউ বলে বার্ধক্যই সব দুঃখের মূল; তাদের দুঃখভরা কণ্ঠে যত করুণ কাহিনী বর্ণিত হয় তাদের সবার দায়িত্ব 'বার্ধক্যের' কাঁধে গিয়ে বর্তায়। কিন্তু সক্রেটিস, আমার মনে হয় আমার অভিযোগকারী বন্ধুগণ তাদের দুঃখের মূল খুঁজে পাচ্ছে না। বৃথাই তারা বার্ধক্যকে দায়ী করছে। কারণ, বার্ধক্য যদি সব দুঃখের কারণ হত তা হলে বৃদ্ধ আমি এবং বৃদ্ধ আর সকলের মনেই তো একই অভিযোগ আর দুঃখবোধের সৃষ্টি হত। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এরূপ নয়। এমন কিছু বৃদ্ধ অপর বন্ধুও আমার রয়েছে যাদের অভিজ্ঞতাও এরূপ নয়। সফোক্লিস আজ নয়, বহু বছর পূর্বে এ-প্রসঙ্গে সুন্দর জবাবই দিয়েছিলেন। বৃদ্ধ কবি যখন জিজ্ঞাসিত হলেন ঃ কবি, বলো বার্ধক্যে কি প্রেম সাজে? যে-তরুণ একদিন তুমি ছিলে আজও কি তুমি তা-ই রয়েছ? কবি বললেন ঃ 'শান্ত হও! তোমরা যার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছ আমি যে তার শৃঙ্খলকে এড়াতে পেরেছি তাতেই আমার পরম সন্তোষ। উন্মত্ত আর

অমিত সে প্রভু। তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, মুক্তি পেয়েছি এ-আনন্দই আমার বড়।' বৃদ্ধ কবির এ-বাণী আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উক্তির দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত কতবার এ-বাণীকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেছি। এ-বাণীর যথার্থতা উক্তির দিনটির ন্যায় আজও অম্লান। বার্ধক্য সত্যই আমাদের জীবনে একটা শান্তি আর মুক্তির অনুভূতি নিয়ে আসে। সফোক্লিসের বাণীর মর্মানুযায়ী, আমাদের উদগ্র বাসনার বন্ধন যখন শিথিল হয় তখন আমরা যে কেবল একটি দুর্দম প্রভুর দাসত্ব থেকেই মুক্তি পাই তা-ই নয়, আমাদের বশকারী বহু প্রভুর বন্ধন থেকেই আমরা মুক্তির আস্বাদ লাভ করি। সক্রেটিস, এক্ষেত্রে যারা বৃদ্ধ বয়সে আত্মীয়স্বজনদের উপর অবজ্ঞার দোষ আরোপ করে তারাও আসল কারণটিকে নির্ধারণ করতে পারে না। অবজ্ঞাত হওয়ার আসল কারণ বার্ধক্য নয়, আসল কারণ তাদের আপন আপন চরিত্র এবং মেজাজ। কেননা, একথা আমরা জানি, যে চরিত্রে শান্তএবং সুখী, সে তার বয়সের বোঝা আদৌ বোধ করে না। অপরদিকে চরিত্রই যার বিপরীতধর্মী, কী তারুণ্য কী বার্ধক্য সবই তার নিকট ভার হয়ে দাঁড়ায়।

মুগ্ধ হয়ে আমি সিফালাসের আলোচনাট শুনছিলাম এবং যাতে তিনি তাঁর এই মেজাজটি নিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে যেতে পারেন সেজন্য আমি বললাম ঃ তোমার কথা অবশ্যই ঠিক সিফালাস। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার এরূপ বক্তব্যের উপর সাধারণ লোক কোনো আস্থা স্থাপন করবে না। কেননা, তারা হয়তো ভাববে যে, বার্ধক্য যদি সিফালাসের নিকট বোঝা বলে অনুভূত হয়ে না থাকে তো সে এজন্য নয় যে সিফালাস প্রকৃতিগতভাবে ধীর, শান্ত ও বিবেচক। আসল কারণ হচ্ছে, সিফালাস অর্থবান, সিফালাস সম্পদশালী। কেননা, লোকে বলে সম্পদই মানুষের মনে শান্তি আনে।

আমার কথা শুনে সিফালাস বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস, সাধারণ লোক আমার কথা বিশ্বাস করে না। এবং আমার সম্পর্কে তাদের বক্তব্য যে একেবারে মিথ্যে একথাও আমি বলছিনে। অবশ্য তাদের কথা যতখানি যথার্থ বলে তারা মনে করে ততখানি যথার্থ নয়। এক্ষেত্রে থেমিসটোক্লিসের ন্যায় আমিও তাদের একটি জবাব দিতে পারি। তুমি জান যে, জনৈক সেরিফিয় তাঁর প্রতি কটূক্তি উচ্চারণ করে বলেছিল যে, থেমিসটোক্লিসের খ্যাতির পেছনে তাঁর নিজের গুণ কিছু নেই; এথেন্সের অধিবাসী বলেই তিনি খ্যাত। সেরিফিয়বাসীর এ উক্তির জবাবে থেমিসটোক্লিস বলেছিলেন ঃ 'যথার্থ। আর এজন্যেই আমি বলছি যে, তুমি যদি আমার দেশের অধিবাসী হতে, কিংবা আমি তোমার দেশের

অধিবাসী হতাম তা হলে তুমি কিংবা আমি কারুর ভাগ্যেই খ্যাতির কোনো প্রসাদই জুটতো না।' থেমিসটোক্লিসের ন্যায় আমিও যারা সম্পদে বঞ্চিত আর বার্ধক্যে উদ্বিগ্ন তাদের লক্ষ্য করে বলতে পারি ঃ যে নির্ধন কিন্তু সৎ, তার কাছে যেমন বার্ধক্য কোনো বোঝাস্বরূপ বোধ হতে পারে না, তেমনি যে সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু অসৎ, সে-ও কখনো অন্তরের শান্তি লাভ করতে পারে না।

আমি বললাম ঃ সিফালাস, আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি তোমার এই সম্পদ সবই কি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, না তোমার স্বোপার্জিত?

ঃ সক্রেটিস, অবশ্যই স্বোপার্জিত। কিন্তু তুমি কি যথার্থই জানতে চাও, আমার উপার্জিত সম্পদের পরিমাণ কতখানি? অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে আমাকে তুমি আমার পিতামহ আর পিতার মধ্যবর্তী মনে করতে পার। আমার পিতামহ যাঁর নাম আমি ধারণ করছি তাঁর কথা বললে আমি বলব যে তিনি তাঁর পৈতৃক সম্পদকে দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছিলেন। আমার বর্তমান সম্পদের পরিমাণ যতটুকু, তিনি ততটুকুই মাত্র উত্তরাধিকার হিসাবে লাভ করেছিলেন। কিন্তু আমার পিতা লীসানিয়াস আবার তাকে ক্ষয় করে বর্তমানের চেয়েও নিচে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আর নিজের বেলায় আমি বলব যে, যেটুকু আমি পেয়েছিলাম যেন তার কম নয় বরঞ্চ একটু বেশি আমি আমার পুত্রদের জন্য রেখে যেতে পারি। এটুকু হলেই আমি সুখী হব, আমি আর কিছুই চাইব না।

ঃ আমার জিজ্ঞাসার কারণও তা-ই সিফালাস। কেননা অর্থ এবং সম্পদ সম্পর্কে তোমার যে নিস্পৃহতা দেখা যায় সে-বৈশিষ্ট্য কেবল জন্মগতভাবে প্রভূত সম্পদের উত্তরাধিকারীদের চরিত্রেই দৃষ্ট হয়, সম্পদ উপার্জনকারীদের চরিত্রে নয়। অর্থ এবং সম্পদকে যারা নিজেরা উপার্জন করে তারা আপন সৃষ্ট বলে একান্তভাবে ভালোবাসে। তাদের এ-ভালোবাসা হচ্ছে কাব্যের প্রতি কবির কিংবা পুত্রের প্রতি পিতার ভালোবাসারই সদৃশ। অর্থ এবং সম্পদের একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। সেজন্য মানুষমাত্রই তাকে ভালোবাসে। আমাদের সে-ভালোবাসা সাধারণ; কিন্তু সম্পদসর্বস্বদের এই ভালোবাসা অস্বাভাবিক। এজন্য এদের সঙ্গ খুব বাঞ্ছনীয় নয়। এরা সঙ্গী হিসাবে পরিত্যাজ্য। কেননা, তাদের পক্ষে কারু সঙ্গে অর্থ এবং সম্পদের প্রশংসা ব্যতীত অপর কোনো আলোচনা করাই সম্ভব নয়।

সিফালাস বললেন ঃ তোমার একথা যথার্থ সক্রেটিস।

ঃ হ্যাঁ, একথা অবশ্যই সত্য। কিন্তু তোমার নিকট আমার আর একটি প্রশ্ন রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, সম্পদ থেকে কী শান্তি তুমি লাভ করেছ?

সিফালাস বললেন ঃ সম্পদের একটি আশীর্বাদের কথা আমি বলতে পারি। অবশ্য আমি জানি, আমার কথাটি অপরকে সহজে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়। তথাপি, সক্রেটিস, আমি মনে করি যে, সম্পদের এই দানটি খুবই মূল্যবান। কেননা, মানুষ যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হয়ে আসে তখন তার মনে এতদিন পর্যন্ত যে-চিন্তা, ভাবনা ও ভীতির উদয় হয়নি, সেগুলোরই উদ্ভব ঘটতে থাকে; পাতাললোকে যাত্রা যখন তার আসন্ন হয়ে উঠেছে তখন তার কৃতকর্মের ফলস্বরূপ যে-শাস্তি তাকে সেই পরলোকে পেতে হবে তার কথা আতঙ্কজনকভাবে তার মনে উদয় হতে থাকে। মর্তলোকের কার্যাবলীর জন্য পাতাললোকে দণ্ড কিংবা পুরস্কারলাভের কাহিনী সে পূর্বেও শুনেছে। কিন্তু পূর্বে যে-কাহিনী ছিল তার নিকট পরিহাসের বস্তু আজ তাই হয়ে উঠেছে তার নিকট আতঙ্কের বিষয়। আজ সে ভাবছে, এতকাল যাকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, সে-কাহিনী শেষ পর্যন্ত সত্যও হতে পারে। পাতাললোকের সান্নিধ্য অথবা বয়সের আধিক্য—যে-কারণেই হোক-না কেন আজ যেন পাতাললোক সম্পর্কে তার দৃষ্টিটি বেশ পরিষ্কার হয়ে এসেছে; উদ্বেগ এবং আতঙ্কে তাই সে অস্থির হয়ে উঠেছে। আজ সে ভাবতে শুরু করেছে, মর্তলোকের জীবনে কার প্রতি কোন্ অন্যায় সে করেছে। এই হিসাব-নিকাশে যখন সে দেখতে পায় যে, অন্যায়ের অংশ তার মোটেই কম নয় তখন শিশুর মতোই নিদ্রার মধ্যে দুঃস্বপ্নে সে আঁতকে ওঠে; মন তার নানা দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু অন্যায় থেকে যে মুক্ত, পাপের দুশ্চিন্তার উদয় যার মনে ঘটে না, সুন্দর আশাই তার পরলোকের পথে প্রিয় সঙ্গী হিসাবে তাকে অভয় দিতে থাকে। এ কথাটিই সুন্দরভাবে প্রকাশ করে পিন্ডর বলেছেন ঃ

> যে ধর্মের পথে রয়েছে এবং পবিত্র জীবনযাপন করেছে আশা তার আত্মার সঙ্গী; তার বার্ধক্যে আর পাতাললোকের পথে আশা তাকে ভরসা যোগায়; কারণ, দুশ্চিন্তায় অস্থির আত্মাকে শান্ত করার ক্ষমতা একমাত্র আশারই আছে।

পিন্ডরের এ-কথাকয়টিকে আমি খুবই উত্তম বলে মনে করি। আর তাই সম্পদের যেটা সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ সে হচ্ছে উত্তম ও সৎকে এই অভয়দান যে, ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় কাউকে প্রতারণা কিংবা বঞ্চিত করার কোনো কারণ তার ঘটেনি। পাতাললোকে যাত্রার মুহূর্তে মানুষ কিংবা দেবতা কারু কাছে কোনো ঋণের চিন্তাতেই আর সে নিজেকে চিন্তাগ্রস্ত বোধ করে না। একথা অবশ্যই সত্য যে, এ-আশীর্বাদ কেবলমাত্র উত্তমের ভাগ্যেই জুটতে পারে, সকলের ভাগ্যে নয়। দুশ্চিন্তা থেকে মানুষের মুক্তিবোধের এই যে শান্তি সে কেবল সম্পদ থেকেই

আমরা লাভ করতে পারি। সম্পদের সুবিধা এ ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও অনেক রয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, যে-ব্যক্তি জ্ঞানী, যে চিন্তাশীল তার কাছে সম্পদের আশীর্বাদ এর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।

আমি বললাম ঃ তুমি ঠিকই বলেছ সিফালাস, এর চেয়ে সম্পদের বড় আশীর্বাদ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু তা হলে ন্যায় সম্পর্কে আমরা কী বলব? সত্যকথন কিংবা ঋণ-পরিশোধকে কি আমরা ন্যায় কিংবা ধর্মের সংজ্ঞা বলে নির্দিষ্ট করতে পারি? তা ছাড়া, এমন সংজ্ঞারও কি ব্যতিক্রমের কথা আমাদের স্বীকার করতে হয় না? কারণ, ধরো, আমার এক বন্ধু সুস্থ অবস্থায় তাঁর একটি অস্ত্র আমার কাছে জমা রাখলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর সে-অস্ত্র ফেরত চাইলেন, তখন তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। এখন আমার কী করণীয়? আমি কি তাঁকে তাঁর জমা-রাখা অস্ত্র ফেরত দেব? এমন অবস্থায় তাঁর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত বলে নিশ্চয়ই কেউ বলবে না। অনুরূপ অবস্থায় যিনি আছেন তাঁর কাছে সত্যকথন কেউ উচিত-কার্য বলে মনে করবে না।

সিফালাস বললেন ঃ তোমার কথা যথার্থ সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ তা হলে সত্যকথন এবং ঋণ-পরিশোধকে ন্যায় বা ধর্মের সঠিক সংজ্ঞা বলে অভিহিত করা চলে না।

এবার পলিমারকাসও আলাপে যোগ দিলেন। তিনি বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ সক্রেটিস। সিমোনাইডিসের কথাকে যদি বিশ্বাস করতে হয় তা হলে ধর্মের সেরূপ সংজ্ঞা-নির্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সময়ে সিফালাস চলে যাওয়ার উপক্রম করে বলে উঠলেন ঃ আমার তো আর বিলম্ব করার উপায় নেই সক্রেটিস। বলিদান অনুষ্ঠানের তদারক আমাকে করতে হবে। তাই পলিমারকাস এবং অন্য বন্ধুদের হাতে যুক্তির বল্লাটি তুলে দিয়ে আমি এবার নিষ্ক্রান্ত হতে চাই।

আমি বললাম ঃ তা হলে পলিমারকাসই তোমার যুক্তি-সম্পদের উত্তরাধিকারী, কী বল?

সিফালাস যেতে যেতে সহাস্যমুখে বললেন ঃ তাতে আর সন্দেহ কী?

অধ্যায় ঃ ২

[৩৩২—৩৩৮]

পলিমারকাস ঃ ন্যায় হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব, শত্রুর প্রতি শত্রুতা

ন্যায়ের একটা সংজ্ঞা পাওয়া গেছে বটে। কিন্তু সেটিই কি চরম? যুক্তির কষ্টিপাথরে তাকে তো টিকতে হবে। সত্যকথন এবং অন্যের দায়শোধ মহৎ গুণ বটে। এরূপ মহৎ গুণ তো মানুষের আরও আছে। কিন্তু সব মহৎ গুণের আন্তরিক সেই গুণটি কী, যে-গুণের কারণে এই গুণকে আমরা উত্তম গুণ বলে বিবেচনা করি? তা ছাড়া সক্রেটিস, সিফালাসের দায়শোধের গুণটিকে বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে, অবস্থানির্বিশেষে দায়শোধ বা ঋণশোধকে মহৎ গুণ বলা চলে না। উন্মাদ ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য অস্ত্র প্রত্যর্পণকে কি মহৎকার্য বলা চলে? অর্থাৎ কোনো গুণের বিচারে প্রেক্ষিতের প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে একটি মহৎ গুণকে অ-মহৎ গুণে পর্যবসিত করতে পারে। কিন্তু ন্যায় হবে এমন গুণ যে অবস্থানির্বিশেষে মহৎ বলে বিবেচিত।

সক্রেটিসের এই সমালোচনার জবাবে পলিমারকাস প্রখ্যাত কোনো কবির উল্লেখ করে ন্যায়ের একটি নূতন সংজ্ঞা তৈরি করার চেষ্টা করলেন। পলিমারকাস বললেন ঃ ন্যায় হচ্ছে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন এবং শত্রুর প্রতি শত্রুতা। অর্থাৎ যার যা প্রাপ্য তাকে তা-ই দেয়াই হচ্ছে ন্যায়। এক্ষেত্রে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রীসে পবিত্র এবং অলংঘনীয় কোনো ধর্মগ্রন্থ ছিল না। লোকে কবিদেরই ঐশ্বরিক জ্ঞানের আধার বলে মনে করত। তাই কোনো সমস্যায় কবিদের বাণীর বরাত দেওয়া সাধারণ রীতি ছিল। কিন্তু সক্রেটিস বিনা প্রশ্নে কবিদের বাণী স্বীকার করতে চাননি। বরঞ্চ সক্রেটিস প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কবিদের অনেক বাণী যুক্তির বিচারে টেকে না। এবং যারা যুক্তির বিচারে টিকতে পারে আমরা কেবল

সেই বাণীকেই গ্রহণ করতে পারি। কাজেই কবির বরাতে আমরা যদি বলি 'যার যা প্রাপ্য, তাকে তা-ই দেয়াই ন্যায়' তা হলে তাকেও যুক্তির বিচারে টিকতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সক্রেটিস এই সংজ্ঞাটির অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি বিশ্লেষণ করে তার অসারতা প্রমাণের চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে সক্রেটিস বিভিন্ন কার্যের দক্ষতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। মানুষের কর্ম বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত। এদের আমরা মানুষের গুণ, শিল্প, কলা বলে আখ্যায়িত করি। যেমন, চিকিৎসা বা নিরাময়-শিল্প, নৌচালনার শিল্প, পাদুকা তৈরির শিল্প। প্লেটোর মতে মানুষের জীবন যেসব কর্ম-শিল্পে বিভক্ত সেসব শিল্পে দক্ষতা-অর্জন মানুষের একটি স্বভাবগত এবং নীতিগত কর্তব্য। এই দক্ষতা-অর্জনকে প্লেটো অনেক সময়ে ন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। কারণ এই দক্ষতা-অর্জন নির্ভর করে ব্যক্তির পক্ষে তার নির্দিষ্ট কর্মের লক্ষ্য অনুধাবনের ওপর। মানুষের প্রতিটি কর্মই হচ্ছে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কাজ, উদ্দেশ্যসাধনমূলক কাজ। যে জুতা তৈরির শিল্পী তার এই শিল্পে দক্ষতা-অর্জন নির্ভর করে তার কর্মের উদ্দেশ্য কী, অর্থাৎ পরিণামে কর্মটি কী রূপ লাভ করবে, এর পূর্ণতম রূপটি কী হবে সে-সম্পর্কে শিল্পীর ধারণা থাকার উপর। যে-শিল্পীর তার শিল্পের পূর্ণতম রূপ সম্পর্কে যত সম্যক জ্ঞান, তত সে তার শিল্পে পূর্ণতর শিল্পী। নৌচালনার শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এদিক থেকে জীবনধারণটাও একটা শিল্প। এবং ব্যক্তির উত্তম জীবনধারণও জীবনধারণের পরিণতি বা জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্র-পরিচালনাও একটি শিল্প। এ-শিল্পে দক্ষতা নির্ভর করে এর মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাষ্ট্রের পূর্ণতম বিকাশ কিংবা সর্বোত্তম রাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞানের উপর। প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা-অর্জনের আবশ্যকতা এবং দক্ষতা-অর্জন যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, এই তত্ত্ব প্লেটো-দর্শনের অন্যতম মূল তত্ত্ব। রিপাবলিকের মধ্যে এই তত্ত্বটিই ন্যায় এবং উত্তম রাষ্ট্রের কল্পনার মূল নিয়ামক। এই তত্ত্বের দুটি তাৎপর্য ঃ ১. উদ্দেশ্য কিংবা আদর্শের একটা অস্তিত্ব আছে। না হলে সে আমাদের জীবনের এবং জীবনের সকল ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কার্যের নিয়ামক হতে পারত না। ২. উদ্দেশ্য বা আদর্শকে জানার চেষ্টা করতে হবে। উদ্দেশ্যকে জানা যায়। জানা না গেলে তাকে জানার চেষ্টা নিরর্থক হত। এবং তাকে জানার উপরই মানুষের কর্মের উৎকর্ষ নির্ভর করে। রাষ্ট্র- পরিচালনার ক্ষেত্রে রিপাবলিকের মূল প্রতিপাদ্য ঃ রাষ্ট্র-পরিচালনা-রূপ শিল্পে যাদের সর্বোত্তম দক্ষতা থাকবে তারাই রাষ্ট্রের শাসক

হবে। উপরোক্ত দর্শনের ভিত্তিতেই প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা তৈরি করেছেন।

* * *

পলিমারকাসের প্রস্তাবিত সংজ্ঞার অসঙ্গতি বিশ্লেষণশেষে সক্রেটিস বললেন ঃ "তা হলে পলিমারকাস, আগের কথাটি আর থাকে না। এরূপ বলার আর অর্থ থাকে না যে, ন্যায় বা ধর্মের অর্থ হচ্ছে অপরের দেয়কে শোধ করা এবং দেয় বা ঋণ বলতে বুঝাবে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব আর শত্রুর প্রতি শত্রুতা।'

"পলিমারকাস বললেন ঃ সক্রেটিস তোমার সঙ্গে আমি একমত।"

যুক্তির উত্তর-পুরুষ। এবার তা হলে তুমি আমায় বলো, তোমার সিমোনাইডিস ধর্ম কিংবা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সত্যকারভাবে কী বলেছেন?

পলিমারকাস বললেন ঃ সিমোনাইডিসের মতে দায়শোধই হচ্ছে যথার্থ ধর্ম কিংবা ন্যায়পরায়ণতা। আর তাঁর এ-মতকে আমার যথার্থ বলেই বোধ হয়।

ঃ যুক্তির ক্ষেত্রে তোমার এরূপ সিদ্ধপুরুষের কথাকে সন্দেহ করতে আমার অবশ্যই ভয় হয়। কিন্তু আসল কথা কী জান পলিমারকাস, তোমার এই জ্ঞানী পুরুষের কথা তোমার নিকট খুব স্বচ্ছ বোধ হলেও আমার নিকট ঠিক তার উলটাটিই বোধ হচ্ছে। কারণ, তিনি নিশ্চয়ই একথা বলবেন না যে, দায়শোধ ধর্ম বলে একজন উন্মাদকে তার পূর্বপ্রদত্ত মারণাস্ত্র আমি ফিরিয়ে দেব। অথচ আজ যে উন্মাদ কাল সে এই দ্রব্য আমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিল। তার গচ্ছিত দ্রব্য অবশ্যই আমার দায়। তার নিকট তার এ-ঋণে আমি ঋণী, একথাও আমি অস্বীকার করতে পারিনে।

হ্যাঁ, একথা তোমার সত্য, সক্রেটিস।

তা হলে উন্মাদ তার দত্ত দ্রব্যকে ফেরত চাইলে আমি তা ফিরিয়ে দেব না?

না, কোনোক্রমেই তা তুমি ফিরিয়ে দিতে পার না।

তা হলে 'ঋণশোধেই ধর্ম' বলতে সিমোনাইডিস নিশ্চয়ই উন্মাদের এরূপ ঋণশোধকে বোঝাতে চাননি। ঠিক নয় কি?

না, তা তিনি চাননি। কেননা, সিমোনাইডিস একথাও বলেছেন যে, যে বন্ধু সে তার বন্ধুর মঙ্গল সর্বদাই কামনা করবে, অমঙ্গল নয়।

অর্থাৎ, দু'জনে যদি আমরা পরস্পরের সুহৃদ হই আর তোমার গচ্ছিত স্বর্ণের প্রত্যর্পণে যদি তোমার কোনো ক্ষতি কিংবা অমঙ্গল ঘটে তা হলে সে-স্বর্ণের প্রত্যর্পণ আমার পক্ষে ঋণশোধের কার্য হবে না। তোমার সিমোনাইডিসের কথার তো এরূপই অর্থ করবে তুমি। ঠিক নয় কি পলিমারকাস?

হ্যাঁ, তোমার একথা ঠিক সক্রেটিস। তাঁর কথার এরূপ অর্থ।

বেশ। কিন্তু যে আমার সুহৃদ নয়, যাকে আমি আমার শত্রু মনে করি তার গচ্ছিত ধনের প্রত্যর্পণ কি আমার পক্ষে সঙ্গত হবে?

নিশ্চয়ই। আমার তো মনে হয়, আমার নিকট শত্রুর যা প্রাপ্য অর্থাৎ তার ক্ষতি কিংবা অমঙ্গল, তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়াতে অসঙ্গতির কিছু নেই।

তা হলে সিমোনাইডিসের কথাকে কবিদের বাণীর অনুরূপই ধরতে হয়। তাঁদের মতো সিমোনাইডিসও ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক অভিমতই পোষণ করেন। কেননা, তাঁর কথার আসল অর্থ হচ্ছে এই যে, যার যা প্রাপ্য তাকে তা ফিরিয়ে দেওয়াই হচ্ছে ধর্ম। ধর্ম তাঁর কাছে যথার্থই একটা ঋণ-পরিশোধের ব্যাপার।

আমারও তা-ই মনে হয়।

তা-ই যদি সত্য হয়, তা হলে ব্যাপারটা কিন্তু একটু সাংঘাতিকই হয়ে দাঁড়াবে, পলিমারকাস। কেননা, তেমন ক্ষেত্রে যদি আমরা সিমোনাইডিসকে জিজ্ঞেস করি, ঔষধের কিংবা বলা যাক চিকিৎসকের দেয় কার প্রতি কী, তা হলে সে-প্রশ্নের জবাবে তিনি কী বলবেন?

তেমন প্রশ্নের জবাবে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন যে, দেহের প্রতি ঔষধের দেয় হচ্ছে নিরাময়ের উপকরণ, খাদ্য, পানীয় আর শক্তি।

উত্তম কথা। তা হলে রন্ধনশাস্ত্রের দেয় কি রইল?

রন্ধনশাস্ত্রের দেয় হচ্ছে, খাদ্যবস্তুকে গ্রহণযোগ্য করে দেওয়া।

তা হলে ধর্মের দেয় কার প্রতি কী?

সক্রেটিস, পূর্বের উপমাগুলোর তাৎপর্যকে মেনে নিলে এখানেও আমাদের বলতে হয় যে, ধর্ম বলতে আমরা সুহৃদের প্রতি সৎ এবং শত্রুর প্রতি অসৎ দানকে বুঝব।

তা হলে এটাই সিমোনাইডিসের কথার তাৎপর্য?

আমার তো তা-ই মনে হয়।

বেশ। কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় কাকে তুমি বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব এবং শত্রুর প্রতি শত্রুতা-প্রদর্শনে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করবে?

তেমন অবস্থাতে চিকিৎসকই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

অসুস্থ অবস্থা ব্যতীত, ধরো আমরা সমুদ্রযাত্রায় একটা বিপদের মুখে পড়েছি, তখন কে সে উত্তম ব্যক্তি?

সে অবশ্যই আমাদের সমুদ্রযানের কর্ণধার এবং পরিচালক।

তুমি বলেছ, যে ন্যায়পরায়ণ সে শত্রুর প্রতি যেমন শত্রুতাসাধনে, তেমনি বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্বসাধনে সক্ষম। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ ক্ষেত্রে সে তার এই ক্ষমতার প্রয়োগ করবে এবং এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগে কোন্ উদ্দেশ্যসাধনে সে সচেষ্ট হবে?

সক্রেটিস, এ-প্রশ্নের জবাব তো সহজ। যে ন্যায়পরায়ণ সে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে আর বন্ধুর সঙ্গে সখ্যেই তার এই ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

উত্তম কথা, প্রিয় পলিমারকাস। কিন্তু আমার সুস্থ অবস্থায় নিশ্চয় আমার কোনো চিকিৎসকের আবশ্যক হবে না। তাই নয় কি?

না, সুস্থ অবস্থায় আমাদের কোনো চিকিৎসকের আবশ্যক হয় না।

তেমনি, যে সমুদ্রে যাত্রা করেনি তারও নিশ্চয় কর্ণধারের কোনো প্রয়োজন পড়ে না?

না, তারও কর্ণধারের কোনো প্রয়োজন নেই।

তা হলে শান্তির সময়ে তোমার ন্যায়পরায়ণতা বা ধর্মের কোনো ভূমিকা রয়েছে, একথা আমরা বলতে পারিনে?

না সক্রেটিস, এমন কথা আমি বলতে পারিনে।

তা হলে তুমি বলতে চাও, কেবলমাত্র যুদ্ধের সময়ে নয়, শান্তির সময়েও ধর্মের করণীয় কিছু রয়েছে?

অবশ্যই।

শান্তির সময়ে ধর্ম কি ক্ষেতের শস্য গোলায় তুলবে?

উপমাটা অসম্ভব নয়।

অথবা এও বলতে পার, পাদুকা তৈরি করার ন্যায়, ধর্ম শান্তির সময়েও কিছু তৈরি করতে থাকবে?

তাও বলতে পার।

তা হলে এবার আমাদের বলা উচিত ধর্ম নির্দিষ্টভাবে কী কার্য সাধন করবে?

নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, চুক্তির ক্ষেত্রে ধর্মের অবশ্যই একটি ভূমিকা আছে, সক্রেটিস।

চুক্তি বলতে তুমি অংশীদারদের মধ্যে লেনদেনের চুক্তি বোঝাতে চাইছ?

হ্যাঁ, আমি ঠিক এরূপ চুক্তির কথাই বলছি।

আচ্ছা ধরো, সতরঞ্চ খেলার অংশীদারদের লেনদেনের বিষয়টি। এরূপ ক্ষেত্রে কাকে তুমি অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করবে? একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে, না একজন কৌশলী খেলোয়াড়কে?

কৌশলী খেলোয়াড়ই এখানে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি।

শুধু তা-ই নয়। কারিগরির ব্যাপারটিকেও ধরা যাক। একটি গৃহ-তৈরির বেলায়, তার ইট-পাথর ব্যবহারের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে কি তুমি গৃহ-তৈরির কারিগরের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত অংশীদার বলে বিবেচনা করবে?

না, বরঞ্চ আমি তার বিপরীত ব্যক্তি অর্থাৎ কারিগরকেই উপযুক্ত মনে করব।

বীণাবাদনের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই দক্ষ বাদকের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অধিকতর উপযুক্ত নয়। তা হলে অংশীদারিত্বের এমন কোন্ ক্ষেত্র আছে, যেখানে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই অধিকতর উপযুক্ত?

আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

পলিমারকাস, তোমার কথা আমি স্বীকার করলাম। কিন্তু অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার ভূমিকাকে নিশ্চয়ই তুমি খুব উপযুক্ত বিবেচনা করবে না; কেননা অর্থ দিয়ে অশ্ব-ক্রয়ের ক্ষেত্রে অশ্ব-বিশেষজ্ঞের চেয়ে অবশ্যই তুমি ন্যায়পরায়ণের পরামর্শকে অধিকতর উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারবে না?

তা অবশ্য সত্য।

কিংবা ধরো তুমি একটি জাহাজ ক্রয় করতে চাইলে। সেখানেও কি এসব যানের বিষয়ে জাহাজ-নির্মাতা কিংবা এসব যানের যারা পরিচালক তাদের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি খুব কাজের হবে?

না।

তা হলে স্বর্ণ-রৌপ্যের আর্থিক অংশীদারিত্বে বা লেনদেনে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ভূমিকা আমরা কোথায় পাই?

কেন? অন্তত কোনো সম্পদকে নিরাপদে গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি।

তুমি বলতে চাচ্ছ যে, টাকাপয়সা ব্যবহার না করে আমরা যখন কেবল জমাতে থাকি তখনই ন্যায়পরায়ণের প্রয়োজন পড়ে?

হ্যাঁ, আমি ঠিক সেকথাই বলতে চাচ্ছি।

তার অর্থ টাকা যখন অনাবশ্যক, ন্যায়পরায়ণতা তখনই আবশ্যক?

হ্যাঁ, সেরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

অর্থাৎ তুমি যখন তোমার কাটছাঁটের কাঁচিখানাকে শিকায় তুলে রাখতে চাইবে, তখনই মাত্র ন্যায়পরায়ণতা ব্যক্তির এবং রাষ্ট্রের খেদমতে আসতে সক্ষম হবে; কিন্তু কাঁচিখানার বাস্তব প্রয়োগ যখন তুমি শুরু করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার বদলে দ্রাক্ষাকুঞ্জের দক্ষ মালীরই দরকার পড়বে?

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

ঠিক তেমনিভাবে একখানি বর্ম কিংবা বীণাকে যখন তুমি তোমার গৃহে অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখবে তখন ন্যায়পরায়ণতা তোমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে; কিন্তু যখন তুমি এদের ব্যবহার করার প্রয়াস পাবে তখন তোমাকে একজন সৈনিক এবং একজন সঙ্গীতজ্ঞেরই শরণাপন্ন হতে হবে।

হ্যাঁ, একথাও ঠিক।

তা হলে সবক্ষেত্রেই ব্যাপারটি এইরূপ। অর্থাৎ, কোনো একটি বস্তু যখন অনাবশ্যক তখনই ন্যায়পরায়ণতার আবশ্যক, আর বস্তুটি যখন আবশ্যক, ন্যায়পরায়ণতা তখন আমাদের নিকট অনাবশ্যক।

এই সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

আবার দ্যাখো, একটি রোগের নিরাময়ের কিংবা প্রতিরোধের কৌশল যে জানে সে অবশ্যই সে-রোগটি তৈরি করার উপায়টিও জানে।

একথা সত্য।

সমরক্ষেত্রেও আমরা তাকেই উত্তম শিবিররক্ষক বলে বিবেচনা করব যে সঙ্গোপনে তার প্রতিপক্ষের শিবিরকেও অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে যেতে সক্ষম হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই।

অর্থাৎ উত্তম লশকর উত্তম তস্কর? অথবা বলতে পার উত্তম রক্ষকই উত্তম ভক্ষক?

আমার তো মনে হয়, এরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হচ্ছে।

তা হলে তো আমাদের বলতে হয়, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যদি অর্থের রক্ষক হিসাবে উত্তম বলে বিবেচিত হয় তা হলে সে অর্থের উত্তম অপহরণকারী বলেও বিবেচিত হবে?

আমাদের যুক্তির তাৎপর্য তা-ই।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত একজন তস্করে পরিণত হয়ে গেল! এ-শিক্ষা নিশ্চয়ই তুমি হোমারের কাছ থেকে পেয়েছ, পলিমারকাস! হোমার ঠিক এমনি করে তাঁর প্রিয়পাত্র অডিসাসের মাতামহ অটোলাইকাস সম্পর্কে প্রশংসা করতে যেয়ে বলেছেন ঃ "অপহরণে আর মিথ্যাভাষণে তাঁর মতো উত্তম ব্যক্তির আর জুড়ি ছিল না।" কাজেই এবার আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি, হোমার এবং সিমোনাইডিস তিনজনই এ-বিষয়ে একমত যে, ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে আসলে একটি চৌর্য-কৌশল কিংবা কলা-বিশেষ। অবশ্য আমি এখানেই ইতি দিচ্ছিনে। এ চৌর্যকলার সাধনা অবশ্যই 'বন্ধুর ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের জন্য আর শত্রুর ক্ষেত্রে শত্রুতার জন্য'। পলিমারকাস, একথাই তো তুমি বলেছিলে। নয় কি?

না, সক্রেটিস, নিশ্চয়ই এরূপ কথা আমি বলিনি। অবশ্য সঠিকভাবে আমি কী বলেছি তা আমি স্মরণ করতে পারছিনে। কিন্তু একথা সত্য, তোমার শেষের কথাগুলোকে আমি এখনও স্বীকার করি।

অতি উত্তম, পলিমারকাস! তা হলে অপর একটি প্রশ্ন তোলা যাক ঃ বন্ধু এবং শত্রু বলতে কাদের তুমি বোঝাতে চাও? যারা প্রকৃতভাবেই বন্ধু কিংবা শত্রু তাদের, কিংবা যাদের বন্ধু কিংবা শত্রু বলে মনে হলেও যারা বন্ধু কিংবা শত্রু নয় তাদের?

নিশ্চয়ই। আমরা যাকে ভালো মনে করি তাকে ভালোবাসা এবং যাকে খারাপ

মনে করি তাকে ঘৃণা করাই তো আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

সে তো বটেই! কিন্তু ভালোমন্দ সম্পর্কে কি আমরা অনেক সময়ে ভুল করিনে? কেননা, এমন অনেক মানুষ আছে যারা প্রকৃতপক্ষে ভালো নয়; কিন্তু তাদের দেখে ভালো মনে হয়; আবার খারাপের ব্যাপারেও যে খারাপ নয় তাকে খারাপ বোধ হতে পারে। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে যারা বিচারে ভুল করবে তাদের নিকট বন্ধুই শত্রু এবং শত্রুই বন্ধু বলে বোধ হবে?

হ্যাঁ, তা-ই হবে।

তা হলে এক্ষেত্রে বন্ধুর প্রতি শত্রুতা এবং শত্রুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন কোনো অন্যায় হবে না?

না, স্পষ্টতই এরূপ ক্ষেত্রে কোনো অন্যায় হতে পারে না।

কিন্তু যে উত্তম সে অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ, আর যে ন্যায়পরায়ণ সে নিশ্চয়ই কারুর প্রতি কোনো অন্যায় করতে পারে না। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, তোমার একথা ঠিক সক্রেটিস।

কিন্তু তোমার আগের বক্তব্য অনুযায়ী ন্যায়পরায়ণ বা উত্তমের প্রতি অন্যায়াচরণে কোনো অন্যায় নেই।

না, না, সক্রেটিস, তা কী করে হতে পারে? এরূপ কথা বলা তো নীতি-বিগর্হিত।

তা হলে আমাদের কথাটা এভাবে বলতে হয় যে, ন্যায়বানের প্রতি সৎ-আচরণ আর যে অসৎ তার প্রতি অন্যায়াচরণ করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

হ্যাঁ, তোমার এবারের কথাটিকে গ্রহণ করা চলে।

কিন্তু আমাদের একথারও পরিণতি খেয়াল করে দ্যাখো ঃ অনেক মানুষ আছে যারা মানবচরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ। এরা বন্ধু-বিচারে ভুল করে। অসৎ লোক এদের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অসৎ লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ যখন সঙ্গত তখন এরূপ বন্ধুর ক্ষতিসাধন করা অসঙ্গত কিংবা অন্যায় নয়। এরূপ লোকের আবার এমন শত্রুও থাকে যারা আসলে সৎ। কিন্তু শত্রু হলেও যেহেতু তারা সৎ সেজন্য তাদের কোনো ক্ষতিসাধনের পরিবর্তে তাদের মঙ্গলসাধন করাই সঙ্গত। ব্যাপারটা যদি এই দাঁড়ায়, তা হলে কিন্তু সিমোনাইডিসের বক্তব্যের বিপরীত অর্থই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

তোমার এ-অভিমত খুবই যথার্থ সক্রেটিস। এবার আমার মনে হচ্ছে, 'বন্ধু' এবং 'শত্রু' কথা দুটির ব্যবহারে আমাদের কিছু ভুল হয়েছে। সে-ভুলটি আমাদের সংশোধন করা আবশ্যক।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কী ভুল আমরা করেছি বলে তোমরা মনে হয়, পলিমারকাস?

পলিমারকাস বললেন ঃ যাকে সৎ বলে মনে হয় তাকেই আমরা বন্ধু বলে মনে করেছি। এটি আমাদের ভুল।

তা হলে এ-ভুলের সংশোধন তুমি কীভাবে করতে চাও?

সক্রেটিস, ভুলটি সংশোধন করে আমাদের বরঞ্চ বলা উচিত, বন্ধু বলে বিবেচিত হবে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি—যে শুধুমাত্র আপাতভাবে নয়, সত্যকারভাবেই উত্তম এবং সৎ। যাকে উত্তম বলে শুধুমাত্র মনে হবে, কিন্তু যে আসলে উত্তম নয় তাকে আমরা সত্যকার বন্ধু বলে গ্রহণ করব না। যে সত্যকারভাবে শত্রু নয় তার সম্পর্কেও আমরা কথাটি এমনভাবেই বলব।

পলিমারকাস, তোমার যুক্তি হচ্ছে, যে উত্তম সেই-ই আমাদের বন্ধু, আর যে মন্দ বা খারাপ সেই-ই আমাদের শত্রু?

হ্যাঁ সক্রেটিস, আমার কথা তা-ই।

অর্থাৎ আমরা পূর্বে যেখানে সোজাসুজি বলেছিলাম, বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব আর শত্রুর প্রতি শত্রুতা দেখানো সঙ্গত, সেখানে এবার আমাদের বলা উচিত, বন্ধু যখন সত্যকার বন্ধু হবে—অর্থাৎ বন্ধু যখন সৎ এবং উত্তম হবে, তখনই তার প্রতি বন্ধুত্ব দেখানো এবং শত্রু যখন যথার্থভাবে শত্রু হবে, তখনই তার প্রতি শত্রুতা দেখানো আমাদের সঙ্গত।

হ্যাঁ, এবার যেভাবে তুমি কথাটি বলেছ সেটিই যথার্থ বলে বোধ হচ্ছে।

বেশ! কিন্তু যে ন্যায়বান তার পক্ষে কি কারুর কোনো ক্ষতিসাধন সঙ্গত হতে পারে?

কেন নয় সক্রেটিস? যারা সত্যই দুষ্ট এবং তার শত্রু তাদের ক্ষতিসাধন করা তার পক্ষে অবশ্যই সঙ্গত।

আচ্ছা একটা অশ্বের কথা ধরো। একটা অশ্ব যখন আঘাতপ্রাপ্ত হয় তখন সে লাভবান হয়, না ক্ষতিগ্রস্ত হয়? অর্থাৎ তার উন্নতি ঘটে, না অবনতি ঘটে?

তার অবশ্যই অবনতি ঘটে।

কিন্তু কিসে তার ক্ষতি ঘটে? নিশ্চয়ই ক্ষতি ঘটে তার অশ্বত্বে, কুকুর কিংবা অপর কোনো জন্তুর গুণের ক্ষেত্রে নয়।

একথাও ঠিক।

তা হলে একজন মানুষ যখন আহত হবে তখন মানুষ হিসাবে তার উত্তম গুণগুলোরই কি ক্ষতি ঘটবে না?

অবশ্যই। মানুষের উত্তম গুণেরই ক্ষতি ঘটবে।

কিন্তু মানুষের উত্তম গুণ বলতে কি ধর্ম কিংবা ন্যায়পরায়ণতাকে বোঝায় না?

নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণতাই মানুষের উত্তম গুণ।

তা হলে যে-মানুষ আহত হয় সে এই আঘাতের কারণেই ন্যায়পরায়ণতাকে হারাতে শুরু করে? নয় কি?

হ্যাঁ, তা-ই বটে।

এবার সঙ্গীতজ্ঞের কথা ধর। যে সঙ্গীতজ্ঞ কিংবা বাদক সে কি অপর কাউকে অ-সঙ্গীতজ্ঞ করে তুলতে পারে? অথবা অশ্বচালকের কথা ধরো। সে কি অপর মানুষকে নিকৃষ্ট অশ্বচালকে পরিণত করতে পারে?

না, তাও অসম্ভব।

তা হলে যে ন্যায়পরায়ণ সে কি তার ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে অপরকে অসৎ করে তুলতে পারে? কথাটা আর একটু ব্যাপকভাবে বলা চলে। আমরা বলতে পারি, সৎ কি তার সততা দিয়ে অপরকে অসৎ করে তুলতে পারে?

অবশ্যই না।

অর্থাৎ তাপ যেমন শৈত্যকে সৃষ্টি করতে পারে না, তেমনি সৎ-ও অসৎকে সৃষ্টি করতে পারে না।

ঠিক তা-ই, সক্রেটিস।

অথবা বলা চলে, শুষ্কতা যেমন আর্দ্রতা সৃষ্টি করতে পারে না।

হ্যাঁ, তা তো বটেই।

উত্তমের পক্ষে তাই আঘাত করে অপরের ক্ষতিসাধন করা সম্ভব নয়।

না, উত্তম কাউকে আঘাত করে অধম করতে পারে না।

এবং ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম তো অভিন্ন? নয় কি?

হা, এরা উভয়েই অভিন্ন।

তা হলে বন্ধু কিংবা অ-বন্ধু, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তমের কাজ নয়; বরঞ্চ যে ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম নয়, অর্থাৎ যে অসৎ সেই-ই মাত্র অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ঠিক নয় কি?

সক্রেটিস, তুমি যা বলছ তাকে খুবই যথার্থ বলে বোধ হচ্ছে।

তা হলে পলিমারকাস, আগের কথাটি আর থাকে না। কেননা, আমরা যথার্থভাবেই প্রমাণ করেছি, কাউকে আঘাত করে ক্ষতিগ্রস্ত করা কোনো ক্ষেত্রেই ন্যায্য কিংবা সঙ্গত বলে বিবেচিত হতে পারে না। একথা যদি সত্য হয় তা হলে এরূপ বলার কোনো অর্থ থাকে না যে, 'ন্যায়' বা 'ধর্মে'র অর্থ হচ্ছে অপরের দেয়কে শোধ করা এবং দেয় বা ঋণ বলতে বোঝাবে বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব আর শত্রুর প্রতি শত্রুতা। এরূপ অভিমত পোষণ করা এখন আর বিজ্ঞোচিত হবে না।

পলিমারকাস বললেন ঃ সক্রেটিস তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তা হলে এবার যদি কেউ এরূপ অভিমতকে সিমোনাইডিস, বিয়াস কিংবা পিটাকাস অথবা অপর কোনো জ্ঞানী কিংবা সত্যদ্রষ্টার অভিমত বলে চালাতে চায় তবে আমরা দু'জনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে লড়াই করব। তুমি এ-প্রস্তাবে রাজি তো পলিমারকাস?

সক্রেটিস, তোমার পাশে থেকে লড়াই করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত রয়েছি।

বস্তুত এই অভিমতটি কার অভিমত বলে আমি বিশ্বাস করি, তুমি জান?

কার অভিমত?

আমার বিশ্বাস, পেরিয়ানডার কিংবা পারডিকাস কিংবা জারাক্সেস অথবা থিবের ইজমেনিয়াস অথবা এমনিতরো কোনো সম্পদশালী এবং শক্তিমত্ত মানুষের সম্পদ এবং শক্তির গর্বে স্ফীত হয়ে এই অভিমতের সৃষ্টি করেছে যে, 'বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব এবং শত্রুর প্রতি শত্রুতাসাধনই ধর্ম।'

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এবার আমার মনে হচ্ছে, তোমার এই কথাই যথার্থ।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ পলিমারকাস, আমার বিশ্বাস এ-অভিমত এঁদেরই সৃষ্টি। কিন্তু এখন ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতার এই সংজ্ঞা যদি খণ্ডিত হয় তা হলে নূতনভাবে ধর্মের কী সংজ্ঞা আমরা তৈরি করতে পারি?

আমি লক্ষ করছিলাম, আমাদের আলোচনার মাঝখানে কয়েকবারই থ্র্যাসিমেকাস যুক্তির লাগামটি নিজের হাতে নিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু যতবারই তিনি আমাদের সংলাপের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করছিলেন ততবারই মজলিসের অন্য শ্রোতাগণ আমাদের আলোচনার পরিণতি দেখার আগ্রহে তাঁকে দাবিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু এবার যেইমাত্র আমি এবং পলিমারকাস আমাদের আলাপ শেষ করে আলোচনায় খানিকটা বিরতি দিয়েছি অমনি নিজেকে আর সংযত রাখতে না পেরে থ্র্যাসিমেকাস একটি হিংস্র জন্তুর মতো আমাদের উপর দস্তুরমতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে আমরা রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলাম।

থ্র্যাসিমেকাস এবার সমগ্র মজলিসটিকে লক্ষ্য করে গর্জন করে উঠলেন ঃ গণ্ডমূর্খের দল, তোমরা করছ কী? সক্রেটিস এরই মধ্যে তোমাদের সবাইকে বশীভূত করে ফেলল! এরচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কী হতে পারে? তোমরা কী মূর্খ যে সবাই মিলে সক্রেটিসকে কাবু না করে একে অপরকে আঘাত করে চলেছ! আর তোমাকেও বলছি, সক্রেটিস। তুমি যদি সত্যিকারভাবে জানতে চাও, ধর্ম কী, তা হলে কেবলমাত্র অপরকে প্রশ্ন করে চলার এই কৌশলটি তোমাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তুমি নিজে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলবে না পাছে কোনো প্রতিপক্ষ তোমাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। তথাপি তুমি অপরকে প্রশ্ন করে যাবার সুবিধাটি ভোগ করবে, এরূপ অবস্থা চলতে পারে না। তোমাকেও এবার অন্যের প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। একজনকে প্রশ্ন করাটা খুব শক্ত কিছু নয়। আর এরূপ লোকের সংখ্যাও কিছু কম নয় যারা সুন্দরভাবে প্রশ্নই করতে পারে, কিন্তু কোনো প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। তা ছাড়া জবাবের ক্ষেত্রেও তুমি যে ধর্ম কিংবা ন্যায়পরায়ণতাকে কেবল দায়িত্ব কিংবা সুবিধা কিংবা লাভ কিংবা কোনো প্রাপ্তি বা আগ্রহ বলে অভিহিত করে পার পেয়ে যাবে, তেমনটিও হবে না। তুমি জবাব দিলে আমাদের প্রশ্নের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট জবাবই তোমাকে দিতে হবে।

থ্র্যাসিমেকাসের এরূপ তম্বি শুনে আমি দস্তুরমতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বস্তুত তাঁর এই হুমকি শুনে তাঁর দিকে তাকাতে যেয়ে আমি ভয়ে কেঁপেই উঠছিলাম। তথাপি আমি সর্বশক্তি দিয়ে হুঙ্কারকারী থ্র্যাসিমেকাসের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। কেননা, আমার দৃষ্টি তাঁর মুখের দিকে স্থিরনিবদ্ধ না করলে তাঁর গর্জন আমাকে অবশ্যই বাকরহিত করে ফেলত। যখন দেখলাম তাঁর হুঙ্কার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন আমি সাহস করে চোখ তুলে

একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। এর ফলটি উত্তম হল। তাঁকে জবাবদানের একটা সাহস আমি নিজের মধ্যে যেন বোধ করলাম।

কম্পিত কণ্ঠেই আমি বললাম ঃ প্রিয় থ্র্যাসিমেকাস, আমাদের উপর তুমি নির্দয় হয়ো না। পলিমারকাস এবং আমি আলোচনা করছিলাম। সে-আলোচনায় আমাদের ভুলত্রুটি কিছু হতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এরূপ ভুলত্রুটি আমরা ইচ্ছা করে করিনি। সত্যের স্বর্ণখণ্ডের অন্বেষণে আমরা একে অপরের দ্বারস্থ হচ্ছিলাম। একথা যথার্থ। কিন্তু তাতে পরস্পরকে আঘাত করার ইচ্ছা আমাদের ছিল এরূপ মনে করা তোমার উচিত নয়। কেননা, সেরূপ হলে ক্ষতি আমাদেরই হবে। সত্যের অন্বেষণে তা হলে আমরা ব্যর্থ হব। বস্তুত ধর্ম স্বর্ণের চেয়েও মূল্যবান। তার অনুসন্ধানে আমরা যখন রত তখন আমরা একে অপরের নিকট আত্মসমর্পণ করছি বা হেরে যাচ্ছি, তোমার এরূপ ভাবাও অনুচিত। সেজন্যই বলছি, প্রিয় সাথি, তুমি বিশ্বাস করো, আমরা সত্যের সন্ধানলাভের জন্য যথার্থই আগ্রহশীল, ঐকান্তিকভাবেই উৎসুক। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, সত্যকে সন্ধান করে বার করার উপযুক্ত ক্ষমতা আমাদের নেই। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন তোমার মতো সর্বজ্ঞের আমাদের প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে একটু করুণা হওয়া উচিত। নয় কি বন্ধু?

আমার কথার জবাবে মুখে একটি তিক্ত হাসি টেনে থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ এ হচ্ছে অপরকে পরিহাস করার তোমার পরিচিত বিশিষ্ট ভঙ্গি, সক্রেটিস। তারপর অপর সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন ঃ তোমরা সবাই এবার বুঝে দ্যাখো, সক্রেটিস সম্পর্কে আমার সাবধানবাণী ঠিক হয়েছে কি না। আমি আগেই বলেছিলাম যে, তাকে তোমরা যা-কিছু প্রশ্ন কর-না কেন সে ব্যঙ্গ, পরিহাস কিংবা অপর কোনো কৌশলে তার জবাবটি এড়িয়ে যাবেই।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, তুমি অবশ্যই একজন দার্শনিক। আর একথা তুমি ভালো করেই জান যে, তুমি যদি একদিকে একজনকে প্রশ্ন কর, কী কী দিয়ে বারো সংখ্যাটি তৈরি হয় এবং অপর দিকে তাকে নিষেধ করো, তোমার প্রশ্নের জবাবে সে বলতে পারবে না, দুটো ছ'তে কিংবা তিনটে চারে অথবা ছ'টা দুয়ে কিংবা চারটা তিনে বারো হয় তা হলে সেও তোমাকে বলতে পারে ঃ থ্র্যাসিমেকাস, তোমার এই জবরদস্তি বন্ধ করো। তা না হলে কারুর পক্ষেই তোমার এই প্রশ্নের জবাবদান সম্ভব হবে না। কারণ, সে সঙ্গতভাবেই পালটা জবাবে তোমাকে বলতে পারে, "তুমি কি বলতে চাও থ্র্যাসিমেকাস, তোমার নিষিদ্ধ সংখ্যাগুলোর মধ্যেই যদি তোমার প্রশ্নের জবাব থাকে তা হলে তোমার

জবরদস্তির কারণে সঠিক জবাবের বদলে আমি এমন সংখ্যার উল্লেখ করব যে-সংখ্যা আদৌ সঠিক নয়?' থ্র্যাসিমেকাস, এই প্রশ্নের জবাবটি তুমি কীভাবে দিতে পারবে বলে মনে কর?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার কথার ভাবটি এমন যেন দুটো দৃষ্টান্ত এক হল।

আমি বললাম ঃ দুটো দৃষ্টান্ত কেন এক হবে না থ্র্যাসিমেকাস? আর যদি এক না-ও হয়, তবু তুমি যাকে প্রশ্ন করেছ তার কাছে যদি তারা এক বলেই বোধ হয় তা হলে তুমি কিংবা আমি তাকে নিষেধ করি কিংবা না করি, সে যা সঠিক বিবেচনা করে তা বলাই কি তার উচিত হবে না?

একথার মানে সক্রেটিস, তুমি নিষিদ্ধ জবাবদানই স্থির করেছ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যদি তোমার নিষিদ্ধ জবাবগুলোর মধ্যেই আমি আমার যথার্থ জবাবকে দেখতে পাই তা হলে সে-জবাবদানে অবশ্যই আমি কুণ্ঠিত হব না।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ কিন্তু ধরো, নিষিদ্ধ জবাবগুলোর চেয়ে ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর উত্তম একটি জবাবকেই আমি তোমার নিকট উপস্থিত করলাম। তা হলে এ-বাবদ দেয় কী হবে বলে তুমি মনে কর?

বারে! আমার দেয় কী? মূর্খ আমি জ্ঞানী থ্র্যাসিমেকাসকে আবার কী দেব? জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানই তো আমার প্রাপ্য। আমার আবার দেয় কী?

বাহ্! কী চমৎকার কথা! বিনা পয়সাকড়িতেই তুমি জ্ঞান লাভ করবে?

বেশ, আমি না হয় তোমাকে পয়সাই দেব। আমার যখন অর্থাগম হবে তখন তোমারও নিশ্চয়ই তা থেকে কিছু প্রাপ্তি ঘটবে।

গ্লকন বললেন ঃ এখনও তোমার টাকার অভাব নেই সক্রেটিস। আর থ্র্যাসিমেকাস, তোমারও ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। তুমি জ্ঞান দান করো। সক্রেটিসের ঋণ না হয় আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলেই শোধ করব।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ তাতেই-বা ভরসা কোথায় গ্লকন? সক্রেটিস তো তখনও তার চিরাচরিত কৌশল নিয়ে প্রশ্নের জবাব কেবল এড়িয়েই যাবে। সে কেবল অন্যের জবাবকেই ছিন্নভিন্ন করার দক্ষতা দেখাতে পারে। নিজের জবাবদানে সে অক্ষম।

প্রিয় বন্ধু! আমার বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ বস্তুত ভিত্তিহীন। তুমিই বলো, যে জানে এবং নিজেই স্বীকার করে সে কিছুই জানে না, সে তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে কেমন করে সক্ষম হবে? আর কোনোকিছু সম্পর্কে যদিবা তার সামান্য

এবং অস্পষ্ট একটা ধারণা থেকে থাকে তো, 'জ্ঞানবানে'র নিষেধে সে-জবাবও তার স্তব্ধ। এমন অবস্থায় এ বেচারির বলার আর কী থাকতে পারে? এর পক্ষে বক্তা হওয়া কিংবা কোনো জবাবদান আদৌ সম্ভব নয়। বরঞ্চ বক্তা হওয়া তাকেই সাজে যে জানে এবং দাবি করে সে জানে। এমন জ্ঞানীমাত্রই অপরকে জবাব দিতে পারে। কাজেই থ্র্যাসিমেকাস, জবাব দেওয়া তোমাকেই সাজে। তুমিই দয়া করে আমাদের সবার উপকারের জন্য এবং বিশেষ করে আমার জ্ঞানের জন্য জবাব দাও।

অধ্যায় ঃ ৩

[৩৩৮—৩৪৮]

থ্র্যাসিমেকাস ঃ ন্যায় হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ

ন্যায় সম্পর্কে পলিমারকাসের সংজ্ঞা সক্রেটিস নাকচ করেছেন। কিন্তু এখনও তিনি নিজের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা উপস্থিত করেননি। বস্তুত সরাসরি কোনো প্রশ্নের সমাধান পেশ করা সক্রেটিসের রীতি নয়। সক্রেটিসের রীতি আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক। অসার তত্ত্বের অসঙ্গতি দেখাবার মাধ্যমে তিনি অগ্রসর হন। কিন্তু ন্যায়ের প্রশ্নে পলিমারকাসের তত্ত্বই তো একমাত্র অসার তত্ত্ব নয়। সক্রেটিস পলিমারকাসের তত্ত্বের অসঙ্গতি দেখাতে পলিমারকাস অমনি স্বীকার করলেন, তাঁর সংজ্ঞাটি গ্রহণ করা যায় না। থ্র্যাসিমেকাস পলিমারকাসের এমন সহজ পরাজয়-স্বীকারটি পছন্দ করলেন না। তিনি একটি নূতন সংজ্ঞা উপস্থিত করলেন ঃ ন্যায় হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ। তাঁর মতে 'ন্যায়' 'অন্যায়' ইত্যাকার নীতিবাচক শব্দ শক্তিমান অর্থাৎ শাসকের তৈরি। তাদের জন্য যা স্বার্থবহ তাকেই তারা ন্যায় বলে শাসিতের ওপর জবরদস্তিভাবে আরোপ করে। শাসিতের যে-কাজ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী তাকে শক্তিমান শাসক অন্যায় বলে। কাজেই 'ন্যায়' 'অন্যায়' মানুষেরই তৈরি, শক্তিমানের তৈরি। ব্যক্তিনিরপেক্ষ, অবস্থানিরপেক্ষ ন্যায় বলে কোনো সত্তা থাকার যে-তত্ত্ব সক্রেটিস উপস্থিত করতে চাচ্ছেন এ-তত্ত্ব তার চরম বিরোধী তত্ত্ব। এ-তত্ত্ব যে প্লেটো কেবল একটি সংজ্ঞার পালটা সম্ভাব্য অপর একটি সংজ্ঞা হিসাবে উপস্থিত করেছেন, এমন নয়। সমসাময়িক গ্রীসীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা মতাদর্শের সংঘাত চলছিল। থ্র্যাসিমেকাসের মুখে যে-তত্ত্বটি স্থাপন করা হয়েছে তা কাল্পনিক নয়। পেশাদার শিক্ষকসম্প্রদায় বা সফিস্টগণের সাধারণভাবে কোনো দর্শন না থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁদের সবার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। প্রচলিত বা প্রতিষ্ঠিত

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় তত্ত্বসমূহের তারা সমালোচনা করতেন। কেবল সমালোচনা নয়, কোনো কোনো সমস্যায় প্রখ্যাত সফিস্ট দার্শনিকদের বিশিষ্ট অভিমতও ছিল। থ্র্যাসিমেকাসের মুখে ন্যায়ের প্রশ্নে প্লেটো সফিস্টদের প্রচারিত তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন। থ্র্যাসিমেকাসের মতে ন্যায় হচ্ছে দুর্বলকে শোষণ করার জন্য শক্তিমানের কৌশল কিংবা শক্তিমানকে প্রতিরোধের জন্য দুর্বলের জোট। ন্যায়ের এরূপ ব্যাখ্যায় অনেকে সামাজিক চুক্তিতত্ত্বের প্রাচীন প্রকাশ আঁচ করেন। কিন্তু থ্র্যাসিমেকাসের এরূপ ব্যাখ্যায় সামাজিক চুক্তির প্রকাশ দেখা যায়, এরূপ বলা চলে না। কারণ এরূপ মতে জনসাধারণ চুক্তির মাধ্যমে যে ন্যায় বা নীতিকে তৈরি করেছে এমন নয়। শাসক শক্তির জোরে তার নীতিকে সমাজের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, থ্র্যাসিমেকাসের তত্ত্বের বক্তব্য এরূপ।

থ্র্যাসিমেকাসের তত্ত্বকে নাকচ করতে যেয়ে সক্রেটিস বললেন ঃ শাসকের স্বার্থই যদি ন্যায় হয় তা হলে শাসক যেখানে নিজের স্বার্থ কী তা বুঝতে ভুল করে, সেখানে তার স্বার্থকে কেমন করে ন্যায় বলে অভিহিত করা চলবে? এখানেও সক্রেটিসের চেষ্টা তার সেই বিশ্বাসকে প্রকাশ করা যে, শাসকমাত্রই যে তার স্বার্থকে সঠিকভাবে জানবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সঠিকভাবে জানা নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। সে-জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্তভাবে কারুর মধ্যে আসে না। সক্রেটিসের এই তত্ত্বের পথেই থ্র্যাসিমেকাসের জবাবের দুর্বলতা উন্মুক্ত হয়। থ্র্যাসিমেকাস জবাব দেন ঃ শাসক, শাসক হিসাবে তার স্বার্থকে কখনো ভুল বুঝতে পারে না। এর পালটা জবাবে সক্রেটিস উল্লেখ করেন যে, প্রত্যেক শিল্পেরই একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে। এ-সার্থকতা শিল্পীর ইচ্ছা অনিচ্ছা বা তার নিজের স্বার্থের উপর নির্ভর করে না। চিকিৎসা শিল্পের সার্থকতা রোগীর রোগ-নিরাময়ে। যে-চিকিৎসক যত অধিক তার রোগীকে রোগমুক্ত করতে পারবে সে-চিকিৎসক তত বেশি সার্থক, রোগী তাকে প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে সক্ষম হোক বা না হোক অর্থাৎ চিকিৎসকের স্বার্থ রক্ষিত হোক বা না হোক। ঠিক তেমনি শাসনশিল্পের সার্থকতাও শাসনে অর্থাৎ শাসিতের মঙ্গলসাধনে। শাসকের ব্যক্তিগত স্বার্থ-অস্বার্থ বা লাভ-ক্ষতির ওপর শাসনশিল্পের সার্থকতা নির্ভর করে না। কাজেই থ্র্যাসিমেকাসের শাসক যেখানে মনে করে যে, তার

ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষাই ন্যায় সেখানে সে তার শিল্পের স্বার্থকে অনুধাবন করতে ভুল করে। কাজেই শাসক, শাসক হিসাবে তার স্বার্থ বুঝতে ভুল করতে পারে না, থ্র্যাসিমেকাসের এরূপ দাবি যুক্তির বিচারে টিকতে পারে না।

মজলিসের গ্লকন এবং অপরাপর সবাই আমার এ-কথার সঙ্গে একমত হয়ে থ্র্যাসিমেকাসকে জবাবদানের অনুরোধ করতে লাগল। বস্তুত থ্র্যাসিমেকাসও তখন তাঁর বক্তব্য পেশ করার জন্য অস্থির হয়ে উঠছিলেন। কেননা, বোঝা যাচ্ছিল যে, থ্র্যাসিমেকাস মনে করছিলেন, আমাদের প্রশ্নের মোক্ষম জবাব তাঁর জানা আছে আর সে-জবাবদানে তিনি আমাদের সবাইকে বিস্মিত করে দেবেন। কিন্তু তবু তিনি আমাদের জবাবদানের ওপর আরও কিছুক্ষণ জোর দিতে লাগলেন। পরিশেষে তিনি নিজেই জবাব দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু, এবারও বলতে যেয়ে তিনি প্রথমেই আমাকে আক্রমণ করে বললেন ঃ তোমরা সবাই সক্রেটিসের জ্ঞানের বহরটি দ্যাখো। একদিকে সে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে নারাজ, অপরদিকে সে ঢাক পেটাচ্ছে যেন সে অপরের কাছ থেকে সত্যই শিক্ষিত হতে আগ্রহী। অথচ, যার কাছ থেকে সে জ্ঞান পাবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত একটি 'ধন্যবাদে'র কথাও সে নিজমুখে উচ্চারণ করবে না।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, আমি যে অপরের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহন করি একথা যথার্থ; কিন্তু তাই বলে আমি অকৃতজ্ঞ, এ-অভিযোগ আমি স্বীকার করিনে। অর্থ-সম্পদ বলতে আমার কিছু নেই। এজন্য অর্থদান করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি আমাকে উত্তমরূপে জ্ঞানদান করে তা হলে তার প্রশংসায় আমি অকৃপণ। প্রশংসায় অমি দীন নই। প্রশংসা দিয়েই আমি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করি। প্রিয় থ্র্যাসিমেকাস! আমার একথার সত্যতা তুমি তোমার জবাবদানকালেই বুঝতে পারবে। তোমার জবাবদান নিশ্চয়ই উত্তম হবে এবং আমিও তোমার প্রশংসায় অবশ্যই অকৃপণ হব।

উত্তম কথা! তা হলে এবার আমার জবাব শোনো। আমি ঘোষণা করছি ঃ ধর্ম কিংবা ন্যায়পরায়ণতা সবলের স্বার্থ ব্যতীত অপর কিছুই নয়।.... কিন্তু সক্রেটিস, এজন্য আমার প্রতি তোমার প্রশংসা কোথায়? আমি জানি এজন্য তুমি আমায় আদৌ প্রশংসা করবে না।

একটু অপেক্ষা করো, থ্র্যাসিমেকাস। আমাকে প্রথমে বুঝতে দাও। তুমি বলছ ঃ 'ধর্ম সবলের স্বার্থ।'—বেশ। কিন্তু এর তাৎপর্য কী হতে পারে? তুমি তোমার এই কথা দ্বারা নিশ্চয়ই এরূপ বোঝাচ্ছ না যে, কুস্তিগির পলিডামাস-এর জন্য যা উত্তম, দুর্বল আমাদের জন্যও তা উত্তম। পলিডামাস একজন কুস্তিগীর; কুস্তিক্রীড়ায় সে বিজয়ী; তার দেহের শক্তি আমাদের মতো দুর্বল মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। গোমাংস তার দেহের শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। সুতরাং, সে-মাংস তার জন্য উত্তম। থ্র্যাসিমেকাস, তুমি কি বলতে চাও যেহেতু গোমাংসভক্ষণ পলিডামাসের জন্য উত্তম, সুতরাং গোমাংসভক্ষণ দুর্বল আমাদের জন্যও উত্তম?

সক্রেটিস, এখানেই তুমি অসহ্য! তুমি মানুষের কথার এরূপ বিকৃত অর্থ কর যার ফলে যুক্তি নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমি বললাম ঃ ক্রুদ্ধ হয়ো না, জ্ঞানীবর। আমি তোমার কথার আদৌ বিকৃত অর্থ করিনি। আমি তোমার কথাকে শুধুমাত্র বোঝার চেষ্টা করছিলাম। সেই বোঝার প্রয়োজনেই বলছি, তুমি যদি তোমার বক্তব্যে দয়া করে আর একটু স্পষ্ট হও তা হলে আমাদের বড় উপকার হয়।

থ্র্যাসিমেকাস এবার গুরুত্বসহকারে বললেন ঃ সক্রেটিস, তুমি কি জীবনে একথা কোনোদিন শোননি যে, রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় পার্থক্য রয়েছে? স্বৈরতন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্র-রূপ বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার কথা কি তোমার অজ্ঞাত?

না, থ্র্যাসিমেকাস, এরা আমার অজ্ঞাত নয়। আমি এদের কথা শুনেছি।

তুমি কি একথাও জান না যে, একটি রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা বা সরকারই হচ্ছে শাসকশক্তি?

হ্যাঁ, অবশ্যই, সেই হচ্ছে শাসকশক্তি।

আর বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা তাদের আপন-আপন স্বার্থানুযায়ী তাদের আইনকানুন বিধিব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক, অভিজাততান্ত্রিক কিংবা স্বৈরতান্ত্রিক রূপ দান করে। অথচ, এই আইনকানুন বা বিধিব্যবস্থাকেই তারা ধর্ম বা ন্যায়পরায়ণতা বলে অভিহিত করে। নিজেদের স্বার্থে রচিত এই বিধিব্যবস্থাকে তারা ধর্ম বলে তাদের শাসিত নাগরিকদের নিকট উপস্থিত করে। নাগরিকদের মধ্যে কেউ যদি তাদের বিধানকে লংঘন করে, তা হলে তাকে তারা বিধানভঙ্গকারী এবং অন্যায়কারী বলে দণ্ডদান করে। এজন্যই,

সক্রেটিস, আমি বলেছি যে, ধর্ম বা ন্যায় রাষ্ট্রব্যবস্থা-নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রেই এক। অর্থাৎ, রাষ্ট্রব্যবস্থা যা-ই হোক, সর্বত্রই ন্যায়পরায়ণতার অর্থ হচ্ছে শাসকের স্বার্থ। আবার শাসকই হচ্ছে শক্তি। তাও আমি বলেছি। কাজেই এ থেকে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে এরূপ সিদ্ধান্তও করতে পারি যে, ন্যায়রায়ণতা শক্তিমানেরই স্বার্থ।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, এবার আমি তোমায় বুঝতে পারছি। এবার আমি দেখতে চেষ্টা করব, তোমার একথা সঠিক কি সঠিক নয়। কিন্তু গোড়াতেই একটা কথা আমি বলে নিচ্ছি। কথাটা এই যে, ন্যায়ের সংজ্ঞাদানে তুমি 'স্বার্থ' কথাটিকে ব্যবহার করতে কসুর করনি। অথচ, এটি তোমার একটি নিষিদ্ধ শব্দ। আমি শব্দটিকে ব্যবহার করাতে তুমি আপত্তি তুলেছ। অবশ্য, তোমার ক্ষেত্রে পার্থক্য এতটুকু যে, তোমার সংজ্ঞায় তুমি স্বার্থের সঙ্গে সবল কিংবা শক্তিমান কথাটি যোগ করে ন্যায়ের সংজ্ঞাটিকে শক্তিমানের স্বার্থ বলে অভিহিত করেছ।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ হ্যাঁ, তা আমি করেছি। কিন্তু সেই সামান্য যোগটুকুতে তোমার আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না, সক্রেটিস।

তোমার যোগটুকু ছোট কি বড়, সেটি আসল কথা নয়। আমাদের এখন দেখতে হবে; তুমি যা বলেছ, সেকথা সত্য কি না। ধর্ম বা ন্যায় যে একপ্রকার স্বার্থ, সে-সম্পর্কে তুমি এবং আমি উভয়েই একমত। অবশ্য, স্বার্থের সঙ্গে তুমি শক্তির যে-যোগসাধন করেছ, সেটি যথার্থ কি না সে-সম্পর্কে আমি এখনও নিশ্চিত নই। এ-সম্পর্কে অধিকতর বিচার আমাদের প্রয়োজন।

বেশ, তা হলে তা-ই করো।

হ্যাঁ, সে-বিচার করারই আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তার পূর্বে তুমি আমার একটি কথার জবাব দাও। তুমি বলো, তুমি কি একথা স্বীকার কর যে, শাসিতের পক্ষে শাসককে মান্য করাই ধর্ম?

হ্যাঁ, আমি একথা স্বীকার করি।

কিন্তু, তুমি কি মনে কর, রাষ্ট্রের শাসকগণ সর্বদাই অভ্রান্ত? না, কোনো কোনো সময়ে ভুল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব?

অবশ্যই, তাদের পক্ষে ভুল করাও সম্ভব।

বেশ, তা হলে আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো সময়ে তারা সঠিক হতে পারে, আবার কোনো সময় তারা ভ্রান্তও হতে পারে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

আর যখন তারা তাদের বিধানের ক্ষেত্রে সঠিক হয়, তখন সে-বিধান তাদের স্বার্থকে সাধন করে; কিন্তু, যখন বিধানের ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্ত হয়, তখন সে-বিধান তাদের স্বার্থবিরোধী হয়। থ্র্যাসিমেকাস, একথা কি তুমি স্বীকার কর?

হ্যাঁ, একথা আমি স্বীকার করি।

কিন্তু, বিধান ভ্রান্ত কিংবা অভ্রান্তই হোক, তাকে মান্য করাই শাসিতের পক্ষে কর্তব্য; আর তোমার মতে সেটাই ধর্ম?

নিঃসন্দেহে, তা-ই তার ধর্ম।

তা হলে, তোমার যুক্তি অনুযায়ী ন্যায় কিংবা ধর্মের অর্থ কেবলমাত্র শাসকের স্বার্থকেই মেনে চলা নয়, ধর্মের অর্থ শাসকের স্বার্থের বিরোধিতা করাও হতে পারে?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, তুমি কী বলতে চাও, সক্রেটিস?

থ্র্যাসিমেকাস, আমি নতুন কথা বলছিনে। তুমি যা বলেছ, কেবল তারই পুনরাবৃত্তি করছি। তবু আমার কথাটাকে বুঝতে না পারলে আমি আবার বুঝিয়ে বলছি ঃ একথা তো ঠিক যে, বিধানের ক্ষেত্রে শাসক তার স্বার্থের ব্যাপারে ভ্রান্ত হতে পারে; আর এও আমরা স্বীকার করেছি যে, শাসককে মান্য করাই হচ্ছে শাসিতের ধর্ম?

হ্যাঁ, সেকথা আমরা বলেছি।

তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, ধর্ম কিংবা ন্যায়ের অর্থ সব সময়ে শক্তিমান কিংবা শাসকের স্বার্থরক্ষা নাও হতে পারে। বিশেষ করে স্বার্থের ব্যাপারে শাসক যেখানে ভ্রান্ত, ন্যায় সেখানে শাসকের স্বার্থরক্ষা নয়। সেখানে শাসক বা শক্তিমানের স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করাই হবে শাসিতের ধর্ম। কারণ, প্রাজ্ঞবর, তুমিই বলেছ যে, ধর্মের অর্থ হচ্ছে শাসিতের পক্ষে শাসকের বিধানকে মেনে চলা। তোমার এ-যুক্তির অনিবার্য সিদ্ধান্ত হিসাবে তোমাকে তাই স্বীকার করতে হয় যে, সবল শুধু তার স্বার্থরক্ষার জন্যই দুর্বলকে হুকুম দেয় না, তার স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যও সে হুকুম দিতে পারে। তোমার পূর্ব যুক্তি থেকে এ-সিদ্ধান্তকে এড়িয়ে যাবার তো কোনো উপায় নেই, থ্র্যাসিমেকাস।

এখানে পলিমারকাস বলে উঠলেন ঃ এ-সম্পর্কে আর সন্দেহ কী, সক্রেটিস?

তার সঙ্গে ক্লিটোফোন যোগ করলেন ঃ তোমার সাক্ষ্যটি মূল্যবান পলিমারকাস। কিন্তু, থ্র্যাসিমেকাস তোমাকে মান্য করলেই তো তার মূল্য।

পলিমারকাস বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি বলে বলছিনে। বস্তুত এখানে অপরের সাক্ষ্যদানেরই কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, থ্র্যাসিমেকাস নিজেই স্বীকার করেছেন, শাসকরা শাসিতের উপর যে-বিধান প্রয়োগ করে সে-বিধান কোনো কোনো সময়ে শাসকের স্বার্থবিরোধীও হতে পারে। তথাপি বিধানমাত্রকে মেনে চলাই হচ্ছে শাসিতের ধর্ম।

হ্যাঁ, পলিমারকাস, একথা সত্য যে, থ্র্যাসিমেকাস বলেছেন, শাসক শাসিতের জন্য যে-বিধান স্থির করবে তাকে মেনে চলাই শাসিতের ধর্ম।

হা, ক্লিটোফোন, তা ছাড়া তিনি একথাও বলেছেন যে, শাসকের স্বার্থই হচ্ছে ধর্ম। এই দুটো কথাকে স্বীকার করতে যেয়ে থ্র্যাসিমেকাস একথাও স্বীকার করেছেন যে, সবল দুর্বলের প্রতি অথবা বলা চলে, শাসক শাসিতের প্রতি এমন আদেশ জারি করতে পারে যে-আদেশ শাসকের আদৌ স্বার্থবহ নয়। এ থেকেই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়, সবল কিংবা শাসকের স্বার্থরক্ষাতেই কেবল ধর্ম নয় ঃ ধর্ম তার স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করাতেও।

ক্লিটোফোন বললেন ঃ শাসকের স্বার্থ বলতে থ্র্যাসিমেকাস নিশ্চয়ই 'শাসক যা তার স্বার্থ বলে মনে করে' তা-ই বোঝাতে চেয়েছেন। শাসক যাকে নিজের স্বার্থবহ বলে মনে করে, শাসিত তাকেই মান্য করে চলবে, থ্র্যাসিমেকাসের মতে এটাই ধর্ম।

পলিমারকাস বললেন, কিন্তু থ্র্যাসিমেকাসের ভাষা এরূপ ছিল না।

আমি বললাম ঃ তাতে কিছু যায় আসে না। থ্র্যাসিমেকাস যদি এখন এরূপভাবেই বলতে চান তা হলে আমরা এটাকেই তাঁর বক্তব্য বলে ধরে নেব। কাজেই, থ্র্যাসিমেকাস, তুমি এবার পরিষ্কার করে বলে ঃ ধর্ম কিংবা ন্যায় বলতে তুমি কি সবল বা শাসক যাকে তার নিজের স্বার্থবহ বলে মনে করে, সত্যকারভাবে তা তার স্বার্থবহ হোক বা না হোক, তাকেই বোঝাতে চেয়েছ?

না, এরূপ আমি বোঝাতে চাইনি। কখনোই আমি একথা বলতে পারিনে। তুমি কি মনে কর, যে নিজে ভ্রান্ত তাকে আমি অভ্রান্ত বলে অভিহিত করতে পারি?

আমি বললাম, থ্র্যাসিমেকাস, তুমি যখন বললে যে, শাসক অভ্রান্ত নয়, সে কোনো কোনো সময়ে ভ্রান্তও হতে পারে, তখন তোমার কথার অর্থকে তো আমি এরূপেই গ্রহণ করেছিলাম।

থ্র্যাসিমেকাস রেগে বললেন, সক্রেটিস, তুমি কথা বলছ গুপ্তচরের ন্যায়। তুমি কি মনে কর, যে-চিকিৎসক তার রোগীর ব্যাপারে ভ্রান্ত, যে-অঙ্কবিদ তার অঙ্কের ব্যাপারে ভ্রান্ত, কিংবা যে-ব্যাকরণিক ভাষার ব্যাকরণের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত, সে এই ভ্রান্ত অবস্থায়ও চিকিৎসক, কিংবা অঙ্কবিদ, কিংবা ব্যাকরণিক বলে অভিহিত হতে পারে? অবশ্য, একথা সত্য যে, আমরা সাধারণত বলে থাকি, চিকিৎসক একটি ভুল করেছেন কিংবা অঙ্কবিদ এই অঙ্কটি ঠিক করেননি কিংবা ব্যাকরণিক এখানে ভ্রান্ত। কিন্তু, এ হচ্ছে শুধুমাত্র আমাদের কথার একটি ভঙ্গি। তা না হলে সত্যই আমরা ভ্রান্ত চিকিৎসককে চিকিৎসক বলিনে। বস্তুত চিকিৎসক, অঙ্কবিদ কিংবা ব্যাকরণিক—দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনোক্রমেই ভ্রান্ত হতে পারে না। দক্ষতা এবং দক্ষতার ভ্রান্তি একই সঙ্গে সম্ভব হতে পারে না। যেখানে দক্ষতা ভ্রান্ত অর্থাৎ দক্ষ যেখানে অ-দক্ষ সেখানে কিংবা সে-মুহূর্তে সে আর দক্ষ নয়। সুতরাং, সে-নামে তাকে অভিহিত করাও চলে না। কাজেই কোনো ব্যক্তি শিল্পী কিংবা জ্ঞানী থাকা অবস্থায় তার শিল্পে কিংবা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভ্রান্ত হতে পারে না। একথা সত্য হলেও সাধারণভাবে শিল্পী কিংবা জ্ঞানীও ভুল করতে পারে—এরূপ আমরা বলে থাকি। কিন্তু, আমি পূর্বেই বলেছি, এটা আমাদের একটা কথার ভঙ্গিমাত্র। এ ক্ষেত্রেও আমি এই ভঙ্গিতেই কথাটি বলেছিলাম। কিন্তু, আমরা যদি আমাদের ভাষায় পুরোপুরি সঠিক হতে চাই, আর তুমি যখন কথা বলার সঠিকতার উপর আগ্রহটা একটু অধিক পরিমাণেই দেখাচ্ছ, তখন আমাদের বলা উচিত যে, শাসক শাসক হিসাবে ভ্রান্তিহীন; আর যেহেতু শাসক ভ্রান্তিহীন সেজন্য যে-বিধান সে শাসিতের জন্য রচনা করে সে-বিধানও ভ্রান্তিহীন; সে ভ্রান্তিহীন বিধান অবশ্যই তার স্বার্থমূলক। শাসিতের কর্তব্য বা ধর্ম হচ্ছে শাসকের বিধানকে পালন করা। কাজেকাজেই সবলের কিংবা শাসকের স্বার্থই হচ্ছে ন্যায় বা ধর্ম—একথা যেমন আমি পূর্বেও বলেছি, এখনও আমি তার পুনরাবৃত্তি করছি।

কিন্তু, থ্র্যাসিমেকাস, আমি গুপ্তচর কী করে হলাম! আমার কথায় কি তোমার সত্যই মনে হচ্ছে যে, আমি তোমার বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করছি?

হ্যাঁ, অবশ্যই, তা ছাড়া আর কী?

তুমি কি মনে কর যুক্তির মধ্যে তোমাকে আঘাত করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি তোমাকে এই প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করছি?

না, আমার 'মনে করার' ব্যাপার নয়, আমি জানি এই তোমার উদ্দেশ্য। কিন্তু সক্রেটিস, একথা তুমি ঠিক জেনো যে, কেবলমাত্র যুক্তির জোরে তুমি আমাকে কখনো পর্যুদস্ত করতে পারবে না।

প্রিয় সঙ্গী, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমায় পর্যুদস্ত করার কোনো চেষ্টাই আমি করব না। কিন্তু, ভবিষ্যতে আমাদের মধ্যে যেন কোনো ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেজন্য এখানে আমি একটি প্রশ্ন পরিষ্কার করে নিতে চাই। থ্র্যাসিমেকাস, তুমি আমায় বলো, তুমি কোন্ অর্থে শাসককে সবলতর কিংবা শাসক বলতে চাচ্ছ? তুমি বলেছ, শাসক শক্তিমান, সুতরাং শাসিত দুর্বলের কর্তব্য হচ্ছে তার স্বার্থের বিধানকে পালন করা। কিন্তু, তুমি কী অর্থে একথা বলছ? কথাটি কি তুমি জনপ্রিয় বা সাধারণ অর্থে বলছ, না 'শাসক' কথাটির সঠিক অর্থে বলছ?

শুধু সঠিক নয়, সঠিকতম অর্থেই আমি কথাটি বলেছি, সক্রেটিস! এখন তুমি গুপ্তঘাতক কিংবা গুপ্তচর যেমন ইচ্ছা তেমন হতে পার। তোমার নিকট কোনো করুণা ভিক্ষা করার পাত্র আমি নই। কিন্তু তোমার সব চাতুরীই ব্যর্থ হবে, সক্রেটিস। আমাকে বাগে পাওয়া তোমার ঘটবে না, একথা জেনে রেখো।

কী বলছ, থ্র্যাসিমেকাস! তুমি কি আমাকে পাগল ভেবেছ যে, আমি তোমার সঙ্গে চাতুরী করতে চেষ্টা করব? সে কি একটি সহজ কাজ? তার চেয়ে একটা সিংহের শ্মশ্রু মুণ্ডন করাও কি আমার পক্ষে অনেক বেশি সহজ নয়?

আহা! কী নির্দোষ! মুহূর্তখানেক পূর্বে তুমি কি আমার উপর সেই কাজটি করতে যেয়েই ব্যর্থ হওনি?

কিন্তু, আমাদের এই বাক্‌চাতুর্য এবার থাক। যথেষ্ট হয়েছে। এরচেয়ে বরঞ্চ তোমায় আমি একটি প্রশ্ন করি। চিকিৎসকের সঠিক অর্থেই তুমি বলো, একজন চিকিৎসককে তুমি কী মনে কর? সে কি রোগের নিরাময়কারী, না সে অর্থের উপার্জনকারী? জবাব দেয়ার পূর্বে তুমি মনে রেখো থ্র্যাসিমেকাস, আমি একজন সত্যিকারের চিকিৎসক সম্পর্কে বলছি।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, চিকিৎসক রোগীর নিরাময়কারী।

বেশ। একজন নাবিক বা কর্ণধার—অর্থাৎ, যে সত্যিকারের কর্ণধার, তার সম্পর্কে তুমি কী বলবে? সে কি শুধুই নাবিক, না সে জাহাজের খালাসিদের পরিচালক?

সে খালাসিদের পরিচালক।

হ্যাঁ, তুমি তাকে খালাসিদের নাবিক বা কর্ণধার বলবে। কিন্তু কর্ণধারকে যখন তুমি কর্ণধার বল তখন নিশ্চয়, সে একটি জাহাজে আরোহণ করে সমুদ্রে ভেসেছে—এই ঘটনাটিকেই তার এরূপ আখ্যার কারণ হিসাবে দেখ না; কিংবা তাকে তুমি কেবলমাত্র একজন খালাসি বলেও এ-কারণে আখ্যায়িত কর না।

বস্তুত এই মুহূর্তে তার জাহাজে আরোহণের সঙ্গে তার—পরিচালক হওয়ার কোনো কার্যকারণগত সম্পর্ক নেই। তার নাবিক আখ্যাটিও তার জাহাজে আরোহণ-নিরপেক্ষভাবেই একটি দক্ষতা এবং জাহাজিদের উপর ক্ষমতার প্রকাশচিহ্ন-বিশেষ।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, তোমার একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

এবার আমি বললাম ঃ তার কারণ, যে-কোনো দক্ষতা বা শিল্পেরই একটা কার্য বা লক্ষ্য থাকে।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, অবশ্যই। এই লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করা তার কর্তব্য।

আর শিল্পের লক্ষ্য নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতা। সম্পূর্ণতা ব্যতীত তার লক্ষ্য অপর কিছুতেই নিবদ্ধ হতে পারে না। নয় কি?

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

থ্র্যাসিমেকাস! আমার কথাটিকে আমি দেহের দৃষ্টান্ত দিয়ে হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারব। ধরো, তুমি আমাকে জিজ্ঞাস করলে ঃ দেহের মধ্যে কি কোনো অভাববোধ আছে, না দেহ অভাবহীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ? তোমার সে-প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয়ই আমি বলব ঃ দেহের মধ্যে অবশ্যই অভাববোধ রয়েছে। কারণ, দেহ—অসুস্থ হলে তার নিরাময়ের আবশ্যক হয়; তার এই নিরাময়ের লক্ষ্য নিয়েই তৈরি হয়েছে চিকিৎসাশিল্প। দেহের অসুস্থতাতেই যে নিরাময়শিল্পের উদ্ভব—একথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে?

হ্যাঁ, একথা আমি স্বীকার করি। নিরাময়শিল্পের সূত্রপাত অবশ্যই দেহের অসুস্থতায়।

কিন্তু থ্র্যাসিমেকাস, শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কি হবে? অভাবের বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে বলা যায়। আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তির অভাব হতে পারে; তেমনি আমাদের কর্ণেরও শ্রবণশক্তির অভাব ঘটতে পারে। এজন্য আমাদের চোখ বা কান অভাবহীন নয়; তাদের এই অভাব পূরণের জন্য—অর্থাৎ, দৃষ্টিশক্তি কিংবা শ্রবণশক্তি লাভের জন্য তাদের নির্ভর করতে হয় নিরাময়শিল্পের উপর। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, চোখের ন্যায় কিংবা আমাদের কানের ন্যায় শিল্পের মধ্যেও কি অনুরূপ কোনো অভাব সম্ভব? এমন কি সম্ভব যে, একটি শিল্পও কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, আর তার এই ত্রুটিপূরণের জন্য তাকে ভিন্নতর আর এক শিল্পের দ্বারস্থ হতে হয়? শুধু

এখানেই শেষ নয়। যে শিল্পের সে দ্বারস্থ হল, তার মধ্যেও কি অপর কোনো ত্রুটি থাকা সম্ভব নয় যার পূরণের জন্য তাকেও দ্বারস্থ হতে হবে আর এক শিল্পের? আর এমনি করে প্রক্রিয়াটি চলতে থাকবে সীমাহীনভাবে? অথবা, ব্যাপারটা এমনই যে, কোনো শিল্পের মধ্যে ভুলত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না। কাজেই সংশোধনের জন্য নিজের সত্তার চর্চা কিংবা অপর কারও দ্বারস্থ হওয়া কোনোটিরই কোনো প্রয়োজন তার পড়ে না? অপরের দ্বারস্থ না হয়ে আপন সত্তায় নিমগ্ন থাকাকেই তারা তাদের কর্তব্য বলে জ্ঞান করে। কেননা, শিল্পমাত্রই যতদিন সৎ ততদিনই সে সত্য। আর, সত্যকে অবলম্বন করেই তার যা-কিছু বিশুদ্ধতা এবং সম্পূর্ণতা। থ্র্যাসিমেকাস, আমার কথাগুলোকে সঠিক অর্থে গ্রহণ করে এবার বলো আমার বক্তব্য যথার্থ কি না।

তোমার কথার যথার্থতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, সক্রেটিস। স্পষ্টতই তুমি সঠিক কথা বলেছ।

তা হলে নিরাময়শাস্ত্রের লক্ষ্য ঔষধাদি নয়, তার লক্ষ্য হচ্ছে দেহের মঙ্গল। নয় কি?

অবশ্যই।

ঠিক তেমনি, অশ্বচালনার কৌশলেরও লক্ষ্য এই কৌশল বা বিদ্যাটি নয়। তার লক্ষ্য অশ্বের মঙ্গলসাধন। অনুরূপভাবে শিল্প বা কলামাত্রই আত্মস্বার্থে নয়, বরঞ্চ পরের হিতার্থেই নিয়োজিত। কেননা, শিল্পের আত্মস্বার্থ বা নিজ প্রয়োজন কিংবা অভাব বলতে কিছু নেই। শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে, যে-বিষয় নিয়ে তার কারবার, সে-বিষয়ের ধ্যান করা, তার উন্নয়নের চেষ্টা করা।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, নিশ্চয়ই সক্রেটিস।

কিন্তু তা হলে, থ্র্যাসিমেকাস, একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে, শিল্প এবং বিষয়ের মধ্যে অর্থাৎ বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে শিল্পই উত্তমর্ণ, বিষয় নয়। শিল্প হচ্ছে বিষয়ী, আর বিষয়ী বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করে। এ কথা ঠিক নয়?

থ্র্যাসিমেকাস আমার এ-মন্তব্যটিও অবশ্য স্বীকার করলেন। কিন্তু তাঁর সম্মতির মধ্যে বেশ পরিমাণ অনিচ্ছার ভাবটিও আমি দেখতে পেলাম।

এর পরে আমি বললাম ঃ তা হলে কোনো শিল্প বা বিজ্ঞানই তার নিজের চেয়ে শক্তিমান কারুর স্বার্থ সাধন করে না, তার লক্ষ্য হচ্ছে দুর্বলতরের স্বার্থই সাধন করা।

থ্র্যাসিমেকাস আমার এবারের অভিমতটিতে বেশ একটু আপত্তি জানাবারই প্রয়াস পেলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আমার এ-মতটিকেও স্বীকার করে নিলেন।

আমি বলে চললাম ঃ তাই যিনি সত্যকারভাবে চিকিৎসক তিনি যখন কোনো নিরাময়-পত্র তৈরি করেন, তখন তিনি আপন স্বার্থের কথা আদৌ চিন্তা করেন না, তিনি তাঁর রোগীর মঙ্গলের কথাই চিন্তা করেন। কারণ যিনি যথার্থই চিকিৎসক, তিনি কেবল অর্থোপার্জনকারী ব্যাবসাদার নন, তিনি একটি দেহের শাসকও বটে। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তেমনি নৌপোতের যে কর্ণধার বা চালক সে একজন সাধারণ নাবিক নয়, সে নাবিকদের পরিচালক বা শাসক।

হ্যাঁ, একথা তো আমরা ইতিপূর্বেই স্বীকার করেছি।

বেশ, তা হলে এ-নৌচালকের কাজ হবে তার অধীনস্থ নাবিকদের মঙ্গলামঙ্গলের কথা চিন্তা করা, তার নিজের স্বার্থের চিন্তা করা নয়। এ কথাও নিশ্চয় ঠিক?

থ্র্যাসিমেকাস অনিচ্ছাসহকারে জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক।

তা হলে, থ্র্যাসিমেকাস, একথা আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, নিয়ম কিংবা নিয়ামক যার কথাই তুমি বল-না কেন, নিয়ামক হিসাবে তার কর্তব্য হচ্ছে তার উপর ন্যস্ত বিষয় বা শিল্প নিয়েই চিন্তা করা, তার নিজের স্বার্থ নিয়ে নয়। তাই যা-কিছু সে বলে কিংবা করে তার প্রত্যেকটিরই লক্ষ্য থাকে তার সেই দায়িত্বকে পালন করা।

যুক্তির স্রোতে আমরা যখন এই জায়গাতে এসে উপস্থিত হলাম আর যখন উপস্থিত সবার নিকট পরিষ্কাররূপে ধরা পড়ল যে, ন্যায়পরায়ণতার যে-সংজ্ঞা নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম সেটি এতক্ষণে একেবারে পালটে গেছে, তখন থ্র্যাসিমেকাস আমার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে আমাকে পালটা জিজ্ঞেস করলেন, সক্রেটিস, তোমার কি কোনো শুশ্রূষাকারী পরিচারিকা আছে?

আমি বললাম, আমার কথার জবাব না দিয়ে এমন প্রশ্ন আমায় তুমি জিজ্ঞেস করছ কেন থ্র্যাসিমেকাস?

থ্র্যাসিমেকাস জবাব দিলেন, কারণ তেমন কোনো পরিচারিকা তোমার থাকলে সে তোমার নাকটি অন্তত পরিষ্কার করে দিত। কিন্তু এখন দেখছি, যদি

এমন কেউ তোমার থেকেও থাকে তা হলে সে তোমাকে মেষপালক আর মেষশাবক—এ দুই-এর পার্থক্যটি পর্যন্ত রপ্ত করিয়ে দিতে পারেনি।

কিসের জন্য একথা তুমি বলছ, থ্র্যাসিমেকাস?

কেননা তুমি এখনও মনে করছ যে, মেষপালক বা রাখাল যে মেষশাবকগুলোকে বড় করে তোলে, সে যে তাদের সবল, তাজা করে তোলে, তাদের গায়ে চর্বি জমুক, এ-কামনা যে সে করে তা নিজের কোনো স্বার্থ-চিন্তায় নয়, তা মেষশাবকদেরই মঙ্গলের জন্য! তা ছাড়াও তুমি ভাবছ যে, রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যদি যথার্থই শাসক হয় তা হলে তারা কখনোই তাদের প্রজাকুলকে মেষশাবকদের ন্যায় বিচার করে না, তারা যে দিনরাত চিন্তা করে সে আদৌ তাদের নিজেদের কোনো সুবিধা বা স্বার্থ লাভের জন্য নয়, সব চিন্তাই তাদের শাসিত প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য! সক্রেটিস, ব্যাপারটি আদৌ সেরূপ নয়। বস্তুত ন্যায়-অন্যায়ের যুক্তিতে তুমি এতখানি ভ্রান্ত যে, তুমি আদপে বুঝতেই পারছ না, ন্যায় বলতে আসলে বোঝায় শক্তির ন্যায়—অর্থাৎ শাসকের যা ন্যায়, শাসিতের কাছে তা অন্যায়। ন্যায় হচ্ছে যে শক্তিধর তার লাভের বিষয়, আর যে অসহায় তার লোকসানের বিষয়। অন্যায় সম্পর্কেও এই কথাই সত্য। একের কাছে যা অন্যায়, অপরের কাছে তা ন্যায়। কেননা, যে অন্যায়কারী সে শক্তির জোরেই অন্যায়কারী। যে শাসিত সে যে শাসকের সুখ ও স্বার্থে যোগান দিয়ে চলে, সে এজন্য নয় যে সে নিজের কোনো সুখ লাভ করে। আদৌ তা সত্য নয়। শাসকের স্বার্থ সে রক্ষা করে চলে কেননা সে দুর্বল, কেননা সে শাসিত। তা ছাড়া মূর্খপ্রবর, এটা কি তুমি দেখতে পাও না, ন্যায়-অন্যায়ের লড়াই-এ যে সর্বদা হেরে যায় সে ন্যায়ই, অন্যায় নয়। ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা বা দায়চুক্তির ব্যাপারটিই বিবেচনা করে দ্যাখো। ন্যায়-অন্যায় বা সৎ অসৎ-এর মধ্যে চুক্তির ভিত্তিতে যদি কোনো যৌথ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা ঘটে তা হলে এই ব্যাবসার পরিণতিতে তুমি সৎকেই সর্বদা লোকসানের ভাগী আর অসৎকে লাভের মালিক হিসাবে দেখতে পাবে। আবার রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির দেনা-পাওনার সম্পর্কেও দেখবে যে আয়কর পরিশোধের ক্ষেত্রে একই পরিমাণ আয়ের উপর অসৎ যা দিয়ে পার পাচ্ছে সৎ ব্যক্তিকে দিতে হচ্ছে তার চেয়ে ঢের বেশি; কিন্তু বিনিময়ে কিছু সুবিধা-সুযোগ প্রাপ্য হলে সে ক্ষেত্রেও যে অসৎ সেই-ই লাভ করে তার সিংহভাগ, সৎ-এর প্রাপ্তির ভাণ্ডটি থাকে রিক্ত। শুধু এখানেই শেষ নয়। এবং দুজনেই যদি রাষ্ট্রীয় কোনো পদে আসীন হয় তা হলে সেখানেও যে সৎ সে ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পত্তির অবহেলা করে রাষ্ট্রীয় সেবা করে। বিনিময়ে সে লাভ করে না কিছুই, কেননা সে হচ্ছে সৎ। লাভ নয়, কিন্তু বকশিশ হিসাবে তার যা

উপরি জোটে সে হচ্ছে বন্ধুবর্গ আর আত্মীয়জনদের নিকট থেকে ঘৃণা, কেননা তাদের অনুরোধ অনুযায়ী বেআইনি কাজ করে তাদের স্বার্থসাধন করতে সে অস্বীকার করেছে, তাই তারা রুষ্ট। কিন্তু অসৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই বিপরীত। অবশ্য অন্যায়কে যখন আমি লাভজনক বলছি তখন বৃহৎ আকারের অথবা অন্যায়ের সামগ্রিকতাকেই আমি বোঝাতে চাইছি। পূর্বেও আমি অসৎ এবং অন্যায়ের কথা এই অর্থেই বলেছি। কেননা অন্যায়কে যখন তুমি বৃহৎ কিংবা ব্যাপক আকারে বিচার করবে তখনই মাত্র তুমি তার লাভের ব্যাপারটি স্পষ্টরূপে দেখতে পাবে। আর অন্যায়ের চরম হচ্ছে স্বৈরাচার। তাই স্বৈরাচারের দিকে দৃষ্টি দিলেই তোমরা আমার কথার অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝতে পারবে। কেননা, একদিকে স্বৈরাচারের মধ্য দিয়েই স্বৈরাচারী তার চরম সুখ যেমন লাভ করে, তেমনি অপরদিকে স্বৈরাচারের দুর্ভোগ যাদের ভুগতে হয় তাদের অবস্থাও হয় চরমরূপে শোচনীয়। কেননা, প্রবঞ্চনা আর পরাক্রম মারফত স্বৈরাচার মানুষের সম্পদ ও শক্তিকে সামগ্রিকভাবেই গ্রাস করে ফেলে। এ-গ্রাসে তার কোনো দ্বিধা কিংবা সঙ্কোচ নেই, তার কোনো ধীর গতি বা রওয়া-সওয়া নেই। বেপরোয়াভাবে এক থাবাতেই স্বৈরাচার মানুষের যা-কিছু সম্পদ ঃ ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক, কিংবা সর্বজনীন—সবকিছুকে করায়ত্ত করে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই সামগ্রিকতার বাইরে এ-পাপাচারগুলোকে আমরা চিনতে ভুল করিনে। আমরা এর কোনোটাকে বলি চুরি, কোনোটাকে ডাকাতি, কোনোটাকে বা প্রবঞ্চনা। আর ক্ষুদ্রাকারের এই পাপাচারের কোনো-একটির সম্পাদন-সময়ে আমরা যদি দুষ্কৃতকারীকে হাতেনাতে ধরতে পারি তা হলে তার শাস্তিদানেও আমরা কুণ্ঠিত হইনে। এই দণ্ডের মধ্য দিয়ে দুষ্কৃতকারী লোকচক্ষে অবমানিত হয়, তার সামাজিক মর্যাদা লুপ্ত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী যখন মানুষের কেবলমাত্র সম্পদকেই হরণ করে না, হরণ করে সব সম্পদের বাড়া তার স্বাধীনতাকেও, স্বাধীন নাগরিকগন যখন স্বৈরাচারীর দাসে পরিণত হয়ে যায়, তখন নিন্দার পরিবর্তে আমরা প্রশংসার ডালিতে তাকে বিভূষিত করে দিই, পৃথিবীর সর্বাধিক সুখী ব্যক্তি বলে তাকে অভিহিত করি। শুধু আমরা নাগরিকগণ নই, যারাই তার এই অন্যায়ের সাফল্যজনক অনুষ্ঠানের কথা শোনে তারাই তার সাফল্যে বাহবার যোগান দেয়, নিজেরা উৎফুল্ল বোধ করে। কারণ, মানুষ যখন অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তখন সে অন্যায়কে অন্যায় বলে, এজন্য নয় যে অন্যায় তারা আদৌ করতে পারে না; মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে পাছে অপরের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের অঘাতটি তার নিজের উপরও বা এসে পড়ে। কাজেই সক্রেটিস, আমার কথা হচ্ছে, অন্যায়ের আকার বৃহৎ হলে অবশ্যই সে ন্যায়ের চেয়ে অনেক

বেশি শক্তিশালী হয়; ন্যায়ের চেয়ে তখন তার পরাক্রম ও পরিধি দুই-ই বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ায়। আমি তাই পূর্বেও যেমন বলেছি এখনও তেমনই বলছি ঃ অন্যায় যেমন ব্যক্তির নিজের লাভালাভের চিন্তা বই অপর কিছু নয়, তেমনি ন্যায়ও আসলে শক্তির স্বার্থসাধন ব্যতীত অপর মহৎ কোনো গুণের নাম নয়।

থ্র্যাসিমেকাস তাঁর কথার এই ঝরনাধারায় আমাদের অভিসিক্ত করে প্রস্থানের উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর তা আদপেই পছন্দ হচ্ছিল না। তারা হুল্লোড় তুলল ঃ থ্র্যাসিমেকাসকে অবশ্যই থেকে যেতে হবে এবং পালটা জবাবের বিরুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে হবে। অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও বিনীতভাবে অনুরোধ করে বললাম ঃ কী মনোহর তোমার বক্তব্য, থ্র্যাসিমেকাস! বস্তুত কত তাৎপর্যই-না সে বহন করে! কিন্তু তাই বলে তোমার কি এই মুহূর্তে সরে পড়া চলে? এখন তো তোমার কর্তব্য হচ্ছে, হয় আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া যে তোমার বক্তব্য যথার্থ, নয়তো অপরের কাছ থেকে শিখে নেওয়া যে, শব্দমাত্রই সত্য নয়। মানুষের জীবনের তুমি পথনির্দেশ করতে চেয়েছ। আমরা সবাই কেমন করে সর্বাধিক সার্থকতার ভিত্তিতে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে পারি সে প্রশ্নই তুমি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছ। কিন্তু এ বিষয়টিকে কি তুমি এত ক্ষুদ্র মনে কর যে, বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য ধৈর্যধারণকেও তুমি সঙ্গত বোধ কর না?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ কিন্তু প্রশ্নটির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে তো আমার কোনো দ্বিমত নেই।

আমি বললাম ঃ কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে যেন তুমি যে সত্য জ্ঞাত হয়েছ তাকে আমরাও জ্ঞাত হই কিংবা না হই এবং তার ফলে আমাদের জীবনে ক্ষতি আসুক কিংবা লাভ পৌঁছাক কিছুতেই তোমার যায় আসে না। আমাদের জন্য যেন তোমার আদৌ কোনো উদ্বেগ বা চিন্তা নেই। কিন্তু আমি বলি, দোহাই বন্ধু, তোমার জ্ঞানকে কেবল তোমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না। তুমি আমাদের কথাও একটু চিন্তা কোরো। আমরা সবাই মিলে একটা বান্ধবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছি, একথা তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। তোমার জ্ঞান থেকে যে-সার্থকতায় আমরা ধন্য হব তার বিনিময়ে আমাদের কৃতজ্ঞতায় তুমি কোনো কার্পণ্য পাবে না। অবশ্য আমার কথা বলতে গেলে আমি প্রকাশ্যভাবেই বলব, তোমার বক্তব্যকে আমি গ্রহণ করতে পারিনি। কেননা আমি বিশ্বাস করিনে, বেপরোয়া অন্যায়ও ন্যায়ের চেয়ে লাভজনক বলে গণ্য হতে পারে। কারণ, আমি যদি ধরেও নিই যে, শক্তিমদমত্ত অন্যায়কারী প্রবঞ্চনা কিংবা জবরদস্তি

মারফত অন্যায় করতে পারে তবুও তা থেকে একথা আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে, সেই অন্যায়সাধনই তাকে ন্যায়ের চেয়েও সার্থক করে তুলতে পারে। এ-প্রশ্নে আমার মতো সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা আমার আর বন্ধুদেরও যে না হতে পারে, এমন নয়। হতে পারে আমাদের এ-বিশ্বাস ভ্রান্ত। কিন্তু তেমন হলে বন্ধু হিসাবে তোমার জ্ঞান দ্বারা আমাদের মনকে আলোকিত করে বুঝিয়ে দেওয়া কর্তব্য, কীভাবে অন্যায়ের বদলে ন্যায়কে সমর্থন করে আমরা ভ্রান্ত পথকে গ্রহণ করেছি।

থ্র্যাসিমেকাস রূঢ়ভাবে আমার কথার জবাব দিয়ে বললেন ঃ আমি যা বলেছি তাতে যদি তোমরা না বুঝে থাক, তা হলে তোমাদের আর কী করে বোঝাব? তোমরা কি মনে কর যে আমার বক্তব্যের প্রমাণকে আমি জোর করে তোমাদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব?

বিধাতার দোহাই, এমন তুমি কোরো না। আমার প্রার্থনা শুধু এইটুকু, সঙ্গতি রেখে তুমি কথা বলো। কিংবা তোমার মত তুমি যদি পরিবর্তন কর তা হলে খোলাখুলিভাবেই যেন সেটা কর। তা হলে আমরা অন্তত প্রতারিত হব না। কেননা, একটা কথা আমি বলতে বাধ্য থ্র্যাসিমেকাস যে, তুমি যখন চিকিৎসক দিয়ে তোমার বক্তব্য শুরু করেছিলে তখন চিকিৎসকের সংজ্ঞাটি তুমি যথার্থই দিয়েছিলে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মেষপালকের প্রসঙ্গ যখন এল তখন আর তোমার সংজ্ঞার সেই সঠিকতাকে তুমি রক্ষা করলে না। কেননা, মেষপালকের ব্যাপারে তুমি বললে, মেষপালক মেষশাবকদের স্বার্থে তাদের পরিচর্যা করে না, মেষপালক পরিচর্যা করে মেষশাবকদের ভোজের টেবিলে সুন্দররূপে উপহার দেওয়ার জন্য, কিংবা ব্যবসায়ীর ন্যায় অর্থলাভের জন্য বাজারে তাদের বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করার জন্য। অথচ মেষপালক কথাটির অর্থ হচ্ছে মেষশাবকদের পালন করা। এটি একটি কাজের কলা বা পদ্ধতি। মেষশাবকের মঙ্গলসাধনের মধ্য দিয়েই মাত্র এ-কলার দক্ষতা বা সম্পূর্ণতা আয়ত্ত করা সম্ভব। আর, একটি কলা বা শিল্পের কর্তব্যই হচ্ছে নিজেকে দক্ষ বা পূর্ণ করে তোলা। কাজেই এ থেকেই বোঝা যায় যে, মেষপালক তার মেষশাবকদের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনের মধ্য দিয়েই মাত্র সর্বোত্তম মেষপালক বলে প্রমাণিত হতে পারে। শাসক সম্পর্কেও আমি এইমাত্র সেই কথাই বলছিলাম। কেননা, আমি মনে করি, সত্যিকার যে শাসক, রাষ্ট্রীয় কিংবা অরাষ্ট্রীয়, সর্বক্ষেত্রেই তার কর্তব্য হচ্ছে তার মেষশাবক অর্থাৎ তার প্রজাকুলের মঙ্গলের কথা চিন্তা করা। কিন্তু তুমি যেন মনে করছ, রাষ্ট্রের যে যথার্থ শাসক তার মনোবাসনা হচ্ছে শাসকের আসনকেই কেবল করায়ত্ত করা, প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা নয়।

আমার একথা শুনে থ্র্যাসিমেকাস জবাব দিলেন ঃ আমার মনে করার ব্যাপার নয়, এটিকে আমি নিশ্চিত বলেই জানি।

বেশ, তা হলে ছোটখাটো পদের বেলা মানুষ কেন শুধুমাত্র পদলোভেই বিনা পারিশ্রমিকে দায়িত্বগ্রহণে রাজি হয় না? অপরের সেবা করছে সুতরাং সেজন্য তাদের পারিশ্রমিক প্রয়োজন, এরূপ ধারণা যদি তাদের না হয়—অর্থাৎ তারা যদি ধারণা করত যে পদলাভেই তাদের স্বার্থ, তা হলে তো বিনা পারিশ্রমিকেই এ-সমস্ত পদগ্রহণে তাদের আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক হত। থাক একথা। আমি তোমাকে সোজা একটা প্রশ্ন করতে চাই, থ্র্যাসিমেকাস। তুমি বলো, শিল্পকলা থেকে শিল্পকলায় কি পার্থক্য নেই? অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিল্পকলার কি আপন-আপন নির্দিষ্ট করণীয় নেই? বন্ধুপ্রবর, এ-প্রশ্নটির যাহোক একটি জবাব দাও, কেননা যুক্তির ক্ষেত্রে তো আমরা নিশ্চল হয়ে থাকতে পারিনে।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, বেশ, আমি জবাব দিচ্ছি ঃ করণীয়ের ক্ষেত্রেই একটি শিল্পকলা থেকে অপর একটি শিল্পকলা পৃথক।

আর এক-একটি শিল্পকলা আমাদের জীবনে এক-একটি সার্থকতা বহন করে আনে—যেমন নিরাময়কৌশল আমাদের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। নৌচালনার শিল্প সমুদ্রবক্ষে আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। অপর সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রেই এইরূপ। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

ঠিক তেমনি পারিশ্রমিক দানের যে-কলা তার করণীয় হচ্ছে, পরিশ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক দান করা। কিন্তু তাই বলে একটি দক্ষতা বা শিল্পকলাকে অপর একটি দক্ষতার সঙ্গে আমরা গুলিয়ে ফেলিনে। যেমন ধরো, নৌযান পরিচালনার যে-দক্ষতা তাকে আমরা নিরাময়দক্ষতার সঙ্গে এক করে দেখিনে। সমুদ্র-অভিযানে সমুদ্রযানের পরিচালকের স্বাস্থ্যের অবশ্যই উন্নতি ঘটতে পারে, কিন্তু তাতেই নৌযান পরিচালনা আর স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যাপার এক হয়ে যাবে না। কেননা, তোমার সঠিক শব্দপ্রয়োগের কৌশলটিকে যদি আমরা স্বীকারও করি তা হলেও তুমি নিশ্চয়ই একথা বলবে না যে নৌযান পরিচালনাই হচ্ছে নিরাময়কৌশল। কী বল থ্র্যাসিমেকাস?

না, তেমন কথা আমি অবশ্যই বলব না।

আবার দ্যাখো, আমাদের কাজের পারিশ্রমিক পাওয়ার সময়ে আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে। কিন্তু সেজন্যও নিশ্চয়ই তুমি বলবে না যে পারিশ্রমিক দান আর স্বাস্থ্যের নিরাময়বিজ্ঞান একই ব্যাপার?

না, তাও আমি বলব না।

কিংবা ধরো, চিকিৎসকের পারিশ্রমিকের বিষয়টি। চিকিৎসক চিকিৎসার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলে চিকিৎসাকৌশল আর অর্থপ্রাপ্তির কৌশলও এক নয়?

তা নিশ্চয়ই নয়।

আর তা ছাড়া একথা আমরা আগেই স্বীকার করেছি, প্রত্যেক শিল্পের সার্থকতা তার নিজের লক্ষ্যেই সীমাবদ্ধ। নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা তা বলেছি।

তা হলে এমন কোনো সার্থকতা যদি থাকে যা সমস্ত শিল্প বা শিল্পীর মধ্যেই বিরাজমান তা হলে বলতে হবে যে, সমস্ত শিল্প বা শিল্পীর মধ্যেই এই সার্থকতা একটি লক্ষ্য হিসাবে বিদ্যমান আছে। এ-বিষয়ে তোমার মত কী?

হ্যাঁ, তোমার একথা সত্য, সক্রেটিস।

সুতরাং শিল্পী যখন তার দক্ষতার বিনিময়ে পারিশ্রমিক লাভ করে তখন তার পারিশ্রমিকের এই সার্থকতা পারিশ্রমিকদানের কৌশল থেকেই প্রাপ্ত, শিল্পীর নিজের শিল্পের স্বীকৃত লক্ষ্যসঞ্জাত নয়। কী বল, থ্র্যাসিমেকাস?

এবার থ্র্যাসিমেকাস অনিচ্ছাসহকারে আমার কথায় সায় দিলেন।

তা হলে যে-কোনো শিল্পীর ক্ষেত্রে শিল্পী যে-পারিশ্রমিক পান তা তাঁর শিল্পের সত্তাভুক্ত নয়। বস্তুত ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, নিরাময়কৌশলের কাজ যেমন আমাদের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করা, গৃহনির্মাণ-শিল্পের কাজ যেমন গৃহাদি নির্মাণ করা, তেমনি বেতন বা পারিশ্রমিকদানেরও এক শিল্প রয়েছে যার কাজ হচ্ছে শিল্পীর পরিশ্রমের জন্য পারিশ্রমিক দান করা। নিরাময়শিল্প যখন নিরাময়ের কর্তব্যসাধন করে, কিংবা গৃহনির্মাণ শিল্পী যখন গৃহনির্মাণের কাজ সমাধা করে, তখন পারিশ্রমিকশিল্পের দায়িত্ব হচ্ছে আপন কর্তব্য নিষ্পন্ন করা। অর্থাৎ শিল্পকে তার প্রাপ্য পরিশোধ করা। কাজেই শিল্পের আপন সত্তার সঙ্গে তার পারিশ্রমিকলাভের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা পারিশ্রমিক না দিলে শিল্পী অবশ্যই লাভবান হয় না, কিন্তু পারিশ্রমিক দান না করেও আমরা শিল্পের সেবা থেকে লাভবান হতে পারি। নয় কি?

হ্যাঁ, আমার তো তা-ই মনে হয়।

তাহলে শিল্পী যখন কোনোকিছু প্রাপ্ত না হয়েও তার আপন কর্তব্য পালন করে তখন কি সে অপরের কোনো মঙ্গলসাধন করে না?

নিশ্চয়ই সে মঙ্গলসাধন করে।

তা হলে থ্র্যাসিমেকাস, আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শিল্প কিংবা শাসনব্যবস্থা—কেউই নিজের স্বার্থসাধনের জন্য নিজ কর্তব্য পালন করে না। বরঞ্চ, আমরা আগেও বলেছি, তারা কর্তব্যপালন করে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বা শাসিত প্রজাকুলেরই স্বার্থে। অর্থাৎ শিল্পী বা শাসক শক্তিমানের স্বার্থে কাজ করে একথা সত্য নয়; বরঞ্চ তারা দুর্বলতরের স্বার্থকেই রক্ষা করে, তাদের মঙ্গলসাধনকেই নিজেদের কর্তব্য বলে তারা জ্ঞান করে। থ্র্যাসিমেকাস, এজন্য খানিক পূর্বেও আমি বলছিলাম, স্বেচ্ছায় শাসক হতে কেউ চায় না। কারণ বিনা পারিশ্রমিকে কে আর বনের মোষ তাড়াতে চায়? নিকৃষ্টকে উৎকৃষ্ট করা কিংবা অধমকে উত্তম করার দায়িত্ব কে আর এমনিতে বহন করতে চায়? কারণ যিনি সত্যকারের শিল্পী বা শাসক তিনি যখন তাঁর কর্তব্যপালন করেন কিংবা তা পালন করার প্রয়োজনে অন্যকে পরিচালিত করেন তখন প্রজাকুলের স্বার্থ ছাড়া নিজের স্বার্থের কথা তিনি আদৌ চিন্তা করতে পারেন না। বিনিময়ে তাঁকে পারিশ্রমিকদানের একটা ব্যবস্থা আমাদের রাখতেই হবে। সে পারিশ্রমিক সম্পদ, সম্মান বা শাস্তি—এই তিন প্রকারের যে-কোনো প্রকারের হতে পারে।

গ্লকন বিস্ময়ের সুরে বলে উঠলেন ঃ তুমি কী বলছ, সক্রেটিস! তোমার তিন প্রকার পারিশ্রমিকের মধ্যে প্রথম দুটিকে বোঝা যায়। কিন্তু 'শাস্তি' যে কী করে পারিশ্রমিক হতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি বললাম ঃ অর্থাৎ তুমি বুঝতে পারছ না, কী করে শাসনের ক্ষেত্রে শাস্তি সত্যিকারের উত্তম শাসকের নিকট আকর্ষণীয় পারিশ্রমিক বলে বোধ হতে পারে? বেশ, কিন্তু তুমি তো জান যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর লোভকে মানুষ ঘৃণ্য বলেই মনে করে। আর তারা তা সঙ্গতভাবেই করে, নয় কি?

হ্যাঁ, একথা খুবই সত্য।

আমি বললাম, আর এজন্যই যাঁরা উত্তম মানুষ, অর্থ কিংবা সম্মানকে তাঁরা আকর্ষণীয় বলে মনে করতে পারেন না। কেননা শাসনের বিনিময়ে প্রকাশ্যভাবে পারিশ্রমিক দাবি করলে তাঁরা ভাড়াকরা শাসক বলে অভিহিত হতে পারেন; অপরদিকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ থেকে গোপনে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করলে তাঁরা অপহরণকারী আখ্যাত হবেন। এর কোনোটাই তাঁদের কাম্য নয়।

তা ছাড়া তাঁদের মনে কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও নেই। তাঁরা তাই সম্মানকেও কামনা করেন না। এমন অবস্থায় জবরদস্তিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বস্তুত এমন অবস্থায় উত্তমকে শাস্তির ভয় দেখিয়েই মাত্র শাসক হতে সম্মত করানো যেতে পারে। আমার মনে হয় এ-কারণেই মানুষ বাধ্য হয়ে শাসক হওয়ার বদলে স্বেচ্ছায় শাসক হওয়াকেই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে। আবার দ্যাখো, শাস্তির যে-ভয়ের কথা আমি বলেছি তার সবচেয়ে অবাঞ্ছিত দিক এই যে, উত্তম যদি শাসক হতে অস্বীকার করেন তা হলে অধম দ্বারাই তাঁর শাসিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। কাজেই উত্তম যখন শাসক হতে সম্মত হন তখন তিনি এই চিন্তা থেকে সম্মত হন না যে শাসনের দায়িত্ব তাঁকে সম্পদের ভাগ্য এনে দেবে, কিংবা তাঁর ব্যক্তিগত ভোগের সুযোগ তিনি সৃষ্টি করবেন। কোনো আগ্রহ থেকে নয়, বরঞ্চ গত্যন্তর নেই বলেই শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হন। বস্তুত উত্তম লোকের যদি অভাব না হত, কিংবা তাঁদের চেয়ে অধিকতর উত্তম লোকের উপর যদি তাঁরা শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারতেন তা হলে অবশ্যই তাঁরা শাসনের এই ভার বহন করতে সম্মত হতেন না। বরঞ্চ এমন যদি হত যে একটি নগরীর সব নাগরিকই উত্তম তা হলে দেখা যেত যে, আজ যেখানে শাসক হওয়ার বাসনায় মানুষ একে অপরের সঙ্গে প্রতিযেগিতা করছে সেখানে তখন শাসক না-হওয়ার প্রতিযোগিতাই নাগরিকদের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন আর আমাদের প্রমাণ করতে কোনো অসুবিধাই হত না যে, সত্যিকারের যাঁরা শাসক তাঁদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে শাসিতের স্বার্থরক্ষা করা, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করা নয়। শাসকের এই সংজ্ঞা থেকে একথা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যে, এমন অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপরকে শাসন করার পরিবর্তে অপরের দ্বারা শাসিত হওয়াকেই অধিকতর বাঞ্ছনীয় বোধ করবে। কাজেই থ্র্যাসিমেকাস যেখানে ন্যায়কে শক্তিমানের স্বার্থ বলে অভিমত প্রকাশ করেন, সেখানে আমি তাঁর সঙ্গে আদৌ একমত হতে পারিনে। তথাপি এ প্রশ্নটার আলোচনা আমরা আপাতত মুলতুবি রাখতে পারি। কিন্তু থ্র্যাসিমেকাস যখন বলেন যে, অন্যায়কারীর জীবনই অধিকতর সার্থক তখন তাঁর এ অভিমতটি যেমন নূতন, তেমনি গুরুতর বলেই আমার নিকট বোধ হচ্ছে। এ প্রশ্নে তোমাদের বিচার করতে হবে, কে যথার্থ অভিমত প্রকাশ করেছে : থ্র্যাসিমেকাস, না আমি? বরঞ্চ গ্লকনকেই আমি জিজ্ঞেস করছি, গ্লকন, কার জীবন তোমার নিকট অধিকতর কাম্য, ন্যায়বানের কিংবা অন্যায়কারীর?

গ্লকন বললেন : আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি বলব, ন্যায়বানের জীবনই অধিকতর সার্থক।

কিন্তু থ্র্যাসিমেকাস অন্যায়কারীর জীবনের সুযোগ-সুবিধাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাও নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ?

হ্যাঁ, তাঁর কথাও আমি শুনেছি। কিন্তু তাঁর বর্ণনা আমার প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারেনি।

বেশ। তিনি যদি যথার্থ না হন তা হলে আমাদের কি উচিত নয় তাঁকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা?

গ্লকন বললেন, অবশ্যই আমাদের তা-ই করা কর্তব্য।

আমি বললাম ঃ কিন্তু উপায়টি কী হবে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন। এক হতে পারে যে, এ-ব্যাপারে থ্র্যাসিমেকাস একটি বক্তৃতা দিলেন; আমরা তার জবাবে আর একটি বক্তৃতা দিলাম। তিনি আবার তাঁর প্রত্যুত্তর দিলেন। এভাবে জবাব এবং পালটা জবাবের মধ্য দিয়ে উভয়পক্ষের সুবিধাসুযোগের তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু এরূপ বাদ-প্রতিবাদের মীমাংসার জন্য প্রয়োজন হবে বিচারকের। অপরদিকে এ-পর্যন্ত আমাদের আলোচনাটি যেভাবে চালিয়েছি অর্থাৎ আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে একের অভিমতে যা যুক্তিসঙ্গত অপরে যদি তা গ্রহণ করি তা হলে আমরা সবাই নিজের মধ্যে বিচারক এবং বক্তা উভয় ভূমিকার মিলন ঘটিয়ে মীমাংসার দিকে অধিকতর সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারি।

গ্লকন বললেন, উত্তম কথা।

তা হলে বলো কোনো উপায়টিকে আমরা গ্রহণ করব?

তোমার প্রস্তাবিত উপায়টিই আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য।

বেশ, থ্র্যাসিমেকাস, তা হলে শুরু করা যাক। তুমি তা হলে গোড়া থেকে আবার শুরু করো। আমার প্রশ্নের তুমি জবাব দাও ঃ সত্যকারের অন্যায়কে কি তুমি সত্যকারের ন্যায়ের চেয়ে অধিকতর সার্থক মনে কর?

হ্যাঁ, আমি তা-ই মনে করি; আর এ-ব্যাপারে আমার যুক্তি আমি পূর্বেই পেশ করেছি।

অধ্যায় ঃ ৪
[৩৪৮—৩৫৪]

থ্র্যাসিমেকাস ঃ অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে অধিক লাভজনক

থ্র্যাসিমেকাসের সঙ্গে যুক্তির লড়াই সক্রেটিস এখনও শেষ করেননি। শাসনের প্রশ্ন শেষ করে সক্রেটিস থ্র্যাসিমেকাসের ন্যায়ের তত্ত্বের অপরদিকের উপর তাঁর লক্ষ্য উদ্যত করেছেন। কোন্‌টি লাভজনক? ন্যায় কিংবা অন্যায়? কিসে সুখ? ন্যায়ে কিংবা অন্যায়ে? থ্র্যাসিমেকাস পূর্বের মতো এখানেও সজোরে বলছেন ঃ 'অন্যায়' বল আর যা-ই বল দক্ষতার সঙ্গে যে আত্মস্বার্থ সাধন করতে পারে, সেই-ই সুখী। সবলের স্বার্থই ন্যায় বলতে থ্র্যাসিমেকাস তাই একথাও বলতে চেয়েছেন যে, অন্যায়েই সুখ ঃ ন্যায়ের চেয়ে অন্যায় লাভজনক।

'দক্ষতার মাধ্যমে আত্মস্বার্থ সাধন' কথা দ্বারা থ্র্যাসিমেকাস সক্রেটিসের দক্ষতার তত্ত্বটি স্বীকার করেছেন। অথবা বলা চলে দক্ষতার ব্যাপারে দু'জনার ঐকমত্য আছে। অর্থাৎ সবলকে যদি তার স্বার্থসাধন করতে হয় তা হলে তাকে স্বার্থসাধনে দক্ষ হতে হবে। দক্ষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সম্যক জ্ঞানলাভ। এক্ষেত্রে সক্রেটিস এবং থ্র্যাসিমেকাসের পার্থক্য যা সে হচ্ছে এই যে, থ্র্যাসিমেকাস যেখানে জীবনের স্বার্থ বলতে ব্যক্তির প্রাপ্যের অধিক জীবনের উপাদানের অর্থাৎ তার আনন্দ, সম্পদ এবং শক্তি লাভ করাকে বোঝেন, সক্রেটিস সেখানে জীবনের স্বার্থ বলতে তার কী প্রাপ্য তার অনুধাবন এবং তার প্রাপ্যের চেয়ে অল্প বা অধিক না পাওয়া—অর্থাৎ তার যথার্থ প্রাপ্যকে পাওয়া বোঝেন।

যুক্তির শুরুতে থ্র্যাসিমেকাস বলেছিলেন, অন্যায়কারী কেবল যে অধিক লাভ করে তা-ই নয়; অন্যায়কারী একাধারে জ্ঞানী, উত্তম এবং মঙ্গলকারী অর্থাৎ 'অন্যায়কারী' কোনো নিন্দাজনক আখ্যানে আখ্যায়িত হতে পারে না। কিন্তু সক্রেটিস ধাপে ধাপে প্রশ্নের পর প্রশ্নের ভিত্তিতে

এবং প্রতি ধাপে আপন স্বীকৃতির মাধ্যমে পরিণামের যেখানে তাঁকে পৌঁছালেন সেখানে সক্রেটিস যখন প্রশ্ন করছেন ঃ "থ্র্যাসিমেকাস, তা হলে ন্যায়কে আমরা বলতে পারি জ্ঞানী এবং উত্তমের সদৃশ এবং অন্যায়কে অপকর্ষ এবং অজ্ঞানের সদৃশ। নয় কি?" সেখানে থ্র্যাসিমেকাস না বলে পারছেন না ঃ 'হ্যাঁ, এ-অনুমান ঠিক। প্রতিপক্ষকে দিয়ে প্রতিপক্ষের নিজের যুক্তি অস্বীকার করাবার সক্রেটিসীয় দক্ষতার অতুলনীয় প্রকাশ ঘটেছে সংলাপের এই অংশটিতে।

ভাল কথা। কিন্তু এদের দুটিকে তুমি কী বলে আখ্যায়িত করবে? এদের একটিকে কি তুমি ধর্ম এবং অপরটিকে অধর্ম বলে অভিহিত করবে?

অবশ্যই।

বেশ, তা হলে আমি কি বুঝব যে তুমি ন্যায়কে ধর্ম এবং অন্যায়কে অধর্ম বলে অভিহিত করছ?

বাঃ! কী মজার অনুমান! আমি অন্যায়কে লাভজনক বলেছি বলেই অন্যায় অধর্ম হয়ে গেল?

তা হলে তুমি কী বলবে?

আমি এর উলটো কথাই বলব।

তার মানে তুমি ন্যায়কে অধর্ম বলতে চাও?

না, বরঞ্চ আমি তাকে সরল মানুষের মূর্খতা বলব।

তা হলে তুমি কি অন্যায়কে দ্বেষ বলে অভিহিত করবে?

না, তাও নয়। তাকে আমি বরং বিচক্ষণতা বলব।

তার মানে, অন্যায় তোমার নিকট জ্ঞান এবং মঙ্গল বলেও বোধ হয়?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ হ্যাঁ, অন্তত যারা যথার্থরূপেই অন্যায়কারী আর যাদের ক্ষমতা রয়েছে রাষ্ট্র এবং জাতিকে বশীভূত করার, তারা জ্ঞান এবং মঙ্গলের আকর বটে। অবশ্য তুমি গাঁটকাটাদের প্রশ্নটা তুলতে পার। তবে এ-বিদ্যার সুবিধাও কিছু কম নয়—কেবল আশঙ্কা হচ্ছে ধরা পড়ার। ধরা না

পড়লে এটিও উত্তম বিদ্যা। কিন্তু গাঁটকাটাদের প্রশ্ন বড় নয়। কেননা আমি যাদের কথা বলছিলাম তাদের সঙ্গে এদের কোনো তুলনা হয় না।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, আমার মনে হয় না তোমার কথার কোনো ভুল অর্থ আমি করছি। তথাপি একথা না বলে আমি পারছিনে যে, তুমি যখন অন্যায়কে জ্ঞান এবং ধর্ম আর ন্যায়কে এর ঠিক বিপরীত বিষয় বলে অভিহিত কর তখন আমি বিস্ময়ান্বিত না হয়ে পারিনে।

কিন্তু আমার অভিমতে কোনো দ্বিধা নেই।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, তোমার এখনকার বক্তব্য পূর্বের চেয়ে অধিকতর জোরদার। বস্তুত এবার তোমার কোনো জবাব দেবার আমাদের উপায় নেই। কারণ, অন্যায়কে লাভজনক বলেও তুমি যদি আর দশনজনার মতো তাকে অধর্ম এবং অপকর্ম বলে অভিহিত করতে, তা হলে প্রচলিত নীতির ভিত্তিতে তার যাহোক একটা জবাব দেওয়া সম্ভব হত। কিন্তু এখন দেখছি তুমি অন্যায়কে যেমন শক্তি এবং সম্মানের বিষয় বলে অভিহিত করছ, তেমনি আমরা ন্যায়ের ধর্ম বলে যেসব গুণকে এ-পর্যন্ত চিহ্নিত করে এসেছি সে-সমস্ত গুণকে তুমি অন্যায়ের উপর আরোপ করে তাকে জ্ঞান ও ধর্মের আকর বলেই ঘোষণা করতে চাচ্ছ।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ সক্রেটিস, আমার সম্পর্কে তোমার এ-অনুমান যথার্থই অভ্রান্ত।

আমি বললাম ঃ তা হলে থ্র্যাসিমেকাস আমাদেরও উচিত নয় এই যুক্তির পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটি বার করে আনার চেষ্টা থেকে পিছু হটে আসা। তুমি যতক্ষণ তোমার বিশ্বাস অনুযায়ী কথা বলবে ততক্ষণ আমরাও তোমার সঙ্গে আলোচনা করা অসঙ্গত বোধ করব না। আমার নিজের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে তুমি নিষ্ঠাসহকারেই কথা বলছ, আমাদের মূর্খতার মাশুলে নিজেকে কেবল আমোদিত করে তুলছ না।

আমি নিষ্ঠ অ-নিষ্ঠ, সেটি তো বড় কথা নয় সক্রেটিস; বড় কথা হচ্ছে আমার যুক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করা। নয় কি?

আমি বললাম ঃ একথা খুবই সত্য। আমাকে অবশ্যই তাই করতে হবে। কিন্তু তার পূর্বে তুমি দয়া করে আর একটি প্রশ্নের জবাব দাও ঃ বলো, কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি কি অপর কোনো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রতিকূলে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা করে?

না, তা তো নয়ই, বরঞ্চ উল্টো। বস্তুত সে যদি তেমন সুযোগলাভের চেষ্টা করত তা হলে তার অবস্থাটি অমন করুণ হয়ে দাঁড়াত না।

বেশ, কিন্তু যে-কাজ ন্যায়, তাকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টাও কি সে কখনো করে?

না, তাও সে করে না।

কিন্তু ধরো অন্যায়কারীর প্রতিকূলে কোনো সুযোগলাভের কথা। এক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির ব্যবহার কীরূপ? সে কি অন্যায়কারীর প্রতিকূলে কোনো সুযোগলাভের প্রয়াসকে ন্যায় বলে বিবেচনা করে, না তাকে অন্যায় বলে মনে করে?

অন্যায়ের প্রতিকূলে সুবিধালাভের চেষ্টাকে সে ন্যায় বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু তা হলেও এরূপ চেষ্টায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে সে কোনো সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে না।

আমি বললাম ঃ সেরূপ চেষ্টায় সে কৃতকার্য হবে কি হবে না সেটি প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, একজন ন্যায়বান অপর একজন ন্যায়বানের বিরুদ্ধে অধিকতর কোনো সুযোগলাভে অস্বীকার করেও অন্যায়ের প্রতিকূলে কোনো সুযোগলাভের চেষ্টা সে করবে কি না?

হ্যাঁ, সেরূপ চেষ্টা ন্যায়বান অবশ্যই করবে।

কিন্তু অন্যায়কারী নিজে কী করবে? সে-ও কি ন্যায়ের চেয়ে অধিকতর সুযোগলাভের চেষ্টা করবে?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ নিশ্চয়ই, কেননা অন্যায়ের দাবি সবকিছুকেই অতিক্রম করে যায়।

তা হলে অপর সবার চেয়ে অধিক সুযোগলাভের জন্য এক অন্যায়কারী অপর অন্যায়কারীর বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করবে। নয় কি?

এ কথা যথার্থ।

আমি বললাম ঃ তা হলে ব্যাপারটাকে আমরা এভাবে প্রকাশ করতে পারি ঃ ন্যায় যেখানে কেবল অন্যায়ের প্রতিকূলে অধিকতর সুযোগলাভের চেষ্টা করে, তার সমচরিত্র অর্থাৎ ন্যায়ের প্রতিকূলে নয়, সেখানে অন্যায় তার সম, অসম উভয় চরিত্রের প্রতিকূলেই নিজের জন্য অধিকতর সুযোগলাভের চেষ্টা করে।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ এরচেয়ে উত্তম প্রকাশ আর কিছু হতে পারে না। এবং অন্যায় যেখানে জ্ঞান এবং মঙ্গল উভয়ই, ন্যায় সেখানে না জ্ঞান, না মঙ্গল। সে কোনোটিই নয়।

তোমার এ কথাটিও উত্তম।

তা হলে জ্ঞান এবং মঙ্গলের সঙ্গেই অন্যায়ের চারিত্রিক সাদৃশ্য আর ন্যায়ের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য। ঠিক নয় কি?

এ কথাও যথার্থ। কেননা সদৃশ চরিত্রের মধ্যেই সাদৃশ্য থাকবে, বিসদৃশের মধ্যে নয়।

আর সদৃশের ক্ষেত্রে একটি সদৃশ অপরটির হুবহু অনুরূপ।

হ্যাঁ, অবশ্যই একটি অপরটির অনুরূপ।

আমি বললাম, খুবই উত্তম থ্র্যাসিমেকাস। এবার তা হলে শিল্পের ক্ষেত্রে আসা যাক। এ কথা নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে যে, এক ব্যক্তি সঙ্গীতজ্ঞ হতে পারে, অপর এক ব্যক্তি সঙ্গীতজ্ঞ নাও হতে পারে।

হ্যাঁ, আমি স্বীকার করি।

কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতে অজ্ঞ—এদের মধ্যে কাকে তুমি জ্ঞানী এবং কাকেই বা তুমি মূর্খ বলে অভিহিত করবে?

স্পষ্টতই যে সঙ্গীতজ্ঞ সেই জ্ঞানী, আর যে সঙ্গীতে অজ্ঞ সে মূর্খ।

তা হলে যে জ্ঞানী সে তার জ্ঞানের কারণে উত্তমও বটে; আবার যে মূর্খ সে তার মূর্খতার কারণে অধম।

তা বটে।

একজন চিকিৎসক সম্পর্কে তুমি নিশ্চয়ই একই অভিমত পোষণ করবে?

হ্যাঁ। আমার মত অনুরূপই হবে।

বেশ, কিন্তু বন্ধু থ্র্যাসিমেকাস, দু'জন সঙ্গীতজ্ঞ সম্পর্কে তুমি কী বলবে? ধর দু'জন বীণাবাদকই তাদের বীণার তারগুলিকে সুর যোজনের জন্য কঠিন কিংবা নম্র করে সঙ্গত সৃষ্টির চেষ্টা করছে। এমন ক্ষেত্রে এদের একজন কি তার তারগুলিকে কঠিন কিংবা নম্র করার ব্যাপারে অপরজনকে অতিক্রম করে যেতে চাইবে?

না, আমি সেরূপ মনে করিনে।

কিন্তু যে সঙ্গীতজ্ঞ, সে নিশ্চয়ই সঙ্গীতে অজ্ঞকে অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে চাইবে। নয় কি?

এতে আর সন্দেহ কী?

বেশ, এবার একজন চিকিৎসকের কথা ধরা যাক। রুগিকে সে মাংস এবং পানীয়ের বিধান দিচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে সে কি অপর একজন চিকিৎসক কিংবা চিকিৎসাশাস্ত্রকে অতিক্রম করে যেতে চাইবে?

না, তা সে চাইবে না।

কিন্তু অ-চিকিৎসককে সে নিশ্চয়ই অতিক্রম করে যেতে চাইবে?

হ্যাঁ, তা সে চাইবে।

এবার তা হলে সাধারণভাবে জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার ক্ষেত্রে আসা যাক। তুমি চিন্তা করে দ্যাখো, এ ক্ষেত্রে যে জ্ঞানী সে কী করে? সে কি অপর এক জ্ঞানীর চেয়ে জ্ঞানের ব্যাপারে অধিকতর কিছু বলার কিংবা করার ইচ্ছাপ্রকাশ করে? না, তার সদৃশ জ্ঞানী যা বলে কিংবা করে সে ততটুকুই বলতে কিংবা করতে চায়?

সদৃশ যেমন করবে, সেও ঠিক তেমনি করবে, এতে আর সন্দেহ কী?

কিন্তু অজ্ঞানীর বেলা ব্যাপারটি কিরূপ হবে? অজ্ঞানী কিংবা জ্ঞানী উভয়ের চেয়েই অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষা কি সে পোষণ করবে না?

হ্যাঁ, তা-ই সে করবে, একথা আমি জোরের সঙ্গেই বলছি।

কিন্তু যে জ্ঞানী সে বিজ্ঞ তো বটে।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আর জ্ঞানী উত্তমও বটে।

তাও সত্য।

তা হলে জ্ঞানী আর উত্তম কখনো তার সদৃশের চেয়ে অধিক লাভের ইচ্ছা পোষণ করবে না। বিসদৃশ বা বিপরীতের প্রতিকূলেই সে অধিক লাভের চেষ্টা করবে। নয় কি?

আমার তা-ই মনে হয়।

কিন্তু যে অজ্ঞ এবং অধম সে জ্ঞানী-অজ্ঞানী উভয়ের চেয়েই অধিক লাভে সচেষ্ট হবে। নয় কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু থ্র্যাসিমেকাস, তোমার কথা ছিল যে, একমাত্র অন্যায়ই তার অনুরূপ কিংবা বিরূপ উভয়ের প্রতিকূলে অধিক সুযোগলাভের চেষ্টা করে। একথাই তো তুমি বলেছিলে, নয় কি?

হ্যাঁ, আমার কথা এরূপই ছিল।

তা ছাড়া, তুমি একথাও বলেছিলে যে, ন্যায় অনুরূপের বিরুদ্ধে নয়, কেবলমাত্র বিরূপের বিরুদ্ধেই গমন করে।

হ্যাঁ, সে কথাও সত্য।

তা হলে ন্যায়কে আমরা বলতে পারি জ্ঞানী এবং উত্তমের সদৃশ আর অন্যায়কে অপকর্ষ এবং অজ্ঞানের সদৃশ, নয় কি?

হ্যাঁ, এ অনুমান ঠিক।

আর এদের প্রত্যেকে তার সদৃশের অনুরূপ?

এতো আমাদের স্বীকৃত কথা!

তা হলে এবার ন্যায় জ্ঞান এবং উত্তম, আর অন্যায় অজ্ঞান এবং অধম বলে প্রতিপন্ন হল।

থ্র্যাসিমেকাস এই স্বীকৃতিগুলোকে যে আমার জিজ্ঞাসার সঙ্গে সঙ্গে খুব আগ্রহের সঙ্গে করছিলেন এমন নয়। বস্তুত বিশেষ অনিচ্ছাসহকারেই কথাগুলো তাঁকে মেনে নিতে হচ্ছিল। সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল; দিনটা ছিল ভয়ানক গরম; থ্র্যাসিমেকাসের শরীর বেয়ে তখন ঘামের স্রোতধারা নেমে আসছিল। এবার আমি তাঁর মুখপানে চাইতেই পূর্বে কোনোদিন যা দেখিনি তা-ই দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম থ্র্যাসিমেকাসের গণ্ডদেশ লজ্জারক্ত হয়ে উঠেছে। যাহোক এ-ব্যাপারে আমরা যখন একমত হলাম যে, ন্যায় হচ্ছে জ্ঞান ও ধর্ম, আর অন্যায় হচ্ছে অজ্ঞান এবং অধর্ম তখন আমি অপর একটি বিষয়ের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলাম।

আমি বললাম, থ্র্যাসিমেকাস, এ-বিষয়টার তো একটা মীমাংসা হল। কিন্তু অপর একটি বিষয়েও তো আলোচনা প্রয়োজন। তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, অন্যায়কে আমরা শক্তির আকর বলেও উল্লেখ করেছিলাম, নয় কি?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে। কিন্তু তাই বলে সক্রেটিস তুমি এরূপ মনে কোরো না যে এ-ব্যাপারে তোমার বক্তব্যকে আমি সমর্থন করছি, কিংবা আমার নিজের কোনো জবাব নেই। আমি জানি, আমি জবাব দিলে তুমি

অভিযোগ করে বলবে আমি বক্তৃতাবাজি করছি। আমি তাই বলছি, হয় তুমি আমাকে আমার বক্তব্য পেশ করতে দাও, নাহয় তুমি যদি প্রশ্ন করতে চাও, প্রশ্ন করো। গল্পবুড়ির শ্রোতাদের ন্যায় আমিও তখন তোমার প্রশ্নের উত্তরে 'উত্তম' 'বেশ' 'আচ্ছা' 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে আমার মাথা ঝাঁকাব।

আমি বললাম, না, তা কেন থ্র্যাসিমেকাস? তোমার সত্যকার মতের বিরুদ্ধে হলে তুমি নিশ্চয় আমার কথায় সায় দেবে না।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, আমি তা-ই করব। তুমি যখন আমার বক্তব্যকে পেশ করতে দেবে না, তখন তুমি আমার নিকট থেকে এ ছাড়া আর কী আশা করতে পার?

আমি বললাম ঃ না, আশা আর কী করব? বেশ, তুমি যদি এরূপই স্থির করে থাক, তা হলে আমি তোমাকে অবশ্যই প্রশ্ন করব?

বেশ, করো।

আমি তা হলে আমার পুরোনো প্রশ্নকেই আবার জিজ্ঞেস করে নিতে চাই। ন্যায় অন্যায়ের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিক আলোচনায় এ-পুনরুক্তিটি আমাদের সাহায্য করবে। পূর্বে এরূপ অভিমত আমরা প্রকাশ করেছিলাম যে, ন্যায়ের চেয়ে অন্যায়ই অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু এখন ন্যায়কে জ্ঞান এবং ধর্ম বলে অভিহিত করার অর্থ হচ্ছে এ কথা বলা যে, ন্যায়ই অন্যায়ের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী; কারণ অন্যায় হচ্ছে অজ্ঞানতা। এ অভিমতকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু থ্র্যাসিমেকাস, আমি ব্যাপারটিকে একটু ভিন্ন ভাবে দেখতে চাই। রাষ্ট্রের ব্যাপারে একথা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না যে, একটা রাষ্ট্র অন্যায়াচারী হতে পারে। অন্যায়াচারী রাষ্ট্র অন্যায়ভাবে অপর রাষ্ট্রসমূহকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধার চেষ্টা করতে পারে। এমনকি এই চেষ্টায় কৃতকার্য হয়ে সে অপর রাষ্ট্রসমূহকে আপন দাসে পরিণত করেও ফেলতে পারে। নয় কি?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ যথার্থ। সক্রেটিস, তোমার কথার সঙ্গে বরঞ্চ আমি যোগ করে এও বলব যে সর্বোত্তম অন্যায়াচারী রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ আচরণ সবচেয়ে স্বাভাবিকই হবে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে তোমার মত আমি জানি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে শক্তিশালী রাষ্ট্রে এরূপ ক্ষমতার অস্তিত্ব কিংবা এর প্রয়োগ কি অন্যায় ব্যতিরেকে সম্ভব? অথবা আমরা বলব যে, শক্তিকে কেবলমাত্র ন্যায়ের সাহায্যেই ব্যবহার করা সম্ভব?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ ন্যায়ই জ্ঞান আর ধর্ম, তোমার এই অভিমত যদি সত্য হয় তা হলে ন্যায়ের মাধ্যমেই মাত্র শক্তির ব্যবহার সম্ভব। কিন্তু আমার কথা যদি সত্য হয় তা হলে ন্যায় ব্যতিরেকেই শক্তির প্রয়োগ সম্ভব।

আমি বললাম ঃ থ্র্যাসিমেকাস, তুমি যে কেবল 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে মাথা নাড়ছ না, বরঞ্চ আমার প্রশ্নের দস্তুরমতো সুন্দর জবাব দিচ্ছ তা দেখে আমি যথার্থই আনন্দিত হচ্ছি।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ কী আর করা! তোমার সঙ্গে তো আর অভদ্রতা করতে পারিনে।

তোমার অসীম দয়া থ্র্যাসিমেকাস। তুমি তা হলে দয়া করে আমায় বলো, তুমি কি মনে কর একটা রাষ্ট্র, একটা সৈন্যবাহিনী, একদল দস্যু কিংবা চোর কিংবা অপর যে-কোনো অন্যায়কারীর দল যদি পরস্পরকে আক্রমণ এবং আঘাত করে তা হলে কি তারা তাদের কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর করতে পারে?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ না, এমন হলে তাদের পক্ষে কোনোকিছু করাই সম্ভব নয়।

কিন্তু পরস্পর আঘাত না করে যদি তারা পরস্পর মিলিত হয় তা হলেই তারা সংঘবদ্ধভাবে কোনো কার্যকে সম্পাদন করতে পারে। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কিন্তু এদের পারস্পরিক এই আক্রমণ ও আঘাত কেন? সে তো এইজন্য যে অন্যায় বিরোধের সৃষ্টি করে, ঘৃণার উদ্রেক করে এবং আক্রমণের প্রেরণা যোগায়। অপরদিকে ন্যায় সৌহার্দ্য এবং সখ্যেরই সৃষ্টি করে। একথা কি যথার্থ নয়, থ্র্যাসিমেকাস?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়ায় লিপ্ত হতে চাইনে। তাই বলছি, তোমার এ কথাকে আমি মেনে নিলাম।

তোমার দয়ার শেষ নেই, থ্র্যাসিমেকাস! কিন্তু আমি জানতে চাই, অন্যায়ের স্বভাব যদি এই হয়, তা হলে দাস কিংবা নাগরিক যাদের মধ্যেই তার অবস্থান ঘটুক-না কেন সে তাদের মধ্যে ঘৃণা এবং বিরোধের সৃষ্টি করে তাদের যে-কোনো প্রকার মিলিত কার্যক্রমকেই কি অসম্ভব করে তুলবে না?

অবশ্য সে তা-ই করবে।

এমনকি যদি কেবলমাত্র দুজন মানুষের মধ্যেও অন্যায়ের অবস্থান ঘটে তা হলে সেখানেও কি এরা উভয় উভয়ের শত্রুতে পরিণত হয়ে নিজেদের মধ্যে এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না?

হ্যাঁ, তারা অবশ্যই সংঘর্ষে লিপ্ত হবে।

এবার মনে কর, দুজন নয়। অন্যায়ের অবস্থান একটিমাত্র ব্যক্তির মধ্যে ঘটেছে। তা হলেও অন্যায়ের অবস্থিতিতে তোমার জ্ঞানের কী অবস্থা ঘটবে? জ্ঞান কি তখন নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে, না সে অন্যায়ের কারণে বিনষ্ট হয়ে যাবে?

থ্র্যাসিমেকাস এবার বললেন, মনে করা যাক অন্যায় সত্ত্বেও জ্ঞান তার নিজের ক্ষমতাকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

কিন্তু অন্যায়ের ক্ষমতা কি এরূপ নয় যে নগর, সেনাবাহিনী, একটি পরিবার কিংবা অপর যে-কোনোকিছুতেই তার অবস্থান ঘটুক-না কেন সবকিছুতেই সে বিরোধ, বিদ্রোহ কিংবা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তার ঐক্যবদ্ধ কর্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়? বস্তুত অন্যায় যাকে আশ্রয় করে তার আপন সত্তাকেই সে নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে, নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই অন্যায়ের ক্ষমতা এরূপ।

আর তা ছাড়া, থ্র্যাসিমেকাস, একক ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অন্যায় কি অনুরূপভাবেই মারাত্মক নয়? কারণ, প্রথমত অন্যায় ব্যক্তির সত্তার মধ্যে বিরোধ ঘটিয়ে কর্মক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অক্ষম করে ফেলে; দ্বিতীয়ত, অন্যায় ব্যক্তির জন্য মারাত্মক। কেননা, সে তার স্বভাবের বিরুদ্ধে এবং ন্যায়ের বিরুদ্ধে তাকে নিয়োজিত করতে সক্ষম হয়। আমার এ কথা কি সত্য নয়, থ্র্যাসিমেকাস?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য, সক্রেটিস।

কিন্তু বন্ধুবর, দেবতাদের তুমি কী বলবে? দেবতারা নিশ্চয়ই ন্যায়বান।

ধরা যাক, তাঁরা ন্যায়বান।

তা-ই যদি হয়, তা হলে অন্যায় অবশ্যই দেবতাগণের শত্রু হবে, এবং ন্যায় তাঁদের মিত্র। কি বল থ্র্যাসিমেকাস?

থ্র্যাসিমেকাস রাগতভাবে বললেন ঃ যেমন ইচ্ছা তুমি বলে যাও। তোমার যুক্তির চরম তুমি দেখিয়ে দাও, সক্রেটিস। আমি তোমার কথার প্রতিবাদ করে আমাদের সঙ্গীদের বিরাগভাজন হতে চাইনে।

আমি বললাম ঃ বেশ, তা হলে তুমিও তোমার জবাবদানে দ্বিধা কোরো না। এই ভুরিভোজের বাকিটাও আমাকে তৃপ্তি সহকারেই গ্রহণ করতে দাও। থ্র্যাসিমেকাস, একথা তুমি অস্বীকার করতে পার না যে, ন্যায়ের শক্তিকে আমরা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছি। বস্তুত আমরা প্রমাণ করেছি যে, ন্যায়

নিঃসন্দেহে অন্যায়ের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাবান, জ্ঞানী এবং উত্তম। অপরদিকে অন্যায়াচারীগণ কখনো মিলিত কার্যক্রম গ্রহণ করতেই সক্ষম নয়। শুধু তা-ই নয়, অন্যায়াচারীগণ যদি যথার্থভাবে অন্যায়াচারী হয় তা হলে তাদের পক্ষে আদৌ সংঘবদ্ধ হওয়াই সম্ভব নয়। কেননা স্বভাবগতভাবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বিরোধে লিপ্ত হতে বাধ্য। তবু যে অন্যায়কারী ক্ষমতা দেখা যায় তার কারণ এই অন্যায়কারীগণ যথার্থরূপে অন্যায়াচারী নয়; তাদের সত্তার মধ্যে ন্যায়ের কিছু অবশিষ্ট রয়েছে বলেই তাদের পক্ষে সংঘবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয়েছে। তাদের চরিত্রে ন্যায় কিছু অবশিষ্ট না থাকলে তারা অবশ্যই কোনো মিলিত কার্যাক্রমের বদলে একে অপরকে আক্রমণ করে আহত করে ফেলত। কাজেকাজেই অন্যায়কারী কিংবা অসৎ, চরিত্রগতভাবে অসম্পূর্ণ অসৎ। কেননা পরিপূর্ণরূপে অসৎ হলে অসৎ-এর পক্ষে কোনোপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব হত। থ্র্যাসিমেকাস, এ-ব্যাপারে মনে হয় আমিই যথার্থ, তুমি যা বলেছ, তা ঠিক নয়। তবে ন্যায়বানের জীবন অন্যায়কারীর চেয়ে অধিকতর উত্তম এবং সুখী কি না, সে-প্রশ্নের মীমাংসাও প্রয়োজন। আমি অবশ্য মনে করি যে ন্যায়ের জীবন অন্যায়ের চেয়ে উত্তম এবং সুখী। তার কারণও আমি বলেছি। তবু বিষয়টি নিয়ে অধিকতর আলোচনাই বাঞ্ছনীয়। কেননা কোনো হালকা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিনে—আমরা আলোচনা করছি মানবজীবনের গুরুতর নিয়মনীতির বিষয় নিয়েই।

বেশ, তুমি আলোচনা করো।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেই আলোচনা করব। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি কি মনে কর না যে, একটি অশ্বেরও কিছু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে?

আমার তাই মনে করা উচিত।

আবার একটি অশ্ব কিংবা অপর কিছুর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকার অর্থ হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য সে ছাড়া অপর কারুর পক্ষে সে-উদ্দেশ্যের সার্থক সাধন আদৌ সম্ভব নয়।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, আমি তোমার কথা বুঝতে পারলাম না, সক্রেটিস।

আমি ব্যাখ্যা করে বলছি। তোমার চোখ বাদে কি তুমি দেখতে পার?

না, তা অবশ্যই পারিনে।

অথবা কান বাদে কি তুমি শুনতে পাও?

না।

কিন্তু এই দেখা এবং শোনাটা কাদের লক্ষ্য? সে অবশ্যই চোখ এবং কান—এই ইন্দ্রিয় দুটিরই।

তা হতে পারে।

আবার দ্যাখো, একটি আঙুরশাখাকে তুমি একখানি ছোরা কিংবা একখানি বাটালি দ্বারা সহজেই কেটে ফেলতে পার। নয় কি?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এ কাজ বাটালি কিংবা বড় রকমের ছুরি দ্বারা সহজেই করা যায়।

কিন্তু তাই বলে কাজটি গাছ ছাঁটাইয়ের কাঁচি দ্বারা যেরূপ উত্তমভাবে করা যায় সেরূপ উত্তমভাবে বাটালি দ্বারা নিশ্চয়ই করা সম্ভব নয়। নয় কি?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য।

তার কারণ, লতাপাতা ছাঁটাই করাকে আমরা কাঁচির লক্ষ্য বলে মনে করতে পারি। যথার্থ নয় কি?

হ্যাঁ, সেরূপ আমরা মনে করতে পারি।

তা হলে, থ্র্যাসিমেকাস, এবার আশা করি তুমি বুঝতে পারবে কেন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, কোনোকিছুর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য বলতে আমরা তাকেই বোঝাই কি না, যার কার্য তার মতো উত্তমরূপে অপর কারু দ্বারা সাধন করা সম্ভব নয়?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ হ্যাঁ সক্রেটিস, তোমার প্রশ্নটির তাৎপর্য এবার আমি বুঝতে পেরেছি এবং তোমার কথার সঙ্গে আমি একমত হচ্ছি।

আবার, যে-বস্তুর লক্ষ্য আছে তার নিশ্চয়ই উৎকর্ষও আছে। যেমন চোখের একটি লক্ষ্য আছে। চোখের যে লক্ষ্য আছে এটি নিশ্চয়ই আবার প্রশ্নের বিষয় হয়ে উঠবে না, থ্র্যাসিমেকাস?

না। কেননা চোখের যে লক্ষ্য আছে, সেটি আমি স্বীকার করি।

বেশ। কিন্তু চোখ কি কিছু উৎকৃষ্টতারও অধিকারী নয়?

হ্যাঁ, তার উৎকৃষ্টতাও রয়েছে।

ঠিক তেমনি কানের যেমন আছে লক্ষ্য, তেমনি আছে উৎকৃষ্টতা, নয় কি?

যথার্থ।

অপরাপর যে-কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে এ কথাটি সত্য। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকেরই যেমন আছে একটি লক্ষ্য তেমনি আছে আপন-আপন উৎকৃষ্টতা।

একথা সত্য।

বেশ। কিন্তু চোখের যদি কোনো বিকার থাকে তা হলে সে কি তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে সাধন করতে পারে?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ না, তা কী করে সম্ভব! চোখ যদি অন্ধ হয় তা হলে দেখার লক্ষ্য সে সাধন করবে কী করে?

থ্র্যাসিমেকাস, তুমি বলছ যে চোখের যা বিশেষ উৎকৃষ্টতা অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, সেটি হারালে চোখ তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হবে। কিন্তু এখনও আমি এতদূর এসে পৌঁছিনি। আমি বরঞ্চ আমার প্রশ্নটিকে একটু সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করতে চাই। আমার বর্তমান প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এ কথা কি যথার্থ নয় যে, কোনো বস্তু যখন তার উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হয় তখন সে তার উৎকৃষ্টতার কারণেই সক্ষম হয়; আর যদি সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয় তা হলে তার বিকারের কারণেই সে ব্যর্থ হয়। নয় কি?

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

কানের ব্যাপারেও আমরা একই কথা বলতে পারি। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যখন তার শ্রবণশক্তি হারায় তখন সে আপন লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থ হয়। নয় কি?

হ্যাঁ, এ কথা সত্য।

এ কথা অপরাপর বস্তু সম্পর্কেও সত্য। কী বল, থ্র্যাসিমেকাস?

আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

বেশ! তা হলে এবার আত্মার বিষয়টি বিবেচনা করো। আত্মার ব্যাপারেও কথাটি কি সত্য নয় যে, আত্মারও একটি লক্ষ্য আছে আর সে লক্ষ্য আত্মা ব্যতীত অপর কেউ সাধন করতে পারে না? উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, আত্মার লক্ষ্য হচ্ছে তত্ত্বাবধান এবং অভিনিবিষ্টতার লক্ষ্য। এ-লক্ষ্য কি একান্তভাবে আত্মার নয়? অপর কারুর উপর কি তুমি এ-লক্ষ্যসাধনের দায়িত্বকে অর্পণ করতে পার?

না, অপর কারুর উপর এরূপ দায়িত্ব অর্পণ করা সম্ভব নয়।

বেশ! কিন্তু জীবন সম্পর্কে তুমি কী বলবে? জীবনও কি আত্মার একটি লক্ষ্য বলে পরিগণিত নয়?

হ্যাঁ, অবশ্যই জীবন আত্মার একটি লক্ষ্য।

কিন্তু আত্মা নিজেও কি উৎকৃষ্টতার অধিকারী নয়?

হ্যাঁ, আত্মারও উৎকৃষ্টতা রয়েছে।

বেশ! কিন্তু এই উৎকৃষ্টতা ব্যাতিরেকে আত্মা কি তার আপন লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম?

না, উৎকৃষ্টতা ব্যতীত আত্মার পক্ষে তার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়।

তা হলে অসৎ আত্মা অবশ্যই শাসক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অসৎ এবং সৎ আত্মা শাসক এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সৎ। নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা সেরূপ।

আর একথাও আমরা স্বীকার করেছি যে, ধর্ম বা ন্যায় হচ্ছে আত্মার একটি মহৎ গুণ-বিশেষ আর অন্যায় বা অধর্ম হচ্ছে আত্মার একটি বিকারবিশেষ।

হ্যাঁ, একথাকে স্বীকার করা হয়েছে।

শুধু তা-ই নয়। একথাও বলা হয়েছে যে, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি একটি মহৎ জীবন-যাপন করে; অপরদিকে অন্যায়কারী একটি নিকৃষ্ট জীবনই যাপন করে।

সক্রেটিস, তোমার যুক্তি তা-ই প্রমাণ করে বটে।

সেদিক থেকে মহৎ জীবন যে যাপন করে সে অবশ্যই পবিত্র এবং সুখী; আর যে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করে সে অভিশপ্ত এবং অসুখী। নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

তা হলে যে ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক সে সুখী; আর যে অন্যায়কারী সে অভিশপ্ত?

তা-ই বটে।

তা হলে সুখই সৌভাগ্যের আকর, দুঃখ নয়?

এতে আর সন্দেহ কি?

তা হলে, প্রিয় বন্ধু থ্র্যাসিমেকাস, ধর্মের চেয়ে অধর্ম কখনোই অধিক লাভজনক বলে বিবেচিত হতে পারে না।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন, সক্রেটিস, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কথাটাকে আমি স্বীকার করেই নিলাম।

আমি বললাম ঃ প্রিয় থ্র্যাসিমেকাস, এতক্ষণে তুমি যেন খানিকটা নরম হয়ে এসেছ! সে যাহোক, তিরস্কারের পরিবর্তে তুমি যে আমার তুষ্টিবিধানের নীতি গ্রহণ করেছ সে জন্য তোমার নিকট আমি অবশ্যই ঋণী। তা হলেও ব্যাপারটাতে আমি যে খুব তুষ্ট হতে পেরেছি এমন মনে হচ্ছে না। কিন্তু সেজন্য আর আমি

তোমাকে দায়ী করছিনে। এজন্য দায়ী আমি নিজেই। কারণ, ভোজের আসরে বসে অধৈর্য লোভী যেমন স্বাদ অনুভবের বিরাম বাদেই একটার পর একটা ভোজ্যবস্তুকে গলাধঃকরণ করে চলে আমিও তেমনি আমার অন্বিষ্টের অপেক্ষা না করে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে পরিক্রম করেছি। ন্যায় বা ধর্মের প্রকৃতি স্থির করাই ছিল আমার লক্ষ্য। কিন্তু সে-লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করে আমি জানতে চাইলাম ন্যায় জ্ঞান এবং উত্তম কিংবা অ-জ্ঞান এবং অধম? এখান থেকে যখন প্রশ্ন উঠল লাভ এবং লোকসানের ক্ষেত্রে কে বেশি ভাগ্যবান, ন্যায় কিংবা অন্যায়, তখন সে-আলোচনার লোভকেও আমি সংযত করতে পারলাম না। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, স্থিরভাবে আমি কিছুই এখন জানিনে। কারণ, আমি জানিনে, ন্যায় কিংবা ধর্ম কী? আর এই মূল কথাই যদি না জানি তা হলে আমি কেমন করে জানব, ন্যায় সৎ কিংবা অসৎ; কী করে আমি বুঝব যে ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক, সে সুখী কিংবা অ-সুখী?

দ্বিতীয় পুস্তক

অধ্যায় ঃ ৫

[৩৫৭–৩৬৭]

ন্যায়ের সংজ্ঞা এখনও স্থির হয়নি

কিন্তু ন্যায় কিংবা ধর্ম যথার্থভাবে কী, তার সংজ্ঞা এখনও স্থির হয়নি। এ-পর্যন্ত যে-আলোচনা হয়েছে, তাকে কেবল ভূমিকা বলা চলে। সমস্যাটির গভীরতার ইঙ্গিতমাত্র। যে-ব্যাপক অনুসন্ধান এজন্য চালাতে হবে, তার আভাস। থ্র্যাসিমেকাসের তত্ত্বকে কেবল প্রতিযুক্তি দিয়ে আপাতভাবে অসার প্রতিপন্ন করা কঠিন নয়। কিন্তু প্লেটো জানেন যে, সে-তত্ত্বের মূল সমাজের মধ্যে। কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্রের বিশ্লেষণ বাদে—অর্থাৎ জ্ঞানের সামগ্রিক পটভূমির ভিত্তিতে তত্ত্বের বিচার না করলে এ তত্ত্বকে মূলগতভাবে খণ্ডন করা যাবে না। সক্রেটিস বুঝতে পারছেন, পরিহাসময় যুক্তি এবং প্রতিযুক্তির লড়াই-এর চেয়ে গুরুতরভাবে চিন্তা এবং বিশ্লেষণের সময় এসেছে।

আলোচনার এই অবস্থারই প্রকাশ ঘটেছে সক্রেটিসের তরুণ শিষ্য গ্লকন এবং এ্যাডিম্যান্টাসের প্রস্তাবনায়। গ্লকন বা এ্যাডিম্যান্টাস থ্র্যাসিমেকাসের মতো উগ্র কিংবা প্রচলিতের বিরোধী নন। তাঁরা দুজনেই বিশ্বাস করেন, ন্যায় অন্যায় এবং অধর্মের চেয়ে উত্তম। ন্যায় শুধু সামাজিক একটা রীতিমাত্র নয়। ন্যায় শক্তিমান কিংবা সমাজের উপর অপর কারোর চাপিয়ে দেওয়া প্রথা; একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু থ্র্যাসিমেকাসকে যুক্তির ধারে খণ্ডিত করাতেই তো ন্যায়ের সেই যথার্থ সত্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। কিংবা কেবল নেতিবাচকভাবে তাকে অনুধাবন করা চলে না। তাই সক্রেটিসের কাছে গ্লকনের প্রশ্ন ঃ "সক্রেটিস, ন্যায়, অন্যায়ের চেয়ে সর্বদাই উত্তম, একথা কি তুমি যথার্থই আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাও, না কেবলমাত্র বোঝাবার ভান করতে চাও?' সক্রেটিসের নিকট তাঁদের দাবি, ন্যায় যে কেবল জাগতিকভাবে অন্যায়ের চেয়ে ব্যক্তির জন্য লাভজনক, সুতরাং সে উত্তম—একথা বলা যথেষ্ট নয়। সক্রেটিসকে প্রমাণ করতে হবে, ন্যায় ব্যক্তির লাভ-লোকসান ব্যতিরেকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি,

অস্বীকৃতি, দণ্ড বা দান ব্যতীতই আপন সত্তায় সর্বোত্তম। সক্রেটিস স্বীকার করেন, এরূপ গুরুতর দাবিকে আর পরিহাস দিয়ে স্তব্ধ করা যায় না। এবার তাঁকে যথার্থই সত্যের অনুসন্ধানে যাত্রা করতে হবে। তাই এখন প্রয়োজন কেবল সমালোচনা এবং ধ্বংসের নয়। প্রয়োজন সমস্যার বিশ্লেষণের এবং গঠনের।

ন্যায় মানুষের তৈরি, সমাজের সৃষ্টি এই 'অভিনব' তত্ত্বের আক্রমণের রেশ এখনও কাটেনি। গ্লকন তারই জের হিসাবে সামাজিক চুক্তি বা সামাজিক সৃষ্টির এই তত্ত্বটি, আলোচনার শুরুতে আবার তুলে ধরলেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে সকল সামাজিক আচার-আচরণ নীতিবোধ যা ব্যক্তির উপর রাষ্ট্র বা সমাজ আরোপ করে তার মূলে যেমন মানুষের বুদ্ধি ক্রিয়া করে, তেমনি মানুষের ইচ্ছার ভিত্তিতে তা অনুসৃত বা পালিত হয়। কাজেই এদের উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ—উভয়েই মানুষের হাতে। মানুষ-নিরপেক্ষভাবে এই ন্যায়নীতির কোনো অবিচল অস্তিত্ব নেই। আর সাধারণ বিধানের ন্যায় মানুষই একে প্রণয়ন করে এবং প্রয়োজনবোধে একে মানুষই পরিবর্তন করে। এই সমস্ত রীতিনীতি আচরণের প্রবর্তন এবং প্রয়োজন এই কারণে যে, এদের একেবারে লোপ করে দিলে মানুষ তার প্রবৃত্তিতে এত উদ্দাম হয়ে উঠবে যে, থ্র্যাসিমেকাসের কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াবে ঃ মানুষের যার যেমন শক্তি সে তেমনি অন্যায় করার চেষ্টা করবে। গ্লকনের এরূপ উপস্থাপনার মধ্যে সমাজ এবং রাষ্ট্রগঠনে অর্থাৎ তার ন্যায়, নিয়ম, নীতির গঠনে সামাজিক চুক্তিমূলক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এ্যাডিম্যান্টাস গ্লকনের সঙ্গে যোগ দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়কে যে মানুষ কেবল লাভের উপায় বলে বিবেচনা করে তার উল্লেখ করেন। গ্লকন এবং এ্যাডিম্যান্টাস—উভয়ের দাবি হচ্ছে, সক্রেটিসকে প্রমাণ করতে হবে যে, এই সামাজিক সৃষ্টি, অনুশাসন, লাভ-লোকসান,গোচর,অগোচর নিরপেক্ষভাবেই ন্যায় অস্তিত্বময় এবং উত্তম। গ্লকনের পরে এ্যাডিম্যান্টাস তাঁর সুদীর্ঘ প্রস্তাবনাশেষে বললেন ঃ "আর সে-কারণেই আমার দাবি হচ্ছে, সক্রেটিস, তোমাকে শুধু একথা বললেই হবে না যে ন্যায় অন্যায়ের চেয়ে শ্রেয়। তোমাকে প্রমাণ করতে হবে, মানুষ কিংবা দেবতার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন্ পরিফলের কারণে ন্যায় পুণ্য বলে বিবেচিত এবং অন্যায়ের কোন্ পরিফলের কারণে অন্যায় পাপ বলে পরিগণিত।" [৩৬৭]

আমি শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ভাবছিলাম যে আমাদের আলোচনার এখানেই সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারলাম, যেটাকে আমি সমাপ্তি ভেবেছিলাম সেটা আসলে আর এক কিস্তি তর্কের সূচনা বই অপর কিছু ছিল না। গ্লকন সব সময়েই তর্কপ্রিয়। তাই থ্র্যাসিমেকাসের আত্মসমর্পণটিকে তিনি তেমন খুশির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেননি। থ্র্যাসিমেকাসের ওপর তিনি দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তর্কের লড়াইটাকে শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি ছাড়বেন না, এই ছিল তাঁর মনোভাব। এবার আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ সক্রেটিস, ন্যায় অন্যায়ের চেয়ে সর্বদাই উত্তম, একথা কি তুমি যথার্থই আমাদের যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চাও, না কেবলমাত্র বোঝাবার ভান করতে চাও?

আমি বললাম, আমার ক্ষমতায় যদি কুলোয় তা হলে, যথার্থই আমি তোমাদের একথাটি বোঝাতে চাই।

আমার জবাবে গ্লকন বললেন, সক্রেটিস, তা হলে আমি বলব যে, সে-উদ্দেশ্যে তুমি আদৌ সফল হওনি। আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করছি। তুমি বলো, যে-সমস্ত বস্তুকে আমরা উত্তম বলি, তাদের মধ্যেও কি প্রকারভেদ নেই? একথা কি সত্য নয় যে ফলাফলের প্রশ্ন ব্যতিরেকেও কোনো কোনো বস্তুকে আমরা উত্তম বলি? যেমন ধরো, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ। নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ আমাদের ভোগের মুহূর্তে আনন্দ দেয় ঠিকই, কিন্তু তার পরিণতি তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিণামে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ থেকে আমরা কিছুই লাভ করিনে। তথাপি নির্দোষ আমোদ-প্রমোদকে আমরা উত্তম বলেই বিবেচনা করি।

আমি বললাম, এরূপ উত্তমও যে হতে পারে, তা আমি স্বীকার করছি।

গ্লকন বললেন, আবার এমন বস্তুও আছে যা শুধু তার নিজের কারণেই উত্তম নয়, তার পরিণতি বা পরিফলের কারণেই সে উত্তম। যেমন ধরো, জ্ঞান, দৃষ্টিশক্তি কিংবা স্বাস্থ্য। এরা কেবল নিজেদের কারণেই উত্তম বা কাম্য নয়। এরা উত্তম এদের পরিফলের জন্য। ঠিক নয় কি?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই।

গ্লকন বললেন ঃ তা ছাড়া একটি তৃতীয় শ্রেণীর কথাও তোমার স্বীকার করতে হয়, যেমন ধরো ব্যায়াম, রোগীর সেবা এবং নিরাময়কৌশলের কথা। এ ছাড়াও রয়েছে অর্থোপার্জনের নানা কৌশল। এরা আমাদের নানা উপকারে আসে সন্দেহ নেই। তথাপি কিন্তু একথা সত্য যে আমরা এদের অবাঞ্ছিত মনে করি। এদের কোনো একটিকে নিশ্চয়ই আমরা কেবল তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের

জন্যই গ্রহণ করি না; আমরা এদের গ্রহণ করি এদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপর কোনো ফলের জন্য। নয় কি?

আমি বললাম, একথা ঠিক যে তৃতীয় শ্রেণীও রয়েছে। কিন্তু একথা তুমি কেন জিজ্ঞেস করছ গ্লকন?

কারণ, আমি জানতে চাই ন্যায়কে তুমি এদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর বলে দাবি করতে চাও।

আমি বললাম, ন্যায় অবশ্যই সর্বোত্তম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যে-সমস্ত বস্তুকে মানুষ তার আপন বৈশিষ্ট্য এবং পরিফল উভয়ের জন্য জীবনে কামনা করে ন্যায়কে আমি তারই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করি।

গ্লকন বললেন, এই যদি তোমার মত হয় সক্রেটিস, তা হলে আমি বলব এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা তোমার থেকে ভিন্নতর মত পোষণ করেন। তাঁদের বিবেচনায় এমন অনেক অনিবার্য অপ্রিয় বস্তু রয়েছে যাদের আমরা আয়ত্ত করতে চাই কোনো সুনাম, সম্মান বা অনুরূপ কোনো পুরস্কারলাভের কারণেই, তাদের নিজেদের চরিত্র-মাহাত্ম্যের জন্য নয়। পুরস্কারের আকর্ষণ ব্যতীত নিজেদের চরিত্রগুণে এরা আমাদের নিকট অবাঞ্ছিত এবং পরিহার্য। ন্যায়কেও এঁরা এরূপ অবাঞ্ছিত এবং পরিহার্য, কিন্তু অপরদিকে অনিবার্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন।

আমি বললাম, আমি জানি এঁরা এরূপই চিন্তা করেন। থ্র্যাসিমেকাসও ক্ষণকাল পূর্বে ন্যায়ের নিন্দা এবং অন্যায়ের প্রশংসা করে এই তত্ত্বটিকেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার সে-যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করার ন্যায় মূর্খ আমি নই।

গ্লকন বললেন ঃ আমি আশা করি তুমি থ্র্যাসিমেকাসের বক্তব্য যেরূপ শ্রবণ করেছ, আমার বক্তব্যকেও তেমনি শ্রবণ করবে। আমি বলছি, আমার বক্তব্যকে আগে বলতে দাও। তার পরেই মাত্র দেখা যাবে আমরা দুজনে একমত হতে পারি কি না। কারণ, থ্র্যাসিমেকাস সর্পবৎ তোমার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করা মাত্র বিমোহিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর এই ত্বরিত আত্মসমর্পণটি আদৌ আমার পছন্দ হয়নি। কেননা, ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি আমার নিকট এখনও পরিষ্কার হয়নি। তাদের মাধ্যমে পুরস্কার বা ফললাভের কথা ছেড়ে দিয়ে, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাদের আপন-আপন প্রকৃতিগত সত্তা কী এবং কীভাবেই-বা তারা আমাদের আত্মার অন্তরে ক্রিয়াশীল হয়। কাজেই সক্রেটিস, তুমি যদি অনুমতি দাও তা হলে থ্র্যাসিমেকাসের যুক্তিকে আমি আবার তুলে ধরে শুরু

করতে চাই। এক্ষেত্রে প্রথমে আমি ন্যায়ের মূল এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মতটিকেই পেশ করব। দ্বিতীয়ত আমি তোমাকে প্রমাণ করে দেখাব যে, যারা ন্যায়পরায়ণ তারা স্বেচ্ছায় নয়, অনিচ্ছাসহকারেই তারা ন্যায়পরায়ণ। কেননা তারা ন্যায়কে চরম মঙ্গল বলে গ্রহন করে না, তারা তাকে অপর কোনো মঙ্গল বা সার্থকতালাভের প্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করে। তৃতীয়ত আমি যুক্তি দিয়ে দেখাব যে, দ্বিতীয় এই মতটি ভিত্তিহীন নয়। আমি তাদের মতাবলম্বী যদিও নই, তথাপি তাদের কথাকে সত্য বলে স্বীকার করলে একথা মানতে হয় যে, অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে অনেক বেশি লাভজনক। অবশ্য একথা আমি স্বীকার করছি যে, থ্র্যাসিমেকাস কিংবা তাঁরই মতো অসংখ্য মানুষের মতামতকে শুনতে শুনতে আমি সত্য সম্পর্কে বিভ্রান্তই হয়ে পড়ি। কেননা, অন্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আমি যেরূপ যুক্তি শুনেছি তার চেয়ে কোনো উত্তম যুক্তি আমার নিকট ন্যায়ের পক্ষে আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে পারেনি। আমি চাই যে, ন্যায়ের আপন সত্তা দিয়েই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। ন্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের সেই যুক্তিকেই আমি সন্তোষজনক বলে বিবেচনা করব। কিন্তু সেরূপ যুক্তি একমাত্র তোমার নিকটেই আমি আশা করতে পারি, অপর কোথাও নয়। তোমার জবাবের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমি অন্যায়ের সমর্থন করব। আমার বক্তব্যের ভঙ্গি থেকেই সক্রেটিস, তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার নিকট থেকে আমি কীরূপ জোরের সঙ্গে ন্যায়ের প্রশংসা এবং অন্যায়ের নিন্দাকে পেতে চাই। এবার তুমি বলো আমাদের আলোচনার এই পদ্ধতিটি তুমি অনুমোদন কর কি না?

আমি বললাম, অবশ্যই আমি তোমার প্রস্তাবটি অনুমোদন করি। তা ছাড়া ন্যায়-অন্যায় ব্যতীত এমন কোনো বিষয়ের কথা আমি চিন্তা করতে পারিনে যা নিয়ে আলোচনার সুযোগকে জ্ঞানীমাত্রই তার আন্তরিক কামনার বিষয় বলে তাকে স্বাগত জানাতে পারে।

গ্লকন বললেন, সক্রেটিস, তোমার নিকট থেকে একথা শুনতে পেয়ে আমি যথার্থই আনন্দিত হলাম। এবার আমার প্রস্তাব অনুযায়ী ন্যায়ের প্রকৃতি এবং মূল নিয়েই আমি আলোচনা শুরু করব।

ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ মতটি হচ্ছে এই যে, অন্যায়সাধন করা মানুষের জন্য উত্তম; কিন্তু অন্যায় ভোগ করা হচ্ছে অধম। আবার উত্তম এবং অধমের পরিমাপের দিক দিয়ে অন্যায় ভোগ করায় যে-পরিমাণ অধম মানুষ লাভ করে তা পরিমাণগতভাবে অন্যায় করার উত্তমের পরিমাণের চেয়ে অধিক। মানুষের সমাজে বিধি-নিষেধ বা আইনকানুনের উদ্ভব তার এই ন্যায়-অন্যায়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত। কেননা, একদিন যখন মানুষ অন্যায় করা এবং

অন্যায়কে ভোগ করা উভয় প্রকার অভিজ্ঞতাই লাভ করেছিল, আর একথা উপলব্ধি করেছিল যে, কারুর পক্ষেই দ্বিতীয়টির ভোগ ব্যতীত প্রথমটির উপভোগ সম্ভব নয়, সেদিন তারা নিজেদের মধ্যে এই মীমাংসায় উপনীত হয়েছিল যে, অন্যায় করা কিংবা অন্যায় সহ্য করা কোনোটিতেই তাদের লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। এভাবেই একদিন মানুষের সমাজে বিধিনিষেধ কিংবা আইনকানুনের সূচনা ঘটেছিল। এখান থেকেই আইনসঙ্গত বা ন্যায় কথাটির উদ্ভব হয়েছিল। কেননা, সেদিন থেকে যা-কিছু বিধিসঙ্গত হত তাকেই ন্যায়সঙ্গত বলে অভিহিত করা হত। ন্যায়ের এই প্রকৃতি এবং তার উদ্ভবের এই ইতিহাস থেকে একথাটি বুঝতে পারা যায় যে 'ন্যায়' হচ্ছে আসলে একটি আপোষভিত্তিক ভাব। অর্থাৎ এ হচ্ছে উত্তম এবং অধম অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা। মানুষ একদিকে চেয়েছিল কোনোরূপ প্রতিফল বা শাস্তি ব্যতীত কেবলমাত্র অন্যায় করার সুযোগ। তার স্বাভাবিক কামনায় এটি ছিল সর্বোত্তম অবস্থা; এর অপর প্রান্ত ছিল প্রতিশোধের উপায়হীনভাবে অন্যায়কে সহ্য করার চরম অবস্থা। এই চরমের বিকল্প হিসাবেই মানুষ গ্রহণ করেছিল ন্যায়কে। অর্থাৎ দুই চরমের মধ্যবর্তী অবস্থাটি হচ্ছে ন্যায়। আর তাই মানুষ ন্যায়কে গ্রহণ করেছে কোনো উত্তম হিসাবে নয়, ন্যায়কে সে গ্রহণ করেছে দুই অধমের মধ্যে ন্যূনতর অধম হিসাবে। তার ফলে ন্যায়ের প্রতি মানুষের যে-সম্মানবোধ—এটিও তার কোনো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। ন্যায়কে সমীহ করারও উৎস হচ্ছে অন্যায় করতে না পারার অবস্থা, অপর কিছু নয়। তার কারণ, যে-মানুষ মানুষ হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য তার যদি ক্ষমতা থাকত অন্যায়কে প্রতিরোধ করার কিংবা অন্যায়সাধন করার তা হলে সে আদৌ ন্যায়ের চুক্তিতে নিজেকে আবদ্ধ করত না। সেরূপ করা তার পক্ষে পাগলামি বই অপর কিছু হত না। সক্রেটিস, এতক্ষণ আমি যা বললাম, এটিই হচ্ছে ন্যায়ের প্রকৃতি আর উৎস সম্পর্কে সাধারণভাবে গৃহীত মত।

যারা ন্যায়পরায়ণ, অন্যায় করার তাদের ক্ষমতা নেই বলে অনিচ্ছাসহকারেই যে তারা ন্যায়পরায়ণ, একথাটিকে একটি দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রমাণ করা যায়। যেমন ধরা যাক, ন্যায়, অন্যায় উভয়কেই ক্ষমতা দেওয়া হল তাদের যার যেটি ইচ্ছা সেটিই সে সাধন করতে পারে। এসো, একবার আমরা ন্যায়, অন্যায় উভয়ের এই স্বাধীন ক্ষমতার বাস্তব প্রয়োগটিকে লক্ষ করি। এবার কিন্তু দেখা যাবে, নিজ নিজ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ন্যায়, অন্যায় উভয়ই একই প্রকার কাজ করে চলছে। স্বাধীন ইচ্ছার ক্ষেত্রে এবার আর ন্যায়ের কার্যক্রম থেকে অন্যায়ের কার্যক্রমকে মোটেই পৃথক করা সম্ভব হচ্ছে না। এবার ন্যায়েরও

প্রবণতা অন্যায়ের পথেই চলার। ন্যায়ের পথে সে যতটুকু আসছে তা কেবলমাত্র রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ কিংবা আইনকানুনের জবরদস্তিরই জন্যে, সাগ্রহে কিংবা স্বেচ্ছায় আদৌ নয়। 'ন্যায়'-'অন্যায়'কে ইচ্ছা এবং ক্ষমতার যে-স্বাধীনতা দেবার কথা আমরা চিন্তা করছি সে-স্বাধীনতার তুলনা একমাত্র লীডিয়াবাসী ক্রিসাসের পূর্বপুরুষ গাইজেস-এর স্বাধীনতার সঙ্গেই তুলনা করা চলে। এ-সম্পর্কে এরূপ কাহিনী আছে যে, গাইজেস ছিল লীডিয়া-রাজ্যের একজন বেতনভুক মেষপালক। সেবার একদিন লীডিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল। এই ভূমিকম্পের ফলে গাইজেস যে-স্থানে তার মেষপাল চরিয়ে বেড়াচ্ছিল সে-স্থানটায় একটি বড় আকারের গহ্বরের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চোখের সম্মুখে এরূপ একটি গহ্বর সৃষ্টিতে বিস্ময়ান্বিত হয়ে কৌতূহলবশে মেষপালক গাইজেস তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। গহ্বরে প্রবেশ করে গাইজেস বহু আশ্চর্য বস্তুই দেখতে পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর বোধ হল একটি শূন্যগর্ভ অশ্বের মূর্তি। ভূগর্ভস্থ সেই অশ্বটির দেহে গবাক্ষপথও গাইজেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই গবাক্ষপথে উঁকি দিয়ে গাইজেস অধিকতর বিস্ময়ান্বিত হল একটি বিরাটদেহ মৃত-মানুষের মূর্তিতে। মনুষ্যমূর্তিটির কাছে একটি স্বর্ণ-আংটি ব্যতীত অপর কোনো অঙ্গাভরণই ছিল না। মেষপালক মৃত-মানুষটির হাতের সেই আংটিটি সংগ্রহ করে গহ্বরটি পরিত্যাগ করে ভূপৃষ্ঠে উঠে এল। লীডিয়ারাজের হুকুম ছিল তাঁর মেষপালকগণকে তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের একটি করে মাসিক বিবরণ তাঁর কাছে পেশ করতে হবে। এই আদেশানুযায়ী রাজার নিকট তাদের মেষপালনের মাসিক বিবরণ পাঠাবার উদ্দেশ্যে মেষপালকগণ একদিন একটি সম্মেলনে মিলিত হল। মেষপালক গাইজেস তার নবলব্ধ সম্পদ, ভূগর্ভের আংটিটা হাতের আঙুলে পরে এই মেষপালক-সম্মেলনে এসে উপস্থিত হল। সমবেত সাথিদের মধ্যে আসন গ্রহণ করে কোনো এক সময় আকস্মিকভাবে সে তার অঙ্গুরির মণিবন্ধটিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। অমনি সে অপর সবার নিকট অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার গাইজেস দেখতে পেল যে তার সাথিগণ তাদের আলোচনা এরূপ মন্তব্যাদিসহকারে পরিচালন করছে যেন সে যথার্থই তাদের মধ্যে আর উপস্থিত নেই। বন্ধুবর্গের এরূপ আচরণে বিস্মিত হয়ে হাতের অঙ্গুরির মণিবন্ধটি আবার ঘুরিয়ে দিতেই সে পুনরায় সবার নিকট দৃশ্যমান হয়ে উঠল। অঙ্গুরির মণিবন্ধের ঘূর্ণনে এরূপ ফলাফল তাকে চমৎকৃত করে দিল। বেশ কয়েকবারই সে তার আংটিটির মণিবন্ধকে একবার ভিতরের দিকে, আর একবার বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। প্রত্যেকবারই সে একই ফল দেখতে পেল। অর্থাৎ আংটির মণিবন্ধকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে দিলে

সে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার তাকে বাইরের দিকে নিয়ে এলে সে পুনরায় দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় মেষপালক গাইজেস কৌশল করে সম্মেলনের পক্ষ থেকে রাজদরবারের একজন প্রতিনিধিও নির্বাচিত হয়ে গেল। আর রাজপ্রাসাদে পৌঁছেই সে রানিকে প্রলুব্ধ করে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে রাজাকে হত্যা করে তার রাজ্য দখল করে ফেলল।

এবার মনে করা যাক যে এরূপ ঐন্দ্রজালিক আংটির সংখ্যা একটি নয়, দুটি; আর দুটিকে আমরা পরিয়ে দিলাম ন্যায় এবং অন্যায় উভয়েরই হাতে। এবার দেখা যাবে এই আংটি-হাতে ন্যায়ের আচরণ অন্যায় থেকে মোটেই পৃথক হচ্ছে না। কেননা, সক্রেটিস, এমন মানুষের কথা তুমি আদৌ চিন্তা করতে পার না যে অন্যায়ের সুযোগ পেয়েও ন্যায়কে আঁকড়ে ধরে থাকবে। হাট কিংবা বাজারের দ্রব্যসামগ্রীর দোকান থেকে যে-কোনোকিছুকে ইচ্ছামতো নিয়ে যদি নির্বিঘ্নে সরে পড়া যায় তা হলে এমন সাধু ব্যক্তি কে আছে যে এরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে নিজেকে নিরস্ত করতে সক্ষম হবে! কিংবা এমন যদি সম্ভব হয় যে, ইচ্ছামতো যে-কোনো গৃহে প্রবেশ করে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে-কোনো পুর-সুন্দরীকে আপন শয্যার সঙ্গিনী করে নেওয়া চলে তা হলে এমন নিরাসক্ত ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাবে যে এমন অপূর্ব সুযোগটিকে বিফলে যেতে দেবে! মোটকথা, যা ইচ্ছা তা-ই যদি করা যায়, যাকে ইচ্ছা হত্যা করা যায়, আর যাকে ইচ্ছা রেহাই দেওয়া যায় তা হলে যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা-ই অবশ্যই করবে, এবং মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকারে সে সর্বশক্তিমানের ন্যায়ই ব্যবহার করবে। এমন অবস্থায় অন্যায়ের যা আচরণ, ন্যায়েরও সেই আচরণ। শুরু তাদের যেমনই হোক, পরিণামে তারা একই। কাজেকাজেই, এ থেকে বুঝতে পারা যায়, যে-ন্যায়পরায়ণ সে স্বেচ্ছায় কিংবা ন্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক বিবেচনা করে বলে ন্যায়পরায়ণ নয়; ন্যায়পরায়ণ সে প্রয়োজনের খাতিরে। কেননা, অন্যায়ের নির্বিঘ্ন সুযোগ পেলে পরম ন্যায়বানও তার ব্যবহার না করে ছাড়ে না। কারণ মানুষই আসলে বিশ্বাস করে যে, অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে ঢের বেশি লাভজনক। আর যে আমার যুক্তি গ্রহণ করবে সে মানুষের এই বিশ্বাসকে যথার্থ বলেই মনে করবে। কারণ, এমন যদি হয় যে, কোনো ব্যক্তি পূর্বের গল্পটির ন্যায় অদৃশ্যভাবে যে-কোনো কাজ করার ক্ষমতা পেয়েও কোনো অন্যায় করল না কিংবা অপরের কোনো সম্পদ-সামগ্রীকে নিজে স্পর্শ করল না, তা হলে তার চারপাশের অপর সব মানুষ তাকে মূর্খের অধম বলেই যেমন একদিকে বিবেচনা করবে, তেমনি অপর দিকে নিজেদের ক্ষতির আশঙ্কায় প্রকাশ্যে তাকে তার 'সাধুতার' জন্য বাহবা দিতে থাকবে। যাক, এ-ব্যাপারে যথেষ্ট বলা হয়েছে, আর থাক।

আসলে ন্যায় এবং অন্যায়কে যথার্থভাবে বিচার করতে হলে আমাদের একটিকে অবশ্যই অপরটি থেকে আলাদা করতে হবে। এ ছাড়া কোনো পথ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কী করে এই কাজটি করা যায়। আমি বলি, অন্যায়কে পুরোপুরি 'অন্যায়' এবং ন্যায়কে পুরোপুরি 'ন্যায়' হতে দাও। এদের উভয়ের আপন-আপন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে যাপন করতে দাও। যার যে-জীবন সে-জীবন যাপন করতে তার যা-কিছু সুযোগ কিংবা সম্পদের আবশ্যক, তা থেকে তাকে কিছুমাত্র বঞ্চিত কোরো না। প্রথমত অন্যায়ের কথা এবার ধরা যাক। এই পরিপূর্ণ জীবনে অন্যায়কে হতে হবে অপরাপর কুশলীদের মতোই সুদক্ষ। কুশলী নাবিক কিংবা দক্ষ চিকিৎসক স্বভাবগতভাবে তাদের শক্তি এবং সীমা উভয়কেই জানে। আর তাই কোনো বিপর্যয় বা ব্যর্থতার মধ্যেও তারা পর্যুদস্ত কিংবা হতাশ হয়ে পড়ে না; আপন শক্তিকে সংগ্রহ করে পুনরায় তারা নিজেদের উদ্দেশ্যসাধনে স্থিরকল্প হয়। এদের মতে অন্যায়ও তার অন্যায় কার্য উত্তমভাবেই সাধন করুক। অন্যায়সাধনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে তাকে চতুর হতে হবে। কারণ, সঙ্গোপনে যে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না এবং ধরা পড়ে যায় তাকে আমরা অপদার্থ বলি। কাজেকাজেই, যে পরিপূর্ণরূপে অন্যায়কারী তার চরিত্রে আমরা অন্যায়ের চরম প্রকাশকেই দেখতে পাব। অন্যায়সাধনের ব্যাপারে তার চরিত্রে যেমন কোনো ঘাটতি থাকলে চলবে না, তেমনি চরম অন্যায়েও তাকে পরম ন্যায়বান বলেই লোকের মনে প্রতিভাত হতে হবে। কারণ চরম অন্যায়ের চরম ন্যায় বলে প্রতিভাত হওয়ার মধ্যেই তার সর্বাধিক সফলতা। অন্যায়সাধনে কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপ যদি সে গ্রহণ করে থাকে তা হলে সে-ব্যর্থতা অতিক্রমেও তার দক্ষতা থাকতে হবে; অন্যায় কর্মে ধরা পড়লেও আত্মপক্ষ সমর্থনে তার বাগ্মিতার শক্তি দেখাতে হবে; আপন কার্যসিদ্ধিতে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জবরদস্তি প্রয়োগের যেমন শক্তি ও সাহস থাকবে তার, তেমনি সম্পদ ও সহচর সংগ্রহেও সে হবে ক্ষমতাবান।

এই চরম অন্যায়ের পাশাপাশি এসো, এবার আমরা পরম ন্যায়ের মূর্তিটি অঙ্কিত করি। পরম ন্যায় হবে সারল্য এবং মহত্ত্বের প্রতিমূর্তি। কবি এসকাইলাস যেমন বলেছেন ঠিক তেমনি ন্যায়সাধনের ইচ্ছা এবং চেষ্টাতেও অন্যায়কারী বলে তাকে প্রতিভাত হতে হবে। তাকে কোনোক্রমেই ন্যায়বান বলে পরিচিত হলে চলবে না। কারণ ন্যায়বান বলে খ্যাতিমান হলে তার নিকট আসতে থাকবে সম্মান আর উপঢৌকনের ডালি এবং তখন আর আমরা স্থির করতে পারব না এই 'ন্যায়' ন্যায়বান হচ্ছে কেবলমাত্র ন্যায়সাধনের জন্য, না সম্মান ও উপঢৌকনের আকর্ষণে। কাজেই 'ন্যায়ের' আবরণই হবে তার একমাত্র আচ্ছাদন; অপর কোনো

আকর্ষণের আচ্ছাদন রাখা তার চলবে না। জীবনযাত্রায় তাকে হতে হবে অন্যায়ের ঠিক বিপরীত। একদিকে যেমন তাকে হতে হবে মানুষ হিসাবে সর্বোত্তম, অপরদিকে লোকমুখে সে বিবেচিত হবে নরাধম বলে। এমন অবস্থাতেই ন্যায়ের আসল পরীক্ষা সম্ভব হবে। তখনই আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব হবে, এই চরম অপমান এবং পরিণামের ভয়ে—সে ভীত হয়ে পড়ে কি না। তার এ-অবস্থাকে আমরা কোনোক্রমেই সাময়িক বলে ভাবব না। আমৃত্যু সে পরম ন্যায়বান হয়েও চরম অন্যায়কারী বলে প্রতিভাত হোক। এভাবে পরম ন্যায় এবং চরম অন্যায় উভয় যখন তাদের স্ব স্ব অবস্থার চরমে যেয়ে পৌছবে কেবল তখনই মাত্র আমরা স্থির করতে পারব ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে কে অধিকতর সুখী।

বিস্ময়ের কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম ঃ সাবাস, প্রিয় গ্লকন! বিচারের জন্য কী অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গেই-না তুমি উভয় পক্ষকে সাজিয়ে দিলে। মনে হচ্ছে ন্যায় আর অন্যায় দুটি যেন মূর্তির মতোই প্রত্যক্ষ।

গ্লকন বললেন ঃ আমর যথাসাধ্য আমি করছি। যাক, এদের দুজনার কে কী যখন আমরা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তখন এদের আপন আপন পরিণামকে অঙ্কিত করতেও আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। সেই পরিণামের বিবরণটিই এবার আমি দিতে চেষ্টা করব। তবে সে বিবরণ আমি দিচ্ছি ভাবলে তোমার মন তার স্থূলতার জন্য পীড়িত হতে পারে। কাজেই, সক্রেটিস, তুমি বরঞ্চ মনে কোরো যে এবারের এই বর্ণনাটি আমি দিচ্ছিনে, এ-বর্ণনা তুমি শুনতে পাচ্ছ অন্যায়ের প্রশংসাকারীদের কণ্ঠে। তারা বলবে ঃ যে সত্যিকারের ন্যায়বান তাকে যদি লোকে অন্যায়কারী বলে মনে করে তা হলে তাকেও জনতা অত্যাচারিত না করে ছাড়বে না। তাকে ধরে তারা কোড়ার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে, যন্ত্রণার অগ্নিতে তাকে দগ্ধ করবে, হাত-পা বেঁধে তার চোখকে অগ্নিশলাকা পুরে উপড়ে আনবে এবং পরিশেষে তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করবে। আর তখন এই ন্যায়বানও আফসোস করবে, হায়, এর চেয়ে উত্তম হত যদি আমি সত্যিকারের ন্যায়বান হওয়ার চেয়ে কেবল ন্যায়বান হওয়ার ভান করতাম। কারণ কবি এসকাইলাসের কথা অন্যায়ের ক্ষেত্রেই যথার্থভাবে প্রয়োগ করা চলে। কারণ, একমাত্র অন্যায়কারীই ভান করে না। আপন অন্তঃকরণে সে যথার্থই জানে কী তার লক্ষ্য। তার লক্ষ্য হচ্ছে যথার্থই অন্যায় করা,অন্যায় করার ভান করা নয় ঃ

> 'তার হৃদয়ের জমি যেমন গভীর, তেমন উর্বর,
> আর তা থেকেই জন্ম নেয় তার অভিজ্ঞানের কিশলয়।'[১]

---

১. এসকাইলাস ঃ সেভেন অ্যাগেইন্সট থিবিস (Seven Against Thebes)

কারণ, লোকে তাকে মনে করে সে পরম ন্যায়বান। আর তাই নগরীতে তার সম্রাটের আসন; যাকে ইচ্ছা তাকেই সে বিয়ে করতে পারে, আর যেমন ইচ্ছা তেমন করে সে বিয়ে ঘটাতেও পারে। অন্যায় সম্পর্কে তার কোনো সঙ্কোচ কিংবা ভুল ধারণা নেই। আর তাই জীবনের বিকিকিনির কোথাও সে লাভ বই লোকসানের ভাগীদার নয়। প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ব্যক্তিগত কি রাষ্ট্রীয়—যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক-না কেন, সে অপরাজেয়। লাভের ব্যাপারে লাভ ষোলো আনাই তার—লোকসান অপরের। এই নীতির জন্যই তার সমৃদ্ধি। শক্তিতে যেমন সে ক্ষমতাবান শত্রুর প্রতি আঘাত হানতে, তেমনি সে ক্ষমতাবান মিত্রকে পারিতোষিকে তুষ্ট করতে। তা ছাড়া দেবতাদের তুষ্ট করতে তাদের উদ্দেশে বিরাটাকারের বলিদান-যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও তার কোনো জুড়ি নেই। মোট কথা, মানুষ কিংবা দেবতা যাকেই তুষ্ট করতে বা সম্মান দেখাতে ইচ্ছা করে তাকেই সে ন্যায়বানের চেয়ে অধিকতর উত্তমভাবে সম্মানিত বা তুষ্ট করতে পারে। সক্রেটিস, এজন্যই আমরা দেখি যে ন্যায়বানের চেয়ে অন্যায়কারীর জীবনকে সুখময় করতে মানুষ আর দেবতার কোনো বিরোধ নেই—সেক্ষেত্রে উভয়েই ঐক্যবদ্ধ।

গ্লকনের জবাবে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার পূর্বেই তার ভাই এ্যাডিম্যান্টাস বলে উঠলেন ঃ সক্রেটিস, তুমি নিশ্চয় মনে কর না যে, এ-বিষয়ে আর কিছু বলার নেই?

আমি বললাম, ঠিকই তো, এর পরে বলার আর কী থাকতে পারে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন, এ-ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি তো এখনও বলা হয়নি।

আমি বললাম, তা হলে প্রবাদের কথাই সত্য হোক ঃ 'ভাই ভাইকে সাহায্য করুক।' গ্লকন যদি কোনো যুক্তিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে তা হলে তুমি তার সাহায্যে জোড় কদমে এগিয়ে এসো। অবশ্য এ্যাডিম্যান্টাস, আমার কথা যদি বল তা হলে আমি স্বীকার করব, গ্লকন আমাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে; বেচারা ন্যায়কে সাহায্য করার কোনো ক্ষমতাই আর আমার নেই!

এ্যাডিম্যান্টাস জবাব দিলেন ঃ কি যে বলছ তুমি সক্রেটিস; আমি বলছি, এখনও বলার অনেক কিছু রয়েছে। ন্যায়-অন্যায়ের পক্ষে-বিপক্ষে যে-সমস্ত কথা গ্লকন বলেছে, আমি বলব সিদ্ধান্তগ্রহণের পূর্বে এ-ব্যাপারে আর একটি দিককেও আমাদের জানতে হবে। তা না হলে গ্লকনের কথার যথার্থ তাৎপর্য বুঝতে আমরা সক্ষম হব না। সন্তানের পিতামাতা কিংবা শিক্ষকের কথাই ধরো।

পিতামাতা তাদের সন্তানকে, শিক্ষক তাঁর ছাত্রকেও উপদেশ দেন যেন তারা ন্যায়বান হয়। কিন্তু কেন তাঁরা ন্যায়বান হওয়ার এই উপদেশ দেন? তাঁরাও এই উপদেশ দেন ন্যায়ের খাতিরে নয়, যাতে তারা ন্যায়বান বলে খ্যাত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, পারিবারিক সুখ—ইত্যাকার আনন্দ অর্থাৎ গ্লকনের কথামতো ন্যায়বান বলে পরিচিত হয়ে অন্যায়কারীর যে সমস্ত সুখ ও আনন্দলাভ ঘটে, তা যেন তারা ভোগ করতে পারে তারই জন্য। বস্তুত এই শ্রেণীর লোকদের নিকট পরিচিত হওয়ার গুরুত্ব অপরদের চেয়েও অধিক। কারণ পিতামাতা বা শিক্ষক একথাও বলেন যে, ন্যায়বানের উপর দেবতাদের করুণা অজস্র ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। আর শুধু এঁরাই নন। মহান হিসিয়ড এবং হোমারও একথাই বলেন। হিসিয়ড বলেছেন, দেবতারা ন্যায়বান দ্বারাই ওক বৃক্ষকে তৈরি করেন। আর তাই ঃ

> "চূড়ায় তাদের ফলের সম্ভার, মধ্যভাগে মধুকরের অধিষ্ঠান
> মেষগুলো উষ্ণ লোমের আচ্ছাদনে মুহ্যমান।"[১]

কেবল ফলের সম্ভার আর উষ্ণ লোমের আচ্ছাদন নয়—এমন বহুতর করুণার উল্লেখই হিসিয়ড করেছেন। হোমারের কণ্ঠেও একই সুর। কেননা, তিনিও এমন ন্যায়পরায়ণের কথাই বলেন যার খ্যাতি হচ্ছে ঃ

> 'নিষ্কলঙ্ক সেই সম্রাটের মতো যিনি দেবতাদের মতোই
> ন্যায়ের দণ্ড বহন করেন; যার রাজ্যে কালো মাটির বুকেও
> সৃষ্টি হয় গম আর বার্লি শস্যের সম্ভার; যার বৃক্ষরাজি
> ফলভারে থাকে আনত আর যার মেষগুলো
> কোনোদিন ব্যর্থ হয় না শাবক উৎপাদনে
> আর সমুদ্র কার্পণ্য করে না মৎস্যদানে—'[২]

ম্যুসাস ও তাঁর পুত্র[৩] ন্যায়বানদের জন্য যে-স্বর্গীয় সুখের প্রলোভন দেখিয়েছেন তা পূর্ববর্ণিত বিলাসের চেয়েও আড়ম্বরপূর্ণ। ন্যায়বানদের তাঁরা সরাসরি পাতালপুরীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁরা বলেন, যারা ন্যায়বান তারা সেখানে সোফায় শায়িত এবং বিরামহীনভাবে সুরাপানে চিরমত্ত মনীষীদের সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য লাভ করবে। এদের প্রতিশ্রুতির ভাবটি এমন যে সুরাপানে মত্ততার অমরতা লাভ করাই হচ্ছে ন্যায়বানের জন্য শ্রেষ্ঠতম

---

১. হিসিয়ড ঃ ওয়ার্কস এ্যঅন্ড ডেজ (Works and Days)
২. হোমার ঃ ওডিসি
৩. ইউমোলপাস ঃ উপকথার চরিত্র।

পুরস্কার। অনেকের প্রতিশ্রুতি আবার এদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। তারা বলে, যারা ন্যায়পরায়ণ আর বিশ্বস্ত তারা তাদের পুত্র, পৌত্র, কলত্র নিয়ে পুরুষপরম্পরায় বেঁচে থাকতে পারবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যায়কে প্রশংসা করার ধারা হচ্ছে এদের এইরূপ। অন্যায়ের বেলা এদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে বিপরীত সুর। যে অন্যায়কারী তাকে এরা পাতালপুরীতে নিয়ে একটা জলাভূমির পঙ্কে ডুবিয়ে দেয়, নয়তো তাদের ভাগ্যে জোটে চালুনি ভরে পানি বহন করার পরীক্ষা। মৃত্যুর পূর্বেও তারা অপমানে আর অত্যাচারে হয় জর্জরিত। অর্থাৎ যে-ন্যায়বানরা অন্যায়কারী বলে পরিচিত তাদের ভাগ্যে মানুষের ঘৃণা, অত্যাচার আর অপমান বই অপর কিছুই জুটতে পারে না। গ্লকনের মতো লোকের কল্পনায় ন্যায়-অন্যায়ের এই বিচার ছাড়া অপর কোনো বিচারের কথাই স্থান পায় না। একের প্রশংসা আর অপরের নিন্দার এই হচ্ছে তাদের ধারা।

কিন্তু সক্রেটিস, ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে আর এক প্রকার বিচারও তো আছে। এ-বিচার অবশ্য কবিদের নয়, এ-বিচার গদ্যলেখকদের। সাধারণ মানুষ চিরকাল বলে এসেছে, ন্যায় এবং ধর্মের পথ সম্মানের বটে, কিন্তু তা কঠিন এবং বিপদসংকুল। কিন্তু অন্যায় এবং পাপের পথে সুখ এবং সম্ভোগ সহজেই লাভ করা যায়। রাষ্ট্রীয় বিধানের কিছু ধমক আর সাধারণ মানুষের কিছু নিন্দাবাদ ব্যতীত অন্যায় এবং পাপের পক্ষে ভয় করার কিছু নেই। মানুষ একথাও জানে এবং তারা বলেও এসেছে যে সততার পথে লাভের আশা কম, অসততাতেই লাভ। অসৎকে মানুষ সুখী বলেছে। তাকে তারা তাদের সম্পদ ও শক্তির জন্য প্রকাশ্যে কিংবা গোপনেও সম্মান করেছে। দুর্বল ও দরিদ্রকে তারা অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু তথাপি একথাও সত্য যে, মানুষ অসৎকে কখনো ভালো এবং সৎ-কে মন্দ বলেনি। তা ছাড়া, সক্রেটিস, ন্যায় এবং দেবতাদের সম্পর্কে তাদের বলার ধরনটিতে তুমি বিস্মিত না হয়ে পারবে না। কারণ, তাদের ধরনটি বড় অদ্ভুত। তারা বলে ঃ দেবতাদের রীতিনীতি বড়ই আশ্চর্যজনক। তাঁরা ভাগ্যনিয়ন্তা—আর তাই যারা সৎ এবং ধর্মপরায়ণ তাদের ভাগ্যে তাঁরা বণ্টন করেন দুঃখ এবং দুর্দশা; কিন্তু যারা অসৎ তাদেরকে তাঁরা আশীর্বাদ করেন সুখ এবং আনন্দ দিয়ে। ভিক্ষুবেশে দেবতা তাই হাজির হন যেয়ে ধনীর দরজায় আর অভয় দিয়ে বলেন, কোনো পাপেই তাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা দেবতারা ধনীর নিজের কিংবা তাদের পিতা-পিতামহের পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে দেবেন। কেবল কিছু খরচ করলেই তাদের চলবে। দেবতাদের নামে উৎসর্গ করুক তার কিছু কিংবা দিয়ে দিক একটা ভোজ, তা হলেই তাদের পাপের মার্জনা হয়ে যাবে। বলুক তারা

তাদের শত্রু কে। হোক-না সে-শত্রু ন্যায়পরায়ণ। ধনীর আবদারে সেই ন্যায়পরায়ণকে অচিরে ধ্বংস করে দেবে দেবতা তার বরপুত্র ধনীর স্বার্থে। মন্ত্র পড়ে তারা প্রেতযোনিকে আটকে দিতে পারে, পারে তারা যেমন ইচ্ছা তেমনি করে তাদের দ্বারা কার্যসাধন করতে। এ-ব্যাপারে কবিদের তারা সাক্ষী মানে ঃ হিসিয়ডের কাব্যময় শব্দ দিয়ে তাদের পাপের সড়ককে যেন তারা আরও সহজগতি করতে চায় ঃ

> "পাপের প্রাচুর্যলাভে আমাদের শঙ্কার কোনো কারণ নেই,
> ওর সড়ক যেমন স্বচ্ছন্দ, ওর মঞ্জিল তেমনি সন্নিকট
> এসো, সত্যের পথকে আমরা পরিহার করি,
> ও-পথে দেবতারা সঙ্কটের কাঁটাজাল বিস্তার করে দিয়েছে।"[১]

ও সড়কের চড়াই বড় খাড়া। এবার তারা কবি হোমারের উল্লেখ করেও দেখিয়ে দেয়, কীভাবে মানুষ সহজেই দেবতাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং কীভাবে সহজেই দেবতারা তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন ঃ

> "দেবতাদের বিচ্যুতির পথে টেনে নামানো এমন কোনো শক্ত
> ব্যাপার নয়; মানুষ যদি কিছু পাপ করে থাকে আর
> দেবতা হয়ে থাকেন ক্রোধান্বিত, তা হলে একটু প্রার্থনা,
> কিছু সুরার উপঢৌকন, আর ভাজা চর্বির লোভনীয় গন্ধ
> —এইই হবে যথেষ্ট দেবতার সেই ক্রোধকে প্রশমিত করতে।"[২]

এই ভিক্ষুর দল বহু কেতাবের উল্লেখও করেন। তাদের মতে চন্দ্র এবং মিউজের যারা সন্তান সেই মিউজিয়াস এবং অর্ফিয়ুস-লিখিত গ্রন্থেও একথার সাক্ষ্য রয়েছে। আর এইসমস্ত কেতাবে বর্ণিত ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মহড়া দিয়ে এঁরা ব্যক্তিমাত্রকে নয়, সমস্ত নগরবাসীকে একথা বিশ্বাস করায় যে, যজ্ঞ, ভোজ আর বিসর্জনের হুল্লোড় দ্বারাই মৃত কিংবা জীবিত সবারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁরা করে দিতে পারেন। এভাবেই তাঁরা যাগ-যজ্ঞ ও জাদু দ্বারা নরকের যন্ত্রণা থেকে আমাদের রেহাই দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁদের প্রতিশ্রুতিকে আমাদের বিশ্বাস অবশ্যই করতে হবে কারণ তাঁদের অবজ্ঞা করলে আমাদের জন্য চরম পরিণতি যে অপেক্ষা করছে, একথা বলতে তারা ভোলেন না।

এ্যাডিম্যান্টাস বলে চললেন ঃ তা হলে সক্রেটিস, এবার চিন্তা করে দ্যাখো, ন্যায় অন্যায়ের এই চিত্র এবং অন্যায় সম্পর্কে মানুষ এবং দেবতার বিচার

---

১. হিসিয়ড ঃ রচনাবলি
২. হোমার ঃ ইলিয়ড

প্রণালীর কথা তরুণদের মনে যখন জাগে তাদের নিজেদের চিন্তা কোনদিকে ধাবিত হতে পারে। তরুণদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং বাতাসে ভেসে চলা মাধুকরের ন্যায় পুষ্প থেকে পুষ্পে মধু আহরণ করার যাদের মেজাজ তারা ন্যায়-অন্যায়ের এই বোধ থেকে জীবনের কোন আদর্শকে নির্বাচিত করবে? জীবনের সর্বোত্তম ভোগকেই তারা তাদের চরম আদর্শ বলে বিবেচনা করবে। পিন্ডারের মতোই আমাদের তরুণরা প্রশ্ন করবে ঃ "সম্ভোগের সুউচ্চ চূড়াকে কবলিত করতে কে আমাকে সাহায্য করবে? ন্যায় না অন্যায়?"

একথা আমি বলছি এ-কারণে যে মানুষ মনে করে, সত্যিকারভাবে সৎ হয়েও সৎ বলে প্রচারিত না হলে সততায় কোনো লাভ নেই। এমন ক্ষেত্রে স ৎ-এর ভাগ্যে নিশ্চিতভাবে জুটবে দুঃখ, কষ্ট এবং লাঞ্ছনা। অপরদিকে অসৎ হয়েও সৎ বলে প্রচারিত হতে পারলে স্বর্গসুখের প্রাপ্তি আমার অনিবার্য। কাজেই সত্যের চেয়ে অসত্যের মাহাত্ম্য যখন অধিক এবং অসত্যই যখন সুখলাভের উত্তম মাধ্যম, তখন অসত্যের ধ্যানকেই জীবনের লক্ষ্য বলে স্থির করাকে মানুষ শ্রেয় বলে গণ্য করে। কারণ সে মনে করে সুখলাভের পথ হচ্ছে নিজের চারদিকে ন্যায়ের একটি আবরণ তৈরি করা এবং সেই আবরণের আড়ালে ধূর্ত শিয়ালের ন্যায় নিজের স্বার্থসাধনের জন্য ওত পেতে অপেক্ষা করা। মহর্ষি আকিলোকাস সিদ্ধপুরুষদের অন্যতম। সততার আবরণের আড়ালে ধূর্ত শিয়ালের উপামাটি তিনিই দিয়েছেন। এজন্য তিনি আমাদের কাছে স্মরণীয়। অবশ্য কথা উঠতে পারে ধূর্ততা ঢেকে রাখা কিছু কষ্টের ব্যাপার। তার জবাবে আমি বলব ঃ কোনো বৃহৎ লক্ষ্যই অনায়াসে লাভ করা যায় না। কষ্টকর হলেও যুক্তির দিক থেকে সুখের সড়ক এটাই। এই সড়ক ধরেই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। ধূর্ততা ঢেকে রাখার জন্য আমরা রাজনৈতিক চক্র এবং গোপন মৈত্রীসংঘ প্রতিষ্ঠা করব। আইন-সভা আর বিচারালয়কে ধোঁকা দেবার কৌশল শিক্ষাদানকারী বাগ্মী অধ্যাপকেরও আমাদের অভাব নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে ধূর্ততা থাকাও খুব অসম্ভব কিছু নয়। এভাবে বুদ্ধির কৌশল এবং শক্তির জোরে স্বার্থসাধন করা এবং দণ্ডভোগ থেকে রেহাই পাওয়া খুব অসম্ভব কিছু নয়। এর পরেও হয়তো কথা উঠবে ঃ মানুষকে প্রতারিত করা সম্ভব হলেও দেবতাকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। দেবতাদের উপর শক্তিপ্রয়োগও অসম্ভব। কিন্তু এ-আশঙ্কারও জবাব আছে। জবাব হচ্ছে এই যে, দেবতা থাকলে তো দেবতার ভয়! থাকলেও মানুষের জন্য দেবতাদের ভাবনার গরজই-বা কী? কাজেই কোনো ক্ষেত্রেই দেবতাদের ফাঁকি দেবার ব্যাপারটা খুব কঠিন ব্যাপার

নয়। আর যদি বা তাদের অস্তিত্ব থাকে এবং মানুষের জন্য তাদের শিরঃপীড়াও কিছু থাকে তবুও কোনো চিন্তার কারণ নেই। আসলেই দেবতাদের কথা আমরা পুরাকাহিনী এবং কবিদের নিকট থেকেই তো পেয়েছি। আর এঁরাই বলেছেন ঃ বলিদান, প্রশংসামূলক অর্চনা এবং উপঢৌকন দেবতাদের ঠিক রাখার জন্য যথেষ্ট। এবার তা হলে দুটো পথের একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হয়। কবিদের বাণী সত্য হলে অন্যায়ের পথই হচ্ছে উত্তম পথ, লাভের পথ। কারণ সৎ হয়ে আমাদের কী লাভ? সততা আমাদের দেবতার বা পরকালের দণ্ড থেকে রেহাই দিতে পারে। কিন্তু অন্যায়ের লাভ থেকে সততার কারণে আমরা বঞ্চিত হতে বাধ্য। অপরদিকে অন্যায়ী বা অসৎ হলে একদিকে যেমন জীবনের কোনো উপভোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হব না, প্রার্থনা এবং প্রতারণায় দেবতাকুলকেও খুশি করা আমাদের অসম্ভব হবে না। এ-পথে দণ্ডভোগেরও কোনো আশঙ্কা থাকবে না। অবশ্য কাপুরুষ যারা তারা এখনও বলতে পারে ঃ পাতালপুরীর কথাও আমাদের ভাবতে হবে। সেখানে অন্যায়ের প্রতিফল আমাদের কিংবা আমাদর বংশধরদের ভোগ করতে হবে। আমি অভয় দিয়ে বলব ঃ প্রায়শ্চিত্তের দেবতার অভাব সেখানেও নেই। এরূপ দেবতাদের শক্তিও কম নয়। পরাক্রমশালী নগরী আর দেবতাদের মুখপাত্র কবিকুলের সাক্ষ্য থেকে এ-জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি।

তা হলে সক্রেটিস, ভেবে দ্যাখো, কী কারণে মানুষ চরম অন্যায়ের বদলে ন্যায়কে জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করবে? ন্যায়ের কিছু আবরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেই অন্যায় পথে দেবতা এবং মানুষ উভয়কেই আমরা জয় করতে পারি ঃ ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের সুখ আমরা নিজেদের জন্য নিশ্চিত করতে পারি। প্রাজ্ঞজনদের কাছ থেকে এই শিক্ষাই আমরা লাভ করেছি। এমন শিক্ষার পরেও বুদ্ধি এবং সামর্থ্যের অধিকারী কেউ কি অন্যায়কে পরিত্যাগ করে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে পারে? এমন লোকের মনে ন্যায়ের প্রশংসা পরিহাসের উদ্রেক না করে পারে না। এমন যদি কেউ থাকে, যে অন্যায়ের পক্ষের এই যুক্তি খণ্ডন করতে সক্ষম এবং ন্যায়কে উত্তম বলে বিশ্বাস করে, তার পক্ষেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ ও ক্ষমাহীন হওয়া সম্ভব হবে না। কারণ সে জানে মানুষ ন্যায়বান কিংবা সৎ আপন ইচ্ছাসহকারে হয় না। এর ব্যতিক্রম কেবল স্বর্গীয় প্রত্যাদেশপীড়িত কোনো ব্যক্তি কিংবা যথার্থ সত্যের জ্ঞানে জ্ঞানীর মধ্যেই সম্ভব। আসলে কাপুরুষ, বৃদ্ধ এবং দুর্বল—অর্থাৎ অন্যায়ের পথ অবলম্বনে যারা অক্ষম তারাই অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ন্যায়ের কথা বলে। এর আমোঘ প্রমাণ এই যে, এরূপ কোনো ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হওয়ামাত্র সে তার সাধ্যমতো অন্যায় করতে আদৌ কোনো দ্বিধা বোধ করে না।

সক্রেটিস, এর কারণের কথা এই বিতর্কের গোড়াতেই আমরা বলেছিলাম। আমার সহোদর এবং আমি উভয়েই বলেছিলাম যে, স্মরণীয় প্রাচীন বীর থেকে শুরু করে আমাদের কালের প্রাজ্ঞজনের কাউকেই নিঃস্বার্থভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধতা কিংবা ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করতে দেখা যায় না। ন্যায় এবং অন্যায়ের সমালোচনা কিংবা প্রশংসার সঙ্গে তাদের নিজেদের সৌভাগ্য, সম্মান এবং সুখের প্রশ্নটিকে সর্বকালেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখা যায়। ন্যায় এবং অন্যায়ের বিচারে লাভালাভের এই বিষয়টি আমাদের বিস্ময়ান্বিত না করে পারেনি। কারণ, এমন আদৌ দেখা যায় না যে এঁদের কেউই ন্যায়-অন্যায়ের বিচার মানুষ কিংবা দেবতার গোচরের বাইরে কেবলমাত্র আত্মার স্বাধীন উপলব্ধির ভিত্তিতে কখনো করেছেন। অথবা এমন কথাও তাঁরা বলেননি যে, মানুষের মধ্যে দৃষ্ট গুণের মধ্যে ন্যায় হচ্ছে মহৎ পুণ্য আর অন্যায় হচ্ছে চরম পাপ। পৃথিবীর নীতি যদি এই হত এবং শিশুকাল থেকে ন্যায়-অন্যায়ের এই বোধে মানুষকে যদি উদ্বুদ্ধ করা হত তা হলে আজকের মতো অন্যায়রোধের জন্য পরস্পরের উপর খবরদারি করার আমাদের কোনো প্রয়োজন হত না। তখন প্রত্যেকেই নিজের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে সতর্ক প্রহরীর কাজ করত। কারণ সে বুঝত, তার নিজের অন্যায়াচরণ তার নিজের মধ্যেই নিকৃষ্টতম পাপের সৃষ্টি করবে। এ-উপলব্ধি তাকে অবশ্যই ভীত এবং শঙ্কিত করে তুলত। এটা আমি জোরের সাথেই বলতে পারি যে, ন্যায় এবং অন্যায়ের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে আমি যে-কথা বলেছি থ্র্যাসিমেকাস এবং অন্য সাথিরা অনুরূপ কথাই বলবেন। আমার কথা স্থূল হতে পারে; ন্যায়-অন্যায়ের প্রকৃত চরিত্রের তাতে হানি ঘটতে পারে। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমার কথার যা-কিছু তেজ তা এই কারণেই যে, প্রতিপক্ষের নিকট থেকে আমি যথার্থ যুক্তিটি শ্রবণ করতে চাই। তোমাদের কাছে আমার কথা হচ্ছে, তোমাদের জবাবে অন্যায়ের চেয়ে ন্যায় উত্তম এমন কথা বললেই চলবে না, পরিফলের দিক থেকে তোমাদের একথাও বলতে হবে, কী কারণে ন্যায়-অন্যায়ের অধিকারী একটিকে পুণ্য এবং অপরটিকে পাপ বলে বিবেচনা করছে। এ-ব্যাপারে আর-একটা অনুরোধ আছে। গ্লকনও একথা বলেছেন। জবাবের সময়ে খ্যাতির প্রশ্নটি তোমাদের বাদ দিতে হবে। কারণ খ্যাতি-অখ্যাতির প্রশ্ন বিচারের বাইরে রেখে ন্যায়-অন্যায়ের নিজস্ব সার্থকতার ভিত্তিতে বিচার না করার অর্থ হবে অন্যায়কে অন্ধকারের আড়ালে রাখা। তেমন হলে থ্র্যাসিমেকাস-এর বক্তব্যই যথার্থ প্রমাণিত হবে। কারণ, থ্র্যাসিমেকাস বলেছেন, ন্যায় মানে অপরের স্বার্থসাধন আর অন্যায় হচ্ছে দুর্বলকে আঘাত করে সবলের নিজের স্বার্থোদ্ধার। একটা কথা তোমরা স্বীকার করেছ। তোমরা বলেছ,

ন্যায় হচ্ছে এমন এক বস্তু যার প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষার উৎস তার পরিফল হলেও, ন্যায়ের নিজস্ব কারণেই ন্যায়কে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা আমাদের থাকা উচিত। উপমা দিলে বলা চলে যে, আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণক্ষমতা, জ্ঞান, স্বাস্থ্য বা এমনই যথার্থ সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন, ন্যায়ের ক্ষেত্রেও তেমনি। তা-ই যদি হয় তা হলে ন্যায়-অন্যায়ের বেলাতেও ন্যায়াচরণ দ্বারা ন্যায়বানের যথার্থ লাভ এবং অন্যায়াচরণ দ্বারা অন্যায়কারীর যথার্থ ক্ষতির কথা তোমাদের উল্লেখ করতে হবে। কেননা, সাধারণ মানুষের প্রশংসা-অপ্রশংসাকে আমি গুরুত্ব দিইনে। তারা একের প্রশংসায় অপরকে ধূলিস্যাৎ করতে পারে;একের লাভকে গগনচুম্বী করে অপরের ক্ষতিকে অতলস্পর্শী করতে পারে। কিন্তু তোমাদের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র। তোমরা, যারা তোমাদের সমগ্র জীবন এই প্রশ্নের বিচারে নিবিষ্ট রেখেছ তাদের পক্ষে সাধারণের প্রশংসা-অপ্রশংসার কৌশল শোভা পায় না। অপর দশজনের চেয়ে তোমাদের যুক্তিকে অবশ্যই উত্তম হতে হবে। আর সে-কারণেই আমার দাবি হচ্ছে, সক্রেটিস, তোমাদের শুধু একথা বললেই হবে না যে, ন্যায় অন্যায়ের চেয়ে শ্রেয়। তোমাদের প্রমাণ করতে হবে, মানুষ কিংবা দেবতার জ্ঞানে বা অজ্ঞানে কোন্ পরিফলের কারণে ন্যায় পুণ্য বলে বিবেচিত এবং অন্যায়ের কোন্ পরিফলের কারণে অন্যায় পাপ বলে পরিগণিত।

অধ্যায় ঃ ৬
[৩৬৮—৩৭২]

রাষ্ট্র সংগঠনের উপাদান

কাজেই সক্রেটিসের দায়িত্ব হচ্ছে ন্যায়কে তার স্বরূপে দেখানো। ব্যক্তির আত্মায় ফলাফল নির্বিশেষে তার অবস্থা কীরূপ তা স্থির করা। এ অবশ্যই কঠিন কাজ। এ-দায়িত্বপালনের একটি নূতন উপায় সক্রেটিস উদ্ভাবন করলেন। তাঁর মতে ব্যক্তি হচ্ছে ক্ষুদ্র একক। সরাসরি তার মধ্যে ন্যায়কে প্রত্যক্ষ করা কঠিন। রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তিরই বৃহত্তর প্রতিরূপ। সেই বৃহত্তর প্রতিরূপের মধ্যে ন্যায়কে অন্বেষণ করা এবং খুঁজে পাওয়া সহজতর হবে। তাঁর মতে, চোখের ডাক্তার রুগির চোখের শক্তি বড় হরফ দিয়েই পরীক্ষা করতে শুরু করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি ছোট হরফে যান। তেমনি যদি আমরা স্থির করতে পারি কোন্ নীতিতে একটি রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তা হলে পরবর্তী পর্যায়ে বক্তির মধ্যে সে-নীতির প্রতিফলন এবং তার প্রতিফল স্থির করা সহজ হবে। কিন্তু তৈরি রাষ্ট্রে ন্যায়ের সাক্ষাৎ মিলতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ন্যায়পরায়ন বা উত্তম রাষ্ট্র হলে আজকে এই ন্যায়ের সংকট সৃষ্টি হত না। ন্যায়কে অন্বেষণ করার আবশ্যক হত না। রাষ্ট্রকে অবিকৃত এবং স্বাভাবিকভাবে তৈরি করেই তার মধ্যে ন্যায়ের রূপটিকে দেখতে পারা যাবে। তাই রাষ্ট্রকে তৈরি করা আবশ্যক। এ-কারণেই সক্রেটিস গোড়া থেকে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়ে রাষ্ট্র রচনা করতে এবার শুরু করলেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সক্রেটিসের এই রাষ্ট্ররচনা রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো প্রতিফলন নয়। ঐতিহাসিক কোনো পর্যায়ক্রম প্লেটো এখানে অনুসরণ করছেন না। সমসাময়িক গ্রীসীয় নগররাষ্ট্র আদিতে যেমন করে গঠিত হয়ে থাকতে পারে তারই একটি কল্পনা এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে। এরূপ রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিশ্লেষণ করে তার মূল উপাদানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে গঠন করা হচ্ছে। উপাদানগুলি সক্রেটিসের নিজস্ব যুক্তির পর্যায়ক্রম অনুসরণ করছে; সক্রেটিস ঐতিহাসিক উপাদানের বাস্তব কোনো বিকাশক্রম অনুসরণ করছেন না।

এই যৌক্তিক গঠনে প্লেটো রাষ্ট্রগঠনের সামাজিক চুক্তিমূলক ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। তাঁর মতে, মানুষের কোন কৃত্রিম চুক্তির ফলে রাষ্ট্র উদ্ভূত হয়েছে; কাজেই রাষ্ট্র প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক সংগঠন নয়,একথা ঠিক নয়। কিংবা রাষ্ট্র মানুষের আদিকালের যদৃচ্ছা চলার অবস্থাকে বিনষ্ট করে দিয়েছে এরূপ ধারণাও ঠিক নয়। আসলে মানুষ কেউ স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা হিসাবে জন্মগ্রহণ করে না। কিন্তু এক মানুষ অপর মানুষ থেকে অভিন্নও নয়। তারা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি গুণগতভাবে বিভিন্ন। এ-কারণেই এককে অপরের উপর নির্ভর করতে হয়। রাষ্ট্র হচ্ছে একটি পরস্পরনির্ভরশীল সংগঠন। মানুষের স্বভাব এবং প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। তাই রাষ্ট্র অবশ্যই স্বাভাবিক সংগঠন; অস্বাভাবিক কিংবা কৃত্রিম নয়। এবং সে অপ্রয়োজনীয় নয়। সে অপরিহার্য।

সংলাপের এই অংশটিতে সক্রেটিস প্রধানত মানুষের অর্থনীতিক প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন পূরণে যে-মানুষের যেরূপ দক্ষতা সেই মানুষের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে গঠন করছেন। বর্তমানে জোর হচ্ছে মানুষে মানুষে গুণ এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে বিভিন্নতার উপর। স্বভাবগতভাবে যার যে-গুণ আছে সেই গুণের পরিচর্যায় সে দক্ষ হয়ে উঠলে পরেই মাত্র তার কাছ থেকে সমাজ সর্বোত্তম উপকার অর্জন করতে পারে, সে-ও সমাজকে তার সর্বোত্তম দান করতে পারে। শ্রমের বিভাগ এবং বিশেষকরণের এই মূলনীতিটি প্লেটো এখানে প্রকাশ করছেন। এই মূলনীতিটিই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাতেও প্লেটো পরবর্তীকালে প্রয়োগ করবেন।

এই প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রগঠনের জন্য প্লেটো পাঁচটি অর্থনীতিক শ্রেণীর প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করছেন। এই শ্রেণীগুলি হচ্ছে ঃ ১. উৎপাদক ঃ কৃষকএবং কারিগর; ২. বণিক বা আমদানিকারক; ৩. নাবিক এবং নৌযান মালিক; ৪. ব্যবসায়ী; ৫. শ্রমিক বা দৈহিক শ্রম ভাড়াদানকারী দিনমজুর।

রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের আবশ্যক তার আমরা উল্লেখ পাচ্ছি। কিন্তু এদের মধ্যে দাসের কোনো উল্লেখ নেই। অথচ এথেন্স নগরীর দাসের সংখ্যা নগরীর সমগ্র জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের অধিক বই অল্প ছিল না। বিষয়টি তাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এর কারণ এই নয় যে প্লেটো প্রচলিত দাস

ব্যবস্থাকে অন্যায় বলে বিবেচনা করছেন। দাসরা অন্যদের মতো প্লেটোর নিকটও একটি স্বীকৃত এবং অপরিহার্য উপাদান ছিল। কিন্তু দাসরা নাগরিক নয়। এবং রাষ্ট্র তো নাগরিকদের দ্বারাই গঠিত হবে। কাজেই রাষ্ট্রগঠনের বর্ণনাতেও দাসদের কোনো উল্লেখের আবশ্যকতা প্লেটো বোধ করেন না।

গ্লকন এবং এ্যাডিম্যান্টাসের বুদ্ধির প্রাখর্যকে আমি সব সময়েই প্রশংসা করেছি। কিন্তু এবার তাঁদের যুক্তি শুনে আমি যথার্থই চমৎকৃত হয়ে গেলাম। তাই উৎসাহের প্রাবল্যে আমি বলে উঠলাম ঃ খ্যাতিমান পিতার বংশধরগণ! তোমাদের আমি ধন্যবাদ জানাই। মেগারার যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তোমরা যখন প্রত্যাবর্তন করেছিলে তখন গ্লকনকে উদ্দেশ করে তার স্তুতিগায়ক বলেছিল ঃ এ্যারিস্টনের পুত্রদ্বয় দেবতাদের বরপুত্র-বিশেষ। তোমাদের যুক্তি যে এমন স্তুতির উপযুক্ত তা বলতে আমার দ্বিধা নেই। কারণ দেবতার বরপুত্র বাদে এমন অপরূপভাবে একদিকে অন্যায়ের শ্রেয়তার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন এবং অপরদিকে নিজেদের সেই দুর্বার যুক্তিতে আস্থা স্থাপন না করার কথা উচ্চারণ করা আর কোন্ মানবপুত্রের পক্ষে সম্ভব! কারণ, এ্যাডিম্যান্টাস, আমি মনে করি, তোমরা নিজেদের যুক্তিকে নিজেরাই বিশ্বাস করছ না। তোমাদের যথার্থ স্বভাবকে যদি আমি না জানতাম তা হলে হয়তো তোমাদের মুখের কথাকেই আমি অধিক মূল্য দিতাম। কিন্তু আমি তোমাদের জানি বলেই, তোমাদের উপর আমার আস্থা যত প্রবল হচ্ছে, তোমাদের মুখের কথা অনুধাবন করা আমার পক্ষে তত দুরূহ হচ্ছে। বলা চলে আমি এক উভয়সংকটের মধ্যে নিপতিত হয়েছি। একদিকে আমার আশঙ্কা, আমার যুক্তির উপর তোমাদের আস্থা উৎপাদনের গুরুদায়িত্বে আমি হয়তো-বা অক্ষম। কারণ, অন্যায়ের চেয়ে ন্যায়ের শ্রেয়তার প্রশ্নে থ্র্যাসিমেকাসকে আমি যে-জবাব দিয়েছিলাম সে-জবাবে তোমরা সন্তুষ্ট হতে পারনি। অপরদিকে যুক্তির ক্ষেত্র থেকে অপসরণেরও আমি কোনো উপায় দেখছিনে। কারণ ন্যায়ের অপবাদে তার পক্ষ অবলম্বন না করে নীরব থাকার মধ্যে একটা পাপবোধের যে প্রশয় রয়েছে সে-সত্যকেও আমি অস্বীকার করতে পারিনে। তাই আমার ক্ষমতানুযায়ী আক্রান্ত ন্যায়ের সাহায্যে অগ্রসর হওয়াই আমার কর্তব্য বলে আমি বিবেচনা করছি।

গ্লকন এবং তাঁর সঙ্গীগণও আমাকে নানাভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন যেন আলোচনাটি পরিত্যাগ না করে সত্যানুসন্ধানের কাজটি আমি চালিয়ে যাই।

সত্য নির্ধারণে তাঁদের দাবি প্রধানত দুটি ঃ প্রথমত ন্যায় এবং অন্যায়ের সঠিক চরিত্র নির্দিষ্টকরণ এবং দ্বিতীয়ত উভয়ের লাভালাভ স্থিরীকরণ। এক্ষেত্রে আমি তাঁদের নিকট আমার মনের কথাটি খুলে বললাম। আমি বললাম ঃ সত্যানুসন্ধানের এ-কাজ বিশেষ কঠিন কাজ। কাজেই সত্যোপলব্ধির জন্য আবশ্যক হবে উপযুক্ত দৃষ্টি। এ-ব্যাপারে আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা চিন্তা করে আমি বললাম, এ-কারণে সত্য নির্ধারণের একটি উপযুক্ত পদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় এই পদ্ধতিকে বোঝাবার জন্য আমি আমার সঙ্গীদের নিকট একটি উপমার উল্লেখ করলাম। আমি বললাম, ধর ক্ষীণদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কোনো লোককে দূর থেকে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিপিবদ্ধ কোনো পত্র পাঠ করতে বলা হল। কিন্তু একথা বোঝা সহজ যে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এবং অক্ষর ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে এ-পত্র এই ব্যক্তি পাঠ করতে সক্ষম হবে না। এমন অবস্থায় এরূপ অসম্ভব নয় যে, বুদ্ধিমান কোনো ব্যক্তি বলে উঠবে ঃ দেখা যাক-না বৃহৎ অক্ষরে অনুরূপ কোনো পত্র পাওয়া যায় কি না। তা হলে এই ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হলেও বৃহৎ অক্ষর সে পাঠ করতে পারবে। এবং পরে ক্ষুদ্র অক্ষর অনুধাবন করাও তার পক্ষে সম্ভব হবে। অবশ্য বৃহৎ অক্ষরে অনুরূপ পত্র পাওয়াটা সহজ হবে না। পাওয়া গেলে তাকে বিশেষ সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে। কী বল এ্যাডিম্যান্টাস?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা যথার্থ। কিন্তু সক্রেটিস, এ-উপমা আমাদের বর্তমান অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তুমি কীভাবে প্রয়াগ করবে?

আমি বললাম ঃ আমি বুঝিয়ে বলছি। ন্যায়ের চরিত্র-নির্ধারণই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। আর একথা তোমরা জান যে, এই ন্যায়কে কখনো আমরা ব্যক্তির ধর্ম, কখনো তাকে রাষ্ট্রের ধর্ম বলে অভিহিত করি। একথা ঠিক নয় কি?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা ঠিক।

বেশ! কিন্তু ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র কি বৃহৎ নয়?

অবশ্যই।

তাই যদি হয় তা হলে বৃহত্তরের মধ্যেই ন্যায়ের পরিমাণ যেমন অধিক পাওয়া যাবে, তেমনি তার মধ্যেই তা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। এ-কারণেই আমার প্রস্তাব হচ্ছে, এসো আমরা প্রথমে বিবেচনা করে দেখি, রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় এবং অন্যায় কীভাবে প্রতিভাত হয়। এর পরে ব্যক্তির মধ্যে বিষয়টিকে অনুধাবন করার আমরা চেষ্টা করব। এভাবেই বৃহত্তর থেকে যেমন

ক্ষুদ্রতরের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারব, তেমনি উভয়কে তুলনাক্রমে আমরা বিচার করতেও সক্ষম হব।

এ্যাডিম্যান্টাস উৎসাহিত হলেন। তিনি বললেন ঃ সক্রেটিস, এটি অতি উত্তম প্রস্তাব।

আমার প্রস্তাবের সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমরা যদি রাষ্ট্রের উদ্ভবপ্রক্রিয়াকে লক্ষ করি তা হলে ন্যায় এবং অন্যায়ের উদ্ভবের ধারাটিকেও আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

নিঃসন্দেহে।

রাষ্ট্রের বিশ্লেষণ শেষ করে আমরা দেখব, আমাদের মূল লক্ষ্যটি ইতিমধ্যেই নজরের মধ্যে এসে গেছে এবং তাকে আবিষ্কার করা সহজতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ। অবশ্যই অনেক সহজ হবে।

আমি বললাম ঃ কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস ভেবে দ্যাখো, কাজটি বেশ কঠিন হবে। এ-কাজ শুরু করা কি আমাদের উচিত হবে?

এ্যাডিম্যান্টাস দমলেন না। বললেন, আমি ভেবে দেখেছি সক্রেটিস। আমি তোমার অগ্রসর হওয়ার জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করে আছি।

আমি বললাম ঃ বেশ, তা হলে শুরু করা যাক। রাষ্ট্রের কথা বলছিলাম। ভেবে দ্যাখো, রাষ্ট্রের উদ্ভব কেমন করে ঘটে। আমার মতে মানুষের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। ব্যক্তি হিসাবে আমরা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই অভাব রয়েছে। এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের বাইরে রাষ্ট্রের উ ৎপত্তির অপর কোনো কারণের কথা কি আমরা চিন্তা করতে পারি?

না, অপর কোনো কারণের কথা আমরা চিন্তা করতে পারিনে।

আমাদের অভাব বা প্রয়োজনের সংখ্যা একটি নয়—অনেক। এজন্য সে অভাব পূরণের জন্য আবশ্যক হয় অনেক লোকের। কোনো বিশেষ অভাবপূরণের জন্য আমরা বিশেষ লোককে নিয়োগ করি। অপর কোনো অভাবের জন্য অপর কোনো লোক নিযুক্ত হয়। অবশেষে অভাবপূরণের ক্ষেত্রে নিয়োজিত এই সাহায্যকারীগণ এবং সঙ্গীগণ যখন একটি নির্দিষ্ট লোকালয়ে সম্মিলিত হয় তখন যে-সংস্থার উদ্ভব ঘটে, তাকে আমরা রাষ্ট্র বলে অভিহিত করি।

একথা যথার্থ।

এই সংস্থার অধিবাসীদের মধ্যে তখন বিনিময়ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরস্পরের পরিশ্রমের ফলের বিনিময় ঘটে। বিনিময় ঘটে, কারণ এরূপ বিনিময়কে আমরা পরস্পরের জন্য লাভজনক বলে বিবেচনা করি।

অবশ্যই।

এসো এ্যাডিম্যান্টাস, এবার মনেমনে আমরা এরূপ একটি রাষ্ট্রের পত্তন করি। অবশ্য এর উৎপত্তি মনোগত হলেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না এর মূলে রয়েছে আমাদের অভাব বা প্রয়োজন। কেননা প্রয়োজনই হচ্ছে আবিষ্কারের প্রসূতি।

না, আমরা ভুলব না, প্রয়োজনই আবিষ্কারের প্রসূতি।

বেশ। কিন্তু কোন্ প্রয়োজন আমাদের সর্বাধিক? আমাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে নিশ্চয়ই খাদ্যের। কারণ জীবন এবং অস্তিত্বের মূলে রয়েছে খাদ্য।

এতে আর সন্দেহ কী?

এর পরে আসে বাসস্থানের প্রয়োজন। এবং পরে আসে পর্যায়ক্রমে পরিধেয়-সামগ্রীর প্রয়োজন এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির প্রশ্ন।

একথাও সত্য।

এবার দেখা যাক যে-নগরের কথা আমরা চিন্তা করছি সেখানে এ-সমস্ত প্রয়োজনের যোগান কেমন করে হবে? এর একটা সমাধান হচ্ছে বিশেষ রকম প্রয়োজন পূরণের জন্য বিশেষ রকম লোকের নিয়োগ। এমন হতে পারে যে, কোনো লোক আমাদের খাদ্যসামগ্রী তৈরি করবে এবং বাসস্থান তৈরির জন্য থাকবে অপর কোনো লোক। পরিধেয়র জন্য তন্তুবায়কে আমরা নিযুক্ত করতে পারি। প্রয়োজন হলে পাদুকা প্রস্তুত করার জন্যও লোক নির্দিষ্ট করা যেতে পারে এবং শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও অপর কোনো লোককে নিয়োগ করা যায়। কী বল এ্যাডিম্যান্টাস?

অবশ্যই সক্রেটিস। তাও আমরা করতে পারি।

মোট কথা রাষ্ট্রসংস্থার যে-কোনো প্রাথমিক চিন্তায় চার-পাঁচ রকম লোকের কথা তোমাকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

তাতে আর সন্দেহ কী, সক্রেটিস।

বেশ তা-ই যদি হয়, তা হলে এবার চিন্তা করা যাক, এদের পারস্পরিক সম্পর্ক কী হবে। তাদের কাজের প্রক্রিয়া কেমন হবে? পাঁচরকম লোকের কথা

আমরা বলেছি। এদের মধ্যে খাদ্য উৎপাদনকারীর কথা ধরা যাক। সে কী করবে? সে কি তার নিজের খাদ্যসংস্থান ছাড়া অপর চারজনের জন্যও খাদ্য তৈরি করবে? তেমন হলে তাকে নিজের ছাড়া আরও চারগুণ পরিশ্রম করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তার এই মোট পরিশ্রমের ফল কি সে সম্মিলিত ভাণ্ডারে এনে জমা করবে, না সে তার পরিশ্রমের এক-চতুর্থাংশ দ্বারা কেবল নিজের খাদ্যেরই সংস্থান করবে এবং অপরের খাদ্যের জন্য আদৌ কোনো পরিশ্রম করবে না? এভাবে এক-চতুর্থাংশ সময়ের খাদ্যেই তার নিজের চলে যাবে। বাকি তিন-চতুর্থাংশ সময় সে তার নিজের পরিধেয়, বাসস্থান এবং পাদুকা তৈরিতে ব্যয় করতে পারবে। মোটকথা, জীবন ও জীবিকার প্রশ্নে অপরের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। তার নিজের যা প্রয়োজন তা সে নিজেই পূরণ করবে।

এ-সমস্যার ক্ষেত্রে আমার মনে হল এ্যাডিম্যান্টাসের মনোভাব হচ্ছে খাদ্য উৎপাদনকারী কেবল খাদ্যই উৎপাদন করবে, প্রয়োজনের সকল দ্রব্য নয়।

তাঁর মনোভাবের কথা খেয়াল রেখে আমি বললাম ঃ হয়তো এমন পদ্ধতিই উত্তম। কিন্তু সাথে সাথে একথা তো আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের সকলের প্রকৃতি এক নয়। আমাদের প্রকৃতিতে বিভিন্নতা আছে। কোনো বিশেষ প্রকৃতি হয়তো বিশেষ কাজের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।

তোমার একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

আর তা ছাড়া এক ব্যক্তি যদি একাধিক রকমের কাজ করে তা হলে কি আমরা তার কাছ থেকে উত্তম ফলের আশা করতে পারব? অথবা এক ব্যক্তি কেবল একপ্রকার কাজে নিবদ্ধ থাকলেই আমরা উৎকৃষ্ট ফললাভের আশা করতে পারব?

সে যদি একপ্রকার কাজ করে তা হলেই সে উত্তমভাবে তা করতে পারবে।

আবার সময়ের প্রশ্নটি রয়েছে। ঠিক সময়ে কাজ করা না হলে কাজটা আদতেই পণ্ড হয়ে যেতে পারে।

তা ঠিক।

কারণ, কেউ একটা কাজ করলে সেটা সম্পন্ন করে অবসর পেলে সে অন্য কাজ শুরু করতে পারবে, তার পূর্বে নয়। যে-কাজ সে শুরু করেছে তাকে শেষ না করা পর্যন্ত অপর কাজের অবসর পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কোনো কাজ তো কর্মীর অবসরের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে না।

সেকথাও ঠিক।

তাহলে আমরা এরূপ অনুমান করতে পারি যে, কাজের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ফল কেবলমাত্র তখনই আমরা লাভ করতে পারি যখন একজন লোক একপ্রকার কাজেই নিবদ্ধ থেকে উপযুক্ত সময়ে কাজটি সম্পন্ন করে। এ-পদ্ধতির মাধ্যমেই পরিমাণ এবং গুণ উভয়ের উৎকৃষ্টতাই আমরা লাভ করতে পারি।

নিঃসন্দেহে।

তা-ই যদি হয়, তা হলে কেবল চার রকম লোকেই আমাদের রাষ্ট্রের সমগ্র কাজ নিষ্পন্ন হবে না। কারণ, তখন যে খাদ্য উৎপাদন করবে নিশ্চয়ই লাঙল, জোয়াল, মই অর্থাৎ কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি উৎপাদন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না এজন্যই যে, একাধিক কাজের জন্য তা হলে এর কোনো উৎকৃষ্টতা থাকবে না। তেমনি যে গৃহনির্মাণ করবে সেও নিশ্চয়ই গৃহনির্মাণের যন্ত্র নির্মাণ করবে না। তার জন্যও অপর লোকের প্রয়োজন হবে। তন্তুবায় কিংবা পাদুকা নির্মাণকারীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

হ্যাঁ, একথা তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, যে-ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটির আমরা কল্পনা করেছিলাম তা খুব ক্ষুদ্র থাকছে না। সেখানে সূত্রধর, কর্মকার এবং অপরাপর অন্যান্য অনেক কারিগরেরই প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। এদের সহযোগেই আমাদের রাষ্ট্র গড়ে উঠছে।

তা-ই তো দেখা যাচ্ছে।

কেবল তন্তুবায় কিংবা পাদুকা নির্মাণকারীই নয়, এদের সঙ্গে মেষপালক, রাখাল ইত্যাদির কথাও আমাদের ভাবতে হয়। কারণ, যে হাল চাষ করবে তার তো গো-মহিষের প্রয়োজন হবে। তন্তুবায়দেরও পরিধেয় তৈরির জন্য পশমের প্রয়োজন হবে। অবশ্য এদের যোগ করলেই যে আমাদের রাষ্ট্র খুব বৃহৎ আকার ধারণ করবে, এমন নয়।

তা নয়। কিন্তু এদের সহ রাষ্ট্র আমাদের খুব ক্ষুদ্রও হবে না, সক্রেটিস।

নগরের আর-একটা দিক আছে। সে হচ্ছে নগরের বাইরে থেকে দ্রব্যাদি আমদানি করার দিক। কারণ একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার কোনোকিছুই আমদানি করার আবশ্যক করে না, তেমন নগরের দৃষ্টান্ত পাওয়া ভার।

এমন নগর আদৌ দেখা যায় না।

তা হলে তোমার নগরের মধ্যে আমদানিকারক বলে আর এক শ্রেণীর লোকের কথাও ভাবতে হয়। এদের কাজ হবে অন্য নগর থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি করা।

হ্যাঁ, এদের কথাও আমাদের ভাবতে হয়।

কিন্তু আমদানিকারক বা বণিক অন্য নগরে শূন্য হাতে গেলে তাকে সেখান থেকে শূন্য হাতেই ফিরতে হবে। অন্য নগরের যা আবশ্যক তাকে সে-সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে করে নিতে হবে। তাই নয় কি?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তা না হলে অন্য নগর তাকে তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেন দেবে?

তা হলে দাঁড়াচ্ছে যে, উৎপাদন কেবল নগরের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হলেই হবে না। নগরের উৎপাদনকে অবশ্যই পরিমাণ এবং গুণের দিক থেকে অপর নগরের প্রয়োজনের অনুরূপও হতে হবে।

একথা অবশ্যই সত্য।

তা হলে পূর্বে যা ভেবেছি, তার চেয়েও অধিকসংখ্যক তন্তুবায় এবং অন্যান্য কারিগরের আবশ্যক হবে।

তা ঠিক।

বণিক বা আমদানি এবং রফতানিকারকের প্রয়োজন তো আছেই।

হ্যাঁ, তাদেরও প্রয়োজন থাকবে।

আমাদের রাষ্ট্রে ব্যবসায়ীদেরও ঠাঁই দিতে হবে?

হ্যাঁ, তাদেরও ঠাঁই দিতে হবে।

কিন্তু ব্যবসায়ের দ্রব্যসামগ্রী তুমি সমুদ্রের উপর দিয়ে বহন করবে কিসে? সেজন্য নিশ্চয়ই প্রয়োজন হবে প্রচুরসংখ্যক দক্ষ নাবিকের।

হ্যাঁ, এদের প্রচুর সংখ্যায় আবশ্যক হবে।

তারপর নগরের অভ্যন্তরে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ের প্রশ্ন রয়েছে। এদের বিনিময়ের পদ্ধতি কী হবে? বিনিময়-প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক। কারণ, এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি, আমাদের রাষ্ট্রপত্তনের একটা মূল উদ্দেশ্য ছিল একের পরিশ্রমের ফলের সঙ্গে অপরের পরিশ্রমের ফলের বিনিময় সাধন করা।

হ্যাঁ, বিনিময়ের প্রশ্ন রয়েছে। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই এর সমাধান হতে পারে।

তা ঠিক। তা হলে বিকিকিনির জন্য বাজারের আবশ্যক হবে আর বিনিময়ের জন্য মূল্যের পরিমাপক মুদ্রারও আবশ্যক হবে।

হ্যাঁ, মুদ্রার তো আবশ্যক হবেই।

এবার তা হলে আর-একটা সমস্যার কথা ভেবে দ্যাখো। মনে করো কৃষক কিংবা কারিগর তার উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে এল। কিন্তু সে যখন এল তখন বাজারে কোনো ক্রেতা নেই। এমন কেউ নেই যার সঙ্গে তার দ্রব্যের বিনিময় ঘটতে পারে। এখন সে কী করবে? সে কি তার জীবিকার কাজ ছেড়ে তার উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে বাজারে কর্মহীন হয়ে বসে থাকবে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ না, কর্মহীন হয়ে সে আদৌ কালক্ষেপণ করবে না। বাজারে এমন লোক থাকবে যে তার কাছ থেকে তার দ্রব্য ক্রয় করবে। কারণ, যে-রাষ্ট্র সুসংগঠিত সে-রাষ্ট্রে ক্রয়কারীরও ব্যবস্থা থাকবে। সাধারণত যে-সমস্ত নাগরিক শারীরিকভাবে দুর্বল, অর্থাৎ যারা অপর কোনো পরিশ্রমের উপযুক্ত নয় তাদের দায়িত্ব হবে বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের দপ্তর পরিচালন করা। এখানে বিক্রেতার কাছ থেকে তারা দ্রব্যাদি ক্রয় করে তার মূল্য পরিশোধ করবে এবং ক্রয়কারীকে দ্রব্যাদি সরবরাহ করে তার কাছ থেকে দ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করবে।

তা হলে এই বিশেষ প্রয়োজনে আমাদের রাষ্ট্রে খুচরা ব্যবসায়ী নামক একটি শ্রেণীরও উদ্ভব হচ্ছে? তাই নয় কি? আমি খুচরা ব্যবসায়ী বলছি, কারণ বাজারে যারা ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করে তাদের এই নামেই অভিহিত করা হয়। আর যারা নগর থেকে নগরে যাতায়াত করে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় কিংবা বিক্রয় করে তাদের বণিক বলা হয়। ঠিক নয় কি, এ্যাডিম্যান্টাস?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আর এক ধরনের লোকের কথাও বলতে হয়। এরা বুদ্ধিগতভাবে অপরের সহযোগী নয়। কিন্তু তাদের দেহের শক্তি প্রচুর। তাদের দেহের শক্তি তারা বিক্রয় করে। এ কারণে তাদের আমি বলতে পারি ভাড়াটে। ভাড়াটে এজন্য যে, তাদের পরিশ্রমের মূল্যকে লোকে 'ভাড়া' বলে আখ্যায়িত করে।

তা ঠিক।

তা হলে এবার ভাড়াটেরাও আমাদের রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করল?

তা-ই তো দেখছি সক্রেটিস!

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ্যাডিম্যান্টাস, উদ্ভবের যে-প্রক্রিয়া আমরা দেখলাম তাতে আমাদের রাষ্ট্র পরিপূর্ণ এবং ত্রুটিশূন্য হয়েছে কিংবা হয়নি?

আমি মনে করি, রাষ্ট্র এবার ত্রুটিশূন্য এবং পরিপূর্ণ হয়েছে।

এবার তা হলে দেখা যাক, ন্যায় এবং অন্যায়ের সাক্ষাৎ আমরা কোথায় পাচ্ছি? রাষ্ট্রের, কোন বিভাগকে আমরা ন্যায়ের উৎস বলে গ্রহণ করব?

সক্রেটিস, আমার তো মনে হয় রাষ্ট্রের নাগরিকদের পারস্পরিক লেনদেনের মধ্যেই ন্যায় এবং অন্যায়ের সাক্ষাৎ আমরা লাভ করতে পারি। এ ছাড়া অপর কোথাও ন্যায়-অন্যায়ের উৎপত্তি ঘটতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

অধ্যায় ঃ ৭
[৩৭২—৩৭৪]

সমৃদ্ধ রাষ্ট্র

রাষ্ট্র রচনার গোড়াতে সক্রেটিস তাঁর রাষ্ট্রকে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রাখতে চেয়েছিলেন, যেখানে কৃষক, বণিক, ব্যবসায়ী, নাবিক ও মজুর এই পাঁচটি অর্থনীতিক শ্রেণীই যথেষ্ট। "এই নাগরিকগণ নিজেদের জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, পাদুকা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। ... গম এবং বার্লির ময়দা হবে তাদের প্রধান খাদ্য। এ দিয়ে তারা বিভিন্নপ্রকার খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করবে। পরিচ্ছন্ন পত্রই তাদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।" মোটকথা এটি একটি সরল সমস্যাহীন রাষ্ট্র। সর্বকালের ও দেশের সমস্যাদীর্ণ মানুষই এরূপ অতীতকালের সরল সমস্যাহীন জীবনের কল্পনা করে। মানুষের মনে একটি বাসনা জাগে—যদি এরূপ সরল জীবনে ফিরে যাওয়া যেত তা হলে আর কোনো সমস্যা থাকত না। কিন্তু বহু পর্যায়ের মাধ্যমে উত্তীর্ণ এবং বিকশিত জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনে সংগঠিত সমস্যাদীর্ণ মানুষের পক্ষে কি সেই সরল প্রকৃতির জীবনে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব? না, তা সম্ভব নয়। প্লেটো কল্পনাপ্রবণ বটে, কিন্তু তিনি বাস্তব গ্রীসের সমস্যার বাস্তব সমাধানেরই চেষ্টা করেছেন। সে-কারণেই তাঁর একনিষ্ঠ এই সংলাপ-প্রণয়ন-প্রয়াস। এমন সরল জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের সমস্যা নেই। শাসক-শাসিতের সমস্যা নেই। তাই রাষ্ট্রকে তার বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে নিয়ে যেতে হয়। গ্লকন সেই পর্যায়ান্তরে যাওয়ার সূচনা করলেন তাঁর টিপ্পনী দিয়ে ঃ সক্রেটিস, তোমার নগরবাসীদের খাদ্যে কিছু লবণের আবশ্যক হবে। না হলে তাতে সুস্বাদ সঞ্চারিত হবে না।

"আমি বললাম যথার্থ। এ দিকটাতে আমি খেয়াল রাখতে পারি নি। ..."

তাই গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ঃ "আমি বললাম, তোমার মনোভাবটি আমি বুঝতে পারছি। তোমার কথা হচ্ছে, কেবলমাত্র

রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখালেই চলবে না। আমাদের দেখাতে হবে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের কীভাবে উদ্ভব ঘটে। তোমার প্রস্তাবটি মন্দ নয় গ্লকন। কারণ তেমন রাষ্ট্রে ন্যায়-অন্যায়ের উদ্ভব হয়তো আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে লক্ষ করতে সক্ষম হব।" এ-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের যেমন কামনা অধিকতর সমৃদ্ধ হবার; তেমনি পার্শ্ববর্তী সমৃদ্ধিহীন রাষ্ট্রের চোখ এই সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতি, যদি একে দখল করে নিতে পারে। তাই সক্রেটিসের আদর্শ রাষ্ট্রেরও আবশ্যক সৈন্যবাহিনীর, একটি নূতন এবং বিশেষ শ্রেণীর, যাদের দায়িত্ব হবে দেশকে রক্ষা করা এবং সেজন্য কৌশল অনুশীলন করে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ হওয়া। সক্রেটিসের আদর্শ রাষ্ট্র যে আদর্শ রাষ্ট্রসমূহের কোনো কাল্পনিক দুনিয়ায় নয়, সে যে আক্রমণোদ্যত বাস্তব রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত—এ-সত্যটি প্লেটোর রাষ্ট্র-পরিকল্পনার মূলের বাস্তব দিকটিকেই আবার আলোকিত করে তোলে।

এ্যাডিম্যান্টাসের একথা শুনে আমি বললাম ঃ এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার ধারণা যথার্থ হবে বলেই আমার বিশ্বাস। বেশ, তা হলে অনুসন্ধানের কাজটি পরিহার না করে, এসো আমরা বিচার করে দেখি ন্যায়-অন্যায়ের যথার্থ উৎপত্তি কোথায়।

আমাদের রাষ্ট্রগঠন-প্রক্রিয়াটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। কোন্ কোন্ শ্রেণীর নাগরিকের আবশ্যক, তা আমরা দেখেছি। এবার তাদের জীবনধারার কথা আলোচনা করা যাক। একথা তো সত্য যে, এই নাগরিকগণ নিজেদের জন্য খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, পাদুকা এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। বাসস্থানের নিশ্চয়তার পরে তারা অবশ্যই নিজ নিজ কার্যে লিপ্ত হবে। ঋতুর ব্যতিক্রমে গ্রীষ্মে যদি তারা নগ্নদেহে এবং নগ্নপদে আপন-আপন জীবিকায় নিযুক্ত থাকতে পারে, শীতার্ত সময়ে অবশ্যই তাদের উপযুক্ত বস্ত্রাদি এবং পাদুকার প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রোৎপত্তির শুরুতে নাগরিকগণের জীবনধারাটিও আমরা কল্পনা করতে পারি। গম এবং বার্লির ময়দা হবে তাদের প্রধান খাদ্য। এ দিয়ে তারা বিভিন্নপ্রকার খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করবে। পরিচ্ছন্ন পত্রই তাদের খাদ্যদ্রব্য পরিবেশনের পাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

তাদের খাদ্যগ্রহণ এবং পরিবেশনে একটা আনন্দের ভাব বিদ্যমান থাকবে। খাদ্য প্রস্তুত হলে তারা নিশ্চয়ই আরামের সঙ্গে আসন গ্রহণ করবে।

পানপাত্রে মদ্য থাকবে। তাদের শিশুরা পুষ্পস্তবকে নিজেদের মস্তক আবৃত করে তাদের ঘিরে নৃত্য করবে। সবার কণ্ঠে দেবতাদের বন্দনা ধ্বনিত হবে। পারস্পরিক আনন্দ-সংলাপে এই সময়টি তাদের অতিবাহিত হবে। কিন্তু দারিদ্র্য এবং যুদ্ধের আশঙ্কার কথা তাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। তাই তাদের সতর্ক থাকতে হবে যেন পরিজনের সংখ্যা খাদ্যের পরিমাণকে অতিক্রম না করে।

এ-সময়ে গ্লকন একটু ফোড়ন কাটলেন। গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার নগরবাসীদের খাদ্যে কিছু লবণের আবশ্যক হবে। না হলে তাতে সুস্বাদ সঞ্চারিত হবে না।

আমি বললাম ঃ যথার্থ। এদিকটাতে আমি খেয়াল রাখতে পারিনি। আমাদের নগরবাসীদের খাদ্য অবশ্যই সুস্বাদের হবে। বাদাম তৈল, লবণ এবং পনিরের তাতে মিশ্রণ থাকবে। গ্রামের লোকের ন্যায় তারা তাদের খাদ্যদ্রব্য মূল এবং ওষধি সহযোগে সিদ্ধ করবে। ডুমুর, পিঁয়াজ এবং মটরশুঁটিও তারা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করবে। এরূপ হলে তাদের ভোজনটা গুরুভোজনই হবে। ভোজনের সঙ্গে সংযম সহকারে তারা মদ্যপানও করবে। এরূপ খাদ্যব্যবস্থায় তারা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য-সহকারে শান্তিতে পরিণত বয়স অবধি জীবিত থাকতে পারবে। পরিণত বয়সে মৃত্যুকালে সন্তানসন্ততির জন্য অনুরূপ জীবনের উত্তরাধিকারও তারা রেখে যেতে পারবে, এরূপ আমরা কল্পনা করতে পারি।

গ্লকন আবার ফোড়ন কাটলেন ঃ তোমার পরিকল্পনা অবশ্যই উত্তম সক্রেটিস। শুয়োরের শহরের জন্য এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

আমি বললাম ঃ গ্লকন, তোমার ইচ্ছাটি কী?

গ্লকন বললেন ঃ আমার তো মনে হয়, নাগরিকদের জন্য তোমার আধুনিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। তোমার নাগরিকগণ যদি আয়েশি হয় তা হলে তাদের জন্য বৃক্ষপত্রের বদলে অবশ্যই তুমি নরম গদির ব্যবস্থা করবে। কারণ তারা আহার করবে আহার গ্রহণের উচ্চ টেবিল থেকে। এবং আধুনিক রীতি অনুযায়ী তাদের খাদ্যতালিকায় থাকবে কিছু ঝাল-টক-চাটনি এবং মিষ্টি।

আমি বললাম ঃ তোমার মনোভাবটি আমি বুঝতে পারছি। তোমার কথা হচ্ছে, কেবলমাত্র রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখালেই আমাদের চলবে না। আমাদের দেখাতে হবে একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের কীভাবে উদ্ভব ঘটে। তোমার প্রস্তাবটি মন্দ নয়, গ্লকন। কারণ তেমন রাষ্ট্রে ন্যায়-অন্যায়ের উদ্ভব হয়তো আমরা অধিকতর স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করতে সক্ষম হব। আমার মতে অবশ্য আমি যেরূপ রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছি তেমন রাষ্ট্রই সুস্থ-সংগঠনসম্পন্ন হতে পারে। বিলাস-ব্যসনের চরম

প্রকাশও যদি কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থায় তুমি দেখতে চাও, তবে তার বর্ণনাও আমি করতে পারি। এমন রাষ্ট্রের নাগরিক অবশ্যই সহজ জীবনে সন্তুষ্ট হবে না। বিলাস-উপকরণকে তারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার আগ্রহ পোষণ করবে। গদি, টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবই যথেষ্ট হবে না। তাদের প্রয়োজন হবে সুগন্ধিদ্রব্যাদির এবং পরিচর্যাকারী পরিচারক ও পরিচারিকার। খাদ্যদ্রব্যাদিও কেবল একপ্রকারের হলে চলবে না। বিভিন্নপ্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের আবশ্যক হবে। মোটকথা, একটি সহজ জীবনের অত্যাবশ্যক হিসাবে যে-বাসস্থান, পরিচ্ছদ এবং পাদুকার কথা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম তা এরূপ নাগরিকদের নিকট আদৌ যথেষ্ট বিবেচিত হবে না। বাসস্থানকেও সুশোভিত করতে হবে। এবং সেজন্য প্রয়োজন হবে চিত্রঅঙ্কনের এবং শোভন বস্ত্রের সূচিশিল্পীর। অঙ্গাভরণের জন্য আবশ্যক হবে স্বর্ণ, জগমতি এবং অন্যান্য মহার্ঘ দ্রব্য।

গ্লকন বললেন ঃ তা তো বটেই।

তা হলে সমৃদ্ধির সীমানা আমাদের বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। কারণ গোড়াতে আমি যে-সুস্থ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলাম সে-রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এবার তা হলে এমন জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে যার প্রয়োজন কেবল স্বাভাবিক অভাব-পূরণেই নিহিত নয়। নতুনতর শ্রেণীর এবার উদ্ভব ঘটবে। বাদক, কবি এবং নর্তকের আবশ্যক হবে। স্ত্রীলোকের বিশেষ পোশাকসহ বিভিন্নপ্রকার বস্ত্রের জন্য হরেক রকম বস্ত্র বয়নকারীরও প্রয়োজন হবে। এবং কেবল পরিচারক নয়, ধাত্রী, সেবিকা, ক্ষৌরকার, রন্ধনকারী, শূকর পালক ইত্যাকার অপরাপর শ্রেণীর লোক, যাদের আবশ্যকতা আমাদের প্রাথমিক রাষ্ট্রকল্পনাতে ছিল না, তাদের উদ্ভব ঘটবে। আর কেবল শুয়োরেই শেষ হবে না, লোকের খাদ্য হিসাবে জন্তু-জানোয়ারেরও প্রকারভেদের প্রয়োজন হবে। কী বল তুমি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

আর এ-জীবনে চিকিৎসকের প্রয়োজন আগের চেয়ে অধিক বৃদ্ধি পাবে।

নিঃসন্দেহে।

শুধু তা-ই নয়, গোড়াতে যে-রাষ্ট্রের আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম সে-রাষ্ট্রের পরিধিতে এত সংখ্যক নগরবাসীর আর স্থানসঙ্কুলান হবে না।

একথা সত্য। পুরাতন সীমানা আর যথেষ্ট হবে না।

এই স্থানসঙ্কুলান, পশু পালন এবং কৃষিকার্যের জন্য আমরা তখন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি খণ্ডকে অধিকার করতে চাইব। প্রতিবেশী রাষ্ট্রও যদি

আমাদের ন্যায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করে তবে সেও আমাদের রাষ্ট্রের একটি খণ্ড গ্রাস করতে চাইবে। একথা ঠিক নয় কি, গ্লকন?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এ-অবস্থা অনিবার্য।

এবার তা হলে আমাদের যুদ্ধ শুরু করতে হবে। কী বল, গ্লকন?

অবশ্যই।

তা হলে যুদ্ধ ভালো কি মন্দ সে-সিদ্ধান্তের পূর্বে একথা আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিগত কিংবা সংগঠনগত অন্যায়ের মূলে যে-কারণ, যুদ্ধের মূলেও রয়েছে সেই একই কারণ।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, নিঃসন্দেহে একথা সত্য।

আর যুদ্ধের প্রয়োজন যখন এসে পড়েছে তখন রাষ্ট্রের আকার আমাদের আরও বৃদ্ধি করতে হবে। এবারের বৃদ্ধি সংখ্যার দুই-একটিতে নয়, এবারের বৃদ্ধি একটা পুরো সৈন্যবাহিনী গঠন পর্যন্ত পৌঁছবে। এই সেনাবাহিনী আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিবাসী আর সম্পদ—সব কিছুকে রক্ষার জন্যই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

কিন্তু সক্রেটিস, অধিবাসীকে রক্ষার প্রশ্ন কেন আসছে? অধিবাসীগণ কি নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম নয়?

গ্লকনের এ-প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম ঃ না। যে-নীতির ভিত্তিতে আমরা রাষ্ট্র তৈরি করতে শুরু করেছিলাম সে-নীতি ঠিক হলে রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম নয়। গ্লকন, তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমাদের নীতি ছিল এই যে, এক ব্যক্তি একাধিক শিল্প সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারে না।

হ্যাঁ, একথা আমার স্মরণ আছে সক্রেটিস।

কিন্তু যুদ্ধ কি একটি শিল্পকর্ম নয়?

যুদ্ধ অবশ্যই একটি শিল্পকর্ম।

পাদুকা তৈরিতে যে-অধ্যবসায়ের আবশ্যক, যুদ্ধ করতেও সেই অধ্যবসায়ের আবশ্যক।

একথা সত্য।

অথচ পাদুকা প্রস্তুতকারককে একই সঙ্গে আমরা জমিকর্ষণকারী কিংবা বস্ত্রবয়নকারী অথবা গৃহনির্মানকারী বলে স্বীকার করিনি। কারণ, আমরা

চেয়েছি পাদুকাশিল্পী উত্তমরূপে আমাদের পাদুকাই প্রস্তুত করবে। এজন্য প্রকৃতিগতভাবে যে-ব্যক্তি যে-কাজের উপযুক্ত আমরা তার উপর কেবলমাত্র সেই কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছি, অপর কাজের নয়। যার উপর যে-দায়িত্ব ন্যস্ত সে জীবনব্যাপী সে-দায়িত্বই পালন করবে, অপর কোনো দায়িত্ব নয়। তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে কোনো সুযোগকেই সে উপেক্ষা করবে না। আর এই একাগ্র সাধনাতেই সে উত্তম শিল্পী হিসাবে উত্তীর্ণ হবে। এই নীতিতে একজন সৈনিকের দায়িত্বের কথা বিবেচনা করা যাক। সৈনিকের দায়িত্ব উত্তমরূপে সম্পন্ন করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না। কিন্তু যুদ্ধ করার শিল্প বা দক্ষতা অর্জন কি এত সহজ যে সৈনিক কেবল সৈনিক নয়, একই সঙ্গে সে জমি-কর্ষণকারী, পাদুকা প্রস্তুতকারী এবং একজন কারিগর হওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হবে? অথচ যে-পাশা খেলোয়াড় জীবনব্যাপী সাধনার পরিবর্তে অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে পাশাখেলাকে গ্রহণ করে তাকে আমরা দক্ষ পাশা খেলোয়াড় বলে গণ্য করিনে। একাগ্র অধ্যবসায় ব্যতীত কেবলমাত্র হাতিয়ার হাতে নিলেই একজন শ্রমিক দক্ষ কারিগরে পরিণত হয় না। একথা যদি সত্য হয়, তা হলে যে-সৈনিক কী করে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয় সে-কৌশল আয়ত্ত করেনি কিংবা তা আয়ত্ত করার জন্য কোনো পরিশ্রম ব্যয় করেনি তার পক্ষেও অস্ত্র হাতে নিয়েই দক্ষ সৈনিক হওয়া আদৌ সম্ভব হবে না। ঢাল কিংবা তলোয়ার অথবা ভারী অপর কোনো যুদ্ধাস্ত্র হাতে পেলেই বিনা শিক্ষায় দিনাদিন কোনো সৈনিকের পক্ষে উত্তম যোদ্ধা বলে পরিগণিত হওয়া সম্ভব নয়।

গ্লকন এই কথা স্বীকার করে বললেন : হ্যাঁ, যে-সাধনায় শিল্পী দক্ষতা অর্জন করবে সে সাধনার ক্রয়মূল্য খুব কম নয়।

দেশরক্ষাকারীর দায়িত্ব অপর সকলের চেয়ে অধিক। এ-কারণে এই দায়িত্ব-পালনের দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজন হবে অপর যে-কোনো শিল্পের চেয়ে অধিকতর সময়, কৌশল এবং প্রয়োগনৈপুণ্যের। ঠিক নয় কি, গ্লকন?

একথা যথার্থ, সক্রেটিস।

তা ছাড়া সৈনিকের পেশার জন্য যুদ্ধের একটা স্বভাবগত প্রবণতারও আবশ্যক হবে।

অবশ্যই তার প্রয়োজন হবে।

তা হলে, গ্লকন, দেশরক্ষার জন্য যাদের আমরা নির্বাচিত করব, দেখতে হবে স্বভাবগতভাবে যেন তারা একাজের উপযুক্ত হয়।

হ্যাঁ, এদিকে লক্ষ রাখা আমাদের কর্তব্য হবে।

অধ্যায় ঃ ৮

[৩৭৫—৩৮৩]

অভিভাবকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

রাষ্ট্র রক্ষার জন্য যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পারদর্শী রক্ষিবাহিনীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অভিভাবক বা রক্ষক—এরূপ শব্দেই রাষ্ট্রের এই শ্রেণীর দায়িত্বের কথা প্রকাশ পায়। এদের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে রক্ষা করা। প্রথমত বৈদেশিক আক্রমণ থেকে। দ্বিতীয়ত অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে। এই দায়িত্বপালনে তাদের কুকুরের মতো তেজ এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে। এরা কুকুরের ন্যায় মিত্রের প্রতি মিত্রসুলভ এবং শত্রুর প্রতি শত্রুসুলভ আচরণ করবে। "শত্রুর জন্য তার তেজ হবে বিপজ্জনক। কিন্তু বন্ধুর প্রতি সে তেজকে হতে হবে স্নিগ্ধ। তা যদি না হয় তা হলে রক্ষাকারীর এ-তেজ শত্রু আক্রমণের পূর্বে নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে" এ পর্যায়ে রক্ষাকারী বা অভিভাবকই হচ্ছে রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। কারণ রাষ্ট্রের উপর বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। প্লেটোর পরিকল্পনায় এখনও শাসনের সমস্যাটি আলোচিত হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে এই রক্ষাকারীর মধ্য থেকেই দার্শনিক শাসকবর্গকে বাছাই করা হবে। তখন অভিভাবক বা শাসক বলতে দার্শনিক-শাসক এবং সৈন্যবাহিনী বা সহায়ক বাহিনীকে আমাদের পৃথক করতে হবে। কিন্তু তখনও সামগ্রিকভাবে সৈন্যবাহিনী এবং শাসকবর্গই হবে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এজন্য 'অভিভাবক' দ্বারা প্রায় সময়ই রক্ষী বা সৈন্যবাহিনী এবং শাসক, উভয়কে প্লেটো বোঝাতে চেয়েছেন। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য ব্যতীত উৎপাদকদের সঙ্গে এই দুই শ্রেণীর পার্থক্যের মতো মৌলিক গুণগত কোনো পার্থক্য প্লেটো নির্দেশ করতে চাননি।

আমি বললাম ঃ কিন্তু এ-নির্বাচনের কাজটি খুব সহজ হবে না, গ্লকন। তথাপি এ-ব্যাপারে সাহসের সঙ্গেই আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আমাদের সাধ্যমত নির্বাচনের কাজটি আমরা সম্পন্ন করব।

আমরা তা-ই করব, সক্রেটিস।

তা হলে কাজটি শুরু করা যাক। নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিজাত বংশের যুবকদের আমরা প্রথমে নির্বাচন করতে পারি। কারণ পর্যবেক্ষণ এবং প্রহরাদানের ব্যাপারে অভিজাত বংশের একটি তরুণকে তুমি একটি সুশিক্ষিত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করতে পার।

সক্রেটিস, তোমার এ কথার তাৎপর্য কী?

আমি বলতে চাচ্ছি যে, অভিজাত বংশের যুবক আর একটি কুকুর এরা উভয়েই স্বভাবগতভাবে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণকারী এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে দ্রুতগামী। এদের উভয়ের দেহ শক্তিশালী এবং শত্রুকে কবজা করে তাকে পর্যুদস্ত করতে এরা সক্ষম।

হ্যাঁ, শত্রুর সঙ্গে লড়াই-এর জন্য এ-সমস্ত গুণ অবশ্যই আবশ্যক।

তা ছাড়া গ্লকন, তোমার রাষ্ট্রের যে রক্ষাকারী, লড়াইতে দক্ষ হতে হলে তাকে সাহসীও হতে হবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক। তাকে সাহসীও হতে হবে।

কিন্তু যার তেজ নেই সে অশ্ব, কুকুর কিংবা অন্য যে-প্রকার জন্তুই হোক তার পক্ষে সাহসী হওয়া কি সম্ভব? তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে গ্লকন, তেজ বা মনোবলই হচ্ছে একমাত্র গুণ যা তার অধিকারীকে করে নির্ভীক এবং অপরাজেয়।

একথা আমি স্বীকার করি, সক্রেটিস।

তা হলে রাষ্ট্ররক্ষাকারীর জন্য কী ধরনের শারীরিক গুণের আবশ্যক তার একটি স্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করেছি।

একথা সত্য।

কেবল শারীরিক নয়, তার মানসিক গুণের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। তার মনকেও অবশ্যই তেজোদীপ্ত হতে হবে?

যথার্থ।

কিন্তু এর আর-একটি দিক আছে। তেজ নির্মম। তেজ কাউকে সহ্য করে না, একথা কি সত্য নয়?

হ্যাঁ, তেজের এদিকটি সংবরণ করা সহজ নয়।

অথচ গ্লকন, আমাদের রাষ্ট্রের যে রক্ষাকারী তার তেজের লক্ষ্য হবে শত্রু, মিত্র নয়। শত্রুর জন্য তার তেজ হবে বিপজ্জনক কিন্তু বন্ধুর প্রতি সে-তেজকে

হতে হবে স্নিগ্ধ। তা যদি না হয় তা হলে রক্ষাকারী এ-তেজ শত্রুআগমনের পূর্বে নিজেদেরই ধ্বংস করে ফেলবে।

গ্লকন বললেন ঃ এ আশঙ্কা যথার্থ, সক্রেটিস।

তা হলে এ তো এক সঙ্কটের বিষয়। শান্তস্বভাবের মধ্যে তেজি মনকে আমাদের আবশ্যক। অথচ এর একটি অপরটির একেবারে বিরোধী।

হ্যাঁ, সঙ্কটই বটে, সক্রেটিস।

যাকে আমরা রাষ্ট্রের রক্ষাকারী বলে নির্বাচিত করব এ-দুটি গুণের কোনোটিতেই তার অভাব থাকলে চলবে না। অথচ একই আধারে উভয় গুণের এরূপ সম্মেলন অসম্ভব। এ থেকে আমাদের তা হলে সিদ্ধান্ত করতে হয়, উত্তম রক্ষাকারী বলে কিছু হতে পারে না। কী বল গ্লকন?

এ সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয় সক্রেটিস।

এমন সঙ্কটে হতবুদ্ধি হয়ে আমি স্মরণ করার চেষ্টা করলাম, এ-পর্যন্ত কী ঘটেছে। একটু চিন্তা করে গ্লকনকে বললাম ঃ সুহৃদবর, নিঃসন্দেহে আমরা একটি জটিল পরিস্থিতিতে এসে উপনীত হয়েছি। কারণ, যে-কল্পলোক আমরা গোড়াতে তৈরি করেছিলাম সে-কল্পলোক যেন এবার হারিয়ে যাচ্ছে।

গ্লকন বললেন ঃ তার মানে?

গ্লকন, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে, পরস্পরবিরোধী যে-গুণের উল্লেখ আমরা করেছি সেরূপ চরিত্র কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়।

কোথায় তুমি তার সাক্ষাৎ পেয়েছ?

অনেক জন্তুর মধ্যেই তুমি এরূপ গুণের সাক্ষাৎ পাবে। যেমন ধরো, আমাদের প্রিয় সহচর কুকুরের কথা। কুকুরের ব্যাপারে এটা আমাদের জানা কথা যে কুকুর তার পরিচিতজনদের প্রতি যেমন অত্যন্ত নম্র ব্যবহার করে, তেমনি অপরিচিতদের প্রতি তার ব্যবহার হয় একেবারে বিপরীত।

হ্যাঁ, একথা আমি জানি।

হ্যাঁ, একথা যদি সত্য হয় তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের প্রহরার কাজেও এমন লোক পাওয়া অসম্ভব হওয়া উচিত নয় যার চরিত্রে এই উভয় গুণের একটা সম্মিলন সংঘটিত হয়েছে।

অবশ্যই, এরূপ চরিত্র পাওয়া অসম্ভব হওয়া উচিত নয়।

আর দ্যাখো রাষ্ট্রের রক্ষক হওয়ার যোগ্যতা যার চরিত্রে আছে তার মধ্যে দার্শনিকের গুণ থাকারও আবশ্যক হবে। একথা কি ঠিক নয়?

তোমার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পারছিনে, সক্রেটিস।

আমি বললাম, নতুন যে-গুণের কথা আমি বলছি, কুকুরের চরিত্রে তারও আমরা সাক্ষাৎ পাই।

নতুন কী গুণের কথা বলছ তুমি?

আমি বুঝিয়ে বলছি। কুকুরের স্বভাবটি লক্ষ করো। অপরিচিত কাউকে যখন কুকুর দেখে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে; আবার পরিচিত কাউকে দেখলে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ে। অথচ অপরিচিত লোকটি যে তার কোনো ক্ষতি করেছে এমন নয়, আর পরিচিত ব্যক্তিও হয়তো তার কোনো উপকার সাধন করেনি। কুকুর-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য কি তোমার চোখে অদ্ভুত বলে বোধ হয়নি?

গ্লকন বললেন ঃ বিষয়টিকে আমি পূর্বে আবশ্য এভাবে দেখিনি। কিন্তু তোমার বক্তব্যের যাথার্থ্যকে আমি স্বীকার করি সক্রেটিস।

কুকুরের সহজাত এই বোধশক্তিকে অবশ্যই তুমি উত্তম বলবে। আমি বলব, এ-কারণে সে একজন খাঁটি দার্শনিক বলে পরিগণিত হতে পারে।

কুকুরটা তোমার দার্শনিক হয়ে গেল!

হ্যাঁ, আশ্চর্যের কী আছে? কুকুর কেবল মুখ দেখেই জানা-অজানার ভিত্তিতে সুহৃদ আর শত্রুতে পার্থক্য করে ফেলে—এটা কি তার কম গুণের কথা! যে-পশু জানা-অজানার ভিত্তিতে তার পছন্দ এবং অপছন্দকে নির্দিষ্ট করে সে যে জ্ঞানের একজন প্রেমিক, একথা আমাদের মানতে হবে।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, সে নিশ্চয়ই জ্ঞানপ্রেমিক।

আবার দ্যাখো জানা বা শিক্ষার আগ্রহ হচ্ছে জ্ঞানের প্রতি প্রেমস্বরূপ। এবং জ্ঞানের প্রেমিকই হচ্ছে দার্শনিক।

হ্যাঁ, জানার আগ্রহ আর জ্ঞানের প্রেমে কোনো পার্থক্য নেই।

এবার তা হলে মানুষের দিকে তাকানো যাক। মানুষের ব্যাপারেও আমরা তা হলে জোরের সঙ্গেই বলতে পারি, বন্ধুজনদের প্রতি যে বিনম্র, স্বভাবগতভাবে জ্ঞানেরও সে প্রেমিক হতে বাধ্য।

একথা নির্বিঘ্নেই আমরা বলতে পারি।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের যে উত্তম রক্ষক হবে তাকে একাধারে যেমন দার্শনিক হতে হবে, তেমনি তার চরিত্রে থাকতে হবে তেজ, ত্বরা এবং শক্তির পরিচয়। ঠিক নয় কি গ্লকন?

নিঃসন্দেহে।

তা হলে অভীষ্ট আমাদের সিদ্ধ হয়েছে ঃ আমাদের লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে গেছি। রাষ্ট্রের রক্ষক হওয়ার জন্য যে-চরিত্রের আবশ্যক তার হদিস আমরা পেয়েছি। এবার প্রয়োজন হচ্ছে এই চরিত্রের লালন ও শিক্ষা। আর একথাও নিশ্চিত যে এই আলোচনার মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায়ের চরিত্র নির্ধারণের প্রধান লক্ষ্যেও আমরা পৌঁছতে পারব। রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় এবং অন্যায়ের উদ্ভব কেমন করে ঘটে, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে তাদের উদ্ঘাটন করা। এ-প্রয়াসে আমরা যেমন প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়কে উপেক্ষা করব না, তেমনি লক্ষ্যে পৌঁছার পথকে আমরা কষ্টকর দৈর্ঘ্যেও প্রলম্বিত করতে চাইনে।

এ অনুসন্ধানকার্য যে আমাদের উপকারসাধন করবে, এ্যাডিম্যান্টাস সেরূপ অভিমতই প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, তবু পথ যদি কিছুটা দীর্ঘ হয় তা হলেও এ দায়িত্ব আমরা কোনোক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারিনে।

না, দায়িত্ব আমরা পরিত্যাগ করতে পারিনে।

এসো, তা হলে অবসর বিনোদনের উপায় হিসাবে আমরা গল্প বলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের নায়কদের শিক্ষাদানও ঘটতে থাকবে।

হ্যাঁ, এ সিদ্ধান্ত উত্তম।

কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন শিক্ষার চেয়ে উত্তম কিছু কি আমরা চিন্তা করতে পারি? পুরাতন শিক্ষার দুটি দিকের কথা আমরা জানি। এর একটি হচ্ছে দেহগঠনের জন্য ব্যায়াম এবং আত্মার উন্নতির জন্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা।

এ কথা সত্য।

এ দুটি বিভাগের কোন্‌টির আলোচনা আমরা শুরু করব? সঙ্গীত দিয়ে শুরু করে ব্যায়ামের ক্ষেত্রে পরে প্রবেশ করাই কি উত্তম হবে না?

অবশ্যই।

কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। সঙ্গীত বলতে কি তুমি সাহিত্যকেও বোঝাতে চাও?

হ্যাঁ, সঙ্গীত বলতে সাহিত্যও বোঝাবে।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে সত্য-মিথ্যার প্রশ্ন আছে ঃ সাহিত্য সত্য হতে পারে; সাহিত্য অ-সত্যও হতে পারে।

হ্যাঁ, তা পারে।

আমাদের রাষ্ট্রের যুবকদের নিশ্চয়ই উভয়প্রকার শিক্ষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাদের শিক্ষা কি মিথ্যা দিয়েই আমরা শুরু করব?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছিনে, সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ আমার কথার অর্থ হচ্ছে, যে বয়সে আমরা শিশুদের গল্প বলতে শুরু করি সে বয়সে তারা শরীরগঠনের কৌশল শিক্ষার উপযুক্ত হয় না। আর যে-গল্প আমরা তাদের বলি সে গল্প একেবারে অসত্য না হলেও প্রধানত তা কল্পকথা।

তা ঠিক।

আমি একথাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, ব্যায়ামের আগে সঙ্গীত শেখানোই আমাদের কর্তব্য।

একথা খুবই সত্য।

কারণ যে-কোনো কাজের শুরুটাই হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তরুণদের অর্থাৎ যারা কচি তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একথা তো অবশ্যই সত্য। কচি বয়সেই চরিত্র গঠিত হয়; যা কিছু বাঞ্ছিত তার দাগ মনের উপর এই বয়সে সহজেই কেটে দেওয়া যায়। নয় কি?

নিশ্চয়ই।

তাই যদি হয়, তা হলে শিশুদের গল্প বলার ক্ষেত্রে কি আমরা অসতর্ক হতে পারি? অপরিণামদর্শী যেকোনো লোক শিশুদের যেকোনো অলীক কাহিনী শোনাবে আর সে কাহিনী থেকে তারা অবাঞ্ছিত ধারণা নিজেদের মনে গেঁথে নেবে, এরূপ অবস্থার অনুমোদন নিশ্চয়ই আমরা করতে পারিনে।

না, তা আমরা অনুমোদন করতে পারিনে।

তা হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হচ্ছে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ ব্যবস্থানুযায়ী যে কাহিনী শিশুদের জন্য উত্তম হবে, কেবল সে কাহিনী শিক্ষার অনুমতি দেওয়া হবে। যে কাহিনী উত্তম নয় সে কাহিনী নাকচ করা হবে। শিশুর জননী আর ধাত্রীর প্রতিও নির্দেশ থাকবে তারা শিশুদের কাছে কেবল অনুমোদিত গল্পই বলতে পারবে, নিষিদ্ধ গল্প নয়। তারা যত্নের সঙ্গে শিশুর তুলতুলে শরীরকে যেমন তৈরি করে, তার চেয়েও যত্নের সঙ্গে এই উত্তম গল্পের শিক্ষায় শিশুদের নরম মনকে তৈরি করে তুলবে। কিন্তু বর্তমানে যেসব কল্পকথা আছে তার বেশির ভাগই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

এ্যাডিমেন্টাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কোন্ গল্পের কথা বলছ সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ এর ক্ষুদ্রের নিদর্শন বৃহতের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কারণ ক্ষুদ্র-বৃহৎ এদের চরিত্র অভিন্ন; একই মনোভাব উভয়ের মধ্যে কাজ করছে।

তা হতে পারে। কিন্তু কাকে তুমি বৃহৎ বলছ তা কিন্তু আমার কাছে এখনও বোধগম্য নয়, সক্রেটিস।

আমি বলছি কবিকুলের কথা আর সেই কবিকুলশ্রেষ্ঠ হোমার এবং হিসিয়ডের বর্ণিত কাহিনীর কথা। হোমার আর হিসিয়ড যে মানবজাতির কাহিনীকারদের শ্রেষ্ঠ, একথা তো আমরা জানি।

কিন্তু তাদের কোন্ গল্পের কথা তুমি বলছ আর সে-গল্পের ক্রটিই-বা কী?

তাদের গুরুতর ক্রটি হচ্ছে এই যে, তাদের ভাষণ মিথ্যা আর কেবল মিথ্যাই নয়, নিকৃষ্ট প্রকারের মিথ্যা।

কিন্তু কখন তারা এরূপ ক্রটির প্রশ্রয় দিয়েছে বলে তুমি মনে কর?

কেন? যখনই তারা দেবতাদের আর কাহিনীর নায়কদের কথা বর্ণনা করেছে তখনই তারা এই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাদের এ-ক্রটি তুমি শিল্পীর অলীক চিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পার। শিল্পী যখন মূল বস্তুর সঙ্গে বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ব্যতিরেকে তার চিত্র অঙ্কিত করে তখন সে যেমন এক মিথ্যার সৃষ্টি করে, এই কবির দলও তেমনি তাদের কাহিনীতে এক অলীক জগৎ তৈরি করে।

এ্যাডিমেন্টাস বললেন ঃ এটা অবশ্যই দোষণীয়। কিন্তু কবিদের কোন্ কাহিনীকে তুমি নির্দিষ্ট করে বোঝাতে চাইছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ এদের মধ্যে বৃহত্তম মিথ্যা হচ্ছে ইউরেনাস সম্পর্কে কবির ভাষণ। ইউরেনাস সম্পর্কে হিসিয়ডের[১] ভাষণ আর ক্রোনাসের পালটা প্রতিশোধের কাহিনী কেবল যে বৃহত্তর মিথ্যা তা-ই নয়, এ মিথ্যা নিকৃষ্ট ধরনেরও বটে। ক্রোনাসের কার্যকলাপ এবং ক্রোনাসের উপর তার পুত্রের প্রতিশোধের কাহিনী স্মরণ করো। এ কাহিনী যদি সত্য হয় তা হলেও তরুণ এবং চিন্তার ক্ষমতাশূন্য লোকের কাছে এ কাহিনী এরূপ হালকাভাবে আদৌ বর্ণনা করা সঙ্গত নয়। সম্ভব হয় তো, এ কাহিনীকে নৈঃশব্দের আবরণে ঢেকে রাখাই কর্তব্য। কিন্তু এমন যদি হয় যে, এ কাহিনী বর্ণনা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তা হলেও এ কাহিনী কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক নির্বাচিত শ্রোতার কাছেই বলতে হবে। সে

---

১. হিসিয়ড : থিওগনি

বর্ণনার অনুষ্ঠান সাধারণ শুয়োর বলির মাধ্যমে সার্বজনীন করে তোলা চলবে না। সে অনুষ্ঠানে দুষ্প্রাপ্য কোনো পশুর বলিদান হোক যাতে শ্রোতার সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই নগণ্য হবে।

এ্যাডিমেন্টাস বললেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস। এ-কাহিনীগুলি খুবই আপত্তিজনক।

হ্যাঁ, এ্যাডিমেন্টাস, এ কারণেই আমি বলেছিলাম, আমাদের রাষ্ট্রে এমন কাহিনীর শিক্ষাদান চলবে না। আমাদের রাষ্ট্রের তরুণদের মনে এই মনোভাব সৃষ্টি করা চলবে না যে, পিতার ত্রুটি সংশোধনের নামে পিতাকে অসম্মানিত করার ন্যায় গর্হিত অন্যায় কার্য আসলে অন্যায় নয়, কারণ দেবশ্রেষ্ঠ যিনি তিনিও অনুরূপ কার্য করেছেন আর তরুণরা সেই আদর্শই অনুসরণ করছে।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পুর্ণ একমত সক্রেটিস। এমন কাহিনী অবশ্যই পুনরাবৃত্তির অযোগ্য।

তা ছাড়া আমরা যদি চাই যে, আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রক্ষকগণ আত্মকলহকে সবচেয়ে খারাপ বলে মনে করবে, তা হলে স্বর্গের দেবতাদের আত্মকলহ, একের বিরুদ্ধে অপরের ষড়যন্ত্র এবং একের সঙ্গে অপরের লড়াই-এর যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তার সঙ্গেও আমাদের তরুণদের পরিচিত হতে দেওয়া চলবে না। এগুলো অসার কাহিনী। দেবতাদের মধ্যকার এই সমস্ত লড়াইয়ের কথা তরুণদের নিকট আদৌ উল্লেখ করা চলবে না। পরিচ্ছদ-গাত্রে এ কাহিনীর উৎকীরণও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। দেবসমাজে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও আত্মকলহের আরও বহু কাহিনী আছে। এসব কাহিনীর ব্যাপারে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে আমরা সম্পূর্ণরূপেই নীরব থাকব। বৃদ্ধা এবং জননী অর্থাৎ শিশুদের যারা গল্প শোনাবে তাদের কাজ হবে শিশুদের এরূপ শিক্ষা দেওয়া যে, আত্মকলহের ন্যায় ঘৃণ্য অপবিত্র কাজ আর কিছু হতে পারে না। তাদের বলতে হবে যে, মানুষ কখনো আত্মকলহে লিপ্ত হয়নি। শিশুদের বয়স যখন বৃদ্ধি পাবে তখন কবিরাও তাদের জন্য এমনই কাহিনী তৈরি করবে। কবিদের উপর নির্দেশ থাকবে তারা তরুণদের জন্য এমনই শিক্ষামূলক কাহিনী রচনা করবে। কিন্তু হোমার যেভাবে হেপিস্টাসকে দিয়ে তার জননী হেরাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়েছেন কিংবা অপর কোথাও আবার মায়ের পক্ষ সমর্থন করায় হেপিস্টাসের উপর জিউসের নির্যাতন কিংবা দেবতায় দেবতায় লড়াই-এর কথা বর্ণনা করেছেন তার প্রচার সাধারণ কিংবা রূপক যে-কোনো অর্থের বাহক হিসাবে নিষিদ্ধ করা হবে। কারণ একটি কিশোর-মন সাধারণ এবং রূপক অর্থের মধ্যে কী পার্থক্য

তা নিরূপণ করতে পারে না। তার মনের কাছে তখন যা উপস্থিত করা হয় তা-ই অপরিবর্তনীয় হয়ে মনের পটে বিদ্ধ হয়ে যায়। সে কারণে একটি কিশোর তার জীবনে যে কাহিনীর কথা সবচেয়ে আগে শুনবে সে কাহিনীকে অবশ্যই পবিত্র ভাবের আধার হিসাবে আদর্শ হতে হবে।

তুমি ঠিকই বলছ সক্রেটিস। কিন্তু যদি প্রশ্ন ওঠে এমন আদর্শ কোথায় পাওয়া যাবে এবং কোন্ গল্পকে আদর্শ গল্প হিসাবে নির্দিষ্ট করা হবে, তখন আমরা কী বলব?

এ্যাডিম্যান্টাসের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম ঃ তুমি এবং আমি এই মুহূর্তে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছি। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ নীতি বা কাঠামোর কথা বলবে। কোন নীতির ভিত্তিতে কবিরা তাদের কাহিনী রচনা করবে এবং কোন নিয়ম-নিষেধ তারা মেনে চলবে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা তারই নির্দেশ দেবে। কাহিনী রচনা তার দায়িত্ব নয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমার কথা যথার্থ। কিন্তু ধর্মতত্ত্বের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?

আমি বললাম ঃ এ ব্যাপারে আমার বক্তব্য মোটামুটি এই যে, কাহিনীর আধার কাব্য, গীতিকাব্য বা বিষাদগাথা—যা-ই হোক না কেন, বিধাতাকে তার যথার্থ রূপেই প্রকাশ করতে হবে।

ঠিক কথা।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিধাতার রূপ কী? আমি বলব বিধাতার রূপ হচ্ছে উত্তম। তা-ই যদি হয়, তা হলে তাকে উত্তমরূপেই বিবৃত করতে হবে।

একথাও ঠিক।

কিন্তু কোনো উত্তম কি ক্ষতিকর বলে পরিচিত হতে পারে?

না, তা কী করে হবে?

আবার যা ক্ষতিকর নয় তা কোনো ক্ষতির কারণও নয়।

অবশ্যই সে কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

যা ক্ষতির কারণ হতে পারে না সে কোনো অন্যায়ও সাধন করতে পারে না। ঠিক নয় কি?

না, সে কোনো অন্যায় করতে পারে না।

কিন্তু যে অন্যায় করতে পারে না, সে কি কোনো অন্যায়ের কারণ হতে পারে?

অসম্ভব। সে অন্যায়ের কারণ কীরূপে হবে?

বেশ! এবং উত্তম মঙ্গলকর। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আর এজন্য তাকে মঙ্গলের কারণ বলে আখ্যায়িত করা যায়।

তা ঠিক।

তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, উত্তম সবকিছুরই কারণ নয়; উত্তম কেবল উত্তমেরই কারণ।

নিশ্চয়ই।

তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, বিধাতা সবকিছুরই মূলে বা সবকিছুরই কারণ বলে যে কথা প্রচলিত আছে সে কথা যথার্থ নয়। বিধাতা যদি উত্তম হয় তা হলে সে সবকিছুর কারণস্বরূপ হতে পারে না। সে মনুষ্যজীবনের কোনো কোনো বিষয়েরই মাত্র কারণ-স্বরূপ। মানুষের জীবনে অন্যায়ের পরিমাণ বা সংখ্যাই অধিক; ন্যায়ের পরিমাণ কম। বিধাতা মনুষ্যজীবনের ন্যায়ের কারণ; অন্যায়ের কারণ নয়। অন্যায়ের উৎস আমাদের অপর কোথাও সন্ধান করতে হবে; বিধাতার মধ্যে নয়।

তোমার একথা আমি খুবই যথার্থ বলে মনে করি।

তা যদি সত্য হয় তা হলে হোমার কিংবা অপর কোনো কবি যখন বর্ণনা করে বলেন ঃ

দেবাদিদেব জিউসের কাছে রক্ষিত আছে ভাগ্যের দুটি ভাণ্ড ঃ
একটি ন্যায়ের অপরটি অন্যায়ের।
আর সেই ভাণ্ড থেকে ন্যায় ও অন্যায়ের মিশ্রণ ঘটিয়ে
যার ভাগ্য তৈরি করেন দেবাদিদেব জিউস, তার জীবনে
খেলা চলে দুঃসময় আর সুসময়ের।
কিন্তু যার ভাগ্য তৈরি হয় কেবলমাত্র অন্যায়ের আরক দিয়ে
সুন্দর পৃথিবীর বুকে বুভুক্ষার তাড়নে সে তাড়িত হয় নিশিদিন
কারণ দেবাদিদেব জিউস হচ্ছেন ন্যায় এবং অন্যায়ের বিধাতা।[১]

তখন সে কাহিনীর প্রতি আমরা কিছুতেই কর্ণপাত করতে পারিনে। আবার তেমন প্রতিজ্ঞাভঙ্গের উৎস হিসাবে প্যান্ডারাসের পরিবর্তে কেউ যদি এথেনি এবং জিউসকে নির্দিষ্ট করে কিংবা বলে দেবকুলের আত্মকলহের উৎপত্তি

---

১. ইলিয়াড

ঘটেছিল থেমিস এবং জিউসের প্ররোচনায়, তখন তার সে বর্ণনাকেও আমরা স্বীকার করতে পারিনে। একিলাসের ক্ষেত্রেও আমাদের একই সিদ্ধান্ত। 'মানুষের ধ্বংসের জন্য বিধাতা মানুষের মধ্যে অন্যায়ের বীজ বপন করে দেয়'—একিলাসের এরূপ উক্তিও আমরা আমাদের তরুণদের কাছে প্রচারিত হতে দিতে পারিনে। তেমনি কোনো কবি যদি তার রচনায় নিওব বা পেলপের দুর্ভোগ এবং ট্রয়ের যুদ্ধকে বর্ণিত করতে মনস্থ করে তা হলে এসবের মূলে বিধাতা রয়েছে এমন কথা যেমন তাকে বলতে দেওয়া হবে না, তেমনি বিধাতার উল্লেখ থাকলেও অবশ্যই তার ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা তাকে দিতে হবে। কবিকে বলতে হবে ঃ যা যথার্থ এবং ন্যায় বিধাতা তারই কারণ হিসাবে কাজ করেছে। সে-কারণে যদি দুর্ভোগ কারও ভাগ্যে নিপতিত হয় তবে তা ন্যায্য বলেই নিপতিত হয়েছে। কিন্তু কবির একথা বলা চলবে না যে, দুর্ভোগের কারণ হচ্ছে বিধাতা। কবি বলতে পারে যে, দুরাচারের দুর্ভোগ আসে, কারণ এ তার প্রাপ্য। বিধাতা যদি সে দুর্ভোগ দিয়ে থাকে তবে তার মঙ্গলের জন্যই দিয়েছে। কিন্তু একদিকে বিধাতা উত্তম, অপরদিকে সে অন্যায়ের কারণ—একথা শিশু কিংবা বৃদ্ধ কারও কাছেই ভাষণে, সঙ্গীতে, পদ্যে কিংবা, গদ্যে কোনোপ্রকারে একটা সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় প্রচারিত হতে পারে না। এমন কাহিনী সে-রাষ্ট্রের জন্য অধর্ম, ধ্বংস, আত্মহত্যামূলক।

তোমার সঙ্গে আমি একমত, সক্রেটিস। আর এ বিধানকে আমি স্বীকার করি।

তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, বিধাতার ব্যাপারে এই হচ্ছে আমাদের বিধান যে, বিধাতা জগতের সবকিছুর কারণ বলে বর্ণিত হবে না; বিধাতা কেবল উত্তমেরই উৎস হিসাবে কাজ করবে। আমাদের কবি আর চারণকুলকে এ বিধান স্বীকার করতে হবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই।

এবার একটি দ্বিতীয় নীতির কথা বলা যাক। নীতিটি হচ্ছে বিধাতার রূপ সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিধাতা কি জাদুকর? জাদুকরের ন্যায় সে এখন একরূপ, তখন অন্যরূপে কি প্রকাশিত হতে পারে? বিভিন্ন রূপের প্রকাশ দ্বারা সে কি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে? অথবা আমরা বলব যে, বিধাতার রূপ এক এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে সে আপন রূপে প্রতিষ্ঠিত। তুমি কী বল?

এ্যাডিমান্টাস বললেন ঃ সক্রেটিস, আর একটু চিন্তা না করে তোমার এ প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারিনে।

আমি বললাম ঃ বেশ। পরিবর্তনের কথা ধরা যাক। কোনোকিছুতেই যখন কোনো পরিবর্তন সংঘটিত হয় তখন সে পরিবর্তনের কারণ হয় সেই বস্তু নিজে নয়তো অপর কোনো শক্তি। নয় কি?

অবশ্যই।

কিন্তু বস্তুর ব্যাপারে যে বস্তু যত উত্তম সে তত অপরিবর্তনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ব্যক্তি যত সুস্থ এবং শক্তিশালী সে মদ্য কিংবা মাংসাহারে তত কম অসুস্থ হয়। এমনকি যে উদ্ভিদ যত সতেজ বায়ুর আঘাত, সূর্যের তাপ বা অপর কোনো কারণে তারও ক্ষতি তত কম। একথা কি সত্য নয়, এ্যাডিম্যান্টাস?

একথা অবশ্যই সত্য।

তা হলে যে সবচেয়ে সাহসী এবং সবচেয়ে জ্ঞানী বাইরের কোনো প্রভাবে সে বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট হবে খুবই সামান্য। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কেবল মানুষের ক্ষেত্রে নয়। তৈজসপত্র, গৃহ বা বস্ত্রাদি অর্থাৎ যে-কোনো সুমিশ্রিত বস্তুর ক্ষেত্রেই এ নীতি প্রয়োগ করা চলে। এ সমস্ত বস্তু যখন সুগঠিত হয় তখন সময় কিংবা অবাস্থান্তরের আঘাতে তাদের পরিবর্তনও খুব সামান্য ঘটে।

খুবই সত্য কথা সক্রেটিস।

তা হলে আমরা দেখছি, যা-কিছু উত্তম তা মানুষের শিল্পকর্ম কিংবা প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ম যা-ই হোক-না কেন, বাইরের আঘাতে তার পরিবর্তন খুব সামান্যই সংঘটিত হয়।

যথার্থ।

কিন্তু বিধাতা বা বিধাতার সৃষ্ট বস্তুসামগ্রী সম্পর্কে তুমি কী বলবে? বিধাতা নিজে এবং বিধাতার সৃষ্টি নিশ্চয়ই তা হলে সর্বপ্রকার সুসম্পূর্ণ?

নিশ্চয়ই তারা সুসম্পূর্ণ।

তা হলে বাইরের অভিঘাত তাকে বিভিন্ন রূপগ্রহণে নিশ্চয়ই বাধ্য করতে পারে না।

না, রূপান্তর গ্রহণে তাকে বাধ্য করা যায় না।

কিন্তু নিজের রূপান্তর নিজে সাধন করা তো তার পক্ষে সম্ভব। কী বল তুমি?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ সে যদি আদৌ পরিবর্তিত হয় তা হলে সে-পরিবর্তন সুস্পষ্টত নিজে থেকেই সাধিত হবে।

বেশ। কিন্তু নিজের পরিবর্তন সে কি অধিকতর উত্তমের উদ্দেশে সাধন করবে, না অধিকতর নিকৃষ্টের জন্য সে নিজেকে পরিবর্তিত করবে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ বিধাতা যদি আদৌ পরিবর্তিত হয় তা হলে তাকে নিকৃষ্টতরই হতে হবে, সক্রেটিস। কারণ ধর্ম বা কান্তি কোনো ক্ষেত্রেই বিধাতা অসম্পূর্ণ ছিল এমন কথা আমরা ভাবতে পারিনে।

তোমার কথা খুবই যথার্থ, এ্যাডিম্যান্টাস। কিন্তু এমন কথাও কি আমরা ভাবতে পারি যে, বিধাতাই হোক আর মানুষই হোক, কেউ নিজেকে নিকৃষ্টতর করে পরিবর্তিত করতে চাইবে?

না, তা অসম্ভব।

তা হলে এমন কথাও ভাবা যায় না যে, বিধাতা আদৌ নিজের কোনো পরিবর্তন কামনা করতে পারে। কারণ বিধাতা হচ্ছে সর্বোত্তম এবং মনোহরতম। তাই সে তার নিজের রূপে নিত্যকালের জন্যই থাকবে অপরিবর্তিত।

আমার বিচারে যুক্তি পরম্পরায় এ-সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

তা হলে প্রিয় এ্যাডিম্যান্টাস, কবির দল যখন বলে ঃ

দেবতার দল বৈদেশিকের বস্ত্র ধারণ করে

বিচিত্র রূপে আমাদের মধ্যে বিচরণ করে

তখন কবিদের আমরা স্তব্ধ হতে বলব। আমরা বলব, তোমাদের বিষাদাত্মক বা অপর কোনো কাব্যরীতিতেই প্রটিউস এবং থেটিসকে অপপ্রচারিত করতে পার না। হেরাকে ভিক্ষুণীর বেশে ইনাকাসের জীবনদায়িনী কন্যাগণের প্রার্থনাকারিণীর আকারে প্রকাশ করতে পার না। তোমাদের এমনিধারা মিথ্যার এবার শেষ হোক। কবিদের তৈরি উপাখ্যানের মিথ্যা ভাষ্যে জননীও তার শিশুদের শঙ্কিত করে তুলতে পারবে না। দেবতাদের দল বিচিত্র বেশে রাতের আঁধারে ঘুরে বেড়ায়—এমন ভয়ংকর মিথ্যা কাহিনী বলে একদিকে জননীগণ তাদের শিশুদের মনে আতঙ্কের বীজ বপন করবে এবং অপরদিকে দেবতাদের চরিত্র দুর্নামে দুষ্ট করবে, এমন স্বাধীনতা জননীদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

এ্যাডিম্র্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই তাদের সে-স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু দেবতাগণ অপরিবর্তনীয় হলেও জাদুমন্ত্রাদির সাহায্যে তারা আমাদের সামনে বিভিন্ন রূপের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে কি উপস্থিত হতে পারে না?

তা হয়তো তারা পারে।

কিন্তু বিধাতা কথায় কিংবা কর্মে নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে বা নিজের মিথ্যা প্রতিভাস তৈরি করবে, এমন কথাকি তুমি ভাবতে পার?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমি তা বলতে পারিনে, সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস তুমি তো জান 'সত্যমিথ্যা' বা 'যথার্থ মিথ্যা' বলে কোনো কথা যদি তৈরি করা যায় তা হলে এমন কথাকে দেবতা বা মানুষের যে কেউই ঘৃণা করবে।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ সক্রেটিস?

আমি বলতে চাচ্ছি, কেউই তার যথার্থ প্রকৃতিতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে চায় না। যাকে সে নিজের সর্বোত্তম বা যথার্থতম প্রকৃতি বলে বিবেচনা করে সে-প্রকৃতি মিথ্যার করায়ত্ত হোক, এমন ইচ্ছা কারোর পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।

আমি এখনও তোমার কথা বুঝতে পারছিনে সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি বুঝতে পারছ না, কারণ তুমি আমার কথায় কোনো গভীর তাৎপর্য আরোপ করতে চাচ্ছ। কিন্তু আমি শুধু বলতে চাচ্ছি, মানুষ নিজের আত্মার সত্তায়—অর্থাৎ তার চরিত্রের সর্বোত্তম ক্ষেত্রে প্রতারণা বা মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে পারে না। এমন প্রবণতা মানুষের কাছে অবশ্যই ঘৃণ্য।

এবার অ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ মানুষের কাছে এর চেয়ে ঘৃণ্য আর কিছু হতে পারে না।

প্রতারিতের আত্মার এই অজ্ঞানতাকেই আমি 'সত্যিমিথ্যা' বা 'যথার্থ মিথ্যা' বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছিলাম। কারণ শব্দের মিথ্যা তো আত্মার জন্য কেবল মিথ্যার আভাস মাত্র, বলতে পার মিথ্যার আঁচ। এ-মিথ্যা অবিমিশ্র মিথ্যা নয়। আমার একথা কি ঠিক নয়, এ্যাডিম্যান্টাস?

অবশ্য ঠিক, সক্রেটিস।

এমন অবিমিশ্র মিথ্যা কেবল দেবতাদের কাছে ঘৃণ্য নয়, মানুষও একে ঘৃণা করে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু শব্দগত মিথ্যা সব সময় ঘৃণ্য নাও হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শব্দগত মিথ্যার ব্যবহারগত সুবিধার দিক আছে। শত্রুর সঙ্গে আচরণ, এর একটি দৃষ্টান্ত

হতে পারে। অথবা ধরো আমাদের কোনো সুহৃদ উন্মাদনা বা বিভ্রান্তির মুহূর্তে কোনো ক্ষতিকর কার্য সম্পাদন করতে যাচ্ছে। তেমন অবস্থায় আমাদের পক্ষে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ তার জন্য নিরাময় বা প্রতিরোধের মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে। পুরাণের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। পুরাণের প্রকৃত কথা আমরা জানিনে। তাই পুরাণ সম্পর্কে আমাদের মিথ্যাকে আমরা সত্যের আকার প্রদান করি। সেই সত্যেই আকার দিয়ে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করি।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ খুব ন্যায্য কথা।

কিন্তু মিথ্যা ব্যবহারের এ সমস্ত কারণের কোনোটিকেই কি আমরা বিধাতার উপর প্রয়োগ করতে পারি? বিধাতা কি পুরাণের বিষয়ে অজ্ঞ যে পুরাণের কারণে সে মিথ্যার আশ্রয় নেবে?

না সক্রেটিস, সে তো এক হাস্যকর ব্যাপার।

তা হলে আমাদের কবিকুলের মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে বিধাতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি বলব, কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার কোনো শক্রর ভয়ে ভীত হয়ে বিধাতা মিথ্যার আশ্রয় নেবে, এমনও কল্পনা করা যায় না।

না, তেমন কথা কল্পনাতীত।

কিন্তু এমন তো হতে পারে যে, বিধাতার জ্ঞানহীন কিংবা উন্মাদ কোনো সুহৃদ আছে।

তা কেমন করে হবে! জ্ঞানহীন বা উন্মাদ কি বিধাতার বন্ধু হতে পারে?

বেশ, তা হলে এমন কোনো কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা আমরা চিন্তা করতে পারিনে যেজন্য বিধাতা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

না, তেমন কোনো কারণের কথাই আমরা চিন্তা করতে পারিনে।

তা হলে অতিমানব আর বিধাতা, মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণে এরা একেবারেই অক্ষম।

হ্যাঁ, তারা একেবারেই অক্ষম।

তা হলে আমরা বলব, বিধাতা কথায় এবং কর্মে সরল এবং সত্য; তার কোনো পরিবর্তন নেই; নিদ্রায় বা জাগরণে, শব্দে বা সংকেতে বিধাতা কাউকে প্রতারণা করতে পারে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তুমি আমার মনের কথাই বলছ, সক্রেটিস।

তুমি তা হলে আমার সঙ্গে একমত যে, স্বর্গীয় ব্যাপার নিয়ে আমাদের ভাষণ বা রচনার দ্বিতীয় রীতি হবে এটাই। দেবতাকুল জাদুকর নয়। তারা জাদুমন্ত্রে নিজেদের রূপান্তরিত করে না কিংবা মানবজাতিকেও তারা প্রতারিত করে না।

তোমার একথা আমি স্বীকার করছি।

তা হলে হোমারকে আমরা যতই প্রশংসা করিনে কেন, আমরা তার আগামেমননের কাছে জিউস দেবের স্বপ্ন প্রেরণের মিথ্যাকে প্রশংসা করতে পারিনে। একিলাস থেটিসের বিবাহের ব্যাপারে এ্যাপোলো সম্পর্কে যে-কাহিনী তৈরি করেছে, তাকেও আমরা স্বীকার করতে পারিনে। থেটিসের মুখে কাহিনীটি এরূপ ঃ

এ্যাপোলো আমার বিয়ের আনন্দোৎসবে যোগ দিয়ে আমার সন্তানসন্ততির দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবন কামনা করেছিল। আমার জীবন স্বর্গীয় আশীর্বাদে ধন্য হবে এই ছিল এ্যাপোলোর ভবিষ্যদ্বাণী। তার বাণীতে আমি সেদিন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। ফিবাসের দৈববাণী বিফল হবে না—এই ছিল আমার ভরসা। অথচ যে-এ্যাপোলো আমার বিয়ের উৎসবে উপস্থিত হয়ে এই বাণী উচ্চারণ করেছিল সেই-ই আমার পুত্রকে আজ হত্যা করেছে।

দেবতাদের সম্পর্কে এরূপ মনোভাবের প্রকাশ আমাদের ক্ষুব্ধ না করে পারে না। অন্তত যারা এমন অপবাদের প্রচার করে তাদের সঙ্গে আমরা কণ্ঠ মেলাতে পারিনে। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কে শিক্ষকগণ এই মিথ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত করবে, এমনটিও আমরা হতে দেব না। কারণ, তরুণ সম্প্রদায়ই হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রক্ষাকারী। তারা দেবতাদের অবশ্যই অকৃত্রিম পূজা-অর্চনায় ভক্তি করবে এবং ভালোবাসবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ সক্রেটিস, আমি তোমার সমস্ত নীতিকেই স্বীকার করছি। এ-সমস্ত নীতিকে আমি আমার বিধান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

তৃতীয় পুস্তক

অধ্যায় ঃ ৯
[৩৮৬—৪১২]

অভিভাবকদের শিক্ষা

প্লেটো সুবিস্তারিতভাবে তাঁর রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাখ্যা করেছেন। এজন্য রিপাবলিককে অনেকে বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের অন্যতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। প্লেটো শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে পর্যায়ক্রমে স্থির করেছেন। প্লেটোর রাষ্ট্রে শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, শিক্ষা হচ্ছে নাগরিকদের স্বাভাবিক গুণ-নির্ধারণের উপায় এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রত্যেক নাগরিকের চরিত্রবিকাশের প্রধান মাধ্যম। তাই পরিকল্পিত এই রাষ্ট্রে শিক্ষার পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কারও এখতিয়ারে ন্যস্ত থাকতে পারে না। প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় এবং সামগ্রিক। এ ক্ষেত্রে যা স্মরণযোগ্য সে হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্পার্টার জন্য অভিনব কোনো ব্যাপার না হলেও এথেন্সের প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা অপরিচিত এবং অভিনব ছিল বলে ইতিহাসকারগণ মনে করেন। কারণ, এথেন্সের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত। পরিবারই শিশুদের আদর্শ নিয়ন্ত্রণ করত। এথেন্সের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল ঃ পাঠ এবং লিখন; শরীরচর্চা এবং তৃতীয় পর্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বা সাহিত্যপাঠ। সাহিত্যপাঠ দ্বারা হিসিয়ড, হোমার প্রভৃতি প্রখ্যাত কবির কাব্য মুখস্থ করা এবং যন্ত্রসহযোগে গীত হওয়া বোঝাত। এর মধ্যে সঙ্গীতও তাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্যায়ের পর অষ্টাদশ বর্ষে শিক্ষার্থীদের দুবৎসরের জন্য সামরিক শিক্ষাও গ্রহণ করতে হত। প্লেটো তাঁর পরিকল্পনায় এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা মোটামুটিভাবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রায়ত্ত করে তাকে সংস্কার করার কথা চিন্তা করেছেন। কবি এবং কাব্যের শোধন এবং নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে প্লেটোর যে উদ্বেগ এবং আগ্রহ আমাদের কাছে বিস্ময়কর বোধ হয় তার প্রধান কারণ এই যে, প্রাচীন গ্রীসে নীতিমালার উৎস হিসাবে কোনো পবিত্র ধর্মগ্রন্থের পরিবর্তে প্রখ্যাত কবিদের কাব্য ও বাণীই কাজ করত। ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে কবিদের বাণীকে মান্য বলে উদ্ধৃত করা হত।

প্লেটো তাঁর রাষ্ট্রের নীতির প্রয়োজনে কবিদের এই প্রভাবকে এবং ধর্মের পৌরাণিক কাহিনী এবং বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করেন।

আমি বললাম ঃ আমরা যদি চাই, আমাদের শিষ্যগণ তরুণবয়স থেকেই তাদের পিতা-মাতা এবং দেবতাদের ভক্তি করবে এবং পারস্পরিক বন্ধুত্বের মূল্য দেবে তা হলে ধর্মের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাদের এই নীতি যে সঠিক তাও আমি বিশ্বাস করি।

কিন্তু সাহসী হতে হলে তাদের এ ছাড়া অন্য শিক্ষাপ্রদান কি আমাদের কর্তব্য হবে না? আর সে শিক্ষা এমন হতে হবে যাতে তরুণদের মন থেকে মৃত্যুর ভয় বিদূরিত হতে পারে। কেননা, যার মনে মৃত্যুর ভয় আছে সে কি সাহসী হতে পারে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ নিশ্চয়ই না।

কিন্তু পাতালভুবনকে যে বাস্তবিক এবং ভয়ংকর বলে বিশ্বাস করে তার পক্ষে মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভয় হওয়া কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় এবং দাসত্বের পরিবর্তে মৃত্যুকে বরণ করা কি সম্ভব?

না সক্রেটিস, তা অসম্ভব।

তা হলে অন্যান্য গল্পের ন্যায় পাতালপুরীর গল্পকারদেরও নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এরূপ কাহিনীকারদের আমরা অনুরাধ করব, পাতালপুরী সম্পর্কে তারা আতঙ্ক প্রচার না করে পাতালপুরীকে যেন আকর্ষণীয় করে বর্ণনা করে। কারণ, পাতালের জগৎ সম্পর্কে তাদের বর্ণনা মিথ্যা। এ বর্ণনা আমাদের রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ যোদ্ধাদের মনোবলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও আমাদের কর্তব্য হবে।

আমি বললাম ঃ তা হলে 'মৃতের রাজ্যে সম্রাট হওয়ার চেয়ে দরিদ্র ভূস্বামীর ভূমির সামান্য অংশের দাস হওয়াকে আমি শ্রেয় মনে করব' আমাদের কবিদের এরূপ আপত্তিকর উক্তিকে আমরা নিষিদ্ধ করে দেব। শুধু এই উক্তি নয়, কবির যে স্তবকে এমন কথা রয়েছে ঃ প্লুটো ভয়ার্ত হয়ে বলছে ঃ যে-ভয়ংকর এবং ভগ্ন

ভবনকে দেবতারা পর্যন্ত ভয়ের চোখে দেখে মর অমর সবাইকে সেই ত্রাসসঙ্কুল ভবনের সম্মুখে আনয়ন করা হবে, সে উক্তিকেও তার রচনা থেকে আমরা মুছে ফেলব। তা ছাড়া কবি যেখানে বলেছে ঃ উঃ কী ভয়ংকর হেডিসের প্রাসাদ! সে তো প্রেতাত্মাদের আশ্রয়স্থল। সেখানে কি মানুষের মনের কোনো ঠাঁই হতে পারে? কিংবা কবির উক্তিতে যেখানে রয়েছে ঃ "পাতালপুরীতে সাধারণ আত্মার পক্ষে অপসৃয়মাণ প্রেতছায়ার ভাগ্যবরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই" এবং "যে-আত্মা তার যৌবনকে পরিত্যাগ করে হেডিসে গমন করেছে সে তার ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়েছে এবং আর্তচিৎকারে সে পৃথিবীর অধঃদেশে ধূম্র হয়ে রহস্যময় গুহার গহ্বরে কেবল চক্রাকারে ঘুরে বেরিয়েছে; পর্বতগাত্র থেকে বাদুড় পড়ে গেলে যেমন আর্তস্বর তুলে পরস্পরকে অবলম্বন করতে চায়, হতভাগ্য এই আত্মার দলও তেমনি ভয়ার্তভাবে একে অপরকে পাতালপুরীতে খুঁজে বেড়ায়" রচনার এ-সমস্ত স্থানকে আমরা অবশ্যই নিষিদ্ধ ঘোষণা করব। হোমার এবং অন্য কবিদের কাছে আমাদের আবেদন হবে, তাঁরা যেন এ-কারণে আমাদের উপর রাগান্বিত না হন। তাঁদের এ-সমস্ত উক্তিকে আমরা অকাব্যিক, বা জনতার জন্য আকর্ষণশূন্য বলে নিষিদ্ধ করছিনে। আমরা নিষিদ্ধ করছি, কারণ, যে-তরুণসম্প্রদায় এবং নাগরিককে মুক্ত ও স্বাধীনচিত্ত হতে হবে এবং মৃত্যুর চেয়ে দাসত্বের শৃঙ্খলকে যাদের অধিকতর ভয়ের বিষয় বলে গণ্য করতে হবে, তাদের জন্য কবিদের এ-সমস্ত উক্তি যত বেশি আকর্ষণীয় বলে বোধ হবে তত বেশি এগুলিকে আমরা ক্ষতিকর বলে গণ্য করব।

সক্রেটিস, একথা নিঃসন্দেহে সত্য।

তা ছাড়া প্রেতপুরী, কবন্ধ, ছায়াবাস ইত্যাদি লোমহর্ষক যেসব নাম পাতাল জগতের উপর প্রয়োগ করা হয় সেগুলিকে আমাদের নিষিদ্ধ করতে হবে। এ-আখ্যানগুলি এত ভয়ংকর যে এগুলি শ্রবণমাত্র মানুষের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে। এ-সমস্ত ভয়ংকর কাহিনীর আদৌ কোনো উপযোগিতা থাকতে পারে না, এমন কথা আমি বলছিনে। কিন্তু এগুলির বিপদের দিক হচ্ছে এই যে, এ-সমস্ত ভয়ংকর কাহিনীর আঘাতে আমাদের রাষ্ট্রের রক্ষীগণের স্নায়ু যেমন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, তেমনি তাদের স্বভাব স্ত্রীজনোচিত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হ্যাঁ, এ-আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়।

তা-ই যদি হয় তা হলে এরূপ ভীতিজনক কাহিনীর আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না।

যথার্থ সক্রেটিস।—এ-সমস্ত কাহিনীর এখানে শেষ হোক।

ভয়ের কাহিনী নয় নতুন মহত্তর বাণী আমাদের কণ্ঠে গীত হবে।

অবশ্যই, সক্রেটিস।

কিন্তু খ্যাতিমানদের ক্রন্দন এবং বিলাপেরও কি পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত নয়?

হ্যাঁ, অপরগুলির মতো, এগুলিকেও নিষ্ক্রান্ত হতে হবে।

কিন্তু এদের বর্জন করা কি আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে? এসো, আমরা বিষয়টি চিন্তা করে দেখি। আমাদের নীতি হচ্ছে এই যে, উত্তম তার উত্তম সহযোদ্ধার জন্য মৃত্যুকে ভয়ংকর বলে গণ্য করবে না।

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা ঠিক। এটাই আমাদের নীতি।

আর সে-কারণেই গতায়ু সুহৃদ নির্মম কোনো দুর্ভোগে পতিত হয়েছে, এমন মনে করে বিলাপ করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়।

না, তার পক্ষে এরূপ বিলাপ করা সঙ্গত নয়।

শুধু তা-ই নয়, আমরা আরও বলব, এরূপ লোক তার সুখে এবং স্বভাবে সুসম্পূর্ণ। তার বিলাপকারীর কোনো আবশ্যকতা নেই।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা যথার্থ।

আর সে-কারণে সম্পদের বিনষ্টি, পুত্র কিংবা ভ্রাতার মৃত্যু এমন লোকের নিকট আদৌ কোনো ভয়ংকর ব্যাপার নয়।

নিঃসন্দেহে সক্রেটিস।

তা হলে এরকম দুর্ভাগ্যকে এরূপ উত্তম লোক যেমন কোনো বিলাপের বিষয় বলে গণ্য করবে না, তেমনি সর্বাধিক স্থিরতার ভাব নিয়েই তার মোকাবেলা করার ক্ষমতা সে প্রদর্শন করবে।

হ্যাঁ সক্রেটিস, অন্যের চেয়ে এরূপ লোক তার দুর্ভাগ্যকে অধিক সহজভাবে গ্রহণ করবে।

তা হলে খ্যাতিমানদের বিলাপ করা চলবে না। এরূপ বিলাপকে আমরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করব। দেশের প্রতিরক্ষক হিসাবে যাদের আমরা শিক্ষিত করতে চাই তারা মরণকে পরোয়া করবে না। বিলাপের দায়িত্ব এদের নয়। বিলাপের দায়িত্ব বরঞ্চ আমরা অধম পুরুষ এবং নারীদের উপরই ন্যস্ত করব। নারীদের মধ্যেও যাদের কিছুমাত্র যোগ্যতা আছে বিলাপ তাদের জন্যও বাঞ্ছিত হবে না।

এ-নীতি অবশ্যই যথার্থ হবে, সক্রেটিস।

তা-ই যদি হয় তা হলে আমরা হোমার এবং অন্যান্য কবিকে আবার অনুরোধ করব যেন তাঁরা দেবীর সন্তান একিলিসকে অমন করুণ করে আর চিত্রিত না করেন। বিলাপরত একিলিস একবার শায়িত হলেন তাঁর পার্শ্বদেশের উপর, তারপর পৃষ্ঠদেশের উপর এবং তার পরে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। পরক্ষণে দণ্ডায়মান হলেন একিলিস, আর উন্মাদের ন্যায় শূন্য সমুদ্রের বুকে পাল তুলে ছুটে চললেন আবার। একবার তিনি দুহাত ভরে তুলে নিচ্ছেন কালিময় ভস্ম, নিজের মাথায় ঢেলে দিচ্ছেন, আবার তিনি আর্তচিৎকারে ভেঙে পড়ছেন। এমনি করে চিত্রিত করেছেন হোমার একিলিসকে। বিচিত্র ভঙ্গি একিলিসের আর্তনাদের। দেবকুলের আত্মজন প্রায়াম। তাঁকেও হোমার এমনি করে অঙ্কিত করেছেন। আর্ত আকুতিতে ভেঙে পড়ছে প্রায়াম, ধুলায় গড়িয়ে পড়ছে, সাথিদের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। না, বীরের এমন বিবরণ আমরা নিশ্চয়ই চাইব না। কিন্তু এর চেয়েও অধিক অবাঞ্ছিত বলব কবিদের হাতে দেবতাদের বর্ণনা। দেবতারাও বিলাপ করছেন, বলছেন ঃ

'হায়রে আমার দুর্ভাগ্য! এজন্যই কি আমি

অসম সাহসীকে বক্ষে ধারণ করেছিলাম ...

আমরা বলব কবিকে ঃ আপনি যদি অঙ্কিত করেন দেবতাদের চিত্র, তবে দোহাই আপনার, আপনার কলমের মুখে আমাদের দেবাদিদেবকে যেন বলতে না হয় ঃ

"হায়রে কপাল! আমার নিজের চোখে দেখতে হচ্ছে, আমার প্রিয় সুহৃদ পশ্চাদ্ধাবিত হচ্ছেন নগরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে আর আমার হৃদয় ভরে উঠছে বেদনায়!"

কিংবা বলতে না হয় তাঁকে ঃ

কী হতভাগ্য আমি যে, মানবকুলের মধ্যে

আমার প্রিয়তম সরিপেডনকে আমি

পরাভূত হতে দেখছি প্যাট্রোক্লাসের হাতে" ...

কারণ, প্রিয় এ্যাডিম্যান্টাস, দেবতাদের এমন অপকাহিনী যদি আমাদের তরুণদের মনকে গুরুতররূপে প্রভাবিত করে, তা হলে তারাও অনুরূপ আচরণকে পরিহার না করে তার প্রতি আকর্ষণই বোধ করবে। ফলে আত্মসংযম বা লজ্জার বদলে তারাও অজুহাত পেলেই বিলাপের বিকারে ডুবে যাবে।

এ্যাডিম্যান্টাস জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, সক্রেটিস, একথা খুবই সত্য।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, কিন্তু এরকম হওয়াটা সঙ্গত নয়। আমাদের যুক্তি তা-ই প্রমাণ করেছে। আর এর চেয়ে উত্তম যুক্তির সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত এই যুক্তির পথই আমরা অনুসরণ করব।

হ্যাঁ, ঠিকই। এরকম হওয়াটা সঙ্গত নয়।

আমাদের রক্ষকদেরও হাস্যাস্পদ হতে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ উপহাসকে যদি মাত্রা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়াও সর্বদা মারাত্মক আকার ধারণ করে।

আমারও তাই মনে হয়।

কাজেই মানুষের মধ্যে যারা মর্যাদাবান তাদেরও যেমন উপহাসের বশীভূত বলে পরিচিত হওয়া উচিত নয়, তেমনি দেবতাদের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। দেবতাদের এরূপ চিত্রিত করা অধিকতর অসঙ্গত।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, দেবতাদের ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য।

তাই যদি হয় তা হলে হোমারের মুখেও আমরা দেবতাদের এমন বর্ণনা শুনতে রাজি থাকব না, যে-বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ

"হিপাস্টাসকে প্রাসাদের চতুর্দিকে উত্তেজিত
পরিক্রমায় রত দেখে মহান দেবতাদের মধ্যে
অদৃশ্য এক হাসির দমক উছলে উঠতে লাগল"

তোমার অভিমত অনুযায়ী এরূপ বর্ণনাকে আমরা স্বীকার করতে পারিনে।

অভিমতটা আমার স্কন্ধে চাপাতে চাও, তাতে ক্ষতি নেই। যে কথা সত্য সে হচ্ছে এই যে, এরূপ বর্ণনাকে আমরা স্বীকার করতে পারিনে। আর তা ছাড়া সত্যকে আমাদের অবশ্যই অধিক মূল্যবান মনে করা উচিত। তাই পূর্বকথার ভিত্তিতে আমাদের বলতে হয়, দেবতাদের জন্য মিথ্যাচার যদি অপ্রয়োজনীয় এবং মানুষের জন্য কেবল ঔষধের মতোই প্রয়োজনীয় বোধ হয় তা হলে এরূপ ঔষধের ব্যবহার আমরা চিকিৎসাবিদের হাতেই সীমাবদ্ধ রাখব। সাধারণ মানুষ এরূপ মারাত্মক ঔষধ নিয়ে যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে পারে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই নয়।

আর তাই মানুষের মধ্যে কারু যদি মিথ্যা বলার অধিকার থাকে তবে সে-অধিকার কেবল রাষ্ট্রের শাসকবর্গেরই থাকতে পারে। রাষ্ট্রের শাসক শত্রুর মোকাবেলায় কিংবা নাগরিকদের শাসনের ক্ষেত্রে জনস্বার্থে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণের অধিকার অপর কারুর থাকবে না।

আবার নাগরিকের কাছে শাসকের মিথ্যা বলার এই অধিকার থাকলেও শাসকের সঙ্গে মিথ্যা বলার অধিকার শাসিতের থাকতে পারে না। শাসকের সঙ্গে শাসিতের মিথ্যাচারকে চিকিৎসকের কাছে নিজের দেহের কোনো রোগ সম্পর্কে মিথ্যা বলা কিংবা শারীরাগারের প্রশিক্ষকের কাছে শিক্ষানবিশের মিথ্যা বলার চেয়েও আমরা ঘৃণ্য মনে করব। কিংবা এরূপ মিথ্যাকে আমরা জাহাজের অধিনায়কের কাছে জাহাজের অবস্থান এবং তার সাথিদের অবস্থা সম্পর্কে নাবিকের সত্য বিবরণ না দেওয়ার চেয়েও নিন্দনীয় মনে করব।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এ তো খুবই সত্য কথা।

তা হলে শাসক যদি দেখে, সে ছাড়া অপর কেউ মিথ্যা বলছে তা হলে তাকে রাষ্ট্রবিরোধী হিসাবে দণ্ডদানের তার অধিকার থাকবে। নয় কি?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ নিঃসন্দেহে! রাষ্ট্র সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত করতে হয়, তা হলে অবশ্যই শাসকের এই অধিকার থাকবে।

এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে সংযম বা মিতাচারের প্রশ্ন। আমাদের রাষ্ট্রের যুবশক্তিকে অবশ্যই সংযমী হতে হবে।

নিশ্চয়ই।

কিন্তু সংযমের চরিত্র কী? সাধারণভাবে যদি বলি তা হলে সংযম দ্বারা আমরা আদেশদাতার প্রতি বাধ্যতা এবং ইন্দ্রিয়সুখের ক্ষেত্রে আত্মসংযম বুঝব।

একথা সত্য।

তা হলে হোমারের কাব্যে ডায়োমেড যখন বলেন ঃ 'সুহৃদ তুমি স্থির থাকো এবং আমার অনুগত হও', তখন সে-উক্তিকে আমরা অনুমোদন করব। নিচের কবিতার ছত্র দুটিতেও আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না ঃ

গ্রীসবাসীগণ শক্তিমত্তার সঙ্গে

এবং তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি সভয় আনুগত্যে সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে চলল। অনুরূপ আবেগের প্রকাশে আমাদের অনুমোদন থাকবে।

হ্যাঁ, এরূপ আবেগে আমাদের অনুমোদন থাকবে।

কিন্তু আর-একটি ছত্রের কথা ধরো। ছত্রটি হচ্ছে ঃ আহা! সুরায় সে আবিষ্ট। কুকুরের ন্যায় তার চোখ আর হরিণের ন্যায় তার অন্তর। কবির কাব্যে এর পরে আরও বাক্য আছে। শাসকদের লক্ষ্য করে কোনো নাগরিক এমনি পদ্যে কিংবা

গদ্যে যদি ঔদ্ধত্যের উক্তি উচ্চারণ করে তা হলে আমরা কী বলব? এর উদ্দেশ্য কি মহৎ, না এ-উক্তি কুৎসা-রটনার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত?

এ অবশ্যই কুৎসার উক্তি।

এরূপ উক্তিতে কিছু আমোদের খোরাক থাকতে পারে। কিন্তু এমন উক্তি নিশ্চয়ই সংযমের সহায়ক নয়। কাজেই এমন উক্তি আমাদের তরুণদের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই তুমি আমার সঙ্গে একমত হবে?

হ্যাঁ, আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

আবার যখন দেখি কবি সবচেয়ে জ্ঞানীর মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, নিচের কথার চেয়ে মহত্তর কথা কিছু তিনি শোনেননি ঃ

"আহারের টেবিল সজ্জিত করা হয়েছে; রুটি আর মাংস অপরিমেয়; পরিচারক সুরাপাত্র-হাতে সুরা পরিবেশন করে চলেছে", তখন আমরা কী সিদ্ধান্ত করব? আমাদের তরুণদের সংযমবৃদ্ধির জন্য এরূপ কাহিনীর অবতারণা কি মঙ্গলকর? শুধু উপরের কাহিনী নয়, আর-এক ছত্রে কবি বলেছেন ঃ "বুভুক্ষায় মৃত্যুবরণের চেয়ে দুঃখজনক ভাগ্য আর কী হতে পারে?" এখানেই শেষ নয়। ধরো জিউসদেবের কাহিনীর কথা। মনুষ্যকুল নিদ্রামগ্ন। দেবতাকুলও তা-ই। দেবাদিদেব জিউস একাকী জাগ্রত। তিনি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করছেন, পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। কিন্তু হীরাদেবীকে দর্শনমাত্র জিউসদেব আত্মহারা হয়ে পড়লেন। ইন্দ্রিয়লিপ্সা তাঁকে মুহূর্তের মধ্যে পরাভূত করে ফেলল। জগৎ সম্পর্কে পরিকল্পনার কথা তিনি বিস্মৃত হলেন। হীরাকে নিয়ে শয্যাশায়ী হবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। কুটিরের অভ্যন্তরে প্রবেশের বিলম্ব তার অসহনীয় হয়ে উঠল। জিউস বললেন ঃ "হীরার সঙ্গে এমন বিমোহিত অবস্থা তাঁর আর কখনো ঘটেনি—এমনকি তারা যখন পিতামাতার দৃষ্টির অন্তরালে প্রথম মিলিত হয়েছিল, তখনও নয়।'

কিংবা ধরো হিপাসটাসের কাহিনী। প্রেমরত আরিস এবং আফ্রোদিতের দর্শনে তাদের দুজনকেই হিপাসটাস শেকল দিয়ে বেঁধে ফেললেন।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমি দৃঢ়ভাবে মনে করি এমন কাহিনী আমাদের তরুণদের কোনোক্রমেই শ্রবণ করা উচিত নয়।

কিন্তু প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের ধৈর্যের কীর্তি এবং কাহিনী তরুণদের জন্য পরিবেশন করা যায়। এসব কাহিনী তাদের শ্রবণ করা উচিত। নিচের ছত্র দুটিতে এরূপ কথারই উল্লেখ আছে ঃ

"বক্ষকে সে আঘাত করল এবং নিজের অন্তরকে সে তিরস্কৃত করে বলল, হে আমার হৃদয়, ধৈর্যধারণ করো; এর চেয়ে অধিকতর কষ্টকর অবস্থা কি তুমি সহ্য করনি?"

হ্যাঁ, এরূপ কাহিনী আমাদের তরুণদের অবশ্যই শ্রবণ করা সঙ্গত।

তা ছাড়া আমাদের তরুণদের জন্য পারিতোষিক গ্রহণ এবং অর্থের কামনাকে নিষিদ্ধ করতে হবে। আমরা তরুণদের পারিতোষিক গ্রহণ কিংবা অর্থের কামনাকে অনুমোদন করতে পারিনে।

না, আমরা তা অবশ্যই অনুমোদন করতে পারিনে।

'উৎকোচে দেবতা এবং পূজ্য রাজা সবাই বশীভূত" সঙ্গীতের এমন ধুয়াও আমরা তরুণদের জন্য পরিবেশন করব না। আবার আর-একটা কাহিনী ধরো। একিলিসের শিক্ষক ফিনিক্স তাঁর ছাত্রকে গ্রীসবাসীদের নিকট থেকে পারিতোষিক গ্রহণ করে তাদের সহায়তাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু এমন উপদেশদানকে আমরা উত্তম বলে অনুমোদন করতে পারিনে। কিংবা একথাও আমরা স্বীকার করতে পারিনে যে, একিলিস এত অর্থলিপ্সু বা পারিতোষিকপ্রার্থী ছিলেন যে, পারিতোষিক লাভ করেই তিনি হেক্টরের মৃতদেহ প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং যতক্ষণ তিনি তা পাচ্ছিলেন না ততক্ষণ হেক্টরের মৃতদেহ তিনি প্রত্যর্পণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ না, এরূপ মনোভাবকে আমরা অনুমোদন করতে পারিনে।

হোমার আমার যেরূপ প্রিয় কবি তাতে একথা আমি বলব না যে, কবি একিলিসের মধ্যে এরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে নিন্দনীয় অধর্মের অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। এ্যাপোলোদেবের প্রতি ঔদ্ধত্যের যে-কাহিনীর উল্লেখ কবি করেছেন তাকেও আমি বিশ্বাস করতে চাইনে। ...

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমার এ কথা ঠিকই।

পসিডনের পুত্র থিস্যুস কিংবা জিউসের পুত্র পিরিথুস কিংবা অপর কোনো বীর ঘৃণ্য বলাৎকারের ন্যায় পাপকার্যে লিপ্ত হবে এমন কাহিনী আমরা বিশ্বাস করতে পারিনে। দেবতা এবং বীরদের সম্পর্কে এ-অপবাদ মিথ্যা। কবিদের কাছে আমাদের দাবি হবে, হয় তাঁরা ঘোষণা করবেন এরূপ অপরাধজনক কাজ তাঁরা করেননি অথবা বলবেন, এমন অপকর্মের নায়ক দেবতাদের সন্তান নয়। কিন্তু আমরা কবিদের মুখে একই নিশ্বাসে দেবতাদের সম্পর্কে উভয় রকম অপবাদ উচ্চারিত হতে দিতে পারিনে। দেবতারা সব পাপকার্যের নায়ক আর

সাধারণ মানুষ থেকে বীরপুরুষ আদৌ পৃথক নয়—আমাদের তরুণরা কবিদের কাছ থেকে এমন ভ্রান্ত শিক্ষা পাবে, এ আমরা হতে দিতে পারিনে। কবিদের এমন মনোভাব যেমন নিষ্কলুষ নয়, তেমনি যথার্থও নয়। কেননা আমরা পূর্বেই প্রমাণ করেছি ঃ দেবতারা কোনো অন্যায়ের উৎস হতে পারে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ নিশ্চয়ই নয়।

তা ছাড়া এসব উপাখ্যান যারা শ্রবণ করে তাদের ওপরও এর অবাঞ্ছিত প্রভাব ঘটতে পারে। কারণ তখন সকলেই নিজের অপকর্মকে, এই বলে ক্ষমা করতে শুরু করবে যে, দেবাদিদেব জিউসের আত্মীয়স্বজনরা দেবতা হয়েও যখন এরূপ পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে তখন মানুষ হিসাবে আমাদের পক্ষে এগুলো অন্যায় নয়। কাজেই এসব ভিত্তিহীন উপাখ্যান আমাদের বন্ধ করে দেওয়া কর্তব্য। নচেৎ তরুণদের নীতিবোধের বন্ধনকে এরা শ্লথ করে দেবে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই সক্রেটিস।

তরুণদের আমরা কী কী বিষয়ে শিক্ষিত করে তুলব তা নিয়ে আমরা যখন আলোচনা করছি, তখন আমাদের দেখা আবশ্যক, কোনো বিষয়কে আমরা বিস্মৃত হয়েছি কি না। দেবতা, অধিদেবতা আর মর্ত্যলোকের বীর—কাদের সম্পর্কে কী শিক্ষা দেওয়া হবে তা আমরা ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট করেছি।

অবশ্যই তা আমরা করেছি।

তা হলে সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমরা কী বলব? আমাদের আলোচ্য বিষয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্যটি এখনও বাকি।

একথা ঠিক, সক্রেটিস।

কিন্তু সুহৃদবর, এ-প্রশ্নের জবাবদানের অবস্থা আমাদের এখনও হয়নি বলেই আমার মনে হচ্ছে।

কেন সক্রেটিস?

কারণ আমাদের বলতেই হবে যে, কবি এবং কাহিনীকার—এঁরা সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যখন বলেন যে, জগতে যারা অন্যায়কারী তারাই সুখী এবং যারা উত্তম তারা অসুখী এবং অসহায়; যখন তাঁরা বলেন, অন্যায়কর্ম ধরা না পড়লে লাভজনক এবং ন্যায় ধর্ম একের লোকসান আর অপরের লাভ ছাড়া কিছু নয়, তখন তাঁরা মারাত্মক রকমের মিথ্যাচারণে লিপ্ত হন। এরূপ মিথ্যাভাষণকে কবি এবং কাহিনীকারদের জন্য অবশ্যই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করতে হবে। এর

বিপরীত-মর্মী কাব্য এবং কাহিনী রচনার জন্য তাঁরা আদিষ্ট হবেন। এ-ব্যাপারে তোমার কী মনে হয়?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই কবি এবং কাহিনীকারদের উপর এরূপ আদেশই আমরা জারি করব।

আমি বললাম ঃ এ-বিষয়ে আমাকে যদি তুমি সঠিক বলে স্বীকার কর, তা হলে আমি বলব, যে-নীতি নিয়ে আমরা এ-যাবৎ পরস্পর তর্ক করেছি তুমি তাকেও মেনে নিচ্ছ?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমার অনুমানকে আমি মেনে নিচ্ছি সক্রেটিস।

অবশ্য মানুষ সম্পর্কে এমন উক্তি করা চলে কি চলে না তার শেষ নিষ্পত্তি আমরা ন্যায় কী এবং ন্যায়বান অপরের চোখে ভালো কিংবা মন্দ যেভাবেই দৃষ্ট হোক-না কেন, ন্যায় যে তার জন্য মঙ্গলকর—এ-সত্য উদ্ধার করার পরেই আমরা করতে পারি, তার পূর্বে নয়।

এ কথা যথার্থ।

বেশ, তা হলে কবিতার প্রসঙ্গ আমরা ছেড়ে দিই। কাব্যের ওপর যথেষ্ট হয়েছে। এবার বরঞ্চ আমরা কাব্যের রীতি নিয়ে আলোচনা করব। এ-কাজ সমাধা হলে কাব্যের কথা এবং কৌশল—দুটো দিকের আলোচনাই আমাদের শেষ হবে।

এবার এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তুমি কী বলতে চাচ্ছ, আমি বুঝতে পারছিনে সক্রেটিস।

তা হলে কথাটা আমায় বুঝিয়ে বলতে হয়। বোধগম্য হওয়ার জন্য ব্যাপারটা এভাবেও বলতে পারি। তুমি নিশ্চয়ই জান, কবিতা আর পুরান অতীত, বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনা বই আরকিছু নয়।

অবশ্যই।

আর বর্ণনা সহজ বর্ণনা, বর্ণনার অনুলিপি কিংবা এ-দুটোর মিলনে রচিত হতে পারে। ঠিক নয় কি?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ না সক্রেটিস, এ-ব্যাপারটাও আমি বুঝতে পারলাম না।

এবার তো শিক্ষক হিসাবে লজ্জা আমারই। আমি এক অপদার্থ শিক্ষক। না হলে বিষয়টা বুঝতে এত অসুবিধে হচ্ছে কেন? এবার তা হলে কৌশলটা বদলাতে হয়। খারাপ বক্তার ন্যায় বরঞ্চ আমি সমগ্র বিষয়টা একসঙ্গে উত্থাপন

না করে এর একটি অংশকে আমার অর্থের দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করছি। তুমি তো ইলিয়াডের উদ্বোধনী ছত্র ক'টি জান। কবি এ-চরণগুলোতে ক্রাইসেস-এর উল্লেখ করে বলছেন ক্রাইসেস আগামেমনের কাছে তাঁর কন্যার মুক্তির দাবি করেন। কিন্তু এ-দাবি শুনে আগামেমনন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ক্রাইসেস নিজের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যর্থ হয়ে একিয়ানদের বিরুদ্ধে দেবতার সাহায্য কামনা করেন। এই ছত্রগুলি সম্পর্কে লক্ষণীয় হচ্ছে যে, কবি এখানে উত্তম পুরুষে কথা বলছেন। তাঁর উক্তি থেকে আমরা আদৌ বুঝতে পারিনে যে তিনি অপর কেউ। কিন্তু এর পরবর্তী পঙ্ক্তিতে আমরা দেখি কবি ক্রাইসেস-এর জবানিতে কথা বলছেন। আর এর পরে দেখা যায় কবি এমনভাবে বর্ণনা করছেন যেন বক্তা হোমার নন, বক্তা হচ্ছে বৃদ্ধ পুরোহিত স্বয়ং। এই দ্বৈত ভূমিকায় কবি সমগ্র ওডিসিতে ট্রয় এবং ইথাকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ অবশ্যই ঠিক।

কবির বর্ণনার এই কৌশলকে কবির নিজের আবৃত্তি কিংবা আবৃত্তির অন্তর্বর্তী চরণ সর্বত্রই আমরা দেখতে পাই।

যথার্থ সক্রেটিস।

কিন্তু কবি যখন অপর কারুর জবানিতে কথা বলেন তখন কি তিনি সেই অপর চরিত্রের প্রকাশরীতিকেই আত্মস্থ করে নেন না?

অবশ্যই কবি অপর চরিত্রের রীতি গ্রহণ করেন।

কিন্তু অপর চরিত্রের রীতির এরূপ গ্রহণ, সে কণ্ঠধ্বনিতে হোক কিংবা ভঙ্গিতেই হোক, সেই প্রক্ষিপ্ত চরিত্রের কি অনুকরণ নয়?

অবশ্যই তা অনুকরণ।

তা হলে এক্ষেত্রে কবির বর্ণনা অনুকরণকে অনুসরণ করেছে, একথা আমরা বলতে পারি?

অবশ্যই একথা আমরা বলতে পারি।

আবার অন্যদিকে কবি যদি কোনো ক্ষেত্রেই অপর কোনো চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ না করেন তা হলে তাঁর মধ্যে আর অনুকরণ থাকে না এবং তাঁর বর্ণনা সরাসরি বর্ণনাতে পরিণত হয়ে যায়। কিন্তু আমার বক্তব্যটি আর একটু স্পষ্ট করার জন্য এবং যাতে তুমি আবার বলে উঠতে না পার "সক্রেটিস, আমি তোমায় বুঝতে পারছিনে" সেজন্য এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটিও আমি তোমাকে দেখাতে চাই। ধরো হোমার বলছেন ঃ "পুরোহিত তাঁর কন্যার মুক্তিপণ হাতে

নিয়ে একিয়ানদের এবং তাঁদের রাজার কাছে আবেদনে ভেঙে পড়লেন।" আর ক্রাইসেসের কোনো জবানি উল্লেখ না করে তাঁর বর্ণনাটা কবি যদি এই রীতিতে চালিয়ে যেতেন তা হলে আমরা বলতাম কবি নিজের ভাষায় কথা বলছেন এবং তাঁর বর্ণনা সাক্ষাৎ বর্ণনার চরিত্র গ্রহণ করেছে। এই রীতিতে কবির বর্ণনাটি যেমন হত তার আমি উল্লেখ করছি। আমি অবশ্য কবি নই তাই ছন্দ বাদ দিয়েই আমি বিবরণটি পেশ করছি ঃ "এবার পুরোহিত এলেন। হাতে তাঁর মুক্তিপণ। তিনি গ্রীকদের হয়ে দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন তারা ট্রয়কে জয় করে নিরাপদে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারে। তাঁর অনুরোধ, গ্রীকগণ যেন মুক্তিপণ গ্রহণ করে তাঁর কন্যাকে মুক্তিদান করে এবং দেবতাকে সম্মান প্রদর্শন করে। পুরোহিত এমনিভাবে তাঁর আবেদনটি গ্রীকদের সামনে উপস্থিত করলেন। গ্রীকগণ পুরোহিতকে সম্মান করত। তারা তাঁর আবেদনটি গ্রহণের জন্য সম্মতি প্রকাশ করল কিন্তু আগামেমননের ক্রোধ প্রশমিত হল না। তিনি পুরোহিতকে নিষ্ক্রান্ত হতে বললেন। আগামেমনন পুরোহিতকে সতর্ক করে দিলেন, পুরোহিত পুনরায় তাঁর আবেদন নিয়ে এলে দেবতাগণও তাঁকে কোনো সাহায্য করতে সক্ষম হবে না। ক্রাইসেসের কন্যাকে মুক্তি দেওয়া হবে না। তাঁর কন্যা আরগসে আগামেমননের সঙ্গে জীবনপাত করে একদিন বার্ধক্যে উপনীত হবে। পুরোহিত নিরাপদে আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাকে উত্তেজিত না করে যেন তিনি অবিলম্বে আগামেমননের সম্মুখ থেকে প্রস্থান করেন। এই উক্তি শ্রবণ করে বৃদ্ধ নীরবে আতঙ্কিত হৃদয়ে আগামেমননের শিবির পরিত্যাগ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেবতা এ্যাপোলোকে তাঁর সকল নামে আরাধনা করতে লাগলেন। দেবতা এ্যাপোলোকে বৃদ্ধ পুরোহিত স্মরণ করিয়ে দিলেন তাঁর মন্দিরস্থাপনে কিংবা তাঁর উদ্দেশে পশু উৎসর্গে তাকে তুষ্ট করতে কোনোদিন তিনি কার্পণ্য করেননি। আজ তার বিনিময়ে যেন তিনি তাঁকে রক্ষা করেন এবং তাঁর চোখের অশ্রু যেন দেবতার বাণ নিয়ে একিয়ানদের উপর নিপতিত হয়।" এভাবে কবির বিবরণ একটি সাক্ষাৎ বর্ণনার আকার গ্রহণ করবে।

আমার এ-বিবরণ শুনে এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এবার আমি বুঝতে পারছি।

আবার তুমি এর বিপরীতটিও চিন্তা করতে পার। মনে করো মধ্যবর্তী অনুচ্ছেদগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সংলাপটিকে রাখা হল।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাও আমি বুঝতে পারছি। তুমি হয়তো বিয়োগান্ত নাটকের কথা বলতে চাচ্ছ।

আমার কথার তাৎপর্য তুমি যথার্থই ধরতে পেরেছ। আর আমার তো মনে হয়, যে-কথা তুমি এর পূর্বে বুঝতে পারনি, সেকথা তুমি এবার বুঝতে পারছ। অর্থাৎ কাব্য এবং পুরাণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি অনুকারী। বিয়োগান্ত আর মিলনান্তক নাটকে আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই। আর এর বিপরীত রীতিরও দৃষ্টান্ত আছে যেখানে কবি হচ্ছে একমাত্র কথক। বীররসাত্মক কাব্যে এর উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়। মহাকাব্য এবং অপরাপর রচনায় উভয় রীতির সাক্ষাৎ মেলে। কী বল এ্যাডিম্যান্টাস? আমার কথার তাৎপর্যটি তুমি ধরতে পারছ?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ সক্রেটিস, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি।

আমি তোমায় আর-একটি কথাও স্মরণ করিয়ে দেব। আমি বলেছিলাম,এ-বিষয়ে যথেষ্ট হয়েছে; এবার আমরা রীতির আলোচনায় চলে যাব।

হ্যাঁ, তাও আমার মনে আছে।

আমার সেকথা বলার অর্থ ছিল, অনুকারী কাব্যকলা সম্পর্কে আমাদের একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। ঘটনার বর্ণনায় কবিদের কি অনুকারী রীতি অনুসরণ করতে দেওয়া হবে? যদি কবিদের তা করতে দেওয়া হয় তবে তা কি সমগ্র রচনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, না তার অংশবিশেষের উপর? যদি অংশবিশেষের উপর হয় তা হলে রচনার কোন্ অংশে এ-রীতি ব্যবহৃত হবে? অথবা অনুকারী-রীতি পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে?

সক্রেটিস, তোমার প্রশ্নটা কি এই, বিয়োগান্ত এবং মিলনান্তক রচনাকে আমরা আমাদের রাষ্ট্রে রচিত হতে দেব কি দেব না?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তা-ই বটে। তবে প্রশ্নের তাৎপর্য আরও অধিক কিছু হতে পারে। আমি নিজেও নিশ্চিত নই। আমি কেবল এটুকু বলতে পারি, যুক্তির হাওয়া আমাদের যেদিকে টেনে নেবে, আমরা সেদিকেই যাব।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই। সেদিকেই আমাদের যেতে হবে।

তা হলে, এ্যাডিম্যান্টাস, আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ আমাদের রাষ্ট্রের যারা অভিভাবক তারা কি অনুকারী হবে? অথবা বলব, এ-প্রশ্নের জবাব আমাদের মূল বিধানেই রয়ে গেছে? মূল বিধানের সিদ্ধান্ত ছিল ঃ একটি মানুষ কেবল একটি কাজই সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে, একাধিক কাজ নয়। যদি কেউ একাধিক কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করে তা হলে সে কোনোটিতেই তেমন সুনাম অর্জনে সক্ষম হবে না।

নিঃসন্দেহে।

আর একথা অনুকরণের ক্ষেত্রেও সত্য। একটি বিষয়ের অনুকরণে একজন

মানুষ যে-দক্ষতা অর্জন করতে পারে, একাধিক বিষয়ের অনুকরণে সে-দক্ষতা সে নিশ্চয়ই অর্জন করতে পারে না।

না। তা সে পারে না।

তা হলে একই ব্যক্তির পক্ষে কোনো গুরুচরিত্রের দায়িত্বপালন এবং অন্য চরিত্রের অনুকরণ একই সময়ে সম্ভব হতে পারে না। কারণ, অনুকরণীয় বিষয়ের চরিত্র যতই সাদৃশ্যমূলক হোক-না কেন, একই সঙ্গে একাধিক চরিত্রের ভূমিকাপালনে সাফল্য অর্জন করা কারো পক্ষে সহজ নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একই সঙ্গে কারো পক্ষে বিয়োগান্ত এবং মিলনান্ত নাটক যে সুদক্ষতার সঙ্গে রচনা করা সম্ভব নয় আমরা তার উল্লেখ করতে পারি। কারণ এই উভয় শিল্পকেই তুমি অনুকারী শিল্প বলে অভিহিত করেছ। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ সক্রেটিস, আমি তা করেছি। এবং তোমার একথাও যথার্থ যে একই শিল্পীর পক্ষে উভয়ক্ষেত্রে সমান সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

যেমন কেউ একই সঙ্গে কবিওয়ালা এবং অভিনেতার ভূমিকা পালন করতে পারে না।

যথার্থ।

ঠিক যেমন ভাঁড় এবং বিষাদাত্মক চরিত্রের অভিনয় কেউ একই সঙ্গে করতে পারে না। আর এগুলি সবই অনুকরণের বিষয়। নয় কি?

হ্যাঁ, এরা অনুকরণের বিষয়।

আসলে, এ্যাডিম্যান্টাস, মানুষের ক্ষমতা খুবই কম। যে-ছাঁচে সে সৃষ্ট হয়েছে সে-ছাঁচের আকারক্ষুদ্র, ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তার পক্ষে একাধিক অনুকরণীয় চরিত্রের অনুকরণ করা যেমন কষ্টকর তেমনি একাধিক কাজ সুসম্পন্ন করাও অসম্ভব।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা যথার্থ, সক্রেটিস।

এবার যদি রাষ্ট্রের অভিভাবক অর্থাৎ শাসকদের সম্পর্কে আমাদের স্থূল অভিমতের কথা স্মরণ করি তা হলে আমরা দেখব যে, যেহেতু অভিভাবকদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেদের উৎসর্গ করা এবং এই কর্তব্য-সম্পাদনকে নিজেদের বিশেষ দক্ষ কলায় পরিণত করা, সে-কারণে অভিভাবকদের পক্ষে এই কর্তব্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অপর কোনো কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করা কিংবা অপর কোনোকিছুকে অনুকরণ করা সঙ্গত নয়। অভিভাবকদের পক্ষে কোনোকিছু যদি অনুকরণীয় হয় তবে তারা অনুকরণ করবে

অল্প বয়স থেকে কেবল সেই সমস্ত চরিত্রকেই যে-চরিত্র মূল কর্তব্য সম্পাদনে তাদের উপযুক্ত করে তুলবে ঃ তাদেরকে সাহসী, সংযমী, পবিত্র এবং স্বাধীনচেতা করে তুলবে। অন্য কথায়, অভিভাবকগণ কোনো গর্হিত কিংবা অনুদার চরিত্রের অনুকরণের চেষ্টা করবে না। কারণ অনুকরণের মাধ্যমে অনুকৃত ভূমিকা যথার্থই তাদের চরিত্রের অংশে পরিণত হয়ে যেতে পারে। কারণ, এ্যাডিম্যান্টাস তুমি কি লক্ষ করনি যে, ছোটকাল থেকে শুরু করে দীর্ঘকাল ধরে কেউ কিছু অনুকরণ করতে থাকলে অনুকৃত বৈশিষ্ট্য অনুকারীর শরীর, কণ্ঠ এবং মনকে প্রভাবান্বিত করে তার দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা অবশ্যই সত্য।

তা হলে যাদের আমরা মঙ্গল কামনা করি এবং যাদের উত্তমরূপে গঠিত হওয়া আবশ্যক তাদের কেউ কোনো স্ত্রীলোককে অনুকরণ করবে, এটি আমরা হতে দিতে পারিনে। কোনো স্ত্রীলোক, সে তরুণী কিংবা বৃদ্ধা যা-ই হোক-না কেন, যে তার স্বামীর সঙ্গে কলহরতা, যে সুখের অহঙ্কারে কিংবা যাতনা, দুঃখ বা ক্রন্দনের তীব্রতায় দেবতাদের তুচ্ছ করে, তেমন স্ত্রীলোক অনুকরণের পাত্রী হতে পারে না। এবং যে অসুস্থা, প্রেমে নিমজ্জিতা বা প্রসবের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সেও কোনোক্রমে অনুকরণীয় হতে পারে না।

খুবই যথার্থ কথা, সক্রেটিস।

আর তা ছাড়া আমাদের তরুণরা দাসদের করণীয় কোনো কাজও করবে না। স্ত্রী কিংবা পুরুষ কোনো দাসের প্রতিনিধিস্থানীয়ের ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে না।

না, তেমন কোনো কাজ তারা অবশ্যই করবে না।

আর অধমের অনুকরণ তো কোনোক্রমেই অনুমোদনযোগ্য হতে পারে না। কারণ, অধম, সে কাপুরুষ কিংবা অপর যে-চরিত্রের হোক না কেন, আমরা যা উত্তম মনে করেছি তার বিপরীত কার্যে লিপ্ত থাকে। তারা পানাসক্ত কিংবা সচেতন অবস্থায় পরস্পরকে এবং তাদের প্রতিবেশীকে কটুবাক্যে এবং আচরণে আহত করে। এরূপ স্বভাবই তাদের মজ্জাগত। কাজেই এদের আচরণ যেমন তরুণরা অনুকরণ করবে না, তেমনি পাগলের কোনো আচরণও তাদের অনুকরণীয় নয়। কারণ, পাপকর্মের ন্যায় পাগলামিকে জানতে হবে কিন্তু তাকে জীবনে আচরিত হতে দেওয়া চলবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

তা ছাড়া কর্মকার বল কিংবা নৌকোর দাঁড়ী বা অপর কোনো চাতুর্যের কথা বল—এরূপ গুণের অনুকরণও আমাদের নিষিদ্ধ করতে হবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এ-ব্যাপারে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। আমাদের তরুণরা যখন এরূপ কোনো জীবিকা গ্রহণের কথা চিন্তাই করতে পারবে না, তখন এদের অনুকরণও তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

কিংবা ধরো অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, ষাঁড়ের শব্দ, নদীর মৃদু কুলুরব বা সমুদ্রের গর্জন এবং বজ্রের নির্ঘোষ—এসবও আমাদের তরুণদের অনুকরণীয় নয়।

অবশ্যই নয়। পাগলামিকে যদি আমরা নিষিদ্ধ করি, তা হলে পাগলের ক্রিয়াকাণ্ডের অনুকরণ অবশ্যই নিষিদ্ধ হবে।

আমি বললাম, এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার বক্তব্য যদি আমি সঠিকভাবে বুঝে থাকি তা হলে আমার মনে হচ্ছে তোমার মতে বর্ণনার দুটো রকম হতে পারে। একটি উত্তম, অপরটি অধম। সত্যিকারের উত্তম ব্যক্তি যেখানে বর্ণনার উত্তম রীতি গ্রহণ করে, অধম শিক্ষা ও চরিত্রের ব্যক্তি সেখানে বর্ণনার অধম রীতি গ্রহণ করে।

কিন্তু রীতি দুটির পার্থক্য কী?

আমি বলছি। ধরো, একজন উত্তম এবং ন্যায়বান ব্যক্তি বর্ণনাকালে অপর কোনো উত্তমের কোনো বাণী কিংবা কর্মের বর্ণনার মুহূর্তে উপস্থিত হলেন। এমন মুহূর্তে বর্ণনাকারী উত্তমের বাণী বা কর্মকে প্রত্যক্ষ ভঙ্গিতে বর্ণনা করতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করবেন না। অর্থাৎ এই উত্তম চরিত্র যদি মহৎ কর্ম এবং দৃঢ়তার পরিচয় দেয় তা হলে বর্ণনাকারী তাকে সরাসরি অনুকরণ করবেন। অবশ্য সে চরিত্র যদি অসুস্থ, পানাসক্ত, প্রেমাসক্ত বা অপর কোনো বিপর্যয়ে নিপতিত হয়ে থাকে তা হলে হয়তো এ-অনুকরণ অত প্রত্যক্ষ হবে না। কিন্তু বর্ণনাকারী যখন অধম চরিত্রের সাক্ষাৎ পান তখন তিনি তার কর্মের প্রতি নজরই দেন না। আর যদি তার অনুকরণ করেন তবে কেবল এই চরিত্রের উত্তম মুহূর্তটুকুরই অনুকরণ করবেন। এর অতিরিক্ত অনুকরণে বর্ণনাকারী লজ্জিত বোধ করবেন। অধমের আদর্শে নিজেকে রূপায়িত করাকে তিনি অমর্যাদাকর বলে গণ্য করবেন। বস্তুত পরিহাসের মাধ্যম ব্যতীত এমন শিল্পরীতির ব্যবহারকে তিনি নিজের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করবেন। এরূপ রীতির বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহ করে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমারও তা-ই মনে হয়, সক্রেটিস।

এমন ক্ষেত্রেও হোমারের যে-দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করেছি বর্ণনাকারী তেমন রীতি অনুসরণ করবেন। অর্থাৎ তার রীতি হবে অভিনয়মূলক এবং

বর্ণনামূলক—উভয়ই। অভিনয়ের অংশ এতে অল্পই থাকবে; বর্ণনামূলকই অধিক হবে। তুমি কি আমার সঙ্গে একমত এ্যাডিম্যান্টাস?

অবশ্যই, সক্রেটিস। আমাদের বক্তা এরূপ রীতিই অনুসরণ করবেন।

কিন্তু অন্য ধরনের চরিত্রও আছে যার কোনোকিছু বর্ণনাতেই আপত্তি হবে না। বরঞ্চ বর্ণনার বিষয় যত অধম হবে সে তত সঙ্কোচহীন হয়ে উঠবে। কোনো অধমই তার কাছে অধম বলে গণ্য হবে না। কোনোকিছুর অনুকরণেই তার কোনো দ্বিধা হবে না। এবং শুধু পরিহাসের জন্য নয়, যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বিপুলসংখ্যক দর্শকের সম্মুখে এইরূপ চরিত্রের অভিনয় করবে। মুহূর্ত পূর্বেই আমি বলেছি ঃ এমন চরিত্র বজ্রের নির্ঘোষ অনুকরণ করবে; ঝড়ের শব্দ, শিলাপাতের ধ্বনি, চক্র এবং কপিকলের ঘরঘর, বাঁশি বা অপরাপর বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের সে অনুকরণ করবে; কুকুরের ন্যায় ঘেউঘেউ করতে তার সঙ্কোচ হবে না; ভেড়ার ভ্যাভ্যা ধ্বনি কিংবা কুক্কুটের রবেও সে নিঃসঙ্কোচ। মোটকথা, তার সমগ্র শিল্পই বর্ণিতের কণ্ঠধ্বনি এবং অঙ্গভঙ্গির অনুকরণে পর্যবসিত হবে। বর্ণনার অংশ তাতে খুব কমই থাকবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, তার বলার রীতি এটাই হবে।

তা হলে রীতির ক্ষেত্রে আমরা এই দুটো রীতিকে নির্দিষ্ট করতে পারি। তুমি কী বল।

হ্যাঁ, এরূপভাবে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি।

আমি বললাম ঃ তা ছাড়া তুমি আমার সঙ্গে এ বিষয়েও একমত হবে যদি আমি বলি যে, এই রীতি দুটির একটি হচ্ছে খুবই সরল; এর পরিবর্তন ঘটে সামান্যই। আর বর্ণনাকারী যদি এই সঙ্গতি এবং ছন্দকে এর সারল্যের জন্য গ্রহণ করে তা হলে তার ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, আবৃত্তিকারী যদি সঠিকভাবে আবৃত্তি করতে সক্ষম হয়, তা হলে রীতিটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠবে এবং পরিবর্তনের খাদ অল্প হওয়াতে সে একই গ্রামে যেমন বিচরণ করতে সক্ষম হবে, তেমনি একই ছন্দ ব্যবহারেও তার কোনো অসুবিধে হবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা অবশ্যই সত্য।

অপরদিকে দ্বিতীয় রীতির ক্ষেত্রে সঙ্গীতের সঙ্গে রীতির সঙ্গতি রক্ষার জন্য, পরিবর্তনের খাদ্যের বাহুল্যের কারণে তাল এবং ছন্দের আধিক্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, একথাও যথার্থ।

এই দুই রীতি এবং এই দুই-এর মিশ্রণের মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কাব্য এবং কথার অবস্থান। এই দুই রীতির বাইরে কারুর পক্ষেই কিছু বলা সম্ভব নয়। ঠিক নয় কি?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, ঠিক। এদের মধ্যেই সবকিছুর অবস্থান।

তা হলে প্রশ্ন ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রে আমরা কী করব? আমরা কি এই তিনটি রীতির সব রীতিকেই স্বীকার করব, অথবা এদের মধ্যে অবিমিশ্র দুটি রীতিকে আমরা গ্রহণ করব? তোমার কী মনে হয়? তুমি কি মিশ্ররীতিকেও গ্রহণ করার পক্ষপাতী?

না, আমি বরং কোনো গুণের বিশুদ্ধ অনুকারকের রীতিটি গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, এ্যাডিম্যান্টাস। কিন্তু মিশ্ররীতিরও একটি দিক আছে। মিশ্ররীতিটি বেশ চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে তোমার বিশুদ্ধ রীতির বিপরীত রীতি হিসাবে মূকাভিনয়ের রীতিটি বালক-বালিকা, তাদের পরিচারকবৃন্দ এবং সাধারণভাবে দর্শকদের নিকট খুবই জনপ্রিয়।

আমি তা অস্বীকার করছিনে, সক্রেটিস।

কিন্তু তুমি হয়তো যুক্তি দিয়ে বলবে, আমাদের রাষ্ট্রের জন্য এরূপ রীতি উপযুক্ত নয়। আমাদের রাষ্ট্রে একজন মানুষ কেবল একটি ভূমিকাই পালন করবে, কারণ মানুষের চরিত্রে ক্ষমতার আধিক্য নেই। একের মধ্যে একাধিক দক্ষতার সমাবেশ ঘটতে পারে না।

হ্যাঁ, আমি বলব, এমন রীতি আমাদের রাষ্ট্রের জন্য খুবই অনুপযুক্ত।

আর এ-কারণেই অন্য কোনো রাষ্ট্রে না হলেও আমাদের রাষ্ট্রে জুতা তৈরিকারক জুতা তৈরিকারকই হবে, সে নৌচালক হবে না, কৃষক কৃষকই হবে, একই সঙ্গে সে বিচারক হবে না, এবং যে সৈনিক সে সৈনিকই হবে, একই সঙ্গে সে বণিক হবে না। কর্মের অপর সব ক্ষেত্রে এই একই কথা।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ যথার্থ।

কাজেই সবকিছুর অনুকরণে দক্ষ এই যে মূকাভিনেতাগণ—তাঁদের কেউ যদি আমাদের রাষ্ট্রে আসেন এবং প্রস্তাব দেন যে আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে তিনি তাঁর কাব্য-শক্তি এবং অভিনয়শক্তি প্রদর্শন করবেন তা হলে আমরা নতজানু হয়ে তাঁকে মধুর এবং পবিত্র এবং বিস্ময়কর বলে প্রশংসা করব, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁকে আমরা জানিয়ে দেব যে আমাদের রাষ্ট্রে তাঁর মতো ব্যক্তির কোনো স্থান

নেই। আমাদের আইন তাঁর এরূপ গুণ-প্রদর্শনের অনুমতিদানে অক্ষম। আর তাই সুগন্ধি নির্যাসে তাঁকে যখন আমরা লিপ্ত করেছি, তাঁর মস্তকোপরি পশমের মাল্যস্থাপন যখন আমাদের সম্পন্ন হয়েছে, তখন ভিন্নতর একটি রাষ্ট্রে আমরা তাঁকে প্রেরণ করে দেব। কারণ আমাদের আত্মার স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের প্রয়োজন কাঠিন্যের, আমাদের প্রয়োজন কঠিন এবং দৃঢ়তর এমন কবি এবং কাহিনীকারের যাঁরা কেবলমাত্র ন্যায়বানের রীতি অনুকরণ করবেন এবং আমাদের দেশরক্ষা বাহিনীর শিক্ষার জন্য যে-আদর্শ আমরা প্রণয়ন করেছি কেবল সেই আদর্শকে অনুসরণ করবেন।

আমাদের ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই তাঁকে আমরা অন্য রাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেব।

আমি বললাম, এ্যাডিম্যান্টাস, এবার তা হলে কাহিনী কিংবা উপকথার সঙ্গে সম্পর্কিত সাহিত্য এবং তা শিক্ষাদানের প্রশ্নটির আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। কারণ, এর বিষয় এবং রীতি—উভয় দিকই আলোচিত হয়েছে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমিও তা-ই মনে করি, সক্রেটিস।

তা হলে এর পরে আসবে সুর এবং সঙ্গীতের বিষয়।

হ্যাঁ, এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই।

আমি বললাম ঃ আর আমরা যদি যুক্তির সঙ্গতি রাখতে চাই তা হলে এ-বিষয়েও আমাদের বক্তব্য কী হবে তা বুঝতে কারুর অসুবিধে হবে না।

কিন্তু গ্লকন সহাস্যে বলে উঠলেন ঃ 'কারুর অসুবিধে হবে না'—একথার মধ্যে আমি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারছিনে, সক্রেটিস। কারণ কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও এই মুহূর্তে আমি জানিনে এ-বিষয়ে তোমার বক্তব্য কী হবে।

আমি বললাম, গ্লকন, তুমি অন্তত একথা বলতে পার যে, একটি গান কিংবা গাথার তিনটি অংশ আছে ঃ একটি তার শব্দ, অপরটি সুরমাধর্য এবং তৃতীয়টি তার ছন্দ বা তাল লয়ের অংশ। এ-বিষয়ে তোমার এতটুকু জ্ঞানকে আমি ধরে নিতে পারি, কী বল গ্লকন?

গ্লকন জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, সক্রেটিস, যতটুকু তুমি বললে, ততটুকু ধরে নিতে পার।

আর শব্দের কথা যদি বলি তা হলে সে-বিষয়েও আমরা বলতে পারি, যে-শব্দে সুর যোজনা করা হয়েছে এবং যে-শব্দে সুর যোজনা করা হয়নি, তাদের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। এদের উভয় একই বিধান অর্থাৎ যে-

বিধানকে আমরা পূর্বে নির্দিষ্ট করেছি সেই বিধান মেনে চলবে।

হ্যাঁ, তা-ই মেনে চলবে।

কিন্তু সুর এবং ছন্দকে তো শব্দের উপর নির্ভর করতে হয়, নয় কি?

অবশ্যই।

গ্লকন, আমরা যখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম তখন আমরা বলেছি হুতাশের সুরের কোনো প্রয়োজন আমাদর নেই।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু গ্লকন, বিষাদের সুর কোনগুলি? তোমার সঙ্গীতের ধারণা আছে। তুমি আমাদের বলতে পার, বিষাদের ভাব ফুটে ওঠে কোন সুরে?

গ্লকন বললেন ঃ তুমি যে-সুরের কথা বলছ সেগুলি বিশুদ্ধ কোনো সুর নয়, সেগুলি মিশ্র সুর। এগুলিকে আমরা উচ্চগ্রামী এবং ভারী নিম্নগ্রামী লীডীয় সুর বলতে পারি।

আমি বললাম ঃ এগুলিকে তা হলে আমাদের নির্বাসিত করতে হবে। পুরুষদের কথা বাদ দিলেও, স্ত্রীলোকদের জন্যও এ-সুর চরিত্র রক্ষার উপযুক্ত নয়।

সেকথা যথার্থ।

তা ছাড়া মদ্যাশক্তি, কোমলতা এবং আলস্য—এগুলি আমাদের শাসকদের জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত। নয় কি?

কিন্তু কোমল এবং পানাসক্তির সুর কোনগুলি?

গ্লকন বললেন ঃ এগুলি হচ্ছে আয়োনীয় এবং লীডীয়। এগুলিকে 'আয়েশি' সুর বলা হয়।

আচ্ছা, কিন্তু এ-সুরের কি কোনো সামরিক তাৎপর্য আছে?

গ্লকন উত্তর দিলেন ঃ বরঞ্চ তার বিপরীত। এ ছাড়া সুরের ক্ষেত্রে অবশিষ্ট থাকে কেবল ডোরীয় এবং ফ্রিজীয় সুর।

আমি বললাম ঃ আমি সুরের বিষয়ে কিছু জানিনে। কিন্তু আমি বুঝি যে, আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে যুদ্ধের সুরের—এমন সুরের যার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে সেই ধ্বনি যে-ধ্বনি উচ্চারিত হয় বীরের কণ্ঠে তার আসন্ন বিপদ কিংবা দৃঢ় সংকল্পের মুহূর্তে কিংবা যখন তার লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম করে কিংবা বীর আঘাত কিংবা মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান হয়। জীবনের সঙ্কটে ভাগ্যের এরূপ আঘাত সহ্য করার দৃঢ়তায় বীর যে ধ্বনি উচ্চারণ করে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে

সেই সুরের। আমাদের শান্তির সুরেরও আবশ্যক। প্রয়োজনের অনিবার্যতা থেকে রাষ্ট্র যখন মুক্ত, শান্তি এবং কর্মের স্বাধীনতা যখন রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শাসক যেখানে দেবতার নিকট প্রার্থনায় রত কিংবা রাষ্ট্রের নাগরিককে সে যখন নির্দেশ বা মৃদু ভর্ৎসনার মাধ্যমে শাসনের প্রয়াস পাচ্ছে কিংবা ধরো শাসক যখন বিজ্ঞতার মাধ্যমে তার লক্ষ্যসাধনে সক্ষম হয়েছে কিংবা সাফল্যে আত্মহারা না হয়ে যখন সে মর্যাদার সঙ্গে আচরণ করছে তখন যে-সুর ধ্বনিত হয়, তেমন শান্তির সুরেরও আমাদের আবশ্যক। এই দুটি সুরকে তুমি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতে পার। আমাদের এ-সুর হচ্ছে অনিবার্যতা এবং স্বাধীনতার সুর; ভাগ্যহত এবং ভাগ্যবানের সুর; সাহস এবং ধৈর্যের সুর।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, এ দুটোই হচ্ছে ডোরীয় এবং ফ্রিজীয় সুর। আমি এই সুরের কথাই একটু পূর্বে উল্লেখ করছিলাম।

আমি বললাম ঃ আমাদের সঙ্গীত এবং রাগে আমরা যদি এই দুটোমাত্র সুরই ব্যবহার করি তা হলে সুরের বৈচিত্র্যের আমাদের আর প্রয়োজন কি?

না, এর অধিক সুরের আমাদের প্রয়োজন হবে না।

তা হলে ত্রিকোণ বীণা এবং তার জটিল স্বরগ্রাম কিংবা অনুরূপ বহু তারযন্ত্র এবং তাদের দুর্গম বাঁধুনিতে দক্ষ যন্ত্রীদের পোষণ করারও আমাদের প্রয়োজন হবে না।

না, সে-প্রয়োজন আমাদের হবে না।

কিন্তু গ্লকন, বংশী প্রস্তুতকারক এবং বংশীবাদকদের সম্বন্ধে আমাদের কী বক্তব্য হবে? চিন্তা করে দেখলে ঐকতান সৃষ্টিতে বাঁশির ভূমিকা অন্য সব তারযন্ত্রের চেয়েই নিকৃষ্ট। এমনকি সকল বাদ্যযন্ত্র মিলিয়ে যে-সুরলহরি সৃষ্টি করা হয় তাও আসলে বাঁশির অনুকরণ বই আরকিছু নয়।

সে কথা ঠিক।

তা হলে আমাদের নগরে ব্যবহারের জন্য রইল কেবলমাত্র বীণা এবং সেতার। গ্রামের মেষপালকগণ তাদের একনলী বাঁশিটি অবশ্য রাখতে পারবে।

হ্যাঁ, আমাদের যুক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

আমি বললাম ঃ আমরা পূর্বে যে-আলোচনা করেছি তাতে এবার বোঝা যাচ্ছে সাধারণের মধ্যে মারসিয়াস এবং তার বাদ্যযন্ত্রের চেয়ে এ্যাপোলো এবং তার বাদ্যযন্ত্রসমূহের অধিকতর খাতিরে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

না, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

তা হলে এবার মিশরের সারমেয়র নামে আমরা শপথ করে বলতে পারি যে, অচেতনভাবে হলেও আমাদের বিলাসবহুল রাষ্ট্র থেকে আমরা তার বাহুল্যকে ছেঁটে ফেলতে শুরু করেছি।

গ্লকন বললেন ঃ আমাদের এ-কাজ বিজ্ঞজনোচিত হয়েছে বলেই আমরা বলব।

আমি বললাম ঃ তা হলে এসো রাষ্ট্রের ছাঁটাই বা বিশোধনের কাজটি আমরা সম্পন্ন করে ফেলি। সুরের পরে ছন্দের প্রশ্নটি আসে। আর এক্ষেত্রেও আমাদের নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবে না। কারণ জটিল ছন্দপ্রকরণ কিংবা সকল প্রকার ছন্দের আমাদের আবশ্যকতা নেই। আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে নির্দিষ্ট করা, কোন ছন্দ বীরত্বময় এবং সঙ্গতিপূর্ণ জীবনকে প্রকাশ করতে সক্ষম। এ-কাজে সিদ্ধ হলে আমরা বীরত্বব্যঞ্জক ও সঙ্গতিময় শব্দকে গাঁথার জন্য ছন্দকে ব্যবহার করব, ছন্দের মাত্রাকে গাঁথার জন্য শব্দকে ব্যবহার করব না। সুরের প্রশ্নে তুমি যেমন আমায় শিখিয়েছ, এখানেও গ্লকন, তোমাকে বলতে হবে আমাদের রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত ছন্দ কী হবে।

গ্লকন বললেন ঃ কিন্তু সক্রেটিস, এ-বিষয়ে তো আমি তোমাকে কিছু বলতে পারব না। আমি শুধু জানি সুরের জগতে যেমন সমস্ত সুর চারটি মাত্রা থেকে তৈরি হয়, তেমনি ছন্দের ক্ষেত্রেও তিনটি নীতি আছে যার ভিত্তিতে ছন্দপ্রকরণের সৃষ্টি হয়। আমি এই মন্তব্যই কেবল করতে পারি। কিন্তু কোন্ জীবনের অনুকারী কে তা বলতে আমি অক্ষম।

আমি বললাম ঃ তা হলে তো আমাদের দামনের[১] সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। দামন আমাদের বলে দিতে পারবেন কোন্ ছন্দ হীনতা, ঔদ্ধত্য, প্রচণ্ডতা কিংবা অনুরূপ অবাঞ্ছিত ভাবপ্রকাশের ছন্দ এবং কোন্ ছন্দ এ-সমস্ত ভাবের বিপরীত উৎকৃষ্ট ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত ছন্দ। আমার অবশ্য দামনের উল্লেখিত একটা জটিল ক্রীটিয় ছন্দের কথা অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। দামন তিন পদাংশবিশিষ্ট বীরত্বব্যঞ্জক একটা ছন্দের কথাও বলেছিলেন। এগুলিকে সাজাবার জন্য যে-কৌশল তিনি ব্যবহার করেছেন, তা আমার ঠিক বোধগম্য নয়। তিনি এই ছন্দটাকে হ্রস্ব এবং দীর্ঘমাত্রার উঁচু এবং নিচুগ্রামের মধ্যে সমভাবে উত্থান-পতনের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করেছেন। আর আমি যদি খুব বেঠিক না হই তা হলে বলব তিনি দুই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ছন্দেরও উল্লেখ করেছিলেন এবং ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ পদের ভিত্তিতে তাদের বিভক্ত করেছিলেন। আবার দেখা যায় দামন কোথাও

১. দামন ঃ খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের একজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ এবং এথেন্সের রাষ্ট্রীয় নেতা পেরিক্লিসের বন্ধু—কর্নফোর্ড (রিপাবলিকের অনুবাদ ঃ পৃঃ ৮৬)

মাত্রা এবং ছন্দের গতি দ্রুততার পক্ষে বলেছেন, কোথাও তার বিপক্ষে বলেছেন। আবার কোথাও তিনি দুটোর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। আসলে বিষয়টি জটিল এবং আমি ঠিক বুঝতে পারিনে, তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন। এর বিশ্লেষণ আমাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। বিষয়টি দামনের কাছে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়, কী বল গ্রকন?

আমারও তা-ই মনে হয় সক্রেটিস।

তবে এটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হওয়ার কথা নয় যে, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট ছন্দের পার্থক্য তার উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট প্রভাবের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

না, এটা বুঝতে আমাদের কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

এ ছাড়া একথাও আমরা বুঝতে পারি যে, উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট ছন্দের সঙ্গে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট শিল্পরীতিও জড়িত। আবার সঙ্গতি এবং বিরোধ শিল্পরীতির সঙ্গে জড়িত। কারণ, আমরা বলেছি, ছন্দ এবং সঙ্গতির নিয়ামক হচ্ছে শব্দ, শব্দের নিয়ামক ছন্দ এবং সঙ্গতি নয়।

হ্যাঁ, তাই শব্দকে অনুসরণ করেই ছন্দ এবং সঙ্গতি।

আমি বললাম ঃ কিন্তু রীতির চরিত্র এবং শব্দসম্পদ কি আত্মার মেজাজের উপর নির্ভর করে না?

হ্যাঁ, তা করে।

বাকি সবকিছু রীতির উপর নির্ভর করে।

তা ঠিক।

তা হলে রীতির সৌন্দর্য, সঙ্গতি, লাবণ্য এবং উত্তম ছন্দ—সবই সারল্যের উপর নির্ভর করে, নয় কি? আমি অবশ্য এখানে মহৎ সঙ্গতি এবং চরিত্রের ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত আত্মার সত্যকার সারল্যের কথা বলছি, যে-সারল্য নির্বুদ্ধিতার অপর নাম তার কথা বলছিনে।

তোমার কথা খুবই যথার্থ, সক্রেটিস।

এবং আমাদের তরুণদের যদি জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করতে হয় তা হলে এই সঙ্গতি এবং সারল্যকেই তাদের জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করা আবশ্যক, নয় কি?

হ্যাঁ, তাদের অবশ্যই এই লক্ষ্য স্থির করা আবশ্যক।

সঙ্গতির প্রশ্নে আমরা বলতে পারি যে, বয়নশিল্প, সূচিকর্ম, স্থাপত্য কিংবা অপর যে-কোনো নির্মাণশিল্প হোক, প্রত্যেক শিল্পীর সৃজনশীল শিল্পকর্মের মধ্যে

এই সঙ্গতির আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি। তা ছাড়া প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে, পশুই বল কিংবা বৃক্ষলতাই বল—এদের সব অস্তিত্বের মধ্যেও আমরা একটা সারল্যের অস্তিত্ব কিংবা তার অভাবকে প্রত্যক্ষ করি। এবং সৌন্দর্য এবং সঙ্গতি যেমন উত্তম এবং ন্যায়ের সঙ্গে জড়িত, তাদের চরিত্রের সাদৃশ্যে তারা যেমন যুক্ত, ঠিক অনুরূপভাবে অসুন্দর, বিষম এবং অসঙ্গত চরিত্র অবাঞ্ছিত শব্দ এবং অবাঞ্ছিত মেজাজের সঙ্গে সম্পর্কিত।

একথা যথার্থ, সক্রেটিস।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার সীমা কী হবে? আমাদের কবিদের বলব, তাঁরা তাঁদের সৃষ্টিতে উত্তমের ছবি তুলে ধরবেন। এর অন্যথা হলে আমাদের রাষ্ট্র থেকে তাঁদের বহিষ্কৃত হতে হবে। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ কেবল কি কবিতে সীমাবদ্ধ থাকবে? অথবা ভাস্কর্য, নির্মাণ কিংবা সৃজনশীল অপর সকল শিল্পক্ষেত্রের শিল্পীকেও আমরা বলব, তাঁরাও তাঁদের সৃষ্টিতে অধর্ম, অন্যায়, অধৈর্য, হীনতা এবং অসুন্দর কোনো ভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। এবং কেউ যদি এই নির্দেশ অনুসরণ করতে না পারেন তা হলে তাঁর শিল্পচর্চাকেও নিষিদ্ধ করা হবে। না হলে তাঁর শিল্পকর্মের প্রভাবে আমাদের নাগরিকদের মন কলুষিত হয়ে যাবে। কেননা আমাদের রাষ্ট্রের শাসককুলকে আমরা নৈতিক বিকারের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দিতে পারিনে। তেমন হলে বিষাক্ত এঁদো চারণভূমিতে চরে বিষাক্ত লতাগুল্ম ভক্ষণ করার ন্যায় দিনে-দিনে নিঃশব্দে বিন্দু বিন্দু করে বিকারের ঘায়ে তাদের আত্মা বিষাক্ত হয়ে উঠবে। কাজেই আমাদের শিল্পী হবে তারা যারা সৌন্দর্য এবং কমনীয়তার যথার্থ প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সক্ষম। তা হলেই মাত্র আমাদের রাষ্ট্রের তরুণসমাজ স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং উত্তম পরিবেশের মধ্যে বৃদ্ধিলাভ করতে পারবে। আমাদের শিল্পীর সৃষ্টির সৌন্দর্য আমাদের তরুণদের দৃষ্টি এবং শ্রবণকে বিশুদ্ধ পরিবেশ থেকে প্রবাহিত স্বাস্থ্যপূর্ণ মলয় হিল্লোলে অভিষিক্ত কর দেবে। এর প্রভাবে তরুণদের আত্মা শিশুবয়স থেকেই অচেতনভাবে যুক্তির সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠবে।

গ্লকন বললেন ঃ এর চেয়ে মহৎ শিক্ষা আর কী হতে পারে?

আমি বললাম ঃ গ্লকন, এজন্যই সঙ্গীতের শিক্ষা অপর যে-কোনো শিক্ষার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। কারণ সুরের ছন্দ এবং সঙ্গতি আত্মার গভীরে প্রবেশ করে তার চেয়ে সুদৃঢ় প্রভাবে যে সুশিক্ষিত তাকে সুন্দর এবং যে কু-শিক্ষিত তাকে অসুন্দর করে তোলে। আর এ-কারণে যে তার আত্মার গভীরে

সুশিক্ষিত সে তার তরুণ বয়সে চেতনার পূর্বেই শিল্পের যা ব্যর্থতা বা অপূর্ণতা, যা তার ত্রুটি তাকে যেমন চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে তেমনি শিল্পের যা মহৎ, উত্তম এবং সুন্দর তাকেও সে নিজের আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নিতে পারবে; যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্তির পূর্বেই যা মন্দ তাকে সে চিহ্নিত করতে এবং ঘৃণা করতে সক্ষম হবে। এবং যখন যুক্তির চেতনা তার মধ্যে জাগ্রত হবে তখন অনায়াসে তার যথার্থ যে সুহৃদ, তার আত্মার শিক্ষা যার সঙ্গে তাকে দীর্ঘ পরিচয়ের বন্ধনে বেঁধে দিয়েছে সেই উত্তম এবং সুন্দরকে সে স্বাগত জানাতে পারবে।

গ্লকন বললেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস। তুমি যেমন-ভাবে বলেছ, আমিও মনে করি আমাদের তরুণদের তেমনভাবেই সঙ্গীতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

আমি বললাম ঃ অক্ষরপরিচয়ের ক্ষেত্রে যা সত্য, এখানেও তা-ই। অক্ষরের সংখ্যা আমাদের অধিক নয়। সেগুলিকে তার বিভিন্ন আকার এবং সংযুক্তির প্রকারে যতক্ষণ-না আমরা উত্তমরূপে চিনতে পারি ততক্ষণ আমরা বলিনে যে আমাদের বর্ণপরিচয় সম্পূর্ণ হয়েছে। অক্ষরের আকার ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ যা-ই হোক না কেন, কোনো আকারকেই গুরুত্বহীন মনে না করে আমরা সর্বত্র এই অক্ষরগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করতে থাকি। বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে-কোনো স্থান থেকে আমাদের এই অক্ষরগুলোকে চিনে বার করতে না পারি ততক্ষণ আমরা বলিনে যে আমাদের বর্ণপাঠ সুসম্পূর্ণ হয়েছে।

একথা যথার্থ।

অথবা প্রতিবিম্বের কথা ধরো। জলে কিংবা আরশিতে যদি অক্ষরের ছায়া পড়ে তা হলে অক্ষরগুলোকে আমরা পূর্বে যদি জেনে থাকি তবেই মাত্র তাদের প্রতিবিম্বকে আমরা চিনতে পারি। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

তা হলে সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা কিংবা আমাদের শাসক যাদের আমরা শিক্ষিত করতে চাই তারা সঙ্গীতের মূল আকার এবং তার সংযুক্তির প্রকারের সঙ্গে পরিচিত না হলে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নির্বিশেষে সবকিছুর মধ্যে সে আছে এমন উপলব্ধি তাদের না হলে এবং যেখানে তাদের প্রতিবিম্ব পড়ে সেখানে তাদের চিহ্নিত করতে না পারলে কখনোই তারা সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে উঠতে সক্ষম হবে না।

নিঃসন্দেহে একথা সত্য, সক্রেটিস।

আর সুন্দর আত্মা যখন সুন্দর আকারের সঙ্গে সঙ্গতির মাধ্যমে মিলিত হয় এবং দুটি মিলে একটি অস্তিত্বে পরিণত হয় তখন যে-মনোহর দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা কেবল যার সত্যকার দৃষ্টি আছে তার চোখেই ধরা পড়ে।

এমন সৃষ্টি অবশ্যই সবচেয়ে সুন্দর।

এবং যা সবচেয়ে সুন্দর তা-ই সবচেয়ে মনোহর। নয় কি?

হ্যাঁ, একথাও আমরা ধরে নিতে পারি।

এবং যে-মানুষের মধ্যে সঙ্গতির বোধ আছে সে এই মনোহরের প্রতি সর্বাধিক অনুরাগ বোধ করবে; কিন্তু যার আত্মার মধ্যে অসঙ্গতি সে তার প্রতি কোনো অনুরাগ বোধ করবে না।

গ্লকন বললেন ঃ একথা ঠিক। তার অপূর্ণতা যদি আত্মার অপূর্ণতা হয় তা হলে অবশ্যই সে সুন্দরের প্রতি অনুরাগ বোধ করবে না। কিন্তু তার অক্ষমতা যদি কেবল দৈহিক অক্ষমতা হয় তা হলে সুন্দর তার সে-অক্ষমতাকে ক্ষমার চোখে দেখবে এবং সে অক্ষমতা সত্ত্বেও তাকে সে ভালবাসবে।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, আমি দেখছি এ-বিষয়ে তোমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে। তোমার অভিমতের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমার আর-একটি প্রশ্ন আছে ঃ আনন্দের আধিক্যের সঙ্গে কি মিতাচারের কোনো সাদৃশ্য আছে?

গ্লকন বললেন ঃ না, এদের মধ্যে সাদৃশ্য কেমন করে থাকতে পারে? বেদনার আধিক্য যেমন, আনন্দের আধিক্যও তেমনি মানুষের কর্মক্ষমতাকে বিনষ্ট করে।

কিন্তু সাধারণভাবে ন্যায়ের সঙ্গেও কি কোনো সাদৃশ্য নেই?

না, আদৌ কোনো সাদৃশ্য নেই।

কিন্তু যথেচ্ছার এবং অনাচারের সঙ্গে কি কোনো সাদৃশ্য আছে?

হ্যাঁ, এক্ষেত্রে এদের মধ্যে সর্বাধিক সাদৃশ্য বিদ্যমান।

কিন্তু গ্লকন, ইন্দ্রিয়প্রেমের চেয়ে অধিকতর কিংবা তীব্রতর কোনো আনন্দ কি আছে?

না। ইন্দ্রিয়প্রেমের চেয়ে উন্মত্ততর আনন্দ আরকিছু নেই।

অথচ যথার্থ প্রেম হচ্ছে সুন্দর এবং শৃঙ্খলার প্রেম, মিতাচার এবং সঙ্গতির প্রেম। তা-ই নয় কি?

খুবই যথার্থ কথা সক্রেটিস।

তা হলে কোনো অনাচার কিংবা উন্মত্ততাকে যথার্থ প্রেমের নৈকট্যলাভের অধিকার দেওয়া চলে না?

না, তেমন অধিকার দেওয়া চলে না।

তা হলে উন্মত্ত কিংবা অসংযত আনন্দ প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের নৈকট্যলাভ করতে পারে না। প্রেমিক প্রেমাস্পদের প্রেম যদি যথার্থ হয় তা হলে তাদের কেউ উন্মাদনা কিংবা অসংযমকে নিজেদের চরিত্রের অঙ্গীভূত করতে পারে না।

যথার্থ বলেছ সক্রেটিস। উন্মাদনা এবং অসংযমকে প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের নৈকট্যলাভ করতে কখনো দেওয়া চলে না।

তা হলে যে-রাষ্ট্র আমরা প্রতিষ্ঠিত করছি সেখানে এই বিধান আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যে, পিতা তার পুত্রকে যেমন করে ভালোবাসে তার চেয়ে ভিন্নতর কোনো ঘনিষ্ঠতায় প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে ভালোবাসতে পারবে না। মহৎ কোনো উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তারা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে না। এবং এমন ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে প্রেমাস্পদের সম্মতির প্রয়োজন হবে। পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে এই সীমাবদ্ধতাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এই সীমাকে যে অতিক্রম করবে তাকে স্থূলতা এবং কুরুচির দোষে দোষী বলে গণ্য করা হবে।

এ-বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত, সক্রেটিস।

তা হলে সঙ্গীত সম্পর্কে আর নয়। সঙ্গীতের আলোচনার এ-সমাপ্তিকে নিশ্চয়ই তুমি উপযুক্ত সমাপ্তি বলবে। কারণ সুন্দরের প্রেমের চেয়ে সঙ্গীতের উত্তম সমাপ্তি আর কী হতে পারে?

ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

সঙ্গীতের পরে আসে শরীরচর্চা। আমাদের রাষ্ট্রের তরুণদের শরীরচর্চায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

অবশ্যই।

শরীরচর্চা এবং সঙ্গীতের শিক্ষা ছোটকাল থেকেই শুরু করা আবশ্যক। এ-শিক্ষাকে যেমন সতর্কতার সঙ্গে দিতে হবে তেমনি সমগ্র জীবন ধরেই এ-শিক্ষাকে কার্যকর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, শারীরিক কোনো উৎকর্ষ আত্মার কোনো উৎকর্ষসাধন করে না। কিন্তু আত্মার উৎকর্ষ শারীরিক উৎকর্ষকে সম্ভবমতো সাহায্য করে। আমার এ-বিশ্বাস ঠিক কি না আমি জানিনে। এ-বিষয়ে, গ্লকন, আমি তোমার অভিমতটি জানতে চাই। তুমি কী বল?

তোমার বক্তব্যকে আমি স্বীকার করি, সক্রেটিস।

তা হলে আত্মা যখন উপযুক্তরূপ শিক্ষিত হয়েছে তখনই মাত্র আমরা তার কাছে আমাদের শরীরের উৎকর্ষের প্রশ্নটি ছেড়ে দিতে পারি। ঠিক নয় কি? তা-ই যদি হয় তা হলে বর্ণনার দৈর্ঘ্যকে পরিহার করার জন্য আমরা বরঞ্চ বিষয়টির একটি সাধারণ চিত্র উপস্থিত করব।

তা-ই ভালো।

আমাদের শাসকের যে সুরামত্ততা পরিহার করতে হবে, সেকথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, আর যে-কেউ সুরামত্ত হোক-না কেন, রাষ্ট্রের যে শাসক তার পক্ষে সুরামত্ত হয়ে তার আপন অবস্থানের কথা বিস্মৃত হওয়া কোনোক্রমেই চলতে পারে না।

গ্লকন বললেন ঃ একথা ঠিক। কারণ রাষ্ট্রের শাসককে সুস্থ রাখতে যদি আর-এক শাসকের প্রয়োজন হয় তা হলে ব্যাপারটি যথার্থই হাস্যকর হয়ে ওঠে।

কিন্তু যারা শরীরচর্চায় নিয়োজিত তাদের আহারাদি সম্পর্কে আমাদের কী বিধান হবে? এটিও তো গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষায় নিযুক্ত রয়েছে, নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তা যদি হয় তা হলে সাধারণ ক্রীড়াবিদদের স্বাস্থ্য কি তাদের জন্য যথেষ্ট?

কেন নয়, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ না। তার কারণ, এদের শরীরের মেজাজ আমার নিকট নিদ্রালু বলে বোধ হয়। আর এ-মেজাজ স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক। গ্লকন, তুমি কি একটা বিষয় খেয়াল করে দেখনি যে, এই ক্রীড়াবিদগণ তাদের জীবনের অধিক সময় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়? এর ফলে তাদের প্রচলিত জীবনপদ্ধতির সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে তারা বিষম সব রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

হ্যাঁ, আমি খেয়াল করেছি। একথা ঠিক।

তা হলে আমাদের রক্ষক অর্থাৎ সামরিক ক্রীড়াবিদদের জন্য আবশ্যক হবে উন্নততর প্রশিক্ষণের। কারণ আমাদের সামরিক ক্রীড়াবিদগণ হবে জাগ্রত কুকুরের ন্যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে শীত, গ্রীষ্ম, খাদ্য এবং আবহাওয়ার সমস্ত রকম পরিবর্তনকে তাদের সহ্য করতে হবে। সমস্ত অবস্থার মধ্যেই তাদের চোখ ও কানকে সর্বাধিক তীক্ষ্ণতায় সজাগ রাখতে হবে। কোনো অবস্থায় তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে চলবে না।

আমার অভিমতও তাই।

যথার্থ শরীরচর্চাকে আমরা সঙ্গীতের যমজ সহোদরা বলে অভিহিত করতে পারি।

কেমন করে?

কারণ, আমার মনে হয় শরীরচর্চার মধ্যেও এমন প্রশিক্ষণ আছে যা আমাদের সঙ্গীতের ন্যায় সরল এবং উত্তম। বিশেষ করে সামরিক শরীর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একথা সত্য।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

হোমারের উল্লেখ করলে আমার কথার অর্থ তোমার নিকট পরিষ্কার হবে। তুমি জান হোমার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর নায়কদের যে-বর্ণনা দিয়েছেন তাতে দেখা যায় তাদের খাদ্যের মধ্যে কৃচ্ছ্রের লক্ষণ আছে। তাদের খাদ্য হচ্ছে সৈন্যবাহিনীর খাদ্য। সমুদ্রতীরে তাদের অবস্থান। কিন্তু কবির বর্ণনায় তাদের খাদ্যে কোনো মৎস্যের পরিবেশন নেই। মাংসের ক্ষেত্রে তাদের দেওয়া হচ্ছে পোড়া মাংস, রান্না মাংস নয়। কারণ মাংস সিদ্ধ কিংবা রান্না করার জন্য আবশ্যক হরেক রকম পাত্রের। এগুলোকে বহন করার অসুবিধা আছে। কিন্তু সৈন্যদের পক্ষে আগুন জ্বালিয়ে মাংস পুড়িয়ে আহার করা অনেক সহজ।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তা ছাড়া হোমারের বর্ণনায় কোথাও মিষ্টান্নের ব্যবস্থা আছে, এমন তো আমার আদৌ স্মরণ হয় না। অবশ্য মিষ্টিদ্রব্যাদি নিষিদ্ধকরণে হোমার কোনো একক ব্যক্তি নন। পেশাদার ক্রীড়াবিদমাত্রই জানে যে যারা তাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে চায়, মিষ্টদ্রব্য খাওয়া তাদের জন্য কিছু উপকারী নয়।

গ্লকন বললেন : হ্যাঁ, একথা ঠিক। তারা একথা জানে এবং সে-কারণেই মিষ্টদ্রব্য আহার করা থেকে তারা সঠিকভাবেই বিরত থাকে।

তা-ই যদি হয় তা হলে তুমি নিশ্চয়ই সাইরাকুজের ভূরিভোজ এবং সিসিলির রন্ধন প্রণালীকে অনুমোদন করবে না।

না, এসব অনুমোদন করা যায় না।

তা ছাড়া সৈনিককে যদি সুস্থ থাকতে হয় তা হলে কোরিন্থের তরুণীকেও তুমি তার সঙ্গিনী করে দেবে না নিশ্চয়ই?

নিশ্চয়ই না।

কিংবা ধরো এথেন্সের বেকারি সামগ্রীর কথা। এগুলিও নিশ্চয়ই তুমি তার জন্য অনুমোদন করবে না।

না, এগুলি তার জন্য নিশ্চয়ই অনুমোদন করা চলে না।

এই সমস্ত পানাহার এবং জীবনযাত্রা—একে আমরা সঠিকভাবেই বিচিত্র সুর এবং ছন্দের সৃষ্টি আর্কেষ্ট্রার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ঠিক নয় কি?

তুমি ঠিকই বলেছ।

সুরের আধিক্য যেমন স্বেচ্ছাচারিতার সৃষ্টি করে তেমনি পানাহারের আধিক্যও রোগের সৃষ্টি করে। অপরদিকে সুরের সারল্য যেমন আত্মার সংযমের জনক, শরীরচর্চার সারল্যও তেমনি শরীরের সুস্থতার কারণ।

তোমার কথা খুবই সত্য সক্রেটিস।

কিন্তু রাষ্ট্রে যখন যথেচ্ছাচার এবং রোগের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে, তখন একদিকে যেমন 'হাকিম কাছারি' অর্থাৎ বিচারালয়ের আধিক্য ঘটতে থাকে তেমনি অপরদিকে ডিসপেন্সারি এবং ডাক্তারের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রের বিচারক আর চিকিৎসক এদেরই জয় জয়কার। কেবল দাস নয়, স্বাধীন নাগরিকও সর্বদা শরণাপন্ন হয় বিচারক আর চিকিৎসকের। বিচারক এবং চিকিৎসকদের মনে তাই ভাব জাগে যেন তারা মস্ত কেউ।

এতে আর সন্দেহ কী?

শিক্ষার দুর্দশার নিদর্শন এর চেয়ে অধিক আর কী হতে পারে? যে-শিক্ষায় কেবল মাত্র কারিগর এবং নিকৃষ্ট ধরনের মানুষেরই বিচারকের এবং চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় উচ্চশিক্ষিত নাগরিকদেরও, সে-শিক্ষা অবশ্যই দুর্দশাগ্রস্ত। ব্যক্তিকে যখন বিচার এবং চিকিৎসার জন্য অর্থাৎ ন্যায় এবং স্বাস্থ্যের জন্য অপরের নিকট ছুটতে হয় কারণ তার নিজের মধ্যে ন্যায় এবং স্বাস্থ্যের অস্তিত্ব নেই এবং এ-কারণে যখন সে অপরকে তার বিচারক এবং প্রভুতে পরিণত করে নিজকে তার কাছে সমর্পণ কর দেয়, তখন তার আত্মার অমর্যাদা চরমে উপনীত হয়।

গ্লকন বললেন ঃ যথার্থ। এর চেয়ে লজ্জাজনক আরকিছু হতে পারে না।

কিন্তু গ্লকন, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হচ্ছে, যখন কোনো ব্যক্তি কেবল যে জীবনভর বিচারালয়ে মামলার বাদি কিংবা প্রতিবাদি হিসাবে জড়িত থাকে তা-ই নয়, তার কুশিক্ষার কারণে সে তার এই হীন অবস্থাতে আনন্দ এবং গর্ব বোধ করে। সে নিজেকে অসততার সেরা কারিগর মনে করে। তার কাছে ন্যায় কিছু না। সে মনে করে বিচারালয়ের প্রতিটি জটিল কন্দর এবং বন্ধন থেকে সে পিচ্ছিল জীবের ন্যায় অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারবে। সে মনে করে, যে-কোনো অবস্থাকে নিজের স্বার্থে মোচড় দেবার তার অপার ক্ষমতা। কিন্তু এতসব

কিসের কারণে? এতে তার যা লাভ তা উল্লেখের অযোগ্য। অথচ সে জানে না, কোনো বিচারকের শরণাপন্ন না হয়ে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারা অধিকতর মহৎ। এই যে বিচারালয়ের বন্দিত্ব—এ কি ব্যক্তির জন্য অধিকতর অসম্মানকর নয়?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, সক্রেটিস। এ অবস্থা অধিকতর অসম্মানজনক।

আমি বললাম ঃ আবার ঔষধের কথা ধরো। মহামারি শুরু হলে কিংবা তুমি যখন আহত হও তখন নিরাময়ের জন্য ঔষধের ব্যবহার অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সেরূপ কারণে নয়, কেউ যখন আলস্যে এবং শ্লথ জীবনযাপনে নিজের শরীরকে বদ্ধ জলাভূমিতে পরিণত করে নিত্যনূতন রোগের উদ্ভবভূমিতে পর্যবসিত করে ঔষধের আশ্রয় গ্রহণ করতে থাকে তখন তার জীবনে কি দুর্দশার চরম নেমে আসে না? এমন অবস্থায় এসলেপিয়াসের[১] শিষ্যদেরও উদর স্ফীতি, ছানি ইত্যাকার অদ্ভুত রোগের নাম আবিষ্কারে গলদঘর্ম হতে হয়।

তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস। এরা অদ্ভুত সব রোগের নাম আবিষ্কার করতে থাকে।

আমি বললাম ঃ আমি মনে করি না, এসলেপিয়াসের যুগে এমন সব রোগের অস্তিত্ব ছিল। হোমারের কাহিনী থেকেই আমি এ সত্য অনুমান করতে পারি। আমরা হোমারের কাহিনীতে দেখি, নায়ক ইউরিপাইলাস যখন আহত হল তখন তাকে পান করানো হল বার্লি এবং পনিরমিশ্রিত প্রামানীয় সুরা। নিরাময়ের এমন উত্তেজক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এসলেপিয়াসের যে-শিষ্যবৃন্দ ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল তাদের কোনো বিরূপ মন্তব্য আমরা দেখতে পাইনে। যে-তরুণী এই সুরাকে নায়কের হাতে তুলে দিল কিংবা যে-প্যাট্রোক্লাস আহত নায়কের চিকিৎসায় রত ছিল তাদের কাউকে এসলেপিয়াসের অনুসারীগণ ভর্ৎসনা করার কারণ দেখেনি।

গ্লকন বললেন ঃ আহত নায়কের যে-অবস্থা তাতে এমন সুরার ব্যবস্থা করা অসাধারণই বটে।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, খুব যে অসাধারণ এমন কথা আমি বলতে পারিনে। কারণ তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, হেরোডিকাসের পূর্বে এসলেপিয়াস সম্প্রদায় আমাদের বর্তমান কালের রোগশিক্ষা ও নিরাময়ব্যবস্থার চর্চা করত না। কিন্তু হেরোডিকাস নিজে ছিল শারীর-শিক্ষক এবং রোগাক্রান্ত। ফলে শারীর-শিক্ষণ

১. এসলেপিয়াস (কিংবা এসকিউলেপিয়াস) ঃ চিকিৎসকদের পৌরাণিক পৃষ্ঠপোষক। (কর্নফোর্ড ঃ রিপাবলিকের অনুবাদ পৃঃ ৯৩)

এবং চিকিৎসা—এই উভয়ের সংযোগে হেরোডিকাস যেমন নিজেকে পীড়িত করেছে, তেমনি সে পীড়িত করেছে পৃথিবীর অপর সকলকে।

গ্লকন জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে?

আমি বললাম ঃ মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত করার পন্থা আবিষ্কার করে। কারণ হেরোডিকাসের ছিল এক মারাত্মক রোগ। এ রোগ নিরাময়ের কোনো উপায় ছিল না। ফলে হেরোডিকাস সর্বদা এ রোগকে পোষণ করে চলত। সমগ্র জীবন সে এমনি রুগ্ন অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হয়। এই রোগের পরিচর্যা করা ব্যতীত তার কোনো উপায় ছিল না। তার অভ্যস্ত জীবনের ব্যতিক্রম ঘটলে রোগের যন্ত্রণায় সে ক্লিষ্ট হত। এমনিভাবে নিজের নিরাময়ব্যবস্থায় মৃত্যু বিলম্বিত হতে হতে হেরোডিকাস বিরামহীন যন্ত্রণার মধ্যে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবিত থাকে।

নিজের নিরাময় দক্ষতার এক চমৎকার পুরস্কার বটে।

হ্যাঁ গ্লকন, এক চমৎকার পুরস্কার বটে। আর এ পুরস্কার সে লাভ করেছে তার এই অজ্ঞতা থেকে যে, তার এমন নিরাময়ব্যবস্থার উল্লেখ এসলেপিয়াস যে তাঁর বংশধরদের জন্য করে যাননি তার কারণ এই নয় যে এসলেপিয়াস এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন কিংবা তাঁর অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। কারণ, এসলেপিয়াস জানতেন একটি সুব্যবস্থিত সমাজে প্রত্যেকেরই একটা করণীয় থাকে এবং কারুর পক্ষে কেবল রোগের পরিচর্যা এবং নিরাময়ব্যবস্থায় জীবনপাত করা সঙ্গত নয়। কারিগর বা শ্রমিকের ক্ষেত্রে এ কথাটি বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না। কিন্তু কী আশ্চর্য এ-সত্য যে ধনবান এবং সুবিধাভোগীদের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য, একথাটিই আমরা বুঝতে চাইনে।

কেমন করে প্রযোজ্য?

আমি বলতে চাচ্ছি, একজন সূত্রধর যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে কী করে? সে তার চিকিৎসকের নিকট গমন করে এবং তার রোগের আশু নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থার অনুরোধ করে। এজন্য চিকিৎসক তার পাকস্থলী পরিশোধনের কিংবা দহনের কিংবা প্রয়োজন হলে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করে। কিন্তু কেউ যদি তার জন্য একটি দীর্ঘ পথ্যের পরামর্শ দেয়, যদি বলে তার মাথাটা বস্ত্রাবৃত রাখা আবশ্যক কিংবা অঙ্গের কোথাও পট্টি বাঁধা প্রয়োজন কিংবা অনুরূপ আরও কিছু তার করা আবশ্যক তখন সূত্রধর তেমন ব্যবস্থার জবাবে বলে ঃ অসুস্থ হওয়ার তার সময় নেই এবং তার দৈনন্দিন কর্মকে অবহেলা করে তার রোগের পরিচর্যা করার কোনো সার্থকতাও সে স্বীকার করে না। একথা বলে সে অবশ্যই তার চিকিৎসকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজের

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন করে এবং দৈনন্দিন কর্তব্য-সম্পাদনে সে রত হয় এবং এমন অবস্থায় হয় সে রোগমুক্ত হয়ে জীবনধারণ করে এবং নিজের দায়িত্ব পালন করতে থাকে নয়তো শারীরিক শক্তি নিঃশেষিত হলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোটকথা, তার উদ্বেগের আর কারণ থাকে না।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, ঠিকই। এমন অবস্থা যার, তার পক্ষে এর অধিক ঔষধ ব্যবহার করা সঙ্গত নয়।

কারণ তার একটা জীবিকা আছে। তার নিরাময়ব্যবস্থা যদি তাকে তার জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে তা হলে তার বিনিময়ে সে কী লাভ করবে?

ঠিক কথা, সক্রেটিস।

কিন্তু যে সম্পদশালী তার কথা ভিন্ন। যার অর্থ আছে তার সম্পর্কে আমরা বলিনে যে তার করণীয় একটা নির্দিষ্ট জীবিকা আছে।

হ্যাঁ, ঠিক কথা। বরঞ্চ সাধারণত মনে করা হয় যে তার কিছুই করণীয় নেই।

কিন্তু ফসিলাইডিসের বাণীর কথা কি তুমি শোননি? ফসিলাইডিস বলেছেন, যার জীবনধারণের উপায় আছে অর্থাৎ যার জীবিকার জন্য চিন্তা করতে হয় না তার ন্যায়ের চর্চা করা আবশ্যক।

ফসিলাইডিসের এ কথা আরও পূর্বে বলা আবশ্যক ছিল।

গ্লকন, এ বিষয়ে ফসিলাইডিসের সঙ্গে ঝগড়ায় আমরা প্রবৃত্ত হতে চাইনে। তার চেয়ে আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত ঃ যে সম্পদশালী তার জন্য ন্যায়ের চর্চা কি অনিবার্য? কিংবা ন্যায়ের চর্চা ব্যতিরেকেই সে জীবনধারণ করতে পারে? আর যদি অনিবার্য হয় তা হলে আমাদের অপর প্রশ্ন হবে ঃ সূত্রধর কিংবা অপর কোনো কারিগরের ক্ষেত্রে নিরাময় ব্যবস্থা যদি তার জীবনধারণের প্রতিবন্ধক হয়, তা হলে ধনবানের ক্ষেত্রেও রোগের পরিচর্যা কি ফসিলাইডিসের বাণীর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না?

গ্লকন বললেন ঃ এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই, সক্রেটিস। শরীরের যত্ন—সেও যদি শরীরচর্চার নিয়মকে অতিক্রম করে তা হলে সে ন্যায়চর্চার গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বললাম ঃ যথার্থ বলেছ গ্লকন। এমন পরিচর্যা, সংসারযাপন, সামরিক বাহিনীর রক্ষা কিংবা রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বপালনের প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এবং সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ, পরিচর্যার এই আধিক্য যে-কোনো অধ্যয়ন,

চিন্তা কিংবা সাধনার প্রতিবন্ধক। এমন ব্যক্তির মনে সর্বদাই সন্দেহ, তার শিরঃপীড়া কিংবা শিরঘূর্ণন সবই তার দর্শন অধ্যয়নের কারণে ঘটছে। এই সন্দেহ থেকে ন্যায়ের সব চর্চাই সে বন্ধ করে দেয়। তার কেবল কল্পনা, এই বুঝি সে অসুস্থ হয়ে পড়ল; তার সার্বক্ষণিক উদ্বেগ তার শরীরের অবস্থান্তর সম্পর্কে।

হ্যাঁ, তার উদ্বেগ এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।

এসলেপিয়াসকে আমাদের রাজনীতিজ্ঞই বলতে হয়। কারণ তিনি তাঁর নিরাময়-ক্ষমতা কেবলমাত্র তাদের জন্যই প্রকাশ করেছেন যারা সাধারণত সুস্থ শরীরের অধিকারী কিন্তু যারা নির্দিষ্ট কোনো রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এদের তিনি বিশোধন এবং অস্ত্রোপচার প্রভৃতি পদ্ধতিতে নিরাময় করে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করার উপদেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছেন। কিন্তু রোগ যাদের দেহকে বিদীর্ণ করে ফেলেছে তাদের ক্রমান্বয়ে বিশোধনপ্রক্রিয়া ইত্যাদির দ্বারা নিরাময় করার কোনো চেষ্টা তিনি করেন নি। কারণ যে-জীবনের সার্থকতা নেই, তাকে তিনি প্রলম্বিত করতে চান নি; দুর্বল পিতাকে তিনি দুর্বলতর সন্তানের জনক হতে দিতে চান নি। যে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম হয়ে গেছে তাকে নিরাময় করার কোনো সার্থকতা তিনি দেখেন নি। কেননা, এরকম নিরাময় না ব্যক্তির নিজের, না রাষ্ট্রের কোনো যথার্থ উপকার সাধন করতে পারে।

সক্রেটিস, তা হলে তোমার মতে এসলেপিয়াস একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন?

অবশ্যই। এবং তাঁর এ চরিত্রের দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর সন্তানদের মধ্যেও পাই। এঁরা সেই প্রাচীনকালের লোক ছিলেন এবং নিরাময়ের যে-পদ্ধতির কথা আমি উল্লেখ করেছি তার চর্চা তাঁরা ট্রয়ের অবরোধের মধ্যে করেছেন। তোমার নিশ্চয়ই সেই কাহিনীর কথা স্মরণ আছে, যেখানে প্যান্ডারাস মেনেলাসকে আহত করেছে। কবি[১] বলেছেন, "আহত মেনেলাসের ক্ষত থেকে চুমুক দিয়ে রক্ত টেনে বার করে তার ওপর চিকিৎসকগণ ঠাণ্ডা প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন।" কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার রয়েছে ঃ ইউরিপাইলিসের ক্ষেত্রে যেমন মেনেলাসের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা পথ্যের কোনো নির্দেশ দেখিনে। এর অর্থ এই যে, যারা আঘাতের পূর্বে সুস্থ ছিল এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছে তাদের জন্য আঘাতের ঔষধই যথেষ্ট। এবং সে কারণেই আঘাতের পরে প্রামানিয়ার সুরাপানেও তার

১. হোমার ঃ ইলিয়াড

সুস্থ হয়ে উঠতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কিন্তু যারা অসংযমী এবং অসুস্থ জীবনযাপনকারী, যাদের জীবনের সার্থকতা তাদের নিজেদের নিকট কিংবা অপরের নিকট আর কিছুই নেই, তাদের জন্য চিকিৎসকদের কিছু করণীয় নেই। নিঃশেষিত এমন জীবনের জন্য চিকিৎসাপ্রণালীর আবিষ্কার নয়। এমন অসুস্থ বক্তি যদি রাজা মিডাস-এর ন্যায়ও ধনবান হত, তা হলেও এসলেপিয়াসের চিকিৎসক-সন্তানগণ এমন ব্যক্তির চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই অস্বীকার করতেন।

এসলেপিয়াসের সন্তানদের তা হলে খুবই ন্যায়নীতিজ্ঞ বলে অভিহিত করতে হয়।

অবশ্যই তাঁদের ন্যায়নীতিজ্ঞ বলতে হয়। কিন্তু তথাপি পিন্ডার এবং শোকাত্মক নাট্যকারগণ যে আমাদের নীতি অনুযায়ী কোনো কাহিনী রচনা করেছেন এমন নয়। তাই যদিও তাঁরা এসলেপিয়াসকে দেবতা এ্যাপোলোর পুত্র বলে পরিচিত করেছেন তথাপি তাঁদের কাহিনীতে দেখা যায় যে, এক মরণোন্মুখ ধনাঢ্য ব্যক্তি পারিতোষিকের বিনিময়ে এসলেপিয়াসকে তার চিকিৎসায় সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছে এবং এই অপরাধে এসলেপিয়াস পরিণামে বজ্রাহত হয়ে নিহত হন। কিন্তু আমাদের নীতির ভিত্তিতে আমরা উভয় কাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারিনে ঃ এসলেপিয়াস যদি দেবতার পুত্র হয়ে থাকেন তা হলে তিনি অর্থলোভী হতে পারেন না; আর যদি তিনি অর্থলোভী হয়ে থাকেন তা হলে তিনি দেবপুত্র নন।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার বক্তব্য মনোহর। কিন্তু তোমার নিকট আমার একটি প্রশ্ন আছে। আমাদের রাষ্ট্রে কি উত্তম চিকিৎসকের আবশ্যকতা নেই? এবং কাদের তুমি উত্তম চিকিৎসক বলবে; যে-চিকিৎসক ভালো, মন্দ সর্বপ্রকার রোগের এবং সর্বাধিকসংখ্যক রুগির চিকিৎসা করছে তাকেই তো আমরা উত্তম চিকিৎসক বলব। ঠিক নয় কি? এবং উত্তম বিচারক কে? সর্বপ্রকার চরিত্রের সঙ্গে যারা পরিচিত তারাই তো সর্বোত্তম বিচারক?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, উত্তম চিকিৎসক এবং উত্তম বিচারকের প্রয়োজনের কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আমি উত্তম কাকে বলব?

তুমি বলো সক্রেটিস, কাকে তুমি উত্তম বলবে?

আমি বলার চেষ্টা করছি। কিন্তু তার আগে আমার বলা প্রয়োজন, তোমার প্রশ্নের মধ্যে তুমি দুটো জিনিস একত্র করেছ। অথচ দুটো জিনিস এক নয়?

কী রকম, সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ তুমি চিকিৎসক এবং বিচারককে যুক্ত করেছ। কিন্তু সবচেয়ে দক্ষ চিকিৎসক কাদের বলব? আমরা দক্ষ চিকিৎসক তাদের বলব যারা তাদের তরুণ বয়স থেকে চিকিৎসাপ্রণালীর জ্ঞানের সঙ্গে রোগের সর্বাধিক অভিজ্ঞতার সংযোগসাধন করতে সক্ষম হয়েছে। আর তাই তারা দেহে সবল হবে, এটা বড় প্রয়োজন নয়। বরঞ্চ প্রয়োজন হচ্ছে নিজেরাই সবরকম রোগ তারা ভোগ করবে। কারণ চিকিৎসক তার নিজের শরীর দ্বারা তো অপরের শরীরকে নিরাময় করে না। চিকিৎসকের দেহ তো নিরাময়ের যন্ত্র নয়। তা-ই যদি হত তা হলে চিকিৎসকের কোনোদিন রোগাক্রান্ত হওয়াকে আমরা নিষিদ্ধ করতাম। কিন্তু চিকিৎসক অপরের চিকিৎসা করে তার মনের জ্ঞান দ্বারা। এবং এ-কারণেই, মনের অসুস্থ হওয়া চলে না। যে-মন রোগের দ্বারা আক্রান্ত এবং অসুস্থ সে-মন কাউকে সুস্থ করতে পারে না।

কিন্তু বিচারকের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিন্তু ভিন্নরূপ। বিচারক মন দ্বারা মনের বিচার করে। এ-কারণে অপরাধী মনের সংসর্গে তার শিক্ষা পরিচালিত হবে, একথা যেমন আমরা বলতে পারিনে, তেমনি রোগের ন্যায় অপরাধকে দ্রুত চিহ্নিত করার ক্ষমতার জন্য সে তার তরুণ বয়স থেকে সর্বপ্রকার অপরাধ সম্পাদন করবে, এমন কথাও আমরা বলতে পারিনে। বরঞ্চ আমাদের বলতে হয়, যে-মনের দায়িত্ব হচ্ছে সুস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, সে-মনকে তার তরুণকালে অসৎসঙ্গে কলুষিত হতে দেওয়া চলে না। এ-কারণে যারা সৎ, তরুণকালে তাদের সরল বলে বোধ হয় এবং অসৎকর্মে তাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগে অসৎ ব্যক্তিগণ এদের প্রতারণার সুযোগ লাভ করে।

হ্যাঁ, এরা প্রতারণার সহজ শিকারে পরিণত হয়।

এ-কারণেই আমার বক্তব্য হচ্ছে ঃ বিচারককে তরুণ হলে চলবে না। অসৎকে সে জানবে বটে; কিন্তু তার নিজের আত্মাকে অসৎ করে নয়। অপর চরিত্রের মধ্যে অসৎ-এর পরিপক্ক এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে সে অসৎ এবং অপরাধের জ্ঞান অর্জন করে। এক্ষেত্রে জ্ঞান তার পরিচালক বটে, কিন্তু জ্ঞান তার আপন অভিজ্ঞতা নয়।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একজন বিচারকের আদর্শ তা-ই হবে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এবং তোমার প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলছি, এমনিভাবে বিচারক উত্তম ব্যক্তি হবে। কেননা উত্তম কে? যার আত্মা উত্তম, সেই-ই উত্তম। আর যে ক্রূর এবং সন্দেহপরায়ণ, যে বহু অপরাধের কৃতকর্মা পুরুষ এবং অসৎ-এর সংসর্গে যে নিজেকে নষ্টামির প্রভু বলে গণ্য করে (কেননা সে অপরকে

নিজের মানদণ্ডে পরিমাপ করে) এমন ব্যক্তি যখন এমন সৎ-এর সংসর্গে আসে যে সৎ-এর বয়সগত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হয়েছে, তখন সে-অসৎ নিজেকে আবার মূর্খরূপেই দেখতে পায়। কারণ, অসৎ তার অস্বাভাবিক সন্দেহপরায়ণতা এবং সৎ-এর বিষয়ে তার অনভিজ্ঞতার কারণে সৎ-কে চিহ্নিত করতে অক্ষম হয়। কিন্তু অসৎ-এর এই সুবিধা যে, তার সংখ্যা অধিক; তার সাক্ষাৎ সৎ-এর চেয়ে অসৎ-এর সঙ্গে অধিক আর তাই অসৎ-এর সমাজে সে মূর্খের চেয়ে জ্ঞানী বলেই অধিক বিবেচিত।

এতে আর সন্দেহ কি?

তা হলে উত্তম এবং জ্ঞানী বিচারক, যার আমরা অন্বেষণ করছি সে নিশ্চয়ই অমন অসৎ-এর অভিজ্ঞ ব্যক্তি নয়; বরঞ্চ সে হচ্ছে অপর ব্যক্তি। অসৎ সৎ-কে জানে না, একথা ঠিক। কিন্তু সৎ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত হয়ে ওঠে এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে সে সৎ এবং অসৎ—উভয়ের পার্থক্য চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। কাজেই, আমার মতে, যে সৎ সেই-ই জ্ঞানী, যে-অসৎ সে জ্ঞানী নয়।

আমারও সেই মত, সক্রেটিস।

কাজেই আমাদের রাষ্ট্রে যে-ঔষধ এবং যে-বিধানকে আমরা অনুমোদন করতে চাই তাদের প্রকৃতি হবে আমরা যেরূপ উপরে উল্লেখ করেছি সেরূপ। এরা উভয় সৎপ্রকৃতির সহায়ক হবে; এরা আত্মা এবং দেহ—উভয়ের স্বাস্থ্যকে নিশ্চিত করবে। কিন্তু রোগাক্রান্ত দেহকে যেমন তারা মৃত্যুর হাতে ছেড়ে দেবে তেমনি দূষিত এবং দূরারোগ্য আত্মার অস্তিত্বও তারা বিনষ্ট করে দেবে।

হ্যাঁ, এ-ব্যবস্থা রোগী এবং রাষ্ট্র—উভয়ের জন্যই মঙ্গলকর।

কাজেই আমাদের তরুণ সম্প্রদায়, যারা কেবল সরল সঙ্গীতে শিক্ষিত হয়েছে, এবং যে-সরল সঙ্গীত মানুষের মধ্যে সংযমের প্রেরণা যোগায়—তারা যখন-তখন আইনের দ্বারস্থ হওয়াতে অনিচ্ছুকই হবে।

নিঃসন্দেহে।

তেমনি সঙ্গীতজ্ঞ যে এই একই নীতিতে সরল শরীরচর্চায় নিবদ্ধ রয়েছে, সে যখন-তখন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হওয়াকে উত্তম কাজ বলে বিবেচনা করবে না। কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনেই সে চিকিৎসকের দ্বারস্থ হবে।

আমিও তা-ই বিশ্বাস করি।

কারণ, যে-পরিশ্রম এবং অনুশীলনকে সে স্বীকার করে সে-পরিশ্রম এবং অনুশীলন তার মধ্যে দৈহিক শক্তির চেয়ে একটি সাহসী মনোভাবের সৃষ্টি করে।

আর তাই পরিশ্রম এবং অনুশীলনের মাধ্যমে কেবল তার পেশিগুলিকেই সে দৃঢ় করার চেষ্টা করে না।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

এবং এই সঙ্গীত এবং শরীরচর্চা, এদের কারুরই প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মা কিংবা দেহের প্রশিক্ষণ নয়।

তা হলে এদের প্রকৃত লক্ষ্য কী?

আমি বললাম ঃ আমার বিশ্বাস, এই উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষাদাতার প্রধান লক্ষ্য আত্মার উৎকর্ষসাধন।

গ্লকন বললেন ঃ তা কেমন করে সম্ভব?

আমি বললাম ঃ গ্লকন, কেবল শরীরচর্চায় কেউ নিজেকে নিয়োজিত রাখলে তার আত্মার উপর কীরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং কেবল সঙ্গীতে নিবিষ্ট থাকলে তার আত্মার উপর অপর কী প্রভাব সৃষ্টি হয়, তা কি তুমি লক্ষ করনি?

কী প্রভাব সৃষ্টি হয়?

আমি বললাম ঃ একটি ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তির মন কঠিন এবং হিংস্র হয়ে ওঠে, অপরক্ষেত্রে সেখানে তার মন একেবারে কোমল এবং স্ত্রীসুলভ হীনবল হয়ে পড়ে।

গ্লকন বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ সক্রেটিস। আমি দেখেছি, যে কেবল শরীরচর্চাবিদ সে স্বভাবে প্রায় বর্বর হয়ে ওঠে এবং যে কেবল সঙ্গীতজ্ঞ সে এত অধিক নরম এবং দ্রাব্য হয়ে পড়ে যে এই সঙ্গীত তার কোনো মঙ্গলসাধন করতে পারে না।

এই বর্বরতার কিংবা হিংস্রতার উদ্ভব কিন্তু তেজ থেকে। অথচ সুশিক্ষা এই তেজকে সাহসে পরিণত করতে পারে। কিন্তু তেজের আধিক্য আবার কাঠিন্য এবং বর্বরতায়ও পরিণত হতে পারে।

আমিও তা-ই মনে করি।

কিন্তু যে দার্শনিক, তার মধ্যে থাকবে একটা সুজনতা। আবার সৌজন্যের আধিক্য দুর্বলতায় রূপান্তরিত হতে পারে। কিন্তু সঠিক শিক্ষা তাকে ভদ্র এবং পরিমিত করে তুলতে পারে।

এ কথা সত্য।

এবং আমাদের অভিমত হচ্ছে, আমাদের রাষ্ট্রের শাসকের এই উভয় গুণই থাকতে হবে; সাহস এবং সুজনতা।

অবশ্যই।

এবং উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে একটা সঙ্গতি।

নিঃসন্দেহে।

আর যে-আত্মা সঙ্গতিপূর্ণ সে যেমন সংযমী তেমনি সাহসী। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আবার যে-আত্মা অসঙ্গতিপূর্ণ সে যেমন ভয়ার্ত তেমনি সে অশিষ্ট। কী বল গ্লকন?

খুবই যথার্থ কথা, সক্রেটিস।

এখন সেই সঙ্গীতের কথা ধরো যে-সঙ্গীতের কথা আমরা একটু পূর্বেই আলোচনা করছিলাম। সেই পেলব, মধুর এবং বিষাদময় সঙ্গীতের ধারা যদি কারুর কর্ণকুহরের মধ্যে ঢেলে দেওয়া হতে থাকে এবং এই কর্ণকুহরের মধ্য দিয়ে সেই সঙ্গীতধারা যদি সঙ্গীতপায়ীর আত্মাকে প্লাবিত করে এবং সে তার সমগ্র জীবন এই সঙ্গীতের ধারায় অতিবাহিত করে তা হলে তার ফল কী হয়? এর ফলে গোড়ার দিকে তার মনের তেজ লোহার ন্যায় শক্ত হয়ে ওঠে, মনের ভঙ্গুরতা এবং অপদার্থতা কেটে যায়। কিন্তু সঙ্গীত পানের উপরোক্ত ধারাটি যদি চলতে থাকে তা হলে পরবর্তী পর্যায়ে এই ব্যক্তি আবার দ্রব হতে শুরু করে এবং এই প্রক্রিয়ায় তার তেজ নিঃশেষিত হয়ে যায়। তার আত্মার বাঁধনগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং পরিণামে সে একজন নাজুক যোদ্ধায় পর্যবসিত হয়।

একথাও সত্য, সক্রেটিস।

এই ব্যাপারটাকে আর একটু দেখা যাক। সঙ্গীত-পায়ীর তেজ যদি দুর্বল হয় তা হলে তার ভেতরে পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হয়। কিন্তু তার তেজের পরিমাণ যদি অধিক হয়, তা হলে সঙ্গীতের দ্রাব্য শক্তি তাকে উত্তেজনক্ষম করে তোলে। সামান্য মাত্র উদ্দীপকেই সে মুহূর্তে জ্বলে ওঠে এবং মুহূর্তেই নির্বাপিত হয়ে যায়। এখন থেকেই তার মধ্যে তেজের পরিবর্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জীবনের যুদ্ধক্ষেত্রে সে অবাস্তব অক্ষমে পরিণত হয়ে যায়।

তোমার বর্ণনা খুবই ঠিক, সক্রেটিস।

এবং যেমন সঙ্গীতে, তেমন শরীরচর্চায়। যে ব্যক্তি শরীরচর্চায় আধিক্য দেখায়, সঙ্গীত এবং দর্শনচর্চার বদলে যে কেবল ব্যায়াম এবং খাদ্যগ্রহণেই পারদর্শী সে-ও এর ফলে প্রথমে নিজের তেজ এবং দেহের সুঠাম গঠনে গর্ববোধ করে এবং গর্বের স্ফীতিতে সে নিজেকে নিজের পূর্ব অস্তিত্বের দ্বিগুণ বলে কল্পনা করে।

হ্যাঁ, সে এরূপ কল্পনা করে।

কিন্তু এর ফলে কী হয়? এমন ব্যক্তি যদি আর কিছু না করে, সঙ্গীতের সঙ্গে যদি তার কোনো সম্পর্ক না থাকে তা হলে যতটুকু বুদ্ধি তার মধ্যে ছিল সে-বুদ্ধিও জিজ্ঞাসা, চর্চা এবং চিন্তার অভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর, ভোঁতা এবং অন্ধ হয়ে যায়। ফলে তার মনের চেতনা লোপ পায়, তার সব পরিপোষণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তার অনুভূতিগুলো কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ঠিক নয় কি, গ্লকন?

যথার্থ, সক্রেটিস।

পরিণামে এমন ব্যক্তি দর্শন-বিদ্বেষী এবং বর্বর হয়ে পড়ে। বুদ্ধি বা যুক্তির ব্যবহার তার লোপ পেয়ে যায়। এমন ব্যক্তি বস্তুত বন্য জন্তুতে পরিণত হয়। তার চরিত্রে হিংস্রতা এবং বন্যতা ব্যতীত অপর কোনো গুণের সাক্ষাৎ মেলে না। ফলে অজ্ঞতা এবং নিকৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত হয়। তার জীবনে কোনো পরিমিতিবোধ থাকে না; তার জীবনে সৌন্দর্যের কোনো স্পর্শ থাকে না।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

মানুষের স্বভাবে দুটি ধারা আছে ঃ একটি তেজের। অপরটি চিন্তার, দর্শনের। এবং আমার মনে হয়, দেবতা মানুষের মধ্যে এই দুটি ধারার প্রয়োজনে দুটি দক্ষতার সৃষ্টি করেছে। এ-দুটি নীতি বা দক্ষতা হচ্ছে বীণার দুটি তারের ন্যায়। এদের সৃষ্টি এ-কারণে যেন তার দুটিকে আমরা জীবনে সঙ্গত তৈরির জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনভাবে ঢিলা অথবা শক্ত করে বেঁধে দিতে পারি।

হ্যাঁ, এ-কারণেই জীবনে দুটি ধারার সৃষ্টি।

এবং যে-ব্যক্তি সঙ্গীতকে শরীরচর্চার সঙ্গে সঠিক পরিমাণে মিশ্রিত করতে পারে এবং আত্মার সঙ্গে সঙ্গতির সঠিক বন্ধনে তাদের বাঁধতে পারে তাকে আমরা অপর যে-কোনো সুরকার এবং তন্ত্রীর চেয়ে যথার্থ সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুরকার বলে অভিহিত করতে পারি।

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

আমাদের রাষ্ট্রে সরকারকে যদি স্থায়ী হতে হয় তা হলে এমন দক্ষ প্রতিভার নিশ্চয়ই আবশ্যক হবে।

হ্যাঁ, এরূপ প্রতিভার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

তা হলে আমাদের পরিপোষণ এবং শিক্ষার এই হচ্ছে নীতি। এর পরে কেমন করে আমাদের নাগরিকগণ নৃত্য করবে কিংবা শিকারে বার হবে, কেমন করে তারা শরীরচর্চা করবে বা অশ্বচালনার প্রতিযোগিতা কেমন করে অনুষ্ঠিত হবে—এর বিস্তারিত আলোচনা অনাবশ্যক। কারণ এ সবই আমাদের মূলনীতি দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। সেই মূলনীতি যখন আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি তখন এ-সমস্ত নির্ধারণে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

হ্যাঁ, আমিও জোর দিয়ে বলতে পারি, এ-বিষয়ে কোনো অসুবিধা হবে না।

বেশ ভাল। তা-ই যদি হয় তা হলে আমাদের পরবর্তী জিজ্ঞাসা কী? আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন কি এই নয় ঃ কে রাষ্ট্রের শাসক হবে এবং কে শাসিত হবে?

অবশ্যই। এটাই এখন প্রশ্ন।

এক্ষেত্রে একটা বিষয়ে সন্দেহ নেই যে বয়োজ্যেষ্ঠ বয়োকনিষ্ঠকে শাসন করে।

নিঃসন্দেহে।

এবং এদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তারাই শাসন করবে।

সে-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আচ্ছা, সর্বোত্তম কৃষক আমরা কাকে বলব? যারা কৃষিকাজে একনিষ্ঠ তাদেরই তো আমরা সর্বোত্তম কৃষক বলব, নয় কি?

অবশ্যই।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রে সর্বোত্তম শাসক যখন আমরা চাচ্ছি তখন শাসকের চরিত্র যাদের মধ্যে সর্বাধিক তাদেরই তো আমরা সর্বোত্তম শাসক বা রাষ্ট্রের সর্বেত্তম অভিভাবক বলব?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু রাষ্ট্রের বিশেষ যত্ন যদি তাদের দায়িত্বে হয় তা হলে তাদের জ্ঞানী এবং দক্ষ হতে হবে।

একথাও সত্য।

কারণ মানুষ যত্ন গ্রহণ করে কার? যাকে সে ভালোবাসে তাকেই সে যত্ন করে, নয় কি?

নিশ্চিত।

এবং সে ভালোবাসবে তাকে যার স্বার্থের সঙ্গে তার স্বার্থের মিল রয়েছে এবং যার সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্য তার নিজের সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য বহন করে আনবে বলে সে মনে করে।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

তা হলে আমাদের শাসক বাছাই করতে হবে। আমাদের লক্ষ্য করতে হবে অভিভাবকদের মধ্যে কারা তাদের জীবনে রাষ্ট্রের জন্য যা মঙ্গলকর তা সম্পাদনের সর্বাধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেছে এবং দেশের জন্য যা অমঙ্গলকর তার প্রতি কারা সর্বাধিক ঘৃণা পোষণ করেছে।

হ্যাঁ, এরাই উপযুক্ত শাসক।

অধ্যায় ঃ ১০
[৪১৩—৪১৭]

শাসক বাছাই ঃ তিন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক

বিংশতি বছরে অভিভাবকদের একটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে অভিভাবকগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। সহায়ক বাহিনী এবং শাসক। শাসকদের উপরই ন্যস্ত হবে রাষ্ট্রপরিচালনার মূল দায়িত্ব। সহায়ক বাহিনী শাসকদের সকল আদেশ পালন করবে। সহায়ক বাহিনীর দায়িত্ব বলতে বোঝাবে দেশরক্ষা, শান্তিরক্ষা (পুলিশি কাজ) এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন। শাসকদের পরীক্ষা এবং শিক্ষা হবে অন্যান্য সকলের চেয়ে কঠিন এবং বিস্তারিত। এই কঠিন পরীক্ষাসমূহের মাধ্যমে যারা সর্বোত্তম বলে স্থির হবে তাদেরকে শাসক হিসাবে বাছাই করা হবে। এবার শাসকদের বাছাই করার ফলে অর্থাৎ অভিভাবকগণ সহায়ক বাহিনী এবং শাসক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রের শ্রেণী দাঁড়ায় তিনটি ঃ উৎপাদক, সহায়ক বাহিনী (অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী) এবং শাসক।

এই তিনটি শ্রেণীর যার যে-দায়িত্ব তা পালন করাই যে তাদের পবিত্র কর্তব্য তার প্রতি বিশ্বাস জন্মানোর জন্য প্রয়োজন হলে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এজন্য হিসিয়ডের স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তল জাতির উপাখ্যানকে সত্য বলে চালানো যেতে পারে।

সেই উপাখ্যানটি আমাদের উৎপাদক, সহায়ক এবং শাসকশ্রেণীর শ্রেণীগত পার্থক্য যে অনিবার্য—সে-বিশ্বাসটি তৈরি করবে।

শাসকদের একমাত্র চিন্তা হবে রাষ্ট্রের মঙ্গল। সহায়ক বাহিনীকেও রাষ্ট্রের জন্যই জীবনযাপন করতে হবে। তাই শাসক এবং সহায়ক—উভয়ের জীবন হবে রাষ্ট্রের জন্য নিবেদিত জীবন। তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা থাকতে পারবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ব্যক্তিকে তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে। তাই আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের অভিভাবক অর্থাৎ শাসক ও সহায়কদের কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের মূল হচ্ছে সম্পত্তি এবং পরিবার ও সন্তান। এ-কারণে অভিভাবকদের অর্থাৎ শাসক এবং সহায়কদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পরিবার ও সন্তান থাকতে পারবে না।

অভিভাবকদের চিন্তা হবে সমগ্র রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা, নিজেদের সুখবিধান করা নয়। কারণ, "আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রের সুখ, কোনো বিশেষ শ্রেণীর সুখ নয়"।

তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ উৎপাদকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত পরিবার ও সন্তান থাকবে। তারা শাসক এবং সহায়ক বাহিনীর প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর যোগান দেবে। তাদের প্রদত্ত অর্থ এবং দ্রব্যাদি শাসক এবং সহায়কদের সেবার জন্য মাহিনা বলে গণ্য করা হবে। অভিভাবকগণকে দৃষ্টি রাখতে হবে যেন তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সম্পদ এবং দারিদ্র্যের চরম বৈষম্য সৃষ্টি হতে না পারে। সামরিক দক্ষতা যুদ্ধে বিজয়কে নিশ্চিত করবে। কিন্তু রাষ্ট্রের জনসংখ্যা যদি অধিক বৃদ্ধি পায় কিংবা অধিক হ্রাস পায় তা হলেও রাষ্ট্রের ঐক্য, সংহতি এবং শক্তি বিঘ্নিত হবে। তাই শাসকদের সতর্ক থাকতে হবে যেন রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা রাষ্ট্রের সংহতির জন্য বিপজ্জনকভাবে অধিক কিংবা অল্প না হয়। শিক্ষার মানের দিকেও নজর রাখতে হবে। অধমকে উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নতর শ্রেণীতে যেমন অবনত করতে হবে, তেমনি নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে উত্তমের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলে তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করতে হবে।

উত্তম শাসক যখন পাওয়া গেছে তখন আইন-প্রণয়নের আর আবশ্যক হবে না। যারা দার্শনিক, যারা সর্বোত্তমের জ্ঞানলাভ করেছে তাদের উপর যখন শাসনের দায়িত্ব, অর্থাৎ শাসিতের মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে, তখন অপর কোনো আইনের ব্যবস্থা থাকলে সে-আইন সর্বোত্তম শাসকের বিচারবোধ এবং মঙ্গলবোধের উপর শৃঙ্খল হিসাবে কাজ করবে। সর্বোত্তম দার্শনিক শাসক তখন স্বাধীনভাবে শাসিতের মঙ্গলসাধন করতে পারবে না। তাই আদর্শ রাষ্ট্রে সাধারণ রাষ্ট্রের ন্যায় আইন-প্রণয়ন অনাবশ্যক এবং অনুচিত।

আবার তাদের জীবনের প্রতি পর্যায়ে তাদের ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে। আমাদের দেখতে হবে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের সংকল্প প্রতি পর্যায় থেকে পর্যায়ান্তরে তারা রক্ষা করেছে, কোনো জবরদস্তি বা আকর্ষণে তারা

তাদের দায়িত্ববোধ বিস্মৃত হয়নি কিংবা পরিত্যাগ করেনি।

কেমন করে তারা দায়িত্ব পরিত্যাগ করতে পারে?

আমি বললাম, গ্লকন, আমি তোমায় ব্যাখ্যা করে বলছি। মানুষ তার মনের সংকল্প ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়—দুপ্রকারে বিস্মৃত হতে পারে। ইচ্ছা করে সে বিস্মৃত হয় তখন যখন একটা মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে শিক্ষার মাধ্যমে সে সত্যকে গ্রহণ করে; এবং অনিচ্ছায়, যখন সত্য থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়।

গ্লকন বললেন ঃ ইচ্ছায় সংকল্পত্যাগের ব্যাপারটি আমি বুঝলাম, সক্রেটিস। কিন্তু অনিচ্ছার ব্যাপারটি আমার বুঝতে এখনও বাকি আছে।

আমি বললাম, কেন, তুমি তো সাধারণভাবে দেখতে পাও যে, মানুষ যাকে উত্তম মনে করে তা থেকে যখন সে বঞ্চিত হয় তখন সে অনিচ্ছায় বঞ্চিত হয়। কিন্তু যাকে সে অন্যায় মনে করে তাকে সে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে। আর যাকে সত্য বলে কেউ বোধ করে তা থেকে বঞ্চিত হওয়াকে সে উত্তম বলে মনে করতে পারে না। তেমনি যাকে, কেউ সত্য মনে করে তার প্রাপ্তি অবশ্যই উত্তম। তা ছাড়া কোনোকিছুকে তার যথার্থ অবস্থায় অনুধাবন করা হচ্ছে সত্যকে লাভ করা। ঠিক নয় কি?

গ্লকন জবাব দিলেন ঃ তোমার সঙ্গে এবার আমি একমত সক্রেটিস, মানুষ সত্য থেকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বঞ্চিত হয়।

এবং এই অনিচ্ছায় সত্য ত্যাগ হয় চুরি, নয় জবরদস্তি কিংবা কোনো জাদুকরি প্রভাবের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়। নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ কথাটা ঠিক বুঝতে পারছিনে, সক্রেটিস।

আমি বুঝতে পারছি আমার ব্যাখ্যাটা বিষাদাত্মক নাট্যকারের ন্যায় রহস্যময় হয়ে উঠছে। আসলে আমি বলতে চাচ্ছি ঃ মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যাদের পরিবর্তন ঘটে অন্যের প্রভাবে, আবার এমন কিছু লোক আছে যারা নিজেরাই কালক্রমে একটা বিষয় বিস্মৃত হয়। কিছু লোক আছে যুক্তিতে যাদের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটে; কিছু আছে সময়ের স্রোতে তাদের পরিবর্তন ঘটে। আশা করি এবার তুমি আমাকে বুঝতে পারছ, গ্লকন।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এবার কথাটা আমি বুঝতে পারছি।

যারা বাধ্য হয়ে পরিবর্তিত হয়, কোনো যন্ত্রণার দুঃখ তাদের অভিমত পরিবর্তনের কারণ হয়।

গ্লকন বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ সক্রেটিস।

তা ছাড়া তুমি এটাও স্বীকার করবে যে, জাদুতে যারা প্রভাবিত তাদের মনের পরিবর্তন ঘটে, হয় কোনো আনন্দের কোমল প্রভাবে অথবা ভীতির কঠিন প্রভাবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, যা কিছু প্রতারণা তাকে জাদু বই আর কী বলা চলে?

কাজেই আমি বলছিলাম, আমাদের বার করতে হবে, কারা নিজের বিশ্বাসের ভিত্তিতে সর্বোত্তম শাসক, কারা রাষ্ট্রের মঙ্গলকর বলে যা বিবেচনা করে তাকে নিজেদের জীবনের নীতি হিসাবে গ্রহণ করে। এদের যৌবনকাল থেকেই এদের ওপর আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এবং যে-দায়িত্বে তাদের বিস্মৃতি কিংবা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক সেই দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে তাদের পরীক্ষিত হতে হবে। এমন পরীক্ষায় যারা তাদের দায়িত্ব বিস্মৃত হবে না, এবং যারা প্রতারিত হবে না তাদের আমরা বাছাই করব শাসক হওয়ার জন্য এবং যারা এ-পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবে আমরা তাদের শাসক হওয়ার দাবি প্রত্যাখ্যান করব। এটাই হবে শাসক-নির্বাচনের পদ্ধতি। তোমার কী মনে হয় গ্লকন?

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

শুধু তাই নয়, তাদের জন্য পরিশ্রম, ক্লেশ এবং সংকটের কঠিনতর পরীক্ষা নির্দিষ্ট করতে হবে। এ-পরীক্ষায় অধিকতর যোগ্যতার প্রমাণ তাদের উপস্থিত করতে হবে।

ঠিক কথা, সক্রেটিস।

আকর্ষণ দিয়েও তাদের পরীক্ষা করতে হবে। এ হবে তাদের তৃতীয় স্তরের পরীক্ষা। আমাদের দেখতে হবে, আকর্ষণের মধ্যে তাদের আচরণ কীরূপ হয়। অশ্ব-শাবককে যেমন শব্দ এবং কোলাহলের মধ্য দিয়ে চালনা করে তার স্বভাব ভীরু কিংবা সাহসী তা পরীক্ষা করা হয়, তেমনি আমাদের যুবকদেরও পর্যায়ক্রমে ভীতি এবং আকর্ষণের মধ্যে স্থাপন করে তাদের স্বভাবের যথার্থতা পরীক্ষা করতে হবে। সোনাকে পুড়িয়ে যেমন তার যথার্থতা নিরূপণ করা হয় তেমনি এমনি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের শাসকদের স্বভাবের যথার্থতা নির্ধারণ করতে হবে। দেখতে হবে সকলপ্রকার আকর্ষণের তারা উর্ধ্বে কি না, চরিত্র তাদের মহৎ কি না এবং যে-সঙ্গীতের শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে সে-সঙ্গীতের সুসঙ্গতি তারা নিজেদের চরিত্রের সকলপ্রকার অবস্থা বিপর্যয়েও ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের মঙ্গলকর ধারায় ধারণ করতে সক্ষম কি না। এবং যে তার তারুণ্যে, যৌবনে এবং পরিপক্ব বয়সে—সকল পরীক্ষায় বিজয়ী এবং বিশুদ্ধ

বলে প্রমাণিত হয়েছে, সেইই মাত্র রাষ্ট্রের শাসক এবং রক্ষকরূপে নিযুক্ত হবে। এমন ব্যক্তি তার জীবনে এবং মৃত্যুতে সম্মানিত হবে। তার সমাধি এবং স্মৃতিকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সম্মানিত করব। কিন্তু পরীক্ষায় যারা বিফল হবে তাদের আমরা অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করব। আমার তো মনে হয়, আমাদের রাষ্ট্রের শাসক এবং রক্ষক-নির্বাচনের এবং নিয়োগের এটাই হবে পদ্ধতি। অবশ্য কথাটা আমি সাধারণভাবেই বলছি। সবকিছুই আমার কথানুযায়ী হবে, এমন দাবি আমি করছিনে।

গ্লকন বললেন ঃ এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমিও তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস।

এবং আমার মনে হয় 'রাষ্ট্রের শাসক বা রক্ষক' শব্দকে তার পরিপূর্ণ অর্থে এই উচ্চতর শ্রেণীর উপরই মাত্র প্রয়োগ করা সঙ্গত। কারণ এই শ্রেণীই রাষ্ট্রকে বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে যেমন রক্ষা করে, তেমনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে নাগরিকদের মধ্যে এরাই শান্তি বজায় রাখে, যেন বিদেশী কিংবা স্বদেশী কোনো শক্তির সুযোগ কিংবা সাধ্য না ঘটে রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন করার। যে যুবকদের আমরা ইতিপূর্বে রাষ্ট্রের অভিভাবক বা শাসক বলেছি তাদের যথার্থভাবে আমরা শাসকদের নীতির সাহায্যকারী এবং সমর্থক বলে অভিহিত করতে পারি।

আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস।

তা হলে যে-মিথ্যাচারের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার কী হবে? অর্থাৎ যাকে আমরা 'রাজকীয় মিথ্যা' বলে অভিহিত করেছি, যে-মিথ্যা শাসিতের জন্য তো বটেই, শাসকের ক্ষেত্রেও সম্ভব হলে যাকে প্রয়োগ করা চলে তেমন মিথ্যা আমরা কীরূপে উদ্ভাবন করতে পারি?

গ্লকন বললেন ঃ তুমি কোন্ মিথ্যার কথা বলছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ এমন নূতন কোনো ব্যাপার নয়। একে আমরা ফিনিশীয় কাহিনী বলে অভিহিত করতে পারি। এ-কাহিনী আমাদের সময়ে না ঘটলেও আমাদের পূর্বে অন্যত্র এ-কাহিনী সংঘটিত হয়েছে। আজকাল অবশ্য এমন কাহিনীর সংঘটনকে বিশ্বাস্য বলে গ্রহণ করানো কষ্টকর।

কাহিনীটি বলতে তুমি যেন ইতস্তত করছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ কাহিনীটি শুনলে তুমি আমার ইতস্ততায় বিস্মিত হবে না, গ্লকন।

সক্রেটিস, তুমি নির্ভয়ে কাহিনীটি বর্ণনা করো।

হ্যাঁ, আমি এবার কাহিনীটি বর্ণনা করব। কিন্তু এই দুঃসাহসী কাহিনী তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি কেমন করে বলব, তা-ই ভাবছি। কাহিনীটি আমি ক্রমান্বয়ে বিবৃত করব। কারণ এর প্রথম লক্ষ্য আমাদের রাষ্ট্রের শাসককূল। এর দ্বিতীয় লক্ষ্য রাষ্ট্রের সহায়ক বাহিনী বা সৈন্যগণ। সর্বশেষ এর লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ। এদেরকে বলতে হবে ঃ এদের যৌবন স্বপ্ন বই আরকিছু ছিল না এবং যে-শিক্ষা তারা লাভ করেছে সে-শিক্ষা ভ্রমমাত্র। আসলে সমগ্র সময়টা মাটির গর্ভে তারা অতিবাহিত করেছে। মাটিই তাদের মাতা। মাটির গর্ভে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। তাদের এই সৃষ্টি যখন সম্পূর্ণ হয়েছে জননী মৃত্তিকা তাদের ভূপৃষ্ঠে উৎক্ষেপণ করে দিয়েছে। জন্মভূমি হচ্ছে তাদের জননী, তাদের প্রতিপালনকারী। তাই তাদের কর্তব্য হচ্ছে তাদের রাষ্ট্রের মঙ্গলচিন্তা করা এবং রাষ্ট্রকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। নাগরিকগণ যেমন এই জন্মভূমির জাত, জন্মভূমির সন্তান, তেমনি শাসক এবং সহায়কদের ভ্রাতা।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, এবার আমি তোমার সঙ্কোচের কারণ বুঝতে পারছি। এমন মিথ্যা বলতে তোমার লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি বললাম ঃ ঠিকই বলেছ, গ্লকন। কিন্তু কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। আমি অর্ধাংশ মাত্র বর্ণনা করেছি। আমাদের কাহিনীর ভিত্তিতে নাগরিকদের সম্বোধন করে আমরা বলব ঃ

"নাগরিকবৃন্দ, আপনারা আমাদের ভাই। কিন্তু বিধাতা আপনাদের ভিন্নভাবে গঠন করেছে। আপনাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আছে যাদের আদেশদানের ক্ষমতা আছে। এদের গঠনে স্বর্ণের মিশ্রণ আছে। এ-কারণেই তারা সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী। কিন্তু অন্যদের গঠনে আছে রৌপ্যের মিশ্রণ। এরা হচ্ছে রাষ্ট্রের সহায়ক বা সৈন্যবাহিনী। আর যারা কৃষক বা উৎপাদক এবং কারিগর তাদের গঠনে আছে পিতল এবং লৌহের মিশ্রণ। গঠনে পার্থক্যের ভিত্তিতে এই শ্রেণীর ধারাবাহিকতা সন্তানের মধ্যে রক্ষিত হয়। তবে মূল যখন এক তখন কোনো কোনো সময়ে স্বর্ণগৃহে রৌপ্যসন্তানের যেমন জন্ম হতে পারে, তেমনি রৌপ্যগৃহে স্বর্ণসন্তানের উদ্ভবও অসম্ভব নয়। কিন্তু শাসকদের জন্য বিধাতার প্রথম বিধান হচ্ছে উত্তম শাসক হিসাবে সতর্কভাবে তার জাতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। তাদের দৃষ্টি রাখতে হবে তাদের সন্তানদের চরিত্রে কোন্ বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ঘটেছে। কারণ স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য জনক জননীর সন্তানে যদি পিতল এবং লৌহের মিশ্রণ ঘটে থাকে তা হলে প্রকৃতির বিধানমতো এমন

সন্তানের শ্রেণী-রূপান্তর অবশ্যই ঘটাতে হবে। কিন্তু শাসকের সন্তানের শ্রেণীগতভাবে অধঃস্তরে প্রেরিত হয়ে জমির কৃষক বা শিল্পের কারিগরে পরিণত হওয়ার দৃশ্য দেখে শাসকের চোখ বেদনার বাষ্পে আবিষ্ট হলে চলবে না। আবার কারিগর বা কৃষকের সন্তানদের মধ্যেও স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মিশ্রণ ঘটলে এমন সন্তানও উচ্চতর শ্রেণীতে স্থাপিত হয়ে রাষ্ট্রের অভিভাবক অর্থাৎ শাসক কিংবা তার সহায়ক হওয়ার সম্মানে সম্মানিত হবে। কারণ দেবতার বাণীর নির্দেশ হচ্ছে ঃ পিতল বা লৌহের মিশ্রণে উৎপাদিত সন্তান যদি রাষ্ট্রের প্রহরাদানের দায়িত্বে নিযুক্ত হয় তা হলে সে-রাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য। গ্লকন, এই হচ্ছে কাহিনী। আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ-কাহিনী বিশ্বাস করাবার কোনো উপায় আছে বলে কি তুমি মনে কর?

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, বর্তমান যুগে তোমার এ-কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য করার কোনো উপায় আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে বর্তমানের যারা উত্তরপুরুষ, তারা এবং তাদের সন্তানসন্ততি এবং সেই সন্তানসন্ততির যারা বংশধর সেই দূর ভবিষ্য-মানুষ তোমার এ-কাহিনী বিশ্বাস করতে পারে।

আমি বললাম ঃ কাজটি যে কঠিন তা আমি বুঝতে পারছি। অথচ এই বিশ্বাস নাগরিকদের যেমন তাদের রাষ্ট্রের অধিকতর সযত্ন রক্ষাকারীতে পরিণত করবে, তেমনি তাদের মধ্যে অধিকতর সৌভ্রাতৃত্ববোধেরও সৃষ্টি করবে। সে যাহোক, আমাদের কাহিনীকে আমরা ছেড়ে দিই। সে গুজবের ডানা বিস্তার করে অন্যত্র উড়ে যাক, তাতে আমাদের আপত্তি নেই। এসো আমরা বরঞ্চ শাসকদের অধিনায়কত্বে আমাদের মাটির সন্তানদের আমাদের রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্তরূপে সজ্জিত করে তুলি। শাসকদের কী করণীয়? তাদের চারিপাশের ভূমি পর্যবেক্ষণ করে এমন একটি উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করতে হবে, যেখান থেকে তারা কোনো অবাধ্যতার উদ্ভব ঘটলে তাকে দমন করতে পারবে এবং বৈদেশিক কোনো শক্তি নেকড়ের ন্যায় আক্রমণ করলে তাকে পরাভূত করতে সক্ষম হবে। আমাদের রক্ষিবাহিনী এই নির্বাচিত স্থানে তাদের শিবির স্থাপন করবে, তাদের অবস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং উপযুক্ত দেবতাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, এরূপ করাই সঙ্গত।

আমাদের বাহিনীর বাস-ব্যবস্থাটি এরূপ হতে হবে যাতে শীতের শৈত্য এবং গ্রীষ্মের তাপ থেকে তা সুরক্ষিত থাকে।

বাসব্যবস্থা বলতে, সক্রেটিস, তুমি কি এদের বাসগৃহের কথা বলছ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, কিন্তু এ-গৃহ হবে সৈন্যদের গৃহ, দোকানিদের গৃহ নয়।

কিন্তু দু-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

সেটি আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করব। মেষপালকের প্রহরী-কুকুর যদি শিক্ষার অভাবে কিংবা ক্ষুধার কারণে বা অসৎস্বভাব কিংবা অপর কোনো কারণে মেষশাবকদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রহরারত কুকুরের ন্যায় আচরণ না করে নেকড়ের ন্যায় আচরণ করে, তা হলে মেষপালকের জন্য ব্যাপারটি কি ভয়ানক রকমে অবাঞ্ছিত হবে না?

অবশ্যই অবাঞ্ছিত।

কাজেই আমাদেরও সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন রাষ্ট্রের নাগরিকদের চেয়ে সশস্ত্র এবং শক্তিশালী যে-রক্ষিবাহিনী, তারা যেন নাগরিকদের সুহৃদ এবং মিত্রের পরিবর্তে বর্বর স্বেচ্ছাচারী বাহিনীতে পরিণত হয়ে নাগরিকদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, এ-সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এজন্য কি যথার্থ উত্তম শিক্ষাই সর্বোত্তম নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করবে না?

হ্যাঁ, তা করবে। কিন্তু তারা তো উত্তমভাবে শিক্ষিত হয়েই আছে, নয় কি?

প্রিয় গ্লকন, এ-বিষয়ে আমি তত নিশ্চিত হতে পারছিনে। তবে এই রক্ষকবাহিনীর যে উত্তমরূপে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক, এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কারণ, যথার্থ শিক্ষাই মানুষকে সভ্য করতে পারে, মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং তার অধীনস্থ মানুষের প্রতি তার আচরণকে সত্যকারভাবে মানবিক করে তুলতে পারে।

গ্লকন বললেন, এ তো খুবই সত্য কথা।

এবং কেবল শিক্ষা নয়, তাদের বাসস্থান এবং যা-কিছু তাদের নিজস্ব তার কোনোকিছুই যেন রক্ষক হিসাবে তাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে না পারে কিংবা রক্ষককে অপর নাগরিকদের ভক্ষকে পরিণত করতে না পারে। সুবিবেচনাসম্পন্ন যে-কোনো মানুষই এই প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করবে।

হ্যাঁ, একথা তাকে স্বীকার করতে হবে।

আমাদের তা হলে বিবেচনা করতে হবে, যে-আদর্শের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা বাস্তবায়িত করতে রাষ্ট্রের রক্ষকদের জীবনধারা কীরূপ হতে হবে। প্রথমত যা একেবারে আবশ্যক তা ব্যতীত আমাদের রাষ্ট্রের রক্ষকদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতে পারবে না। কিংবা তাদের এমন কোনো ব্যক্তিগত গৃহ

কিংবা বাসস্থান থাকতে পারবে না যেখানে অপরের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাদের খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণও নির্দিষ্ট হবে সুশিক্ষিত সাহসী এবং সংযমী যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিমাণ দ্বারা। নাগরিকদের নিকট থেকে তারা নির্দিষ্ট হারে একটি বেতন পাবে। এরও পরিমাণ তার বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা নির্দিষ্ট হবে, তার অধিক নয়। তারা শিবিরের ছাউনিতে সৈন্যদের ন্যায় জীবনযাপন করবে। জাগতিক স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের কোনো প্রয়োজন তাদের নেই। কারণ আমরা তাদের বলব, বিধাতার নিকট থেকেই তারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য লাভ করেছে। তাই ঐশ্বরিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সঙ্গে জাগতিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটানো তাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না। কারণ জাগতিক স্বর্ণ এবং রৌপ্য ঐশ্বরিক স্বর্ণ এবং রৌপ্যের চেয়ে অবশ্যই নিকৃষ্ট আর এই নিকৃষ্ট পদার্থ জগতে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছে। কাজেই এই নিকৃষ্ট পদার্থে তাদের আকৃষ্ট হবার কিছু নেই। কারণ তাদের ঐশ্বরিক ধাতু অবিকৃত রয়েছে। এজন্যই তাদের জন্য রৌপ্য এবং স্বর্ণের আকর্ষণ আমরা নিষিদ্ধ করব। তারা স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে স্পর্শ করবে না; এ-সমস্ত দ্রব্যকে নিজেদের সঙ্গী করে একই গৃহে তারা বাস করবে না। নিজেদের অঙ্গের আভরণ হিসাবে এদের তারা ব্যবহার করবে না কিংবা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্র থেকে তারা কোনো পানীয় পান করবে না। এই হবে রক্ষকদের মুক্তির পথ এবং এরাই হবে আমাদের রাষ্ট্রের মুক্তিদাতা। কিন্তু রাষ্ট্রের রক্ষকগণ যদি কখনো নিজেদের গৃহ তৈরি করে কিংবা ব্যক্তিগত জমি বা অর্থের মালিক হয় তা হলে তারা রাষ্ট্রের অভিভাবক বা রক্ষকের পরিবর্তে গৃহীতে এবং কৃষকে পরিণত হবে। তখন তারা নাগরিকদের সুহৃদের পরিবর্তে শত্রু এবং স্বেচ্ছাচারীতে পরিণত হবে। তখন তারা অপরকে ঘৃণা করবে এবং অপরের দ্বারা ঘৃণিত হবে। অপরের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে এবং অপরে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। এমনিভাবে তারা বৈদেশিক শত্রুর চেয়ে অভ্যন্তরীণ শত্রুর ত্রাসে তাদের জীবন অতিবাহিত করবে। তাদের এই পতন তাদের নিজেদের এবং রাষ্ট্রের ধ্বংসকে আসন্ন করে তুলবে। এই সমস্ত কারণেই আমরা বলব, আমাদের রাষ্ট্রকে আমাদের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী সংগঠিত করতে হবে এবং তার রক্ষক এবং শাসকদের জন্য ব্যক্তিগত গৃহসম্পদ এবং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী নিষিদ্ধ করা হবে। এ-বিষয়ে তোমার কী মনে হয়, গ্লকন?

গ্লকন বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

চতুর্থ পুস্তক পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১১
[৪১৯—৪৪৫]

ন্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে ঃ রাষ্ট্রে
ন্যায়ের অবস্থান ঃ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ

রাষ্ট্রগঠনের মূল উদ্দেশ্যটিকে আমাদের আবার স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা রাষ্ট্র গঠন করেছি ন্যায়কে বৃহৎ আকারে প্রত্যক্ষ করার জন্য। রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে উৎপাদক, সহায়ক এবং শাসক দিয়ে। অথবা গুণ হিসাবে বলা চলে রাষ্ট্র তৈরি হয়েছে সংযম, সাহস এবং জ্ঞান দ্বারা। গুণের প্রাধান্য হিসাবে উৎপাদক বা উৎপাদনকারী কৃষক, কারিগর, বণিক, ব্যবসায়ী মজুর সবার প্রধান গুণ সংযম। সহায়ক বা রাষ্ট্রের রক্ষকদের প্রধান গুণ সাহস। এবং শাসকদের প্রধান গুণ জ্ঞান। কিন্তু ন্যায়ের অবস্থান কোথায়? অবশিষ্টের পদ্ধতি প্রয়োগ করে আমরা ন্যায়কে নির্দিষ্ট করতে পারি। সংযম, সাহস এবং জ্ঞানের সমন্বয়ে রাষ্ট্র কেমন করে চলছে? তার মূল কারণটি কী? সে কেবল এই নয় যে রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় গুণকে আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি। তার মূল কারণ হচ্ছে 'সংযম' জানে তার কী দায়িত্ব। এবং তার যা দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করা এবং অপরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ না করাকেই সে তার কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে। 'সাহস' জানে তার কী করণীয় এবং তার সেই করণীয় সে সমাধা করে। অপরের দায়িত্বে সে হস্তক্ষেপ করে না। 'জ্ঞান' জানে তার কী কর্তব্য। মোটকথা, যার যা করণীয় সেটি জানা এবং সেই করণীয় সম্পাদন করার মাধ্যমেই আমাদের আদর্শ রাষ্ট্র আদর্শভাবে ক্রিয়াশীল থাকছে ঃ তার সুস্থতা বজায় থাকছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সংযম, সাহস এবং জ্ঞানের দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে। কেবল বাকি রয়েছে ন্যায়ের দায়িত্ব স্থির করা। এবং ন্যায়ের জন্য অপর কোনো বিশেষ কার্য বলে যখন কিছু নেই তখন সংযম, সাহস এবং জ্ঞানের এই সঙ্গতি, পরিমিতিবোধ অর্থাৎ নিজের কর্তব্য জানা এবং তা সম্পাদন করা এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করাটাই হচ্ছে ন্যায়। অর্থাৎ ন্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রের সকল অপরিহার্য উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গতি। এই সিদ্ধান্তেরই বারংবার উচ্চারণ পাই আমরা সক্রেটিসের এরূপ কথায় ঃ

"প্রকৃতি যাকে যে-কাজের জন্য তৈরি করেছে সে সেই কাজই সম্পাদন করবে। আমি বলব এই নীতিই হচ্ছে ন্যায়।" "ন্যায় হচ্ছে নিজের কাজ করা এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করা।" তাই শেষ সিদ্ধান্ত হল ঃ জ্ঞান, সাহস, সংযম এবং ন্যায়—এই হচ্ছে রাষ্ট্রের মূল উপাদান। বলা চলে রাষ্ট্রের মূল শক্তি বা রাষ্ট্রের আত্মার একক। এবার ব্যক্তির উপরে ন্যায় সম্পর্কে আমাদের এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা আর কঠিন নয়। ব্যক্তির আত্মারও তা হলে মূল উপাদান হবে সংযম, সাহস এবং জ্ঞান এবং এই তিনের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গতি—অর্থাৎ ন্যায়। ব্যক্তির মধ্যেও প্রবৃত্তি জানে তার কী কাজ। এবং সে সেই কাজই মাত্র করে। দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের উপায় করে। সাহস বা তেজ জানে তার কী কাজ। সে সেই কাজই মাত্র করে। শত্রুর আক্রমণ এবং প্রয়োজনবোধে প্রবৃত্তির বিদ্রোহ-চেষ্টাকে দমন করে দেহকে সে রক্ষা করে। জ্ঞান বা বুদ্ধি দেহের প্রবৃত্তি এবং সাহসকে শাসন করে। সে হচ্ছে দেহের আত্মা, দার্শনিক। সে জানে কার কী করণীয়, কার কাজের কী সীমা। এই সঙ্গতি যে দেহ এবং আত্মায় বিরাজ করে সেই দেহ তথা সেই আত্মাকেই আমরা সুস্থ দেহ, সুস্থ আত্মা বলি। এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তি রাষ্ট্রের একক হলেও ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্লেটো প্রথমে নির্দিষ্ট করে তার ভিত্তিতে তাঁর রাষ্ট্র গঠন করেন নি। ব্যক্তির চারিত্রিক বিশ্লেষণ থেকে তাঁর রাষ্ট্রে উত্তরণ ঘটেনি। তিনি রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় উপাদান দিয়ে গঠিত করে তার ভিত্তিতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রে আমরা যেরূপ দেখেছি, ব্যক্তির মধ্যে আমরা সেরূপ দেখি; রাষ্ট্রে যেরূপ সংযম, সাহস এবং জ্ঞান, ব্যক্তির মধ্যেও তেমনি সংযম, সাহস এবং জ্ঞান। একথা ঠিক যে, তাঁর এ-সিদ্ধান্ত আমাদের সাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু বিরোধী নয়। তাই প্লেটোর বিশ্লেষণ ও যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট বাস্তব এবং স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। যার যা কাজ তার তাই করা উচিত—এটি সামাজিক জীবনের একটি বাঞ্ছিত নীতি। প্লেটো এ-নীতিকে চরমে নিয়ে যেয়ে শ্রমের বিভাগকে অনড় শ্রেণী বিভাগে পরিণত করেছেন—এ-অভিযোগ তোলা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে শ্রমের বিভাগ এবং কাজের দক্ষতার সিদ্ধান্তটি মূল্যবান। তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রে উত্তরণের পরিবর্তে রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিতে পৌঁছার পদ্ধতিটির তাৎপর্য

এখানে যে, প্লেটো রাষ্ট্রকে ব্যক্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এর অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ ব্যক্তির জন্য রাষ্ট্র নয়, রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি। অবশ্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিশ্চয় এই যে, রাষ্ট্র একটি যৌগিক জীবন-সংস্থা। এর প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরনির্ভরশীল। ইংরেজিতে বললে ঃ এ হচ্ছে একটি 'অরগানিক হোল', পরস্পরনির্ভর সংগঠিত সংস্থা। তাই ব্যক্তির জন্য যেমন রাষ্ট্র; রাষ্ট্রের জন্য তেমনি ব্যক্তি। একটিকে বাদদিয়ে অপরটি অস্তিত্বহীন। কিন্তু সঙ্গতির সাধক প্লেটো ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের এই পারস্পরিকতার দিকটিতে তত জোর দেননি, যত দিয়েছেন 'ব্যক্তি রাষ্ট্রের জন্য'—এই দিকটিতে। এ-কারণে প্লেটোর রাষ্ট্রে সাধারণ ব্যক্তি ব্যক্তিত্বহীন। দার্শনিক শাসক তার চিকিৎসক। সে তার রুগি। নিজের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল, ন্যায়-অন্যায়ের সিদ্ধান্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তি শাসকের মুখাপেক্ষী। প্লেটোর রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিলোপকারী রূপের মূল প্লেটোর এই বিশ্বাসে যে, রাষ্ট্র আগে, ব্যক্তি পরে। এই সত্যকে সমসাময়িক গ্রীকসমাজ অস্বীকার করার চেষ্টা করছে বলেই রাষ্ট্রের মধ্যে সংকট দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই প্লেটোর এ-তত্ত্ব তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বই নয়, এটি প্রাচীন গ্রীসের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের অন্যতম। এর রেশ আমরা এ্যারিস্টটলেও পাই। এ্যারিস্টটলেরও ঘোষণা ঃ রাষ্ট্রের বাইরে কারওর অস্তিত্ব নেই। রাষ্ট্রের বাইরে বাস করতে পারে কেবলমাত্র দেবতা এবং পশু—অপর কেউ নয়।

আলোচনার এই স্থানে এ্যাডিম্যান্টাস একটা প্রশ্ন করলেন ঃ সক্রেটিস, কেউ যদি প্রশ্ন করে, তুমি এদের অর্থাৎ আমাদের এই রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবন শোচনীয় করে তুলছ, তা হলে তুমি কী বলবে? কারণ এই নগররাষ্ট্র তো নাগরিকদের, অথচ এরা নিজেরাই নিজেদের জীবনের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর সকলে যেখানে জমির মালিক হয়, বৃহৎ এবং মনোহর ঘরবাড়ি তৈরি করে, অন্যান্য আকর্ষণীয় দ্রব্যাদিও তারা যেখানে ভোগ করে, দেবতাদের নিকট নিজেরাই বলি উৎসর্গ করে, অতিথি সৎকার করে, স্বর্ণ এবং রৌপ্য এবং ভাগ্যবানদের মূল্যবান দ্রব্যাদি যেখানে তারা ব্যবহার করে সেখানে

আমাদের রাষ্ট্রের হতভাগ্য নাগরিকগণ বেতনভুক এবং শিবিরবাসী এবং সর্বক্ষণ চৌকিরত সৈন্য ব্যতীত অপর কিছু নয়।

আমি বললাম ঃ এ্যাডিম্যান্টাস, ঠিকই বলেছ এবং তোমার সঙ্গে আমি আরও বলতে পারি, এদের কেবল খাদ্য পরিবেশন করা হয়, খাদ্যের অতিরিক্ত কোনো মাহিনা তাদের দেওয়া হয় না। তারা বিলাসভ্রমণে বেরুতে পারে না। তাদের হাতে এমন কোনো বাড়তি অর্থ নেই যা দিয়ে তারা কোনো সঙ্গিনীকে পুষতে পারে কিংবা আর্থিক সুখ বলতে যা বোঝায় তার কোনো সুখ তারা উপভোগ করতে পারে। বস্তুত এ্যাডিম্যান্টাস, এরূপ আরও অনেক অভিযোগ উত্থাপন করা চলে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, এই সবগুলোকেই অভিযোগ হিসাবে ধরো সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ তার মানে তোমার প্রশ্ন হচ্ছে, এই সবগুলি যদি অভিযোগ হয় তা হলে এর জবাব কী হবে?

হ্যাঁ, আমার প্রশ্ন তা-ই।

আমি বললাম ঃ আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম, অর্থাৎ আমাদের পুরনো পথ ধরে যদি আমরা এগুই, তা হলে, আমার বিশ্বাস, এর জবাব আমরা পেয়ে যাব। এবং আমাদের সে-জবাব হবে, এই অভিযোগ সত্ত্বেও আমাদের অভিভাবক অর্থাৎ শাসকগণ সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি বলে পরিগণিত হতে পারে। তবে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক ঃ আমাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য অসম অনুপাতে কোনো বিশেষ শ্রেণীর সুখসৃষ্টি নয়। আমাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বাধিক সুখের সৃষ্টি করা। কারণ আমরা ভেবেছি, যে-রাষ্ট্র সমগ্রের মঙ্গলের ভিত্তিতে গঠিত সে-রাষ্ট্রেই ন্যায়ের সন্ধান লাভের সম্ভাবনা সবচেয়ে অধিক; আবার যার গঠনের মূলে অসঙ্গতি সে রাষ্ট্রেই অন্যায়ের বাস। এভাবে ন্যায় এবং অন্যায়ের সাক্ষাৎ যদি আমরা লাভ করতে পারি তা হলে এদের মধ্যে কে অধিকতর সুখী তা নির্ধারণ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। বর্তমানে আমরা সুখী রাষ্ট্র গঠন করছি। কিন্তু এ-গঠনকার্য আমরা খণ্ডাকারে কিংবা এর কতিপয় নাগরিককে সুখী করার ভিত্তিতে সম্পাদন করতে পারিনে; আমরা এ-রাষ্ট্রকে সংগঠিত করছি সমগ্র হিসাবে। একাজ সম্পন্ন হলে এর বিপরীত ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। বিষয়টিকে পরিষ্কার করার জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারি। মনে করো আমরা একটি মূর্তি অঙ্কন করছি। এমন সময় একজন এসে বলল ঃ তোমরা

দেহের সবচেয়ে সুন্দর অংশসমূহে সবচেয়ে সুন্দর রং কেন ব্যবহার করছ না? তোমাদের উচিত মূর্তির চোখ দুটিকে লালরঙে রঞ্জিত করা। কিন্তু তোমরা তাকে কালো কেন করেছ? তার এমন প্রশ্নের জবাবে সঙ্গতভাবেই আমরা বলতে পারি ঃ সুজনেষু, আপনি কি চান মূর্তির চোখ দুটিকে আমরা এত সুন্দর করে রঞ্জিত করি যেন চোখ দুটি চোখ বলেই প্রতীয়মান না হতে পারে? তার চেয়ে বরঞ্চ আপনার দেখা উচিত, মূর্তির সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথার্থ অনুপাত রক্ষা করে আমরা সামগ্রিকভাবে মূর্তিটিকে সুন্দর করতে পারি কি না। অনুরূপভাবে আমি তোমাকেও বলব, এ্যাডিম্যান্টাস, রাষ্ট্রের যারা অভিভাবক বা শাসক তাদেরও আমাদের এমনভাবে সুখী করা সঙ্গত হবে না, যাতে তারা আর শাসক হওয়ারই উপযুক্ত থাকতে না পারে। হ্যাঁ, যারা কৃষক তাদেরও আমরা রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত করতে পারি; তাদের মাথায় আমরা স্বর্ণমুকুট স্থাপন করতে পারি। সেইসঙ্গে তারা তাদের জমি যেমন ইচ্ছা চাষ করুক। পাত্র তৈরির কুম্ভকারকে আমরা আয়েশের গদিতে উপবিষ্ট করাতে পারি। অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে তারা একহাতে তাদের পাত্রতৈরির চক্রকে ধারণ করে অপর হাতে সুরাপাত্র গ্রহণ করতে পারে। এমনিভাবে রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীকে সুখী করতে পারি এবং তুমি যেরূপ চাচ্ছ সেরূপে সকলকে সুখী করে সমগ্র রাষ্ট্রকে সুখী করে গঠন করতে পারি। কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, এমন ধারণাটি তুমি আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকিয়ে দিও না, এই আমার অনুরোধ। কারণ এরূপ ধারণার ভিত্তিতে রাষ্ট্র সংগঠিত হলে আমাদের রাষ্ট্রে কৃষক কৃষক থাকবে না, কুম্ভকার কুম্ভকার থাকবে না। বস্তুত রাষ্ট্রের কোনো শ্রেণীরই নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য থাকবে না। অবশ্যই রাষ্ট্রের এই বিকার এবং সত্যকারভাবে যা নয় সেরূপ প্রতিভাত হওয়ার প্রবণতা যদি কেবল চর্মকার অর্থাৎ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা হলে আমাদের উদ্বেগের কারণ তত থাকে না। কিন্তু যেখানে বিধান এবং শাসনের যারা রক্ষক তারা মাত্র দৃশ্যত রক্ষক, যথার্থ রক্ষক নয় সেখানে রাষ্ট্রের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ রাষ্ট্রের শান্তি এবং শৃঙ্খলা সৃষ্টি করার ক্ষমতা একমাত্র শাসকদের। আমরা চাই আমাদের রাষ্ট্রের শাসকগণ রাষ্ট্রের যথার্থ পরিত্রাতা হবে, রাষ্ট্রের ধ্বংসকারী হবে না। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষীয়গণ শাসককে ভাবছেন কোনো উৎসবে পানাহারে মত্ত কৃষক হিসাবে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব-সম্পাদনে নিযুক্ত নাগরিক হিসাবে নয়। এমন হলে আমাদের দুজনার দৃষ্টিভঙ্গি যে পৃথক, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের থেকে যাদের ভিন্ন মত তারা এমন কিছুর কথা ভাবছে, যা রাষ্ট্র নয়। কাজেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে রাষ্ট্রের শাসক নিযুক্তিতে আমরা শাসকদের সর্বাধিক সুখের কথা নিয়ে উদ্বিগ্ন হব, না সুখকে

আমরা সমগ্র রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করব। এই দ্বিতীয় নীতি যদি আমাদের যথার্থ নীতি হয় তা হলে রাষ্ট্রের অভিভাবক বা শাসক, সহায়ক বা সৈন্যবাহিনী এবং অপর সকলেরই কর্তব্য হবে আপন-আপন দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে সাধন করা। এই নীতি অনুসরণে তাদের প্রভাবিত অথবা বাধ্য করা হবে। এই নীতির ভিত্তিতেই সমগ্র রাষ্ট্র একটি মহৎ শৃঙ্খলার মধ্যে গড়ে উঠবে এবং প্রকৃতির অনুপাত অনুযায়ী সকল শ্রেণী আপন-আপন সুখলাভে সক্ষম হবে।

সক্রেটিস, তোমার অভিমত সঠিক বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস আর একটি কথা আছে। আমি জানিনে তার সঙ্গে তুমি একমত হবে কি না।

তুমি কী কথা বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

শিল্পের অবনতির দুটি কারণ আছে বলে আমার মনে হয়।

কী সে-কারণ দুটি?

আমি বললাম ঃ সম্পদ এবং দারিদ্র্য।

কেমন করে এরা কার্যকর হয়?

এদের প্রভাবের ধারাটি এরূপ ঃ যখন একজন কুম্ভকার ধনবান হয়, তুমি কি মনে কর, তখন সে আর পূর্বের ন্যায় তার শিল্পের প্রতি যত্নবান হয়?

না, নিশ্চয়ই সে পূর্বের ন্যায় তার শিল্পের প্রতি আর যত্নবান হয় না। সে ক্রমান্বয়ে অলস এবং অসতর্ক হয়ে ওঠে।

ঠিক কথা।

তার ফলে সে কুম্ভকার হিসাবে পূর্বের চেয়ে নিকৃষ্ট কুম্ভকারে পরিণত হবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, এর ফলে তার বেশ অবনতি ঘটবে।

অপর পক্ষে যদি তার অর্থ না থাকে, যদি প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবস্থা করার কোনো সঙ্গতি তার না থাকে তা হলেও তার পক্ষে উত্তমরূপে কাজ করা, কিংবা তার সন্তানদের কিংবা তার অধীনস্থ অপর শিক্ষানবিশদের উপযুক্তরূপে তার শিল্পে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হবে না।

না, তার পক্ষে উত্তমরূপে কাজ করা সম্ভব হবে না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে সম্পদ কিংবা দারিদ্র্য—উভয়ের প্রভাবে শিল্পী এবং তার শিল্প, কারিগর এবং তার কর্ম—দুএরই অবনতি ঘটতে পারে। ঠিক নয় কি?

এ তো স্পষ্ট, সক্রেটিস।

তা হলে এখানে আমরা এক নতুন রোগের সন্ধান পাচ্ছি। এ-রোগের বিরুদ্ধে আমাদের শাসকদের সতর্ক থাকতে হবে। না হলে অ-দৃষ্টভাবে আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে এ-রোগের অনুপ্রবেশ ঘটে যাবে।

রোগ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ আমি সম্পদ এবং দারিদ্র্যের কথা বলছি। এর একটি বিলাস এবং আলস্যের, অপরটি নীচতা এবং ক্রূরতার জনক। এবং উভয়ই হচ্ছে অসন্তোষের উৎস।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস। কিন্তু আমি জানতে চাচ্ছি আমাদের রাষ্ট্রকে যদি আমরা যুদ্ধের সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত রাখি তা হলে কোনো ধনবান এবং পরাক্রমশালী শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের রাষ্ট্র যুদ্ধের ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে কোন্ শক্তির ভিত্তিতে?

এ-শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অসুবিধার কথা আমি অস্বীকার করিনে। কিন্তু একের বদলে তারা দুজনে হলে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ কেমন করে?

আমি বললাম ঃ প্রথমত আমাদের যদি যুদ্ধ করতে হয় তা হলে আমাদের পক্ষ যেখানে গঠিত হবে দক্ষ যোদ্ধাদের দ্বারা—সেখানে আমাদের প্রতিপক্ষের বাহিনী হবে সম্পদের সৈন্যবাহিনী।

একথা ঠিক।

তা-ই যদি হয় এ্যাডিম্যান্টাস, তা হলে তুমি কি মনে কর না একজন দক্ষ শিক্ষিত মুষ্টিযোদ্ধার পক্ষে তার প্রতিপক্ষীয় দুজন সম্পদবান অ-মুষ্টিযোদ্ধাকে সহজে পরাভূত করা সম্ভব?

দুজন যদি একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে আমাদের যোদ্ধার পক্ষে তত সহজ হবে না।

আমি বললাম ঃ কিন্তু মনে করো আমাদের যোদ্ধা প্রথমে দৌড়ে পালাল এবং তার পরে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রতিপক্ষের সম্মুখবর্তীকে আঘাত করল, তা হলে? এবং মনে করো সূর্যের খরতাপের মধ্যে আমাদের যোদ্ধা তার প্রতিপক্ষীয়কে এমনিভাবে বেশ কয়েকবার আঘাত করল। তখন দক্ষ যোদ্ধা হিসাবে তার পক্ষে বিপুলকায় প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূপাতিত করা কি তেমন কষ্টকর হবে?

না, এমন হলে তার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করা মোটেই বিস্ময়কর কিছু হবে না।

অথচ যারা ধনবান তারা সামরিক কলাকৌশলের চেয়ে মুষ্টিযুদ্ধের কলাকৌশলে অধিক দক্ষ হবে, এটাই তো স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, তাদের মুষ্টিযুদ্ধে দক্ষ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

তা হলে আমরা ধরে নিতে পারি যে, আমাদের মুষ্টিযোদ্ধা বা ক্রীড়াবিদগণ তাদের সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ কিংবা তিনগুণ অধিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গেও লড়াইয়ে পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হবে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন : তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস। তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তা ছাড়া যুদ্ধের পূর্বে আর-একটা কাজ করা যেতে পারে। মনে কর আমাদের নাগরিকদের তরফ থেকে শত্রুপক্ষীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটির কাছে দূত পাঠিয়ে আমরা সত্য কথা বললাম। আমরা বললাম : আমাদের রাষ্ট্রে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের কোনো সম্পদ নেই। স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহের বিধান আমাদের নয়। কিন্তু ধনসংগ্রহের বিধান তোমাদের আছে। এসো, তোমরা এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করো। আমাদের সাহায্য করো। তা হলে আমাদের শত্রুপক্ষের সমস্ত ধনসম্পদ তোমরা লাভ করতে পারবে। এমন প্রস্তাব শোনার পরে এই রাষ্ট্র নিশ্চয়ই আমাদের সম্পদহীন কিন্তু দক্ষ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বদলে এই যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে মেদবহুল তাজা মেষবৎ অপর রাষ্ট্রের যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই অধিক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে।

হ্যাঁ, এমন প্রস্তাবের পর আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ করতে না চাওয়াই সম্ভব। কিন্তু সক্রেটিস, সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তা হলে সে-ঐক্য সম্পদহীন আমাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি তো বেশ সহজে এই রাষ্ট্রগুলির এক-একটিকে 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করছ!

তোমার আপত্তি কী কারণে, সক্রেটিস?

কারণ, আমাদের রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোনো রাষ্ট্রকেই 'রাষ্ট্র' বলা চলে না। তুমি এদের কাউকে 'একটি রাষ্ট্র' না বলে 'একাধিক রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করতে পার। কারণ এদের কোনো একটি নগররাষ্ট্রই একটিমাত্র নগর নয়। তাদের প্রত্যেকটি বহু নগরে বিভক্ত। বস্তুত যে-কোনো নগররাষ্ট্রকে ধর-না কেন, সে যত ক্ষুদ্র হোক তবু সে নিজের মধ্যেই বিভক্ত। একদিকে সে দরিদ্রের নগর, আর একদিকে সে সম্পদবানদের নগর। একই নগরের মধ্যে এই দুই নগর : দারিদ্র্যের এবং সম্পদের নগর নিয়ত যুদ্ধমান। আর এই যুদ্ধমান পক্ষদ্বয়ের

অভ্যন্তরে ক্ষুদ্রতর আরও অনেক বিভাগের অস্তিত্ব বিদ্যমান। কাজেই তুমি যদি এদের কাউকে একটিমাত্র রাষ্ট্র বলে অভিহিত কর তা হলে সে-আখ্যা সত্যের নির্দেশক হবে না। অপরদিকে তুমি যদি এদের যে-কোনো রাষ্ট্রকে একের বদলে একাধিক বলে গণ্য কর এবং অভ্যন্তরের বিবদমান পক্ষসমূহের কোনো একটি পক্ষের সম্পদ, শক্তি ও সংখ্যাকে অপর পক্ষকে দিয়ে দেবার নীতি অনুসরণ কর তা হলে সে-রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে তোমার মিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমার শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পাবে। অপরদিকে যে-উত্তম বিধানের ভিত্তিতে আমরা আমাদের রাষ্ট্র গঠন করেছি সেই বিধানের ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্র সকল রাষ্ট্রের সেরা রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সুনাম কিংবা বহির্দৃশ্যে সে সেরা হবে, এমন কথা আমি বলেছিনে। আমাদের রাষ্ট্রের যদি সহস্রের অধিক রক্ষাকারী নাও থাকে তবু সে সেরা হবে তার কর্মগুণে এবং সত্যের কারণে। গ্রীক কিংবা বর্বর কারুর মধ্যে এরূপ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের সাক্ষাৎ তুমি কোথাও পাবে না। হতে পারে এ-সমস্ত রাষ্ট্র আকারে আমাদের রাষ্ট্রের সমান কিংবা বহুগুণ বৃহত্তর, কিন্তু তথাপি ঐক্যের ভিত্তিতে শক্তিশালী আমাদের রাষ্ট্রের সমকক্ষ তারা নয়। এ-বিষয়ে তোমার কী মত?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমার কথা খুবই যথার্থ, সক্রেটিস।

এবার তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের আকারের কথাটি ধরো। আকার এবং ভূখণ্ডের পরিমাণের ক্ষেত্রে আমাদের শাসকগণ রাষ্ট্রের সীমা কিরূপে নির্ধারণ করবে? কী পরিমাণ ভূখণ্ড আমাদের রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কোন্ পরিমাণকে অতিক্রম করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে না?

এ ক্ষেত্রে কোন্ সীমাকে তুমি উপযুক্ত মনে কর, সক্রেটিস?

আমি বলব, আমাদের রাষ্ট্রের ঐক্যের পরিপোষক যতখানি, আমাদের রাষ্ট্রের সীমা ততখানি হবে। তার অধিক নয়। এই সীমাকেই আমি সঠিক সীমা মনে করি।

উত্তম প্রস্তাব।

এখানে তা হলে আর-একটা বিধানের প্রশ্ন আসে। আমাদের শাসকবর্গের জন্য তা হলে এই বিধান নির্দিষ্ট হবে ঃ আমাদের রাষ্ট্র বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র হবে না; আমাদের রাষ্ট্র হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমাদের শাসকদের জন্য এ-বিধান নিশ্চয়ই কোন কঠিন বিধান নয়।

আমি বললাম ঃ তা যদি হয় তা হলে অপর যে-বিধানের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সে-বিধান অধিকতর সহজ। শাসকের সন্তান যদি অধঃগুণের হয় তা হলে তাকে অধঃস্তরে স্থাপন এবং যদি অধঃশ্রেণীর সন্তানের মধ্যে উত্তমগুণের সাক্ষাৎ মেলে তা হলে তাকে উচ্চতর শ্রেণীতে স্থাপন করার দায়িত্বের কথা বলছি। এ নীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে প্রত্যেককে প্রকৃতিদত্ত গুণের ভিত্তিতে যার যে স্থান তাকে সেই স্থানে স্থাপন করা। এবং একজন নাগরিককে একটি দায়িত্বে নিযুক্ত করা। কারণ তা হলেই প্রত্যেকে আপন দায়িত্বপালনে সক্ষম হবে। তখন এক ব্যক্তি একজন ব্যক্তি হিসাবেই বিবেচিত হবে, বহু নয়। আমাদের রাষ্ট্রও তখন যথার্থভাবে একটি রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করবে, একাধিক রাষ্ট্রে সে বিভক্ত হবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, এ-নীতিও তেমন শক্ত কোনো নীতি নয়।

প্রিয় এ্যাডিম্যান্টাস, যেসব নীতির কথা আমরা বলছি এগুলি বিরাট নীতি নয় ঠিকই। এগুলিকে আমরা একটি নীতিরই অংশ বলতে পারি। সে-নীতি বৃহৎ না হতে পারে, কিন্তু সে-নীতি আমাদের জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত।

কোন্ নীতির অংশ বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ আমাদের নীতি হচ্ছে, শিক্ষা এবং প্রতিপালনের নীতি। কারণ, আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যদি যথার্থরূপে শিক্ষিত হয় এবং বুদ্ধিমান মানুষরূপে তারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা হলে এই সমস্ত প্রয়োজনের কথা এবং বিবাহ কিংবা নারীর উপর স্বামিত্ব এবং সন্তানের উৎপাদন প্রভৃতি যেসব বিষয়ের আমরা এখানে উল্লেখ করছিনে, সকল দ্রব্যের উপর বন্ধুজনের যৌথ-স্বত্বের নীতির যা অনুসিদ্ধান্ত, সে সব বিষয়ও তাদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ হবে।

হ্যাঁ, এ সব সমস্যার সমাধানের সেটাই হচ্ছে সর্বোত্তম উপায়।

তা ছাড়া রাষ্ট্রটাকে তুমি যদি উত্তমরূপে একবার চালু করে দিতে পার তা হলে আপন গতির শক্তিতে নিজের চাকার ওপর ভর করে সে তার পরে আপনিই চলতে থাকবে। কারণ উত্তম শিক্ষা এবং প্রতিপালন মানুষের মধ্যে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। আবার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উত্তম শিক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়মূল হয়ে ক্রমান্বয়ে অধিকতর উন্নত হয়ে ওঠে। চরিত্রের উন্নতি বংশধারাকেও উন্নত করে তোলে। একথা অপরাপর পশুর ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এমন হওয়া খুবই সম্ভব।

এবার আমরা তা হলে সারসংক্ষেপ হিসাবে বলতে পারি ঃ আমাদের রাষ্ট্রের শাসকদের দৃষ্টি সর্বোপরি নিবদ্ধ থাকবে এই লক্ষ্যে যেন সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার কোনো বিকৃতি ঘটতে না পারে, যেন এদের বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় এবং কোনো নূতন উদ্ভাবনের প্রশ্রয় না ঘটে। শাসকগণ সর্বতোভাবে সঙ্গীত ও শরীরচর্চার বিশুদ্ধ রীতিকে রক্ষা করবে। যদি কেউ হোমারকে উদ্ধৃত করে বলে ঃ 'গায়কদের কণ্ঠে সবচেয়ে নূতন সঙ্গীতই সর্বাধিক যত্নের সঙ্গে গীত হয়'[১] তা হলে শাসকদের মনে করতে হবে তার এই প্রশংসা কোনো নূতন সঙ্গীতের নয়, এ-প্রশংসা নূতন ধরনের কোনো সঙ্গীতের। কিন্তু কবির বাক্যে নূতন ধরনের কোনো সঙ্গীতের প্রশংসা আরোপ করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে না। কারণ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবন সমগ্র রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। আর তাই তেমন উদ্ভাবনকে নিষিদ্ধ করতে হবে। দামনের বাণীতে আমি এই শিক্ষাই লাভ করেছি। দামন বলেছেন ঃ সঙ্গীতের নীতি যখন পরিবর্তিত হয় তখন অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক বিধানসমূহও তৎসঙ্গে পরিবর্তিত হয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ ঠিক কথা সক্রেটিস। এ-বিষয়ে দামনের পক্ষে তোমার যেমন সমর্থন, আমারও তেমনি।

আমি বললাম ঃ তা হলে আমাদের শাসকবৃন্দকে সঙ্গীতের মধ্যেই তাদের দুর্গের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে?

হ্যাঁ, সক্রেটিস। কারণ, যে-অরাজকতার কথা তুমি বলেছ তা সহজে এবং সঙ্গোপনেই অনুপ্রবেশ করে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, প্রথমে মনে হয় এতে ক্ষতি কী? কিন্তু ক্রমান্বয়ে অল্প করে উচ্ছৃঙ্খলতার এই মনোভাব সঙ্গোপনে আমাদের আচরণে এবং রীতিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখান থেকে এই উচ্ছৃঙ্খলতা অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করে মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রকে আক্রমণ করে। সম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে এই অরাজকতা দুর্বারভাবে রাষ্ট্রের বিধান এবং সংগঠনে বিস্তারিত হয়ে পরিশেষে ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় সকল অধিকারকে ধ্বংস করে ফেলে।

আমি বললাম ঃ এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার এ কথা সত্য?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমার তা-ই বিশ্বাস, সক্রেটিস।

---

১. হোমার ঃ ওডিসি

তা হলে আমি যেমন বলছিলাম, আমাদের যুবকদের গোড়া থেকেই কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কারণ আমোদ-প্রমোদ যদি উদ্দাম হয়ে ওঠে এবং যুবকরা যদি উচ্ছৃঙ্খল হয় তা হলে তাদের পক্ষে সুশৃঙ্খল এবং ন্যায়পরায়ণ নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠা কখনোই সম্ভব হবে না।

তোমার কথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

আর আমাদের যুবকগণ যদি তাদের আমোদ-প্রমোদও সুন্দরভাবে শুরু করতে পারে এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে নিয়মকে যদি তারা তাদের জীবনের আচরণে পরিণত করতে সক্ষম হয় তা হলে সব কর্ম এবং বুদ্ধিতেই এই শৃঙ্খলাবোধ তাদের নিত্যসঙ্গী হিসাবে বিরাজ করবে। ফলে রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও কোনো অপূর্ণতা থাকলে তাকে পূর্ণ করে তুলতেও তারা সক্ষম হবে।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

এরূপে শিক্ষিত হয়ে উঠলে তাদের পূর্ববর্তীগণ যদি কোনো অপ্রধান বিধান প্রবর্তন নাও করে থাকে তবু তাকে প্রবর্তন করতে তরুণদের কোনো অসুবিধা হবে না।

তোমার এ কথার কী অর্থ, সক্রেটিস?

বিধান বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি, ছোটরা বড়দের সামনে কখন্ নীরব থাকবে, বয়োজ্যেষ্ঠরা এলে কেমন করে ছোটরা দাঁড়িয়ে তাদের সম্মান দেখাবে এবং তাদের উপবেশনে সাহায্য করবে, পিতামাতাকে কীরূপে সম্মান করতে হবে, পরিধানের পরিচ্ছদ কিংবা পাদুকা কেমন হবে, কেশবিন্যাসের ধরন কীরূপ হবে ঃ অর্থাৎ তরুণদের সাধারণ আচার-আচরণ কীরূপ হবে তার বিধান। এ-বিষয়ে তুমি কি আমার সঙ্গে একমত, এ্যাডিম্যান্টাস?

হ্যাঁ সক্রেটিস, আমি তোমার সঙ্গে একমত।

কিন্তু এসবের উপর আইন-প্রণয়নের খুব প্রয়োজন পড়ে না। তা ছাড়া এর উপর লিখিত কোনো বিধান যে খুব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এমনও আমার মনে হয় না।

না, এর ওপর বিধান প্রণয়ন অসম্ভব।

এ্যাডিম্যান্টাস, আমার মনে হয়, শিক্ষা মানুষের জীবনকে কীভাবে শুরু করে দেয় তার উপরই তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। কেননা সদৃশ কি সর্বদা সদৃশকে আকর্ষণ করে না?

নিঃসন্দেহে।

এটা একটা পরিক্রমার ব্যাপার। একটা পরিণতিতে না পৌঁছা পর্যন্ত এ অগ্রসর হতে থাকে। পরিণতি অবশ্য উত্তম কিংবা তার বিপরীতও হতে পারে।

হ্যাঁ, একে অস্বীকার করার কারণ নেই।

আর এ-কারণে এসব খুঁটিনাটির ক্ষেত্রে অধিক আর কোনো বিধান আমি নির্দিষ্ট করতে চাইনে।

তা-ই সঙ্গত।

কিন্তু বিকিকিনির স্থানের ব্যাপারে, মানুষে মানুষে সাধারণ আদান-প্রদান কিংবা কারিগরদের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে, কারুর অপমান এবং আঘাত অথবা কোনো কাজ শুরু করা অথবা বিচারকমণ্ডলীর সভ্য নিয়োগের প্রশ্নে তুমি কী বলবে? বাজারে কর আরোপ এবং আদায় করা, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ নিযুক্ত করা, বন্দরের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্যও তো আইন-প্রণয়নের প্রশ্ন আছে। কাজেই আমরা কী করব? এই সমস্ত বিষয়ে কি আমরা আইন-প্রণয়ন করব?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমার মনে হয় উত্তম মানুষের জন্য এসব বিষয়ে কোনো আইন-প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। এসব বিষয়ে যে-সমস্ত নীতির আবশ্যক হবে তা তারা নিজেরাই নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

নিশ্চয়ই, প্রিয় এ্যাডিম্যান্টাস। কেবল বিধাতা যদি আমাদের মূল বিধানগুলি মান্য করার সুমতি তাদের দেন।

তা তো বটেই। বিধাতার সহায়তা ব্যতীত তারা তাদের জীবনকে ক্রুটিশূন্য করার আশায়, চিরকাল কেবল আইন-প্রণয়ন এবং আইন-সংশোধনই করতে থাকবে।

তুমি এদের সেই অক্ষমদের সঙ্গে তুলনা করতে পার যারা আত্মসংযমের অভাবে উচ্ছৃঙ্খলতাকে পরিত্যাগ করতে সক্ষম হয় না।

খুবই সত্য কথা।

হ্যাঁ, কিন্তু কী অদ্ভুত আনন্দের জীবন তারা যাপন করছে দ্যাখো। তারা কেবল নিরাময়ের কথা ভাবছে, কেবল চিকিৎসাপ্রণালীর পরিবর্তন করছে এবং কেবল তাদের রোগসমূহের জটিলতা বৃদ্ধি করছে। পরিণামে তাদের রোগ-নিরাময়ের আশ্বাস দিয়ে যে-কেউ যে-কোনো টোটকার সন্ধান দিক-না কেন তাকেই তারা বিশ্বাস করে।

রোগে অক্ষম ব্যক্তিদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

হ্যাঁ, আর মজার ব্যাপার হল কেউ যদি তাদের সত্য কথা বলে, যদি বলে যে তাদের পানাহারের অসংযম, যুবতীর-আসক্তি এবং আলস্যে সময়ক্ষেপণের

স্বভাব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পরিত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঔষধ, তপ্ত লোহার দহন, মন্ত্র বা মাদুলি—কোনোকিছুই তাদের কোনো উপকারসাধন করতে পারবে না, তখন তাকেই তারা তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু বলে বিবেচনা করে।

অদ্ভুত তাদের আচরণ। যে তোমাকে সত্য বলছে তার ওপর ক্ষিপ্ত হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, আমি বুঝিনে।

যা-ই হোক, এমতো ভদ্রলোকদের তোমার নিশ্চয় পছন্দ নয়?

অবশ্যই নয়।

শুধু ব্যক্তি নয়, যে-রাষ্ট্র এরূপ মানুষের ন্যায় আচরণ করে তাকেও নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা করবে না। অথচ এরূপ রাষ্ট্রের তো অভাব নেই যেখানে নিয়ম-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব নেই, কিন্তু চরমদণ্ডের হুমকি দিয়ে সেখানে সংবিধানের সব সংশোধন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তথাপি যারা এই রাষ্ট্রের রাজত্বে বাসকারীকে স্তোকবাক্যে তুষ্ট করে, তোষামোদে তাদের মন জয় করার চেষ্টা করে এবং তাদের খেয়ালখুশিকে চরিতার্থ করে তাদেরই বিরাট রাজনীতিজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়। যেরূপ মানুষের বিবরণ আমি একটু পূর্বে দিয়েছি তার সঙ্গে কি এই রাষ্ট্রের সাদৃশ্য নেই?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ অবশ্যই আছে। আর সেই মানুষ যেমন অধম, এই রাষ্ট্রও তেমনি অধম। এমন রাষ্ট্রকে আমি আদৌ প্রশংসা করতে পারিনে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক-দুর্নীতি পরিপোষকদের প্রশান্তভাব এবং দক্ষতাকে নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা না করে পারবে না।

হ্যাঁ, তাদের দক্ষতার প্রশংসা করতে হয় বটে। তবে তাদের সকলের প্রশংসা করা চলে না। কারণ এদের মধ্যে অনেকে আছে যারা জনতার হর্ষধ্বনিতে মূর্খের ন্যায় বিশ্বাস করে যে, তারা সত্যই রাজনীতিজ্ঞ। এমন লোকের বুদ্ধির প্রশংসা করা চলে না।

কেন এ্যাডিম্যান্টাস? এমন লোকের জন্য তো তোমার করুণা হওয়া উচিত। যে-মানুষ নিজে পরিমাপ করতে জানে না এবং তার যে-পারিষদগণও নিজেরা পরিমাপ করতে পারে না, তারা যখন তাকে বলে যে সে চার হাত উঁচু তখন তার বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় কী?

না, এমন ক্ষেত্রে তার বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় থাকে না।

তা হলে এমন লোকের ওপর আমাদের ক্রোধান্বিত হওয়া সঙ্গত নয়। এরা আনাড়ি বই আর কিছু নয়। কারণ এরা তুচ্ছ সংস্কার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

তাদের কল্পনা, আইন করেই তারা চুক্তির প্রতারণা কিংবা মানুষের অন্য সব শঠতাকে নির্মূল করতে পারবে। অথচ তারা জানে না, এ তাদের বৃথা চেষ্টা। বহুশিরবিশিষ্ট রাক্ষসের মাথায় আঘাত করা ব্যতীত এ কিছুই নয়।

হ্যাঁ, তাদের এ-চেষ্টাকে সেরূপ মনে হয়।

আমার মনে হয়, যে যথার্থ আইন প্রণয়নকারী সে অধম কিংবা উত্তম কোনো রাষ্ট্রেই এরূপ আইনের প্রণয়ন কিংবা সংবিধান পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না। কারণ অধম রাষ্ট্রে এরূপ চেষ্টা অর্থহীন এবং উত্তম রাষ্ট্রে এরূপ আইন-প্রণয়ন অপ্রয়োজনীয়। এবং এ-আইনের অনেকগুলি আমাদের মূল বিধান থেকে স্বাভাবিকভাবেই বেরিয়ে আসবে।

তা-ই যদি হয়, সক্রেটিস, তা হলে আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের আর কী করণীয় থাকবে?

আমি উত্তর দিলাম ঃ আমাদের আর করণীয় কিছুই নেই। কিন্তু ডেলফীর দেবতা এবং এ্যাপোলোর করণীয় আছে। তাঁদের এবার সবচেয়ে বৃহৎ, সবচেয়ে মহৎ এবং সবচেয়ে প্রধান কাজ সম্পাদন করতে হবে।

কী সে-কাজ?

তাঁদের কাজ হচ্ছে মন্দির-স্থাপনা, মন্দির-দেবতাদের উদ্দেশে বলিদান, দেবতা, উপদেবতা এবং প্রধান দেবতাদের উপঢৌকনের ব্যবস্থা করা। তা ছাড়া মৃতদের কোথায় সমাহিত করা হবে এবং মৃতের মঙ্গলের জন্য পাতালপুরীর অধিবাসীদের তুষ্টি সাধন কেমন করে করতে হবে, এসবও দেবতাদের স্থির করে দিতে হবে। এ-সমস্ত বিষয়ে আমরা নিজেরা অজ্ঞ। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমাদের পৈতৃক দেবতা ব্যতীত অপর কোনো ব্যাখ্যাদাতার হাতে এসব ব্যাপার ছেড়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে বিজ্ঞের কাজ হবে না। এ-সমস্ত জটিল বিষয়ে একমাত্র ব্যাখ্যাদাতা হচ্ছেন এ্যাপোলো। তিনি মর্ত্যের কেন্দ্রভূমিতে স্থাপিত তাঁর আসন থেকে এ-সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করে থাকেন।

এ বিষয়ে তোমার কথাই ঠিক, সক্রেটিস। এক্ষেত্রে তুমি যেমন প্রস্তাব করছ তেমনই করা হবে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, এ্যারিস্টন-পুত্র প্রিয় এ্যাডিম্যান্টাস, এসবের মধ্যে ন্যায় কোথায়? আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। সে এখন অধিবাসী অধ্যুষিত। এ্যাডিম্যান্টাস, এবার তোমার ভ্রাতাকে এবং পলিমারকাসকে এবং অপর সকলকে আহ্বান করো। এসো, আমরা একটি মোমদণ্ড প্রজ্জ্বলিত করি এবং আমাদের রাষ্ট্রে ন্যায়ের অন্বেষণ আরম্ভ করি। আমাদের অনুসন্ধান করে বার

করতে হবে, কোথায় ন্যায় এবং কোথায় অন্যায়। আমাদের স্থির করতে হবে এ দুই-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

গ্লকন বলে উঠলেন ঃ একী কথা সক্রেটিস? ন্যায়ের অন্বেষণ তুমি নিজে করবে। তুমি তো আমাদের সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলে। তুমি বলেছিলে ন্যায়কে সাহায্য না করা তোমার পক্ষে পাপের বাড়া হবে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমি সেকথা অস্বীকার করছিনে, গ্লকন। আমি অবশ্যই আমার প্রতিশ্রুতি পালন করব। কিন্তু তোমাদের সকলকেও আমার সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, আমরা তাতে সম্মত আছি।

এসো, তা হলে আমরা সন্ধানের কাজটি শুরু করি। আমাদের সন্ধানের পথটি হবে এরূপ ঃ আমরা ধরে নেব আমাদের রাষ্ট্র যদি সঠিকভাবে সংগঠিত হয়ে থাকে তবে সে সুসম্পূর্ণ, সে সর্বোত্তম।

নিঃসন্দেহে।

এবং যেহেতু সে ত্রুটিশূন্য, সর্বোত্তম কাজেই সে প্রাজ্ঞ, সে নির্ভীক, সে সংযমী এবং সে ন্যায়বান।

সে-সম্পর্কেও কোনো সন্দেহ নেই।

এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এ-গুণগুলির কয়েকটিকে যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি তবে অবশিষ্টকেই আমরা আমাদের অন্বিষ্ট বলে গণ্য করব।

খুব ভালো কথা, সক্রেটিস। তারপর?

ধরো চারটি জিনিস আছে। আমরা এদের একটিকে অন্বেষণ করে বার করতে চাই। এক্ষেত্রে হতে পারে যে, আমার অন্বিষ্ট বস্তুটিকে আমি পূর্ব থেকেই চিনি। তেমন হলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। অথবা এমন হতে পারে, আমি তিনটিকে চিনি কিন্তু অন্বেষিত বস্তুটিকে নয়। তা হলে তিনটি নির্দিষ্ট হবার পরে যেটি অবশিষ্ট থাকবে সেটিই আমার অন্বেষিত বস্তু হবে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক।

তা-ই যদি হয় তা হলে গুণ বা ধর্মের ক্ষেত্রেও আমাদের অন্বেষণের পদ্ধতিটি কি একই হবে না? এবং এক্ষেত্রেও যখন গুণের সংখ্যা চার?

হ্যাঁ, স্পষ্টতই একই পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করব।

রাষ্ট্রের গুণের মধ্যে প্রথমে আমাদের নজরে পড়ে জ্ঞান। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

কী বৈশিষ্ট্য?

বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে এই যে, আমাদের বর্ণিত রাষ্ট্র যথার্থই জ্ঞানী। কারণ আমাদের রাষ্ট্রের বিবেচনা উত্তম।

খুবই সত্য কথা।

কারণ, উত্তম বিবেচনা অজ্ঞানতা থেকে নয়, কেবল জ্ঞান থেকেই উদ্ভূত হতে পারে। মানুষ জ্ঞানের ভিত্তিতে উত্তম বিবেচক হয়।

স্পষ্টত তা-ই।

কিন্তু রাষ্ট্রে জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে। জ্ঞান বহু প্রকারের হতে পারে।

অবশ্যই।

যেমন সূত্রধরের জ্ঞান। কিন্তু এ-জ্ঞানের ভিত্তিতে কি আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে জ্ঞানী এবং সুবিবেচক বলে অভিহিত করতে পারি?

না, এ-জ্ঞানের জন্য রাষ্ট্রকে আমরা জ্ঞানী বলতে পারিনে। এ-জ্ঞান রাষ্ট্রকে আসবাবপত্রের নির্মাণে দক্ষতার সুনাম দান করতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী নয়।

তা হলে কাষ্ঠদ্রব্যাদি নির্মাণে সুবিবেচনা বা দক্ষতা থাকার কারণে আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে জ্ঞানী বলতে পারিনে।

নিশ্চয়ই না।

কিংবা পিত্তল পাত্রাদি নির্মাণের দক্ষতা কিংবা অনুরূপ অপর কারণে আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে জ্ঞানী বলতে পারিনে।

না, এরূপ কোনো কারণে আমরা তাকে জ্ঞানী বলতে পারিনে।

কিংবা জমিকর্ষণের দক্ষতার কারণেও পারিনে। সেক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্র কৃষিরাষ্ট্র বলে অভিহিত হবে।

হ্যাঁ, তা-ই।

তা-ই যদি হয়, তা হলে আমাদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের নাগরিকদের কারুর মধ্যে এমন কোনো জ্ঞানের সাক্ষাৎ কি আমরা পাই, যে-জ্ঞান বা দক্ষতা কোনো বিশিষ্ট বিষয়ে নয়, সমগ্র রাষ্ট্রের ব্যাপারে, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়ে এবং তার অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে?

এমন জ্ঞান নিশ্চয়ই আছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কী সে জ্ঞান গ্লকন এবং কার মধ্যে আমরা তার সাক্ষাৎ পেতে পারি?

গ্লকন বললেন : সে-জ্ঞান হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবক বা শাসকদের জ্ঞান এবং এর সাক্ষাৎ সর্বোত্তম শাসকদের মধ্যেই পেতে পারি। যাদের বিষয়ে আমরা একটু পূর্বে আলোচনা করছিলাম।

এবং এই জ্ঞানের কারণে আমাদের রাষ্ট্রকে আমরা কী বলে অভিহিত করতে পারি?

আমরা তাকে যথার্থ জ্ঞানী এবং সুবিবেচক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে কাদের সংখ্যা অধিক? যথার্থ শাসকদের কিংবা কর্মকারদের?

কর্মকারদের সংখ্যাই আবশ্য অনেক বেশি হবে।

জ্ঞানের প্রকারভেদের ভিত্তিতে যে-শ্রেণীভেদ সেখানে তা হলে শাসকদের শ্রেণী কি সংখ্যায় সবচেয়ে ক্ষুদ্র হবে না?

অবশ্যই সংখ্যায় তা সবচেয়ে ক্ষুদ্র হবে।

তা হলে রাষ্ট্রের এই অংশ বা ক্ষুদ্র শ্রেণীর জ্ঞানের কারণেই আমাদের রাষ্ট্র সামগ্রিকভাবে জ্ঞানী বলে অভিহিত হবে। কারণ, প্রকৃতির বিধানে সকল শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্রতম এই শ্রেণীর মধ্যেই মাত্র যথার্থ জ্ঞানের অবস্থান ঘটতে পারে।

খুবই সত্য কথা সক্রেটিস।

আমি বললাম : তা হলে আমাদের চারটি গুণের মধ্যে একটির অবস্থান এবং চরিত্র আমরা কোনোপ্রকারে আবিষ্কার করতে পেরেছি, একথা বলতে পারি?

সক্রেটিস, আমি তো বলব, কাজটি আমরা সন্তোষজনকভাবেই করেছি।

এবার আমরা সাহসিকতা বা বিক্রমের বিষয়টি আলোচনা করতে পারি। কিন্তু সাহসিকতা বা বিক্রমের চরিত্র কী এবং তার কোন্ অবস্থানের জন্য একটি রাষ্ট্র সাহসী বা বিক্রমশালী বলে অভিহিত হয় সেটি নির্ধারণ করা খুব কঠিন কিছু নয়।

কেমন করে কঠিন নয়, সক্রেটিস?

আমি বললাম : কেন গ্লকন, একটি রাষ্ট্র তো সাহসী কিংবা কাপুরুষ বলে অভিহিত হয় যারা সে রাষ্ট্রের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে যায় এবং লড়াই করে, তাদের কারণেই?

হ্যাঁ, একথা ঠিক। অপর কোনো কারণে একটি রাষ্ট্রকে এরূপ অভিহিত করা চলে না।

রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকগণও সাহসী কিংবা ভীরু হতে পারে কিন্তু তাদের সাহস কিংবা ভীরুতার কারণে রাষ্ট্র সাহসী কিংবা ভীরু বলে পরিচিত হবে না। ঠিক নয় কি?

না, তা নিশ্চয়ই হবে না।

তা হলে আমাদের নগরী সাহসী হচ্ছে তার নাগরিকদের সেই অংশের কারণে যে-অংশ রাষ্ট্রের শিক্ষার ভিত্তিতে সকল অবস্থার মধ্যেই তাদের সাহস এবং ভীরুতার জ্ঞানকে ধারণ করে। একেই তো আমরা সাহস বলি?

সক্রেটিস, তোমার কথাটি আর একবার বলো। কারণ আমার মনে হয় না তোমার কথাকে আমি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছি।

আমি বলছি : সাহস হচ্ছে কিছু ধারণ করা, কিছু রক্ষা করা।

কাকে ধারণ করা, সক্রেটিস?

ধারণ করা হচ্ছে, কাকে ভয় করতে হবে, কেন ভয় করতে হবে প্রভৃতি বিষয়ের যে-জ্ঞান রাষ্ট্র তার শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিককে দান করেছে সেই জ্ঞানকে ধারণ করা এবং তাকে পরিত্যাগ না করা। 'সকল অবস্থার মধ্যে' কথাটি দ্বারা আমি সকল ভয়-ভীতি, আনন্দ, আকর্ষণ ও যন্ত্রণা-নির্বিশেষে সেই জ্ঞানকে বিস্মৃত না হওয়াকে বোঝাতে চেয়েছি। তোমাকে একটি দৃষ্টান্ত দিই, গ্লকন?

দাও।

তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ, যে রং করে অর্থাৎ যে রঞ্জক সে যখন পশমকে সমুদ্রের নীল-লোহিতে রঞ্জিত করতে চায় তখন তার রং-নির্বাচন শুরু হয় সাদা থেকে। এই সাদার পটভূমিটি সে যথেষ্ট যত্ন এবং পরিশ্রমসহকারে তৈরি করে যেন সাদা ভূমিতে নীল-লোহিতটি উত্তমভাবে খোলে। এই প্রস্তুতির পরে রং করার কাজটি অগ্রসর হয়। এই পদ্ধতিতে তুমি যে-কোনোকিছুই রং কর-না কেন, তোমার রং স্থায়ী। এর পর একে ক্ষারের পানি কিংবা ক্ষারশূন্য পানি—যার মধ্যেই ধোও-না কেন রঙের সৌন্দর্যটি বিনষ্ট হবে না। কিন্তু ভূমিকাটি যদি উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করা না হয়, তা হলে নিশ্চয়ই দেখেছ, নীললোহিত কিংবা অপর কোনো রংই খোলে না। রং কেমন নিষ্প্রভ দেখায়। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক। আমি জানি, এরূপ হলে রংগুলোকে কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া এবং অদ্ভুত বলে মনে হয়।

আমি বললাম : গ্লকন, এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের রাষ্ট্রে সৈন্যদের বাছাই করা এবং তাদের সঙ্গীত ও শরীরচর্চায় শিক্ষিত করার উদ্দেশ্য

আমাদের কী ছিল। আমরা একটি পটভূমি প্রস্তুত করছিলাম যার উপর আমাদের রাষ্ট্রীয় বিধানের রং উজ্জ্বলভাবে খুলবে। ভীতি কাকে বলে কিংবা এ-সম্পর্কিত অন্য ধারণার রংও এমন পাকা হয়ে যাবে যে কোনো সোডা বা ক্ষারের চেয়ে ধুয়ে ফেলার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্দাম আনন্দরূপ ক্ষারে কিংবা দুঃখ. ভীতি বাসনারূপ সবচেয়ে ক্ষমতাশালী দ্রাবক রসে নিমজ্জিত হলেও এ-অভিমতের রং মুছে যাবে না। আর এই যে প্রকৃত এবং অলীক বিপদ সম্পর্কে রাষ্ট্রের আইন অনুযায়ী যথার্থ অভিমতকে ধারণ করার ক্ষমতা—একেই আমি সাহস বলে অভিহিত করেছি। আমি জানিনে তুমি এর সঙ্গে একমত হবে কি না।

গ্লকন বললেন ঃ আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস। কারণ আমার মনে হয় 'সাহস' থেকে যাকে তুমি বাদ দিতে চাচ্ছ সে পশু কিংবা দাসের অজ্ঞান সাহস। তুমি মনে করছ, রাষ্ট্রের আইন এরূপ সাহসের পরিপোষক নয়। এ কারণে এ-সাহসের অপর কোনো নাম থাকা সঙ্গত?

অবশ্যই।

তা হলে তুমি যাকে সাহস বলছ, তাকেই আমাদের সাহস বলে অনুমোদন করতে হয়।

আমি বললাম ঃ তা বটে, তবে এর সঙ্গে 'একজন নাগরিকের' কথাটি যোগ করতে পার—অর্থাৎ 'একজন নাগরিকের সাহস'। তোমার এ-অনুমান খুব ভুল হবে না। পরবর্তীকালে তুমি চাইলে বিষয়টির অধিকতর আলোচনা করা যাবে। তবে এই মুহূর্তে যাকে আমরা অন্বেষণ করছি সে সাহস নয়। সে 'ন্যায়'। আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের দিক থেকে 'সাহস' সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে।

সক্রেটিস, এ-বিষয়ে তুমি ঠিকই বলেছ।

আমাদের রাষ্ট্রে এখনও দুটি গুণের নির্ধারণ বাকি আছে। একটি সংযম, অপরটি আমাদের অনুসন্ধানের শেষ লক্ষ্য ঃ ন্যায়।

যথার্থ।

কিন্তু সংযমের চিন্তা না করে আমরা কি ন্যায়কে আবিষ্কার করতে পারি?

গ্লকন বললেন ঃ আমি জানিনে সেটি করা সম্ভব কি না। তবে আমিও চাইনে যে ন্যায়ের আবিষ্কারে আমাদের দৃষ্টি সংযম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাক। আর সেজন্য আমার ইচ্ছা, সক্রেটিস, তুমি সংযমের আলোচনাটি প্রথমে সেরে নেবে।

নিশ্চয়ই, তোমার যখন তেমন ইচ্ছা, তখন তোমার অনুরোধকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে গ্লকন।

তা হলে আলোচনাটি শুরু করো।

হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। যতটা আমি বুঝতে পারি তাতে আমার মনে হয়, সংযমের মধ্যে ঐকতান এবং সঙ্গতির স্বভাব অপর গুণের চেয়ে অধিক।

কেমন করে সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ সংযম কাকে বলবে? বিশেষ কতগুলি আনন্দ এবং কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করাকে আমরা সংযম বলি। 'যার প্রভু সে'—এই কথাটির মধ্যেও সংযমের এই অর্থটি নিহিত আছে। ভাষার ব্যবহারেও আমরা এই ধারণার আভাস পাই।

একথা ঠিক।

'যার প্রভু সে অথবা যে যার প্রভু' এ কথার মধ্যে একটা অর্থের বৈপরীত্য আছে। কারণ যে প্রভু সে তো একই সময়ে অপর কারু সেবক বা দাসও বটে; এবং যে সেবক সে আবার কারুর প্রভু। কাজেই এখানে পরিচারক ও প্রভু বলতে একই ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে।

হ্যাঁ, একথাও ঠিক।

এরূপ কথার অর্থ আমার মনে হয় এই যে, মানুষের আত্মার দুটি ভাগ আছে ঃ একটি তার উত্তম ভাগ, অপরটি তার অধম ভাগ। আত্মার উত্তম ভাগ যখন তার অধম ভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে তখন আমরা কোনো মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য করি ঃ 'সে নিজেই তার প্রভু'। এরূপ মন্তব্য তার প্রশংসাসূচক। কিন্তু অসৎসঙ্গ এবং অসৎশিক্ষার কারণে মানুষের আত্মার ক্ষুদ্রতর অর্থাৎ তার উত্তম ভাগ যখন অধমের অধীনে চলে যায় তখন আমরা এমন ব্যক্তিকে নিজের দাস এবং নীতিহীন বলে আখ্যায়িত করি।

হ্যাঁ, এমন বলার যুক্তি আছে।

এবার আমাদের নব প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিই, তা হলে সেখানেও এই দুটি অবস্থার একটিকে বাস্তবায়িত হতে দেখি। কারণ 'সংযম' এবং 'নিজের প্রভু' এই কথা দ্বারা যখন অধমের উপর উত্তমের শাসন বোঝায় তখন আমাদের রাষ্ট্রকে 'নিজের প্রভু' বলে যথার্থই অভিহিত করা চলে।

হ্যাঁ, তুমি যা বলছ, তা সত্য।

তা ছাড়া দ্যাখো, আনন্দ, বেদনা, কামনা প্রভৃতি বিচিত্র এবং জটিল আবেগ প্রধানত দেখা যায় শিশু, নারী, ভৃত্য এবং নাগরিকদের মধ্যে অর্থাৎ যারা অধম এবং সংখ্যায় অধিক তাদের মধ্যে।

অবশ্যই।

কিন্তু যে-ইচ্ছা বা কামনা সরল, পরিমিত এবং যুক্তিনির্ভর এবং মন ও যথার্থ অভিমত যে-কামনার নিয়ন্ত্রক তেমন কামনা সংখ্যায় অল্প সেই নাগরিকদের মধ্যেই মাত্র দেখা যায়, যারা সুজাত এবং সুশিক্ষিত।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

সরল এবং পরিমিত—এই দুটি কামনার একটি ভূমিকা আমাদের রাষ্ট্রে আছে। কারণ অধিকের যে-কামনা অধম, তাকে রাষ্ট্রের সংখ্যাল্পের জ্ঞান এবং মহৎ কামনাই বশীভূত করে রাখে।

একথা ঠিক।

তা হলে কোনো রাষ্ট্রকে যদি তার আনন্দ এবং বাসনার বশকারী এবং নিজের প্রভু বলে আখ্যায়িত করা যায় তবে সে-আখ্যা আমাদের রাষ্ট্রেরই প্রাপ্য। নয় কি?

অবশ্যই।

এবং আমরা আমাদের রাষ্ট্রকে যথার্থভাবে সংযমী বলেও আখ্যায়িত করতে পারি।

হ্যাঁ, তা পারি।

তা ছাড়া আমাদের রাষ্ট্রই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে শাসক কে হবে এ-প্রশ্নে শাসক এবং শাসিত উভয়ই ঐকমত্য পোষণ করে।

হ্যাঁ, এ-বিষয়ে তারা ঐকমত্য পোষণ করে।

এ-বিষয়ে আমাদের নাগরিকগণ যখন ঐকমত্য পোষণ করে তখন সংযমকে আমরা কোথায় নির্দিষ্ট করব? শাসক কিংবা শাসিতের মধ্যে?

গ্লকন বললেন ঃ আমার তো মনে হয় উভয়ের মধ্যে আমরা সংযমকে নির্দিষ্ট করতে পারি।

কিন্তু গ্লকন, তুমি একটা বিষয় নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে, আমরা সংযমকে একটা ঐকতান বলে অভিহিত করেছিলাম?

কিন্তু কেন সক্রেটিস?

কারণ, সংযম তো জ্ঞান এবং সাহসের মতো নয়। জ্ঞান এবং সাহস উভয়ের অবস্থান রাষ্ট্রের অংশবিশেষের মধ্যে। এদের একটির কারণে রাষ্ট্রকে আমরা প্রাজ্ঞ বলি, অপরটির জন্য রাষ্ট্রকে সাহসী বলি। কিন্তু সংযমের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তেমন নয়। সংযম রাষ্ট্রের সমগ্রের উপরই পরিব্যাপ্ত। সংযম সঙ্গীতের সকল

গ্রামের মধ্যে সূত্রের ন্যায় প্রবহমান হয়ে উত্তম, অধম, মধ্যম, জ্ঞান, শক্তি, সংখ্যা এবং সম্পদে সবল কিংবা দুর্বল সকলকে সম্মিলিত করে একটি ঐকতানের সৃষ্টি করে। তা হলে সংযমকে আমরা রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি—উভয় ক্ষেত্রে শাসনের অধিকারের প্রশ্নে উত্তম এবং অধমের ঐকমত্য বলে অভিহিত করতে পারি। ঠিক নয় কি?

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, সক্রেটিস।

তা হলে গ্লকন, এই নিয়ে আমাদের অন্বিষ্ট চারটি গুণের মধ্যে তিনটিকে আমরা আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে আবিষ্কার করেছি, একথা আমরা বলতে পারি। রাষ্ট্রকে মহৎ করে যে-সকল গুণ তার মধ্যে সর্বশেষ গুণ তা হলে ন্যায় ব্যতীত অপর কিছু না?

এ-অনুমান তো স্বাভাবিক।

উত্তম কথা গ্লকন। সময় তা হলে সন্নিকট। শিকারির মতো এবার আমাদের ঘিরে ধরতে হবে। দৃষ্টি আমাদের তীক্ষ্ণ করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ন্যায় যেন আমাদের লক্ষ্য এড়িয়ে সরে পড়তে সক্ষম না হয়। কারণ আমরা নিঃসন্দেহ, আমাদের রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও সে অবশ্যই রয়েছে। কাজেই গ্লকন, তোমার দৃষ্টি সতর্ক করো, দ্যাখো সে কোথায়। তুমি যদি প্রথমে তাকে দেখে ফেলো তা হলে আমাকে বোলো কিন্তু।

আহ! সক্রেটিস, সে-ক্ষমতা যদি আমার থাকত! কিন্তু আমি তো কেবল অনুসারী। তোমার দেওয়া চোখ দিয়ে আমি দেখি। ততটুকুই আমার ক্ষমতা।

তা হলে এসো, প্রার্থনায় যোগদান করো এবং অনুসরণ করো।

আমাকে তুমি পথ দেখাও সক্রেটিস, আমি তোমাকে অনুসরণ করব।

কিন্তু গ্লকন, এখানে কোনো পথ নেই। ঘন অন্ধকার, পথের রেখা জটিল। তবু আমাদের অগ্রসর হতে হবে।

হ্যাঁ চলো, আমরা অগ্রসর হই।

এই সময়ে আমি কিছু একটা যেন দেখতে পেলাম। আমি চিৎকার করে উঠলাম : গ্লকন, একটি পথের রেখা আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে শিকার পালাতে সক্ষম হবে না।

তা হলে তো সুখবর, সক্রেটিস।

কিন্তু আমরা কী মূর্খ, গ্লকন!

কেন?

কারণ, বন্ধু, সেই যুগ যুগ আগে যখন আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের অন্বেষণ, তখন কিন্তু ন্যায় আমাদের পদপ্রান্তেই পড়ে ছিল। কিন্তু আমরা তাকে দেখলাম না। কী অদ্ভুত অবস্থা! আমরা যেন সেই লোক যে তার লক্ষ্যকে হাতের মুঠোয় বন্ধ করে লক্ষ্যের সন্ধানে কেবল ছুটে বেড়ায়। আমরাও তেমনি। যে আমাদের লক্ষ্য তার দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করলাম না। আমরা ছুটে বেড়ালাম দূর-দূরান্তে। আর সে-কারণেই আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলাম।

তুমি কী বলছ, সক্রেটিস!

আমি বলতে চাচ্ছি ঃ বহুকাল ধরেই আমরা ন্যায়ের কথা বলছি। অথচ সে-ন্যায়কে আমরা চিনতে ব্যর্থ হলাম।

সক্রেটিস, তোমার এই রহস্যময় ভূমিকার শেষ হোক।

আমি বললাম ঃ বেশ গ্লকন, তুমি আমার কথার জবাব দাও ঃ তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমরা যখন আমাদের রাষ্ট্রের গঠন শুরু করি তখন তার একটি মৌলিক বিধান আমরা এই নির্দিষ্ট করেছিলাম যে, একজন নাগরিক মাত্র একটি কাজই সমধা করবে,—প্রকৃতি যাকে যে-কাজের জন্য উত্তমরূপে তৈরি করেছে সে সেই কাজই সম্পাদন করবে। আমি বলব ঃ এই নীতিই হচ্ছে ন্যায়। অথবা ন্যায় এই নীতির সঙ্গেই যুক্ত।

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা ঠিক যে আমরা বলেছি ঃ একজন মানুষ একটি কাজই সম্পাদন করবে।

তা ছাড়া আমরা বলেছিলাম, ন্যায় হচ্ছে নিজের কাজ করা এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। একথা আমরা বারবারই বলেছি। শুধু আমরা নয়, অন্য অনেকে এই অভিমতই পোষণ করে।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এরূপ আমরা বলেছি।

তা হলে নিজের কাজ করাও ন্যায়,—একথা আমরা অনুমান করতে পারি। কিসের ভিত্তিতে আমার এই অনুমান তুমি বলতে পার গ্লকন?

না, তুমি বলো।

অনুমানের ভিত্তি আমাদের সেই অবশিষ্টের পদ্ধতি। কারণ জ্ঞান, সাহস এবং সংযম যখন চিহ্নিত হয়েছে তখন ন্যায়ই মাত্র অবশিষ্ট থাকে। শুধু তা-ই নয়, ন্যায় যেমন সব গুণের চরম লক্ষ্য, তেমনি সব গুণের নিয়ামকও হচ্ছে ন্যায়। সব গুণের মধ্যে যেমন এর অবস্থান তেমনি এর কারণেই সব গুণের অস্তিত্ব। আমরা বলেছি গুণের মধ্যে তিনটিকে যদি আমরা আবিষ্কার করতে পারি, তা হলে অবশিষ্ট চতুর্থটি অবশ্যই ন্যায় হবে।

এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য।

এখন আমাদের সামনে যদি প্রশ্ন হয়, এই চারটি গুণের মধ্যে কোন্ গুণটির দান রাষ্ট্রের উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সর্বাধিক—সে কি শাসনের প্রশ্নে শাসক এবং শাসিতের ঐকমত্য, কিংবা সৈন্যদের মধ্যে রাষ্ট্রের বিপদের প্রকৃতি সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় শিক্ষার অনুসরণ কিংবা শাসকের প্রজ্ঞা এবং সতর্কতা অথবা যে-গুণের সাক্ষাৎ শিশু, নারী, দাস এবং মুক্ত মানুষ, কারিগর, শাসক এবং শাসিত—সকলের মধ্যে পাওয়া যায় অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে, অপরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করছে না—সেই গুণের অবদান সর্বাধিক, তা হলে প্রশ্নটির জবাব খুব সহজ হবে না, গ্লকন।

নিশ্চয়ই। কার্ অবদান সবচেয়ে অধিক সে জবাব দেওয়া কঠিন বইকী।

তা হলে আমাদের বলতে হয় যে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রত্যেকের নিজ নিজ কাজ সম্পাদন করার নীতির প্রতিযোগী হচ্ছে জ্ঞান, সাহস এবং সংযম?

হ্যাঁ, সক্রেটিস।

ন্যায় তা হলে অন্য গুণের সঙ্গে প্রতিযোগী?

তাই তো হচ্ছে।

এসো গ্লকন, ব্যাপারটিকে আমরা অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি ঃ রাষ্ট্রের শাসক কে? রাষ্ট্রের শাসক কি তারা নয় যারা আইনগত বিরোধের মীমাংসা করে?

হ্যাঁ।

এবং এই বিরোধ-মীমাংসায় একমাত্র নীতি কি এই নয় যে, কেউ যেমন অপরকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না, তেমন নিজেও সে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে না?

হ্যাঁ, অবশ্যই এই নীতি।

এবং এটাই হচ্ছে ন্যায্যনীতি।

হ্যাঁ।

তা হলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বলতে হয় যে, ন্যায় হচ্ছে যার যা প্রাপ্য তা-ই পাওয়া এবং যার যা করণীয় তা-ই করা।

খুবই সত্য কথা সক্রেটিস।

এবার তা হলে তুমি চিন্তা করে বলো, তুমি আমাদের সঙ্গে একমত কি না। মনে করো, যে সূত্রধর সে চর্মকারের কাজ করতে শুরু করল এবং যে চর্মকার সে

সূত্রধরের কাজ করতে শুরু করল। তারা তাদের কাজের যন্ত্রাদি পরস্পর পরিবর্তন করে নিল। অথবা ধরো একই ব্যক্তি উভয় কাজ করতে শুরু করল। এমন যদি হয় তাতে রাষ্ট্রের কি কোনো ক্ষতি হবে বলে তুমি মনে কর?

না, তেমন কী ক্ষতি হবে সক্রেটিস?

কিন্তু যখন চর্মকার কিংবা অপর কেউ যাকে প্রকৃতি বণিক হিসাবে তৈরি করেছে সে তার অর্থের শক্তিতে কিংবা তার অনুসারীদের সংখ্যা অথবা অপর কোনো সুবিধার ভিত্তিতে শক্তিমান বোধ করে যোদ্ধাশ্রেণীতে জোর করে স্থান গ্রহণ করে কিংবা যখন কোনো যোদ্ধা জোর করে সে যে-কাজের উপযুক্ত নয় সেই আইন প্রণয়নকারী এবং শাসকের আসন দখল করে অথবা যখন একই ব্যক্তি একসঙ্গে বণিক, আইন-প্রণয়নকারী এবং যোদ্ধার ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করে তখন নিশ্চয়ই তুমি আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবে যে, কাজের এই পারস্পরিক পরিবর্তন এবং একের কাজে অন্যের এই হস্তক্ষেপ রাষ্ট্রের ধ্বংসেরই সূচনা করে।

খুবই সত্য কথা।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট শ্রেণী যখন তিনটি, তখন একের কাজে অন্যের হস্তক্ষেপ বা অনধিকার চর্চা কিংবা একের বদলে অপরের আসন গ্রহণ রাষ্ট্রের জন্য সর্বাধিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এরূপ কাজকে আমরা যথার্থই সর্বনাশসাধন বলে অভিহিত করতে পারি?

অবশ্যই, সক্রেটিস।

আর নিজের রাষ্ট্রের এরূপ সর্বনাশসাধনকে নিশ্চয়ই তুমি অন্যায় বলবে?

নিশ্চয়ই।

এটাই হচ্ছে তা হলে অন্যায়। অপরদিকে বণিক বা সৈনিক বা শাসক যখন নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে তখনই ন্যায়ের উদ্ভব হয়, এই দায়িত্বপালনই একটি রাষ্ট্রকে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রে পরিণত করে।

তোমার সাথে আমি একমত, সক্রেটিস।

অবশ্য এখনও জোর করে আমরা কথাটা বলতে পারিনে। পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়ের এই তত্ত্ব যদি প্রমাণিত হয় তা হলে এ-সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু যদি তা প্রমাণিত না হয় তা হলে নূতনভাবে আমাদের অনুসন্ধানের কাজটি শুরু করতে হবে। যা-ই হোক, এসো গ্লকন, প্রথমে আমরা আমাদের পুরনো অনুসন্ধানটি সম্পন্ন করি। এর গোড়াতে আমরা বলেছিলাম ন্যায়কে প্রথমে বৃহদাকারে যদি আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি,

তা হলে পরবর্তীকালে ক্ষুদ্রাকারে ব্যক্তির মধ্যে তাকে অনুধাবন করা কম কঠিন হবে। এই বৃহদাকারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাষ্ট্র। আর এ-কারণেই আমাদের পক্ষে যত উত্তম সম্ভব তত উত্তম রাষ্ট্র গঠন করেছি। এই গঠনের পেছনে আমাদের এই প্রত্যয় কাজ করেছে যে, উত্তম রাষ্ট্রে ন্যায়ের সাক্ষাৎ লাভ করা যাবে। রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়কে আমরা আবিষ্কার করেছি। এসো আমরা এখন সেই আবিষ্কারকে ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। ব্যক্তির উপর প্রয়োগে উভয়ে যদি মিলে যায় তা হলে আমাদের কাজ সমাধা হবে। যদি ন্যায়ের প্রয়োগে ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তা হলে আমরা আবার রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করব এবং রাষ্ট্রের মধ্যে আমাদের তত্ত্বকে পুনরায় পরীক্ষা করে দেখব। এই দু-এর ঘর্ষণে[১] এমন আলোর সঞ্চার হতে পারে যে আলো ন্যায়ের প্রকৃতিকে আলোকিত করে তুলবে। তেমন হলে ন্যায়ের মূর্তিটি আমরা নিজেদের আত্মায় অনড় করে ধরে রাখব।

সেরূপ করাই ঠিক হবে। এসো সক্রেটিস, আমরা সেরূপই করি।

আমি এবার গ্লকনকে জিজ্ঞেস করলাম : দুটো বস্তু, একটি বড় অপরটি ছোট—এদের উভয়কে যখন আমরা একই নামে অভিহিত করি তখন তারা এই নামের কারণে সদৃশ কিংবা সদৃশ নয়?

তারা সদৃশ, সক্রেটিস।

তা হলে, ন্যায়ের ভিত্তিতে যদি আমরা কথাটি বলি তবে ন্যায়বান ব্যক্তি ন্যায়বান রাষ্ট্রের সদৃশ হবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, সে ন্যায়বান রাষ্ট্রের সদৃশ হবে।

এবং আমরা দেখেছি, রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট তিনটি শ্রেণী যখন আপন-আপন দায়িত্বপালন করে তখনই মাত্র রাষ্ট্র ন্যায়বান হয়। শুধু তা-ই নয়, এই শ্রেণীগুলির বিভিন্ন গুণের কারণে ন্যায়বান রাষ্ট্র আবার সংযমী, সাহসী এবং জ্ঞানী বলেও বিবেচিত হয়।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আমরা ধরে নিতে পারি রাষ্ট্রে যেরূপ, ব্যক্তির আত্মায়ও সেরূপ তিনটি উপাদান রয়েছে। এবং রাষ্ট্রকে আমরা যেরূপ ব্যাখ্যা করেছি ব্যক্তিকেও সেরূপ ব্যাখ্যা করতে পারি। কারণ তিনটি নীতি বা উপাদানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যেরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ব্যক্তিরও সেরূপ।

অবশ্যই।

---

১. রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় এবং ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়—এ দুই-এর তুলনা।

এখানেও তা হলে একটি সহজ প্রশ্নের আমাদের জবাব দিতে হয় ঃ আত্মার এই তিনটি নীতি বা উপাদান আছে কিংবা নাই?

তুমি একে সহজ প্রশ্ন বলছ, সক্রেটিস! না, এ মোটেই সহজ নয়। তবে প্রবাদের সে-কথাটি সত্য, কঠিন যা, উত্তম তা।

তুমি যথার্থ বলেছ, গ্লকন। এবং যে পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করছি, সঠিক সমাধানের জন্য সে-পদ্ধতি যে যথেষ্ট তাও আমি মনে করতে পারছিনে। উপযুক্ত পদ্ধতি দীর্ঘতর হবে। কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিতেও আমরা একটি সমাধান পেতে পারি। এ-সমাধান আমাদের পূর্বকার অনুসন্ধানের চেয়ে কম সঠিক হবে না।

বর্তমান অবস্থায় এ সমাধানও আমাদের জন্য কম নয়। আমি এতেই সন্তুষ্ট।

আমি বললাম ঃ আমিও সন্তুষ্ট হব।

তা হলে সক্রেটিস, আলোচনাটি চালিয়ে যেতে ভীত হয়ো না।

আমি বললাম ঃ এ ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমাদের স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে যে-নীতি এবং আচরণ কার্যকর হয়েছে, ব্যক্তির মধ্যে সেই নীতি এবং আচরণই ক্রিয়াশীল। এবং এ-নীতি ও আচরণ ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রে উপগত হয়। তা না হলে অপর কোথা হতে রাষ্ট্রে তাদের আগমন ঘটতে পারে? ধরো বীর্য কিংবা বিক্রমের কথা। আমরা যখন রাষ্ট্রে এর সাক্ষাৎ পাই তখন কি আমরা বলতে পারি যে, থ্রেসবাসী কিংবা সিদীয় অর্থাৎ উত্তরাঞ্চলের যে-জাতিদের মধ্যে এ-গুণের সাক্ষাৎ দেখা যায় তাদের নিকট থেকে রাষ্ট্র এ-গুণকে লাভ করেনি? তেমন বলা অদ্ভুত হবে। জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা আমাদের[১] বৈশিষ্ট্য। অর্থের প্রতি ভালোবাসা তেমনি ফিনিশীয় এবং মিশরীয়দের বৈশিষ্ট্য।

তোমার কথা ঠিক, সক্রেটিস।

এটা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না।

না, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু প্রশ্নটি যখন দাঁড়ায়, এই নীতি বা উপাদান তিনটি কিংবা একটি, তখন জবাবটি আর সহজ থাকে না। আমরা কী করি? আমরা কি আমাদের স্বভাবের একটি অংশ দ্বারা জ্ঞান অর্জন করি, অপর কোনো অংশ দ্বারা ক্রোধান্বিত হই এবং তৃতীয় কোনো অংশ দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের নিবারণ

---

১. এথেনীয়দের

করি? অথবা যে-কোনো আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র আত্মাই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে? এ-প্রশ্নের সমাধান কঠিন।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, এখানেই অসুবিধা।

তা হলে গ্লকন, এসো, আমরা দেখি তারা এক কিংবা ভিন্ন।

কেমন করে আমরা দেখব?

গ্লকনের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম ঃ একই বস্তু কোনো বস্তুর একই অংশে কিংবা ঐ বস্তুর সঙ্গে একই মুহূর্তে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরোধীভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। কাজেই যে-বস্তু আমাদের কাছে দৃশ্যত এক তার মধ্যে যদি পরস্পর বিরোধিতার আমরা সাক্ষাৎ পাই তা হলে বুঝতে হবে যে বস্তুটি এক নয়, তারা বিভিন্ন।

উত্তম।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ একটি বস্তু কি একই সময়ে স্থির এবং অস্থির অর্থাৎ গতিময় হতে পারে?

অসম্ভব।

আমি বললাম ঃ তবু আমাদের পদগুলির সংজ্ঞা অধিকতর সুনির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। না হলে পথে আবার বিভ্রাট ঘটতে পারে। মনে করো একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এই দণ্ডায়মান অবস্থায় সে তার মাথা এবং হাত সঞ্চালিত করছে। আরও মনে করো, এই দৃশ্য দেখে অপর এক ব্যক্তি মন্তব্য করল ঃ এখানে একই ব্যক্তি একই সময়ে স্থির এবং অস্থির। এরূপ মন্তব্যের বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই আপত্তি করে বলব ঃ না, তা নয়। বরঞ্চ ব্যক্তিটির একটি অংশ অস্থির এবং তার অপর একটি অংশ স্থির।

তোমার কথা সত্য, সক্রেটিস।

কিন্তু ধরো আমাদের এ-জবাবের প্রতিবাদী সূক্ষ্মতর যুক্তির ভিত্তিতে বলল ঃ একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানরত ঘূর্ণ্যমান একটি লাটিমের অংশবিশেষ যে একই সময়ে স্থির এবং অস্থির তা-ই নয়; সমগ্র লাটিমটিই একই সময় স্থির এবং অস্থির। লাটিমের ন্যায় ঘূর্ণ্যমান অপর যে-কোনো বস্তু সম্পর্কেই প্রতিবাদী এরূপ কথা বলতে পারে। কিন্তু তার এ-বক্তব্যকে আমরা গ্রাহ্য মনে করব না। আমরা বলব ঃ এমন ক্ষেত্রে বস্তু তার একই সময়ে স্থির এবং গতিময়—একথা বলা চলে না। কারণ লাটিমের যেমন একটি পরিধি আছে, তেমনি তার একটি অক্ষ আছে। লাটিমের অক্ষ স্থির থাকে। কারণ লম্ব থেকে তার কোনো বিচ্যুতি নেই।

কিন্তু লাটিমের পরিধি ঘূর্ণ্যমান সুতরাং অস্থির। কিন্তু পরিধির সঙ্গে অক্ষ যদি লম্বের ডানে কিংবা বামে বিচ্যুত হয় তা হলে লাটিমের কোনো অংশকেই আমরা স্থির বলে অভিহিত করতে পারিনে।

এ বিবরণই ঠিক, সক্রেটিস।

তা হলে এরূপ কোনো আপত্তির কারণে আমরা বিভ্রান্ত হব না কিংবা বিশ্বাস করব না যে, একই বস্তু তার একই অংশে কিংবা একই বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একই সময়ে পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

না, আমার ধারণামতে আমিও মনে করিনে যে, এরূপ হওয়া সম্ভব।

আমি বললাম ঃ এরূপ অভিযোগের প্রত্যেকটি পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষাশেষে তাদের অসত্যতা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এরূপ অভিযোগ অসার বলে আমরা ধরে নেব। তা ছাড়া এই এরূপ নিয়ে আমরা অগ্রসর হব যে, পরবর্তীকালে আমাদের অনুমান যদি অসত্য প্রমাণিত হয় তা হলে এর সকল সিদ্ধান্তকেই আমরা প্রত্যাহার করে নেব।

তা-ই উত্তম হবে, সক্রেটিস।

আচ্ছা, অপর একটি বিষয়ে আসা যাক। সম্মতি এবং অসম্মতি, ইচ্ছা এবং অনিচ্ছা, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ—এগুলো সক্রিয় কিংবা নিষ্ক্রিয় যা-ই হোক না কেন, তুমি তো এদেরকে বিপরীত বলে আখ্যায়িত করবে। ঠিক নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, এরা বিপরীত।

ঠিক তেমনি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা এবং আমাদের সাধারণ কামনা এবং আমাদের ইচ্ছা ও বাসনা—এগুলোকেও আমরা যে-শ্রেণীগুলির উল্লেখ করেছি, তুমি নিশ্চয়ই তার অন্তর্ভুক্ত করবে। নয় কি? যেমন তুমি নিশ্চয়ই বলবে ঃ যার বাসনা আছে তার আত্মা বাসনার সেই বস্তুকে অন্বেষণ করে; কিংবা যে-বস্তুকে আমি অধিকার করতে চাই সে-বস্তুকে আমি আমার নিকটবর্তী করে তুলি কিংবা যখন কেউ কোনো দ্রব্য প্রদত্ত হতে চায় তখন সেই বাঞ্ছিত বস্তু অধিকারের জন্য মন তার ইচ্ছাটিকে সম্মতিসূচক মস্তক সঞ্চালনের মাধ্যমে দাতাকে জ্ঞাত করায়। তার ভাবটি এমন যে ইতিমধ্যেই তাকে এ-সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে।

খুবই যথার্থ, সক্রেটিস।

কিন্তু অনিচ্ছা এবং বিরাগ এবং ইচ্ছার অভাব—এগুলি সম্পর্কে তুমি কী বলবে? এগুলিকেও কি তুমি বিকর্ষণ এবং আকর্ষণ—এই প্রকার বিপরীত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করবে না?

অবশ্যই।

ইচ্ছা সম্পর্কে সাধারণভাবে একথা যদি সত্য হয় তা হলে এসো ইচ্ছার মধ্যে যেগুলি প্রধান যেমন ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা তাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করি।

ঠিক আছে, এসো আমরা তা-ই নিয়ে আলোচনা করি।

এ-দুটোর একটির লক্ষ্য হচ্ছে খাদ্য, অপরটির পানীয়। নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আমাদের মূল বক্তব্য এখানেই ঃ আমরা যখন তৃষ্ণা বোধ করি তখন আমরা কেবল পানীয়ের তৃষ্ণাই বোধ করি। তৃষ্ণা বলতে নিশ্চয়ই আমরা গরম কিংবা ঠাণ্ডা কিংবা অল্প কিংবা অধিক পানীয়ের তৃষ্ণা বুঝিনে। কিন্তু যখন তুমি কেবল তৃষ্ণার্ত নও, তুমি তপ্তও বটে, তখন তুমি নিশ্চয়ই ঠাণ্ডা পানীয় পান করতে চাইবে; কিংবা যদি তুমি ঠাণ্ডা বোধ কর তা হলে গরম পানীয় পান করতে চাইবে। তোমার তৃষ্ণা যদি তীব্র হয় তুমি অধিক পরিমাণ পানীয় এবং তৃষ্ণার বেগ কম হলে তুমি অল্প পানীয় পান করতে চাইবে। ঠিক নয় কি? কিন্তু শুধু তৃষ্ণা বলতে এরকম কোনো বিশেষণ ব্যতীত কেবল পানীয়কেই বুঝাব। ক্ষুধার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ একথা ঠিক সক্রেটিস। সাধারণ ইচ্ছার ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছার স্বাভাবিক বা সহজ বস্তুটিকেই বুঝি। কিন্তু ইচ্ছা যদি বিশেষ রকমের হয় তা হলে তার তৃপ্তির বস্তুও বিশেষ রকমের হবে।

কিন্তু গ্লকন, এখানে একটা বিভ্রমের আশঙ্কা রয়েছে। এ-সম্পর্কে আমি আগে থেকে সতর্ক হতে চাই। আমাদের প্রতিবাদী বলতে পারে, কোনো মানুষই কেবলমাত্র পান করার ইচ্ছা করে না, সে উত্তম কিছু পান করারই ইচ্ছা করে। কেউ কেবল খাওয়ার ইচ্ছা করে না, উত্তম কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে। কারণ ইচ্ছা মাত্রেরই লক্ষ্য হচ্ছে উত্তম। এবং যেহেতু তৃষ্ণা হচ্ছে একটা ইচ্ছা, সে-কারণে তৃষ্ণার লক্ষ্য হবে উত্তম কিছু পান করার ইচ্ছা। অপর যে-কোনো ইচ্ছা সম্পর্কে একথা সত্য। আমাদের প্রতিবাদী কি এমন কথা বলতে পারে না?[১]

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ সক্রেটিস, আমাদের প্রতিবাদী এমন কথা বলতে পারে।

---

১. এখানে ইচ্ছাকে 'কেবলমাত্র ইচ্ছা' এবং 'কোনো বিশেষ বস্তুর জন্য ইচ্ছা' হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। সক্রেটিসের যুক্তিতে এখানে 'বিশেষ' এবং নির্বিশেষ ভাবের সূচনা দেখা যাচ্ছে।

তথাপি আমরা বলব, দুটি অনুবন্ধীসাপেক্ষ পদের ক্ষেত্রে বিশেষণ প্রয়োগ করলে দুটোকেই বিশেষিত করতে হবে, নয়তো কাউকেই বিশেষিত করা চলবে না।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ গ্লকন তুমি নিশ্চয়ই জান, যাকে আমরা 'অধিকতর' বলি সে 'অল্পতর'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

অবশ্যই।

আবার যাকে বলি 'অধিকতর বেশি' সে 'অধিকতর কম'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

এ কথা যথার্থ।

এবং যাকে বলি 'কোনো কোনো সময়ে অধিক' সে 'কোনো কোনো সময় অল্প'-এর সঙ্গে এবং 'অধিকতর' 'অল্পতর'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা অবশ্যই ঠিক।

শুধু এরা নয়, ডবল এবং অর্ধেক, অধিকতর ভারী এবং হালকা, অধিকতর দ্রুতগামী এবং অধিকতর ধীরগামী কিংবা গরম এবং ঠাণ্ডা অর্থাৎ সকল সাপেক্ষ পদ সম্পর্কেই একথা সত্য। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক।

বিজ্ঞানে তো এই একই নীতিকে প্রয়োগ করা হয়? কারণ, বিজ্ঞানের লক্ষ্য কী? বিজ্ঞানের লক্ষ্য জ্ঞান। বিশেষ বিজ্ঞানের লক্ষ্য বিশেষ জ্ঞান। যেমন গৃহনির্মাণের বিজ্ঞান। এরও লক্ষ্য জ্ঞান। কিন্তু এ-জ্ঞানকে অপর জ্ঞান থেকে বিশিষ্ট করে আমরা একে স্থাপত্যবিজ্ঞান বলে অভিহিত করি।

হ্যাঁ, আমরা তাকে এই বিশিষ্ট নামে অভিহিত করি।

কারণ, এ বিশিষ্ট অর্থাৎ এর এমন একটি গুণ আছে যা অপর বিজ্ঞানের নেই।

এ কথা সত্য।

এবং এই বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্য থাকার কারণ, এর একটি বিশেষ লক্ষ্য আছে। একথা অপর সকল কলা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। ঠিক নয় কি গ্লকন?

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক, সক্রেটিস।

আমার কথাটি আমি যদি পরিষ্কার করতে পেরে থাকি তা হলে গ্লকন, সাপেক্ষ পদ সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার তাৎপর্যটি এবার তুমি বুঝতে

পারবে। আমার কথার অর্থটি ছিল ঃ কোনো সম্পর্কের একটি পদকে যদি তুমি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ কর তা হলে তার অপর পদটিকেও তোমাকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করতে হবে; একটিকে যদি তুমি বিশেষিত কর, অপরটিকেও তোমার বিশেষিত করতে হবে। আমি একথা বলছিনে যে, উভয়কে একই বিশেষণে বিশেষিত হতে হবে। স্বাস্থ্য এবং রোগের বিজ্ঞান বলতে স্বাস্থ্যের জ্ঞানটাকেই স্বাস্থ্য এবং রোগের জ্ঞানটাকেই রোগ বলতে হবে, কিংবা উত্তমের জ্ঞান উত্তম এবং অধমের জ্ঞান অধম এমন কথা আমি বুঝাতে চাইনি। আমি বলতে চাচ্ছি তোমার জ্ঞান যখন বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, ধরো স্বাস্থ্য কিংবা রোগের ক্ষেত্রে, তখন সে-জ্ঞান শুধু জ্ঞান নয়, একটি বিশেষ জ্ঞান বলে অভিহিত হওয়া আবশ্যক। তখন সে-জ্ঞানকে আমরা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুনিরপেক্ষ 'শুধুমাত্র জ্ঞান' বলতে পারিনে। তখন 'জ্ঞানের' সঙ্গে আমাদের একটি বিশেষণ যুক্ত করতে হয় 'নিরাময়জ্ঞান' বা 'চিকিৎসাবিজ্ঞান'।

সক্রেটিস, এবার আমি তোমার কথাটি বুঝতে পারছি এবং তোমার সঙ্গে আমি এক্ষেত্রে একমত।

তা হলে এসো আমরা 'তৃষ্ণায়' ফিরে যাই। 'তৃষ্ণা' আমাদের উল্লিখিত সাপেক্ষ পদগুলিরই একটি। তৃষ্ণা মানে কিছুর জন্য তৃষ্ণা। নয় কি?

হ্যাঁ, পানীয়ের তৃষ্ণা।

তা হলে তৃষ্ণারও প্রকার আছে। একটি বিশেষ তৃষ্ণা একটি বিশেষ পানীয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু তৃষ্ণাকে যদি পানীয়নিরপেক্ষভাবে ধর তা হলে সে-তৃষ্ণা না অধিকের, না অল্পের; না অধমের, না উত্তমের—অর্থাৎ তাকে কোনো বিশেষ তৃষ্ণা বলেই অভিহিত করতে পারিনে। সে কেবলমাত্র তৃষ্ণা।

যথার্থ, সক্রেটিস।

তা হলে আমরা বলব, তৃষ্ণার্তের আত্মা কেবল পানীয়ের জন্যই তৃষ্ণার্ত। পানীয়ের জন্য সে ব্যাকুল এবং সেই লক্ষ্যসাধনেরই সে চেষ্টা করে?

হ্যাঁ, এ তো স্পষ্ট।

কিন্তু তৃষ্ণার্ত আত্মা যদি তার পানীয় থেকে অপর কিছু দ্বারা বিকর্ষিত হয় তা হলে সে-বিকর্ষণের কারণ নিশ্চয়ই তৃষ্ণা থেকে ভিন্নতর কিছু। কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি, একই বস্তু একই সময় একই বস্তুর উপর পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না।

না, তার পক্ষে পরস্পরবিরোধী ক্রিয়ার সৃষ্টি অসম্ভব।

যেমন আমরা বলতে পারিনে, তীরন্দাজের হাত একই সঙ্গে ধনুকের ছিলাকে টেনে ধরে এবং ঠেলে দেয়। আমাদের বলতে হয় তীরন্দাজের এক হাত ধনুকের ছিলাটিকে টেনে ধরে এবং তার অপর হাত তাকে ঠেলে দেয়।

হ্যাঁ, তা-ই ঠিক।

তা হলে আমরা কি বলতে পারি, কোনো ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত কিন্তু পানে সে অনিচ্ছুক?

গ্লকন বললেন ঃ অসম্ভব নয়। এরকম আমরা প্রায়ই ঘটতে দেখি।

তাই যদি সম্ভব হয় তা হলে আমরা বিষয়টিকে কেমন করে ব্যাখ্যা করব? আমাদের ব্যাখ্যা হবে ঃ তার আত্মার মধ্যে একদিকে যেমন এমন এক শক্তি আছে যে-শক্তি তাকে তৃষ্ণার্ত করে তুলছে, তেমনি আবার এমন আর-এক শক্তি আছে যে তাকে পান করা থেকে নিবৃত্ত করছে। সে যে তৃষ্ণার্ত হয়েও পান করছে না তার কারণ তার মধ্যকার নিবারণী শক্তি তৃষ্ণার্তকারী শক্তির চেয়ে অধিকতর পরাক্রমশালী। ঠিক নয় কি, গ্লকন?

আমার তা-ই মনে হয় সক্রেটিস।

আর এই নিবারণী শক্তির উৎস হচ্ছে তার বিবেক কিংবা প্রজ্ঞা। অপরদিকে যা তাকে পানীয়ের দিকে আকর্ষণ করে তার উৎস হচ্ছে তার প্রবৃত্তি, তার বিকার।

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা পরিষ্কার।

তা হলে এই দুই শক্তিকে আমাদের দুটি পৃথক শক্তি বলে অভিহিত করতে হয়। একটি অপরটি থেকে পৃথক। যে-শক্তিতে ব্যক্তি চিন্তা করে সে তার আত্মার প্রজ্ঞার দিক। কিন্তু যে-শক্তিতে ব্যক্তি ক্ষুধা বোধ করে, তৃষ্ণাকে অনুভব করে কিংবা অপর সব কামনা-বাসনা দ্বারা তাড়িত হয়, তাকে আমরা বলব তার প্রবৃত্তির দিক। তার অজ্ঞানতার দিক। তার এই প্রবৃত্তি হচ্ছে তার সব কামনা-বাসনার, তার ভোগ এবং তৃপ্তির উৎস। এই দুই শক্তি তা-ই পৃথক। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা যথার্থই এদের পৃথক বলে অনুমান করতে পারি।

তা হলে এসো আমরা সিদ্ধান্ত করি ঃ আত্মার দুটি দিক। একটি প্রজ্ঞা, অপরটি প্রবৃত্তি। কিন্তু ব্যক্তির বিক্রম বা সাহস সম্পর্কে আমরা কী বলব? এটিকে কি আমরা আত্মার তৃতীয় উপাদান বলব কিংবা এটিকে আমরা আগের দুটির কোনো একটির সদৃশ শক্তি বলে মনে করব?

সক্রেটিস, আমার তো মনে হয় প্রবৃত্তিরই এ সদৃশ।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, এখানে আমার একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। গল্পটিকে আমি বিশ্বাসও করেছিলাম। গল্পটি হচ্ছে লিওনটিয়াসকে নিয়ে। আগলায়নের পুত্র লিওনটিয়াস। একদিন লিওনটিয়াস পাইরিউস বন্দর থেকে ফিরে আসছিল। বন্দরের উত্তরদিকের প্রাচীরের নিচে দিয়ে আসতে লিওনটিয়াস দেখতে পেল বধ্যভূমির ওপর কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। এই দৃশ্য তার মধ্যে একদিকে যেমন আরও কাছে যেয়ে মৃতদেহগুলোকে ভালো করে দেখার একটা বাসনা জাগাল, তেমনি অপরদিকে তার মধ্যে ভীতি এবং ঘৃণার ভাবও সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাত দিয়ে চোখকে আবৃত করে লিওনটিয়াস এই দুটো ভাবের সঙ্গে লড়াই করল। কিন্তু পরিণামে মৃতদেহ দেখার ইচ্ছার জোরে চোখ থেকে তার হাত নেমে এল এবং সে দৌড়ে ছুটে গেল মৃতদেহগুলোর কাছে আর ক্রোধের সঙ্গে নিজের চোখ দুটোকে বলতে লাগল ঃ নে নরাধম, নে। এবার প্রাণভরে এই মনোহর দৃশ্য দেখে নে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, গল্পটি আমি শুনেছি।

আমি বললাম ঃ গল্পের শিক্ষাটি এই যে, ব্যক্তির জীবনে এমন সময়ও আসে যখন তার ক্রোধ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত হয়। তখন মনে হয় যেন, ক্রোধ এবং ইচ্ছা দুটি শক্তি, ভিন্ন সত্তা।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এ-গল্পের এটিই তাৎপর্য।

গ্লকন, এরকম দৃষ্টান্ত আমরা আরও দিতে পারি। এ সব ক্ষেত্রে আমরা যা দেখতে পাই সে হচ্ছে এই যে, মানুষের বাসনা যখন জোর করে তার প্রজ্ঞাকে পরাভূত করে ফেলে তখন সে নিজেকেই ভর্ৎসনায় ভরে তোলে। নিজের সত্তার ভেতরে ইচ্ছার প্রচণ্ডতায় সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্বকে তুমি রাষ্ট্রের মধ্যে উপদলীয় দ্বন্দ্বের সঙ্গে তুলনা করতে পার। আর এই উপদলীয় দ্বন্দ্বে তার মধ্যকার যা বিক্রম তাকে সে প্রজ্ঞার পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু বিক্রম প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রজ্ঞার বিরুদ্ধাচারণ করেছে, এমন অভিজ্ঞতা গ্লকন, তুমি নিজের মধ্যে কিংবা অপর কোথাও কি প্রত্যক্ষ করেছ?

না সক্রেটিস, আমি সেরূপ অবশ্যই দেখিনি।

মনে করো কোনো ব্যক্তি অপর কারো প্রতি অন্যায় করেছে। তার এ-অন্যায় সম্পর্কে সে সচেতন এবং দুঃখিত। এই অন্যায়ের প্রতিক্রিয়ায় আহত ব্যক্তি যদি অন্যায়কারীর উপর ক্ষুধা, হিম-কষ্ট কিংবা অপর কোনো যন্ত্রণা এবং দুর্ভোগের প্রত্যাঘাত করে তা হলে অন্যায়কারী যত অধিক মহৎ মনোভাবের হবে, আহত

ব্যক্তির এরূপ আঘাতে সে তত কম ক্ষুদ্ধ হবে। কারণ, এই প্রত্যাঘাতকে সে ন্যায্য বলেই মনে করবে। আহত ব্যক্তির আঘাত তাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে ব্যর্থ হবে। ঠিক নয় কি গ্লকন?

ঠিক সক্রেটিস।

কিন্তু যখন সে মনে করবে সে অন্যায়ভাবে আহত, তখন তার ক্রোধ উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, সে উত্তেজিত হয়ে উঠবে এবং মনে করবে সে ন্যায়ের পক্ষে রয়েছে। তার আঘাতকারী অন্যায়ের পক্ষে। এমন অবস্থায় আঘাতকারীর জন্য ক্ষুধা, হিম-কষ্ট কিংবা অপর যে-দুর্ভোগে সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার প্রতিজবাবের জন্য সে প্রতিজ্ঞায় অধিকতর দৃঢ় হয়ে উঠবে। তার এই মহৎ বিক্রম-বোধ প্রতিপক্ষকে হত্যা করা কিংবা এ-দ্বন্দ্বে নিজে নিহত না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হবে না। কিংবা বলা চলে তার অন্তরের মেষপালক অর্থাৎ তার বিবেক যতক্ষণ তার ক্রুদ্ধ কুকুরকে গর্জন বন্ধ করতে না বলবে ততক্ষণ তার ক্রোধ প্রশমিত হবে না।

সক্রেটিস, তোমার দৃষ্টান্তটি একেবারে ত্রুটিহীন। আমাদের রাষ্ট্রে সহযোগী অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী হচ্ছে কুকুর এবং শাসকরা হচ্ছে মেষপালক। আমাদের রাষ্ট্রেও কুকুর তার মেষপালকের নির্দেশই পালন করবে।

তুমি আমার কথাটি ঠিক ধরতে পেরেছ, গ্লকন। কিন্তু আর-একটি বিষয় তুমি বিবেচনা করে দ্যাখো।

কী বিষয়?

তোমার হয়তো স্মরণ আছে, এই বিক্রম বা তেজ আমাদের কাছে প্রথমে একটা বাসনা বা ইচ্ছা বলেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু এখন আমাদের সে-মতটি পরিবর্তন করতে হয়। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আত্মার দ্বন্দ্বে বিক্রম বিবেকের পক্ষ অবলম্বন করে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা অবশ্যই ঠিক, সক্রেটিস।

কিন্তু এখানে আর-একটি প্রশ্নেরও জবাব আবশ্যক : বিক্রম কি বিবেক থেকে পৃথক, অথবা বিক্রম বিবেকেরই আর-একটি রূপ? যদি বিক্রম বিবেক হয় তা হলে আত্মার উপাদান তিনটি নয়, দুটি : প্রজ্ঞা এবং প্রবৃত্তি। আর তা যদি না হয় তা হলে রাষ্ট্র যেমন বণিক, সৈনিক এবং শাসক এই তিন শ্রেণী দিয়ে গঠিত হয়েছে তেমনি আত্মারও একটি তৃতীয় উপাদান থাকবে। এই তৃতীয় উপাদান হবে বিক্রম। এবং কু-শিক্ষা যদি তাকে কলুষিত করে না ফেলে তা হলে সে প্রজ্ঞার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে?

গ্লকন বললেন ঃ তা হলে আত্মার একটি তৃতীয় উপাদান থাকতে হয়।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, গ্লকন, বিক্রম যখন প্রবৃত্তি থেকে পৃথক বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, তখন সে যদি প্রজ্ঞা থেকেও পৃথক হয় তা হলে তাকে আমরা আত্মার তৃতীয় উপাদান বলে ধরতে পারি।

গ্লকন বললেন ঃ বিক্রম যে প্রজ্ঞা থেকেও পৃথক, এটি সহজেই প্রমাণ করা যায়। ছোট শিশুদের কথা ধরো। শিশুদের মধ্যে প্রায় জন্মের পর থেকেই আমরা তেজ বা সাহসের গুণ দেখতে পাই। কিন্তু তাদের কারোর মধ্যে বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার বিকাশ আদৌ না ঘটতে পারে এবং প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে বেশ বিলম্বে।

চমৎকার বলেছ, গ্লকন। তা ছাড়া পশুদের মধ্যেও আমরা সমভাবেই তেজের সাক্ষাৎ পাই। আর এ-সত্য তোমার কথার যথার্থতাকে অধিকতর জোরদার করে তোলে। এক্ষেত্রে আমরা আবার হোমারকে উদ্ধৃত করে বলতে পারি ঃ

সে তার বক্ষে করাঘাত করল এবং আত্মাকে ভর্ৎসনা করল[১] ... কারণ এই শ্লোকে কবি যে-যুক্তিহীন ক্রোধকে ভর্ৎসনা করছে তাকে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারকারী শক্তি থেকে পৃথক বলেই সে বিবেচনা করছে।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

তা হলে গ্লকন, সমুদ্রের অনেক দোলার পরে আমাদের তরী নিয়ে আমরা তীরে পৌঁছেছি, একথা বলতে পারি। এখন আমরা একমত যে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে-উপাদান, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেই উপাদান। ব্যক্তির আত্মার উপাদানও তিনটি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা খুবই ঠিক।

তা হলে আমরা কি বলব না যে, রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা যাতে নিহিত, ব্যক্তির প্রজ্ঞাও তাতে নিহিত?

অবশ্যই আমরা একথা বলব।

তা ছাড়া আমরা আরও বলব ঃ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যে-গুণকে আমরা বিক্রম বলি, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সেই গুণকে আমরা বিক্রম বলব। অন্যান্য গুণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির সম্পর্ক অনুরূপ।

অবশ্যই।

---

১. হোমার ঃ ওডিসি

এবং রাষ্ট্রকে আমরা যেমনভাবে ন্যায়পরায়ণ বলি, ব্যক্তিকেও আমরা সেইভাবে ন্যায়পরায়ণ বলব।

হ্যাঁ, এ তো একটা অনুসিদ্ধান্ত।

আর একথাও আমরা বিস্মৃত হব না যে, রাষ্ট্রের ন্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রের তিনটি শ্রেণীর আপন-আপন কর্তব্য সাধন করা?

না, একথা আমরা বিস্মৃত হতে পারিনে।

আর একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির স্বভাবের যা উপাদান সেই উপাদান যখন নিজ নিজ কার্যসাধন করে তখনই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হয়, তখনই ব্যক্তি তার নিজ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে।

তা হলে যে-বিবেক হচ্ছে প্রাজ্ঞ এবং আত্মাকে রক্ষা করা যার দায়িত্ব সেইই আত্মাকে শাসন করবে এবং বিক্রম তার সহায়ক হবে?

অবশ্যই সক্রেটিস।

তা হলে আমরা বলতে পারি সঙ্গীত এবং শরীরচর্চা যুক্তভাবে প্রজ্ঞাকে মহৎ বাক্যে এবং শিক্ষায় সঞ্জীবিত রাখবে; সঙ্গতি এবং ছন্দের মাধ্যমে তারা বিক্রমের বন্যতাকে নম্র করে আনবে এবং তাকে ভদ্র করে তুলবে? ঠিক নয় কি, গ্লকন?

হ্যাঁ সক্রেটিস, তুমি ঠিক বলেছ।

তা হলে এমনিভাবে পরিপোষিত এবং শিক্ষিত প্রজ্ঞা এবং বিক্রম, যে-প্রজ্ঞা এবং বিক্রম জানে তাদের করণীয় কী, তারাই আমাদের প্রবৃত্তিকে শাসন করবে। আমাদের আত্মার অধিক পরিমাণ হচ্ছে এই প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির বাসনার শেষ নেই। প্রজ্ঞা এবং বিক্রমের দায়িত্ব হবে এই প্রবৃত্তির উপর সতর্ক প্রহরা রক্ষা করা যেন সে দেহের আরাম এবং আয়েশের প্রাচুর্যে স্ফীত হয়ে নিজের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে, যারা স্বভাবতভাবে তার শাসিত প্রজা নয় তাদেরও তার দাসে পরিণত করার চেষ্টা করে ব্যক্তির সমগ্র জীবনকে গ্রাস করতে না পারে।

যথার্থ কথা সক্রেটিস।

কিন্তু প্রজ্ঞা ও বিক্রম যুক্ত হলে নিশ্চয়ই তারা সমগ্র আত্মার সর্বোত্তম রক্ষকে পরিণত হতে পারবে এবং আমাদের দেহকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে। কারণ প্রজ্ঞা তখন নির্দেশ দেবে এবং বিক্রম তার নির্দেশ অনুযায়ী সাহসের সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

অবশ্যই, সক্রেটিস।

আর সাহসী বলব আমরা তাকেই যার বিক্রম আনন্দ কিংবা ক্লেশ—সর্ব অবস্থায় কাকে ভয় করা সঙ্গত এবং কাকে ভয় করা সঙ্গত নয় সে-প্রশ্নে প্রজ্ঞার আদেশ শিরোধার্য বলে স্বীকার করে।

গ্লকন বললেন ঃ ঠিক কথা।

আর প্রজ্ঞা বলব আমরা তাকে যার মধ্যে শাসনের সেই মূল গুণটি আছে, যে-গুণের শক্তিতে সে অপরকে নির্দেশ দিতে পারে, যে-গুণ জানে আত্মার তিনটি উপাদানের কার কী করণীয় এবং সমগ্রভাবে আত্মার কী করণীয়।

অবশ্যই, সক্রেটিস।

এবং পরিমিত তুমি কাকে বলবে? পরিমিত নিশ্চয়ই তাকে বলবে যার মধ্যে এইসব উপাদানের পারস্পরিক সুমিত্র-সঙ্গতিকে তুমি প্রত্যক্ষ করবে—অর্থাৎ যার মধ্যে শাসকরূপ প্রজ্ঞা এবং শাসিতরূপ বিক্রম এবং প্রবৃত্তি সকলেই এরূপ ঐকমত্য পোষণ করছে যে প্রজ্ঞারই শাসন করা সঙ্গত এবং প্রজ্ঞার শাসনের বিরুদ্ধে বিক্রম এবং প্রবৃত্তি বিদ্রোহের কোনো মনোভাব পোষণ করে না। ঠিক নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ ঠিকই সক্রেটিস। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কিংবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিমিতি বোধ বা সংযমের এই হচ্ছে সত্যিকার সংজ্ঞা।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, আর ন্যায়বান আমরা কাকে বলব, অর্থাৎ কোনো গুণের কারণে কেউ ন্যায়পরায়ণ হবে, তা তো আমরা বারংবারই বলেছি। নয় কি?

নিশ্চয়ই। আমরা তা বলেছি।

তা হলে ব্যক্তির মধ্যে ন্যায় কি রাষ্ট্রের তুলনায় অনুজ্জ্বল এবং ভিন্ন কিছু কিংবা রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা যেরূপ দেখেছি, ব্যক্তির মধ্যেও আমরা তাকে সেরূপই দেখতে পাব?

গ্লকন বললেন ঃ আমি তো এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখিনে।

ঠিকই। কিন্তু তবু এখনও যদি কোনো সন্দেহ আমাদের মনে থেকে থাকে তা হলে সাধারণ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারাই আমাদের কথার সত্যতা আমরা প্রমাণ করতে পারি।

তুমি কীরূপ দৃষ্টান্তের কথা বলছ, সক্রেটিস?

ধরো, আমাদের বলা হল ঃ কিছু স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য জমা রাখা রয়েছে একটি রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তির কাছে। এখন এই অর্থের নিশ্চয়তা কী? এক্ষেত্রে আমরা কি

বলব না, যে-রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি ন্যায়বান তার দ্বারা এই অর্থ অপহৃত হওয়ার আশঙ্কা, অন্যায় রাষ্ট্র কিংবা অন্যায় ব্যক্তির দ্বারা এর অপহৃত হওয়ার চেয়ে অবশ্যই কম? কেউ কি এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে?

গ্লকন বললেন : না, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

ন্যায়বান ব্যক্তি কিংবা নাগরিক কি তার সুহৃদ কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা কিংবা চৌর্য বা অধমের কোনো কার্যে লিপ্ত হতে পারে?

কখনোই না।

যে ন্যায়বান সে শপথ কিংবা চুক্তিকেও ভঙ্গ করতে পারে না?

না, একাজ করা তার পক্ষে অসম্ভব।

তা ছাড়া ব্যভিচার, পিতামাতার অসম্মান বা ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থতাও ন্যায়বানের চরিত্রেই সবচেয়ে কম সংঘটিত হবে। নয় কি?

অবশ্যই।

তার কারণ, শাসন করার ক্ষেত্রে কিংবা শাসিত হওয়ার ক্ষেত্রে তার চারিত্রিক উপাদানসমূহ আপন-আপন কর্তব্য সম্পাদন করে।

হ্যাঁ, যার যে-কাজ সে তা-ই সম্পাদন করে।

তা হলে এরূপ রাষ্ট্র বা চরিত্রগঠনের মূলে যে ন্যায় বিরাজ করছে সেকথা স্বীকারে তোমার নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হবে না? কিংবা তুমি এর মূলে অপর কোনো গুণকে আবিষ্কার করার প্রত্যাশা কর, গ্লকন?

না সক্রেটিস, আমার সেরূপ কোনো প্রত্যাশা নেই।

তা হলে, গ্লকন, আমরা বলতে পারি, আমাদের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। গোড়াতেই আমার অনুমান করেছিলাম, এই নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো ঐশ্বারিক শক্তি ন্যায়ের একটি মৌলিক রূপের দিকে আমাদের টেনে নিচ্ছে। আমাদের সে-অনুমান এবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই, সক্রেটিস।

এবং শ্রমের যে-বিভাগের কথা আমরা বলেছি, শ্রমের যে-বিভাগে সূত্রধরের কার্য সূত্রধর সম্পাদন করে, পাদুকাকার পাদুকা তৈরি করে এবং অনুরূপভাবে প্রত্যেক নাগরিক আপন-আপন কর্তব্য সম্পাদন করে, অপরের কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করে না—শ্রমের সে-বিভাগ ন্যায়েরই প্রতিরূপ। আর সে-কারণেই এই শ্রমবিভাগ সার্থক। নয় কি?

নিঃসন্দেহে সক্রেটিস।

এবং যথার্থভাবে বলতে গেলে যে-ন্যায়ের কথা আমরা বলছি, সে-ন্যায় মানুষের বাইরের কোনো ব্যাপার নয়, সে হচ্ছে মানুষের অন্তরের ব্যাপার, তার যথার্থ আত্মার ব্যাপার। আর এই যথার্থ আত্মার চিন্তাই হচ্ছে মানুষের সত্যকার চিন্তা। কারণ, ন্যায়বান ব্যক্তি তার অন্তরের বিভিন্ন উপাদানের একটিকে যেমন অপরের দায়িত্বে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না, তেমনি একের কাজকে অপরের করণীয় করেও তোলে না। সে নিজের জীবনকে সংঘবদ্ধ করে তোলে। সে নিজেই তার জীবনের এবং বিধানের প্রভু। তার নিজের সঙ্গে তার কোনো বিরোধ নেই। এবং ব্যক্তি যখন তার অন্তরের তিনটি নীতিকে ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করতে সক্ষম হয়েছে, বলা চলে স্বরগ্রামের উচ্চ, মধ্য ও নিম্নস্বরকে যখন সে ঐকতানে একত্রিত করেছে, সুরের বিভিন্নতা যখন বিলুপ্ত হয়েছে, যখন সুরের মধ্যে পরিমিতি এবং স্বভাবের সাযুজ্য সৃষ্ট হয়েছে তখনই মাত্র তার সক্রিয় সিদ্ধান্তের সময় সমুপস্থিত। সম্পত্তি, দেহের ব্যায়াম বা রাজনীতি কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবসায়—যে-কোনো সমস্যায় এবার সিদ্ধান্তগ্রহণের জন্য সে প্রস্তুত। এ-বিচারে যা এই সঙ্গতির স্বার্থ বহন করে তাকে সে ন্যায় এবং উত্তম কাজ এবং যে-জ্ঞানের ভিত্তিতে এই ন্যায় ও উত্তম কাজের সাধন, তাকে সে প্রজ্ঞা বলে যেমন অভিহিত করে, তেমনি যা-কিছু এই সঙ্গতিকে বিনষ্ট করে তাকে সে অন্যায় এবং যে-অভিমতের ভিত্তিতে এই অন্যায়ের সাধন, তাকে সে অজ্ঞানতা বলে অভিহিত করে।

সক্রেটিস, তুমি এক্ষেত্রে যথার্থ সত্যকেই বিবৃত করেছ।

বেশ। তা হলে আমরা যদি বলি যে, আমরা এবার ন্যায়বান মানুষ এবং ন্যায়বান রাষ্ট্রকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছি এবং আমরা স্থির করতে পেরেছি ব্যক্তির মধ্যে এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়ের প্রকৃতি কী, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা মিথ্যাচারের দায়ে দোষী বলে বিবেচিত হব না?

নিশ্চয়ই না, সক্রেটিস।

তা হলে এসো আমরা আমাদের আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করি।

এসো, আমরা তা-ই করি।

আমি বললাম : এবার তা হলে 'অন্যায়ের' বিষয়টিও আমাদের বিবেচনা করতে হয়?

অবশ্যই।

কাকে আমরা অন্যায় বলব? অন্যায় তো অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, অপরের কাজে নাক গলানো। অন্যায় হচ্ছে আত্মার সমগ্র সত্তার বিরুদ্ধে তার

কোনো-একটি উপাদানের বিদ্রোহ। অন্যায় হচ্ছে যথার্থ শাসকের বিরুদ্ধে অবাধ্য শাসিতের অযৌক্তিক বিদ্রোহ। আমাদের চারিদিকে আত্মবঞ্চনা এবং বিভ্রমের সংযমহীনতা এবং কাপুরুষতা এবং অজ্ঞানতার যে-বিস্তার—এসব অন্যায় বই আর কী?

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

এবং আমরা যদি ন্যায় এবং অন্যায়ের প্রকৃতি জানতে পারি, তা হলে 'অন্যায় কার্য' এবং 'অন্যায়কারী' এবং 'ন্যায় কার্য' এবং 'ন্যায়কারী'র অর্থও আমাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে। নয় কি?

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ কেন গ্লকন, এতে বিস্ময়ের কী আছে? ন্যায় এবং অন্যায় হচ্ছে সুস্থতা এবং অসুস্থতার মতো। আমাদের দেহের মধ্যে সুস্থতা এবং অসুস্থতার অবস্থান যেরূপ, আত্মার মধ্যেও ন্যায় এবং অন্যায়ের অবস্থান সেরূপ।

কেমন করে?

আমি বললাম ঃ কেন, যা সুস্থতা তা-ই কি স্বাস্থ্যের কারণ নয় এবং যা অসুস্থতা তা কি আমাদের অসুখের কারণ নয়?

তা বটে।

তেমনি ন্যায় কর্মই ন্যায়ের সৃষ্টি করে, অন্যায় কর্ম অন্যায়ের সৃষ্টি করে। নয় কি।

হ্যাঁ, এটাও নিশ্চিত।

শরীরের মধ্যে স্বাস্থ্যের সৃষ্টি হচ্ছে দেহের মধ্যে যার যা করণীয় তার ভিত্তিতে স্বাভাবিক শাসনের প্রতিষ্ঠা; দেহের মধ্যে অসুখ হচ্ছে এই স্বাভাবিক শাসনেরই ব্যত্যয়। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আর আত্মার মধ্যে ন্যায়ের সৃষ্টিও হচ্ছে আত্মার যে-উপাদানের যা করণীয় তার ভিত্তিতে একটি স্বাভাবিক শাসনের প্রতিষ্ঠা। আত্মার মধ্যে অন্যায়ের উদ্ভবও ঘটে এই স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থার ব্যত্যয়ে।

খুবই যথার্থ।

তা হলে ধর্ম বা ন্যায় হচ্ছে আত্মার স্বাস্থ্য, আত্মার সৌন্দর্য এবং আত্মার মঙ্গল। এবং আত্মার অধর্ম বা অন্যায় হচ্ছে তার পাপ, তার অস্বাস্থ্য, তার হীনতা এবং তার বিকার। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আবার দ্যাখো, উত্তম আচরণেই উত্তম বা ধর্মের সৃষ্টি, পাপাচারেই পাপের সৃষ্টি। তুমি কী বল?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু গ্লকন, ন্যায় এবং অন্যায়ের লাভ-লোকসানের আমাদের পুরনো প্রশ্নটির এখনও জবাব দেওয়া হয়নি। প্রশ্ন ছিল ঃ কোনটি লাভজনক? ন্যায়বান হওয়া এবং ন্যায় কর্ম সাধন করা, ধর্মকে কর্মের নীতি করা, সে-কাজ মানুষ কিংবা দেবতা দেখুক কিংবা না-দেখুক; অথবা অন্যায়কারী হওয়া এবং দণ্ডকে এড়ানো গেলে অন্যায় কর্ম সাধন করা?

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, আমার মতে প্রশ্নটি এখন অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আমরা জানি, দেহের স্বাস্থ্য যদি ভেঙে পড়ে তা হলে তুমি যতই মাংস এবং মদ্য, সম্পদ এবং শক্তির যোগান দাও-না কেন, জীবন আর সহনীয় থাকে না। তেমনি আমরা বলব, জীবনের মূল শক্তি যেখানে শিকড়হীন এবং দূষিত হয়ে পড়েছে সেখানে ব্যক্তি ধর্মের পথ ত্যাগ করে। পাপাচারের সংশোধনকে অস্বীকার করে জীবনে দুর্মদ হয়ে সে মনে করে তার জীবন খুব মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, তুমি ঠিকই বলেছ। প্রশ্নটি এখন হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আমরা যখন সত্যের সন্নিকটে পৌঁছে গেছি এবং সত্যকে আবরণহীনভাবে অবলোকন করার মুহূর্ত যখন সমুপস্থিত তখন সংজ্ঞা হারানো আমাদের অনুচিত। সত্যকে লাভ করার চেষ্টাটি শেষ মুহূর্তে আমাদের পরিত্যাগ করা সঙ্গত নয়।

গ্লকন বললেন ঃ অবশ্যই নয়।

আমি বললাম ঃ তা হলে এই স্থানটিতে আর-একটু এগিয়ে এসো এবং অন্যায় এবং অধর্মের যত রূপ আমাদের দর্শন করা আবশ্যক, এসো আমরা তা দর্শন করি।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ সক্রেটিস, আমি তোমাকে অনুসরণ করে এগিয়ে আসছি।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, যুক্তিটি এবার পর্যবেক্ষণের চূড়ায় যেয়ে আরোহণ করেছে। এখান থেকে কেউ নিচের দিকে তাকালে ধর্ম বা ন্যায়কে সে এক বলেই দেখতে পাবে। কিন্তু অধর্মের রূপ বিচিত্র। তাকে সে বিচিত্ররূপেই

দেখতে পাবে। এই রূপের মধ্যে অধর্মের চারটি রূপের আমরা উল্লেখ করতে পারি। অধর্মের এ-চারটি রূপ উল্লেখযোগ্য।

গ্লকন বললেন ঃ তোমার এ কথার অর্থ কী সক্রেটিস?

আমি বললাম, আমার কথার অর্থ হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রের যত রূপ দেখা যায় আত্মার রূপও তুমি ততটি দেখতে পাবে।

এ-রূপ কতটি?

আমি বললাম ঃ রাষ্ট্রের রূপ পাঁচটি এবং আত্মার রূপ পাঁচটি।

তারা কী সক্রেটিস?

প্রথম রূপটির বর্ণনাই আমরা দিচ্ছিলাম। একে তুমি রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্র—এই দুনামেই অভিহিত করতে পার। এদের পার্থক্য কেবল সংখ্যার ক্ষেত্রে; শাসনকার্য কি একটিমাত্র অভিজাত ব্যক্তি পরিচালনা করছে, না একাধিক অভিজাত দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যেই এর পার্থক্য।

ঠিকই, সক্রেটিস।

কিন্তু দুটো নাম দিলেও এদের রূপ একটিই। কারণ আমরা রাষ্ট্রশাসনের যে-নীতি নির্দিষ্ট করেছি সেই নীতি অনুযায়ী শাসককুলকে শিক্ষিত করা হলে শাসনকার্য একের হাতে ন্যস্ত হোক কিংবা একাধিকের হাতে, তাতে আমাদের শাসনের মূলনীতি বিনষ্ট হবে না। মূলনীতি রক্ষিত হবে।

গ্লকন বললেন ঃ তোমার একথাও সত্য, সক্রেটিস।

পঞ্চম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১২
[৪৪৯—৪৫৭]

মেয়ে এবং পুরুষের সমতা

রিপাবলিকের প্রধান বিষয় যদি ন্যায়ের অন্বেষণ এবং ন্যায়ের সংজ্ঞাদান হয় তা হলে সে কার্য সমাধা হয়েছে বলা চলে। সক্রেটিস রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায় কী তা নির্ধারণ করেছেন, তার সংজ্ঞা দিয়েছেন। রাষ্ট্রের অনুরূপ, ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়ের উপাদান বলতে কী বোঝায় তাও তিনি বলেছেন। মূল আলোচনার অবশিষ্ট থাকে, এই ন্যায়ের ব্যতিক্রমে ব্যক্তির দেহের মতো রাষ্ট্র কীরূপে তার সঙ্গতি হারিয়ে নানাপ্রকার ত্রুটিপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্ম দেয় তা দৃষ্টান্তসহকারে দেখানো, আর্দশ রাষ্ট্রের মানদণ্ডে পরিমাপ করে কোন্ প্রকার বাস্তব রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কতখানি বিচ্যুত তা প্রকাশ করা। এ ছাড়া ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই যে সুখী, অন্যায় রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি নয় তাও এই পর্যায়ে প্রমাণ করা। কিন্তু এই মুহূর্তে সক্রেটিস যুক্তির সেই পর্বে যেতে চাইলেও তাঁর সঙ্গীগণ তাঁকে বাধা দেন। তাঁদের দাবি 'মেয়েরা বন্ধুজনদের যৌথ সম্পত্তি' [৪২৪ দ্রঃ] বলে সক্রেটিস পূর্বে যে-মন্তব্য করেছিলেন, তা তাঁকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

তাই মূল আলোচনা থেকে সরে যেয়ে পার্শ্বীয় আলোচনা হিসাবে আমরা পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুস্তকে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের এবং তার উৎকৃষ্টতা বা অপকৃষ্টতা সম্পর্কে আলোচনা দেখতে পাই। এই আলোচনার দুটি পর্যায় ঃ ১. রাষ্ট্রে মেয়েদের দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত পরিবারের বিলোপ। ২. ইতিপূর্বে অভিভাবকদের শাসক এবং সহায়ক বা সৈন্যবাহিনীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এবার অভিভাবকদের গুণ এবং তাদের শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয় শিক্ষারও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

এখানে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিগত পরিবারের বিলোপের ক্ষেত্রে এর মূলনীতি এবং এর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন।

সমসাময়িক এথেন্সের সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাসের পটভূমিতে প্লেটোর অভিমত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মেয়েদেরও পুরুষের মতো সামাজিক

ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণের সমান অধিকার থাকা উচিত—এ-প্রশ্ন গ্রীসের সমাজজীবনে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তখনও সাধারণভাবে মেয়েরা গুণের এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, এই বিশ্বাসই প্রবল। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মেয়েদের তখনও প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। এই বিশ্বাসের আভাস এরিষ্টটলের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সক্রেটিস যখন বলেন, সন্তানধারণের ক্ষেত্র ব্যতীত গুণের প্রশ্নে মেয়ে এবং পুরুষের মধ্যে তিনি অপর কোনো পার্থক্য দেখেন না তখন সে-অভিমত একেবারে অভিনব না হলেও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের সে বিরোধী এবং তার চেয়ে অগ্রসর। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে এই অভিমত প্রকাশের পূর্বে সক্রেটিসের দ্বিধার মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসের প্রভাবের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, একথা বলা চলে। তাই মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে শরীরচর্চায় নগ্নদেহে অংশগ্রহণ করবে—এ-প্রস্তাব প্রকাশে সক্রেটিস বিশেষ শঙ্কিত। তাঁর এই শঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। কারণ, একমাত্র স্পার্টা ব্যতীত মেয়েদের এরূপ রাষ্ট্রীয় ভূমিকা অপর কোনো গ্রীসীয় রাষ্ট্রে স্বীকৃত ছিল না। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে এরূপ প্রস্তাবের চেয়ে সক্রেটিসের মূলনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির একটি হচ্ছে ঃ রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির মধ্যে রাষ্ট্রের স্বার্থই প্রধান। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঃ রাষ্ট্রের ঐক্য এবং শক্তির স্বার্থে পুরুষের সঙ্গে মেয়েরাও সমান এবং একই দায়িত্ব বহন করবে। কেবলমাত্র দৈহিক গঠনের কারণে যে-কাজে অধিক পরিশ্রম আবশ্যক সে-কাজের দায়িত্ব পুরুষকে দেওয়া হবে। মেয়েদের হালকা কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এবং পরিবার ও সন্তানের উপর অভিভাবক (শাসক এবং সৈনিক)-এর যৌথ স্বামিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমরা যেরূপ বর্ণনা করেছি সেরূপই হচ্ছে একটি উত্তম নগর বা রাষ্ট্র। সত্যিকারের উত্তম মানুষের রূপও এমনই। আমাদের একথা যদি সত্য হয় তা হলে এর বিপরীত যা তা মিথ্যা হবে। আর যা মিথ্যা বা অন্যায় তা কেবল রাষ্ট্রের বিন্যাসকেই বিনষ্ট করে না, সে ব্যক্তির আত্মার যে-শৃঙ্খলা বা বিন্যাস তাকেও বিনষ্ট করে। এই বিনাশ বা বিকারের চারটি রূপ আমরা দেখতে পাই।

সে-রূপগুলি কী, সক্রেটিস?

এই বিকারের চারটি রূপ কেমন করে একটির পরে অপরটি উদ্ভূত হয় সেকথাটি আমি বলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময়ে পলিমারকাসের হাবভাবটি আমার নজরে এল। পলিমারকাস এ্যাডিম্যান্টাস থেকে একটু দূরে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি দেখলাম, তিনি এবার এ্যাডিম্যান্টাসের কানে ফিসফিস করে কী যেন বলছেন। তিনি হাত বাড়িয়ে এ্যাডিম্যান্টাসের গাত্রাবরণের ঊর্ধ্বভাগ আকর্ষণ করে তাঁকে তাঁর নিকটে টেনে নিলেন এবং তাঁর কানের কাছে ঝুঁকে কিছু বললেন, তাঁর সব কথা আমি শুনতে পেলাম না, কিন্তু কয়েকটি শব্দ তবু আমার কানে এল। পরিমারকাস বলছেন ঃ কী হে, সক্রোটিসকে আমরা এমনিভাবে ছেড়ে দেব? তুমি কী বল?

এ্যাডিম্যান্টাস শব্দ করে বললেন ঃ নিশ্চয়ই না। তাঁকে আমরা ছেড়ে দিতে পারিনে।

এবার আমি বলে উঠলাম ঃ কী হে এ্যাডিম্যান্টাস, কাকে তুমি ছেড়ে দেবে না?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তোমাকে।

আমি বললাম ঃ কেন, আমাকেই তোমরা এরূপ বিশেষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করলে কেন?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ কারণ তুমি আলস্য দেখাচ্ছ! তুমি আমাদের ফাঁকি দিতে চাচ্ছ, সক্রেটিস। এ-কাহিনীর যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, তুমি সেই পুরো অধ্যায়টি এড়িয়ে যেতে চাচ্ছ। তুমি মনে করছ, তোমার এই পাশ কাটিয়ে যাওয়াকে আমরা ধরতে পারব না। তুমি বলেছিলে ঃ স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততির ওপর বন্ধুজন সকলের সমষ্টিগত অধিকার। কারণ যারা বন্ধু সকল দ্রব্যেই তাদের সমান অধিকার।[১] তুমি কথাটি বলেই খালাস। যেন সকলের কাছেই কথাটি স্বতঃসিদ্ধ।

আমি বললাম ঃ কেন এ্যাডিম্যান্টাস, আমার কথাটি কি ঠিক নয়?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ সক্রেটিস, তোমার কথাটি ঠিক। কিন্তু অন্যত্র যেরূপ, বর্তমান ক্ষেত্রেও তেমনি 'ঠিকের' ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ 'যৌথ স্বত্ব'-র প্রকারভেদ থাকতে পারে। তুমি আমাদের দয়া করে বলো 'যৌথ স্বত্ব বা মালিকানা' বলতে তুমি কী বোঝাতে চেয়েছে। কারণ আমরা বহুক্ষণ ধরে আশা

---

১. ৪২৪ দ্রষ্টব্য। সংলাপের উক্ত স্থানে সক্রেটিস প্রথমবারের মতো সাম্যবাদী নীতির উল্লেখ করেন।

করছি, আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের নাগরিকদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে তুমি কিছু বলবে ঃ কেমন করে তারা সন্তান উৎপাদন করবে, জন্মের পরে কেমন করে সন্তানদের প্রতিপালন করা হবে এবং বিশেষ করে নারী এবং সন্তানের উপর যৌথ স্বামিত্বের প্রকৃতি কী—এ-সম্পর্কে তোমার বক্তব্য আমরা শুনতে চাই। কারণ, আমরা মনে করি, এ-বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। এ-বিষয়গুলির সঠিক কিংবা বেঠিক ব্যবস্থাপনার পরিফল আমাদের রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আবশ্যই গভীর হতে বাধ্য। কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাব আমরা এখনও পাইনি। অথচ তুমি ভিন্নতর রাষ্ট্রের আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছ। এ-কারণেই আমরা স্থির করেছি, এই সমস্যাগুলির সমাধানের পূর্বে আমরা তোমাকে ছাড়ছিনে। আর এ ভালোই হয়েছে, আমাদের সিদ্ধান্তের কথাটি তুমি শুনে ফেলেছ।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ আর কথা বাড়িয়ে লাভ কী? সক্রেটিস, তুমি ধরে নিতে পার, এ-ব্যাপারে আমরা সবাই একমত।

আমি বললাম ঃ তোমরা জান না আমাকে এরূপ আক্রমণ করে কোন্ বিপদের দ্বার তোমরা উম্মুক্ত করে দিচ্ছ! তোমরা জান না, রাষ্ট্রের কী সাংঘাতিক সমস্যার কথা তোমরা খুঁচিয়ে তুলছ! কী আশ্চর্য! আমি যখন ভাবছিলাম, প্রশ্নটিকে এড়ানো গেছে এবং আমি তখন যা বলেছিলাম তাকে তোমরা বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছ দেখে আমি যখন উৎফুল্ল বোধ করছিলাম তখনই তোমরা আমাকে আবার সেই মূল থেকে শুরু করতে বলছ! অথচ এর অর্থ কী তোমরা জান না। তোমরা জান না, এই প্রশ্ন করে সমস্যার কোন ভিমরুলের চাকে তোমরা প্রস্তর নিক্ষেপ করছ। এই সংকটেরই আমি আশঙ্কা করছিলাম। আর এ-কারণেই আমি একে এড়াতে চেয়েছিলাম।

থ্র্যাসিমেকাস বললেন ঃ সক্রেটিস, আমরা এখানে কেন এসেছি? সে কি স্বর্ণের সন্ধানে, না আলোচনা শ্রবণের জন্য?

আমি বললাম ঃ তা বটে। কিন্তু আলোচনারও একটা সীমা থাকা আবশ্যক।

গ্লকন বললেন ঃ ঠিকই সক্রেটিস। কিন্তু সে-সীমা হচ্ছে জীবনের সীমা। জ্ঞানী যাঁরা তাঁরা এমন আলোচনার সীমা কেবল জীবনের পরিধি দ্বারাই নির্দিষ্ট করেন। সে যাহাকে, আমাদের নিয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। তুমি যেমন প্রয়োজন বোধ কর তেমনভাবে অগ্রসর হয়ো। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ অভিভাবক বা শাসকদের জন্য কোন্ ধরনের যৌথ পরিবার অর্থাৎ যৌথ স্ত্রী এবং সন্তানের কথা চিন্তা করছ? তা ছাড়া জন্ম এবং শিক্ষার মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সময়ের ব্যবস্থাটিও-বা কীরকম হবে। এই বিষয়গুলি তুমি ব্যাখ্যা করো, সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ প্রিয় বন্ধু, তোমার প্রশ্নটি সহজ কিন্তু এর জবাবটি সহজ নয়। আমরা অপর যে-সিদ্ধান্ত করেছি তার চেয়ে এক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ অধিক। কারণ এক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা চলে। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, পরিকল্পনাটি সম্ভব হলেও, এটি যে সর্বোত্তম তার নিশ্চয়তা কী? এ-প্রশ্নও তোলা চলে। এ-কারণেই বিষয়টির আলোচনায় আমার দ্বিধা ছিল, পাছে সমাধানের যে-আশা আমরা পোষণ করছি তা পরিণামে স্বপ্নে পর্যবসিত হয়ে যায়।

তুমি ভীত হয়ো না, সক্রেটিস। তোমার শ্রোতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই তোমার উপর নির্দয় হবে না। আমরা অবিশ্বাসী কিংবা তোমার বিরুদ্ধবাদী নই।

আমি বললাম ঃ প্রিয়বর! আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছ।

হ্যাঁ, আমি তোমাকে অভয় দিচ্ছি।

আমি বলব, গ্লকন তুমি বরঞ্চ তার বিপরীত কাজটিই করে চলেছ। তোমার অভয়বাণীতে আমি যথার্থই উৎসাহিত হতাম যদি আমি বিশ্বাস করতাম, আমি যে-সমস্যার আলোচনা করছি, তার সমাধান আমি জানি। যারা জ্ঞানী এবং যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজের সত্যোপলব্ধির বিষয় প্রকাশ করাতে ভয়ের কিছু নেই, তা আমি জানি। কিন্তু যে-সমস্যায় আমি নিজেই দ্বিধাসঙ্কুল সেখানে সে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। বিপদ এই নয় যে, আমি উপহসিত হব। সেরূপ ভয় হবে শিশুর ভয়। আমার ভয় হচ্ছে, সত্যের দৃঢ় পদস্থাপনার আবশ্যক যেখানে সবচেয়ে বেশি সেখানে হয়তো আমি সত্যভ্রষ্ট হয়ে পদস্খলিত হয়ে পড়ব। এবং সে-পতনে আমার সুহৃদবর্গেরও পতন ঘটবে। আমার প্রার্থনা, যে-বাণী আমি উচ্চারণ করতে যাচ্ছি অদৃষ্টদেব যেন না তাকে আমার জন্য সত্য করে তোলেন। কারণ আমি যথার্থই বিশ্বাস করি সুন্দর, উত্তম এবং ন্যায়ের প্রশ্নে সেচ্ছাপ্রতারণার চেয়ে অনিচ্ছুক নরহত্যা লঘু অপরাধ। এবং এরূপ অপরাধের ঝুঁকি বরঞ্চ আমি শত্রুর সঙ্গে নেব, তবু আমার বন্ধুজনকে আমি প্রতারণা করতে চাইব না। কাজেই তোমার উৎসাহে আমি অভয়বোধ করতে পারছিনে গ্লকন।

গ্লকন হেসে জবাব দিলেন ঃ সক্রেটিস, বেশ, তোমার যুক্তি যদি আমাদের কোনো অনিষ্টসাধন করে তা হলে তোমাকে আমরা নরহত্যার দায়ে দোষী করব না এবং তোমাকে প্রতারক বলেও আখ্যায়িত করব না—এ-প্রতিশ্রুতি আমরা পূর্ব থেকেই তোমাকে দিয়ে রাখছি। এবার তুমি নির্ভয়ে কথা বলো।

আমি বললাম ঃ কিন্তু আইন বলে যে, অভিযুক্ত আসামি যদি বেকসুর মুক্তি পায় তা হলে তার চরিত্রও নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমান যুক্তির ক্ষেত্রে আইনের এই বিধানটি সমভাবেই প্রযোজ্য।

তা হলে তুমি চিন্তা করছ কেন?

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আমার কিছু পিছিয়ে যাওয়া আবশ্যক, এবং পিছিয়ে যেয়ে যে-কথাটি আমার উপযুক্ত স্থানে বলা সঙ্গত ছিল সে কথাটি এখন আমাকে বলতে হবে। আমি বলব, পুরুষের ভূমিকা শেষ। তারা তাদের ভূমিকা পালন করেছে। এখন আসে মেয়েদের কথা। এবার আমি মেয়েদের কথা বলব। বস্তুত মেয়েদের কথা বলার জন্যেই তোমরা আমাকে অনুরোধ করেছ। এখানে বক্তব্য হচ্ছে ঃ আমাদের নাগরিকগণ যেরূপে শিক্ষিত হয়েছে তাতে মেয়েদের উপর এবং সন্তানের উপর মালিকানার প্রশ্নটিও আমরা আমাদের গৃহীত নীতির ভিত্তিতে স্থির করতে পারি। আমরা গোড়াতেই বলেছি, পুরুষরা হবে অভিভাবক বা শাসক এবং মেষপালের রক্ষক।

হ্যাঁ, আমরা এ-নীতিই স্থির করেছিলাম।

তা হলে মেয়েদের ব্যাপারটি কীরূপ হবে? ধরো, আমরা মেয়েদেরও পুরুষদের ন্যায় শিক্ষিত করে তুললাম, পুরুষের তুল্য নিয়মকানুন দিয়েই তারা পরিচালিত হল। তা হলেই আমরা বুঝতে পারব এর ফল আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপূরক কিংবা প্রতিবন্ধক।

তুমি কী বলছ, সক্রেটিস?

আমার কথাটিকে বরঞ্চ একটি প্রশ্নের আকারে আবার বলছি ঃ আমাদের শিকারি এবং প্রহরী-কুকুর সম্পর্কে আমরা কী করি? আমার কি তাদের মর্দ এবং মাদি কুকুর হিসাবে ভাগ করি? এরূপ জাতিভেদে তাদের কাজের কি কোনো পার্থক্য হয়? শিকার কিবা প্রহরার দায়িত্ব কি তারা সমভাবে পালন করে? না আমরা মেষপাল রক্ষার দায়িত্ব কেবলমাত্র মর্দ কুকুরের উপর ন্যস্ত করি এবং মনে করি মাদি কুকুরের দায়িত্ব কেবল কুকুর শাবক গর্ভে ধারণ করা এবং জন্মের পরে তাদের স্তন্যদান করা?

গ্লকন বললেন ঃ না, দায়িত্বের কোনো পার্থক্য থাকে না। তাদের উভয়ের দায়িত্বই এক। মর্দ এবং মাদি কুকুরের একমাত্র পার্থক্য এই যে, মর্দ কুকুর মাদি কুকুরের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

কিন্তু এদের যদি তুমি সমানভাবে প্রতিপালন না কর, সমান খাদ্যে তুমি যদি তাদের ভুক্ত না রাখ তা হলে সকল রকম পশুকে তুমি কি একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পার?

না সক্রেটিস, তা সম্ভব নয়।

ঠিক অনুরূপভাবে পুরুষের ন্যায় মেয়েদেরও যদি একই দায়িত্ব পালন করতে হয় তা হলে তাদের জন্য আমাদের একই প্রতিপালন এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

পুরুষদের জন্য আমরা সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার ব্যবস্থা করেছিলাম। নয় কি?

হ্যাঁ।

তা হলে মেয়েদেরও সঙ্গীতে এবং শরীরচর্চায় শিক্ষিত করতে হবে এবং পুরুষদের ন্যায় তাদেরও রণকৌশল আয়ত্ত করতে হবে। এ-বিষয়ে তুমি কী বল?

গ্লকন বললেন : আমার তো মনে হয়, এই সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

আমি বললাম : তবে আমার মনে হয়, আমাদের এমন কতকগুলি অসাধারণ প্রস্তাব আছে যেগুলি কার্যকর করতে গেলে তাদের অদ্ভুত বলে বোধ হতে পারে।

হ্যাঁ, এমন বোধ হওয়া সম্ভব।

এবং সবচেয়ে অদ্ভুত লাগবে পুরুষদের সঙ্গে নগ্নভাবে বয়স্ক মেয়েদেরও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ[১]। এ-দৃশ্য অবশ্যই মনোহর হবে না। বলি-মুখ উৎসাহী বৃদ্ধগণ যখন ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চার জন্য আসতে থাকে তখন সে-দৃশ্যও মনোহর নয়।

গ্লকন বললেন : ঠিকই বলেছ সক্রেটিস। প্রচলিত ধারণার ভিত্তিতে এই প্রস্তাবটি অদ্ভুত বলেই বোধ হবে।

আমি বললাম : কিন্তু আমরা যখন আমাদের মনের কথা প্রকাশ করে বলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি তখন আমাদের প্রস্তাবের নূতনত্বে অপরের পরিহাসকে ভয় পেলে চলবে না। মেয়েরা সঙ্গীত এবং শরীরচর্চায় কীরূপ দক্ষতা দেখাবে কিংবা কেমন করে তারা অস্ত্রধারণ করবে এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে

---

১. গ্রীকগণ নগ্নদেহে শরীরচর্চা এবং কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করত। মেয়েদের জন্য একই প্রকার শরীরচর্চার প্রস্তাব থেকে তাদের নগ্নভাবে শরীরচর্চা ও কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের কথা স্বাভাবিকভাবেই আসে [দ্রঃ লী'র অনুবাদ পৃঃ ২০৫]

অশ্বচালনা করবে—এসবের উপর অপরের বিদ্রূপের প্রতি আমাদের দৃক্‌পাত করলে চলবে না।

তোমার কথা খুবই সত্য সক্রেটিস।

যা-ই হোক, আমরা শুরু যখন করেছি তখন কঠিন বিধানগুলিও আমাদের প্রণয়ন করতে হবে। পরিহাসকারীদের আমরা বলব, তাঁরা যেন বিষয়টি গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেন। আমরা তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেব, অধিক দিন পূর্বের কথা নয় যখন বর্বরদের ন্যায় গ্রীসীয়গণও পুরুষদের নগ্ন দৃশ্যকেও অদ্ভুত এবং অন্যায় বলে বিবেচনা করত। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রীটবাসীগণ এবং স্পার্টাবাসীগণ নগ্নদেহে শরীরচর্চার প্রথাটি যখন প্রবর্তন করল তখন পরিহাসকারীদের পরিহাসের বস্তুর কি কোনো অভাব ঘটেছিল?

তোমার কথা নিঃসন্দেহে সত্য, সক্রেটিস।

কিন্তু অভিজ্ঞতা যখন প্রমাণ করল যে, শরীরচর্চায় দেহের সর্ব অঙ্গ আবৃত করার চেয়ে অনাবৃত রাখা উত্তম বই অধম নয়, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা অদ্ভুত বলে বোধ হয়েছিল যুক্তির দৃষ্টিতে তা সঙ্গত বলে বোধ হল। শুধু তা-ই নয়, আমরা বলব, যে-মানুষ পাপ এবং অন্যায়ের বদলে অপর বস্তুর উপর তার পরিহাসের ফলাকে উদ্যত করে, যে উত্তম ব্যতীত অপর কোনো মানদণ্ডে সুন্দরকে পরিমাপের চেষ্টা করে সে পরিণামে মূর্খ বলেই প্রতিপন্ন হয়।

খুবই সত্য কথা সক্রেটিস।

তা হলে, প্রশ্নটি আমরা পরিহাস করেই করে থাকি কিংবা গাম্ভীর্যের সঙ্গে করে থাকি, এসো আমরা মেয়েদের প্রকৃতির বিষয়টি সম্যকভাবে বোঝার চেষ্টা করি। প্রশ্ন হচ্ছে ঃ মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সকল কাজই কি সমভাবে সম্পাদন করার ক্ষমতা রাখে, না পুরুষদের কাজের অংশমাত্রকে তারা সম্পাদন করতে পারে? রণকৌশল আয়ত্ত করতে পারে কিংবা এ-কৌশল তাদের সঙ্গে আয়ত্ত করতে তারা অক্ষম? এই প্রশ্ন দিয়েই আমরা শুরু করতে পারি। এ থেকেই হয়তো আমরা সর্বাধিক ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হব?

হ্যাঁ, এই প্রশ্ন নিয়ে অগ্রসর হওয়াই উত্তম হবে।

কিন্তু আমরা কোন্ পক্ষের যুক্তিকে প্রথম প্রকাশ করব? আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধ যুক্তিকেই প্রথমে বিবেচনা করা সঙ্গত। এতে আমাদের প্রতিপক্ষ আর অসমর্থিত থাকবে না।

হ্যাঁ, এই পদ্ধতিতেই অগ্রসর হয়ো, সক্রেটিস।

আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি তাদের মুখের ভাষণেই শোনা যাক। তারা নিশ্চয়ই বলবে ঃ 'সক্রেটিস এবং গ্লকন! তোমাদের যুক্তিখণ্ডনের জন্য কোনো প্রতিপক্ষের আবশ্যকতা নেই। কারণ, তোমাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার গোড়াতে তোমরা নিজেরাই স্থির করেছিলে—প্রত্যেকে তার গুণ অনুযায়ী একটিমাত্র কাজই সম্পাদন করবে।' আমাদের প্রতিবাদীর এ কথায় আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হয়, আমরা এরূপ নীতিই রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার গোড়াতে স্থির করেছিলাম। এবার প্রতিবাদী বলবে ঃ 'তা-ই যদি সত্য হয়, তা হলে মেয়েদের প্রকৃতি কি পুরুষদের প্রকৃতি থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন নয়?' 'হ্যাঁ, তারা ভিন্ন।' এবার পালটা প্রশ্ন হবে ঃ 'তা হলে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের আপন দায়িত্ব কি ভিন্ন প্রকারের হবে না?' আমাদের বলতে হবে ঃ 'অবশ্যই তা ভিন্ন হবে।' তখন ওরা বলবে ঃ 'পুরুষ এবং মেয়েদের প্রকৃতি যখন বিশেষভাবে ভিন্ন ধরনের তখন তাদের উভয়ের জন্য একই কর্মের বিধান দ্বারা তোমরা কী গুরুতর অসঙ্গতির সৃষ্টি করছ না?'—গ্লকন, এ-সমস্ত প্রতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আত্মরক্ষামূলক জবাব কি হবে?

এমন আকস্মিক প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবু, সক্রেটিস, আমরা তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমাদের পক্ষের একটি জবাব তৈরি করো।

গ্লকন, প্রতিপক্ষের যুক্তি আরও আছে। এই সমস্ত প্রতিবাদের বিষয়ে আমি পূর্বেই চিন্তা করেছি। এই সমস্ত কথা চিন্তা করে আমি ভীত হয়েছি। এবং স্ত্রী ও সন্তানদের উপর অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা বোধ করেছি।

গ্লকন বললেন ঃ জিউসদেব জানেন, এ-সমস্যার সমাধান সহজ নয়।

আমি বললাম ঃ সে কথা সত্যি। কিন্তু কেউ যদি পানিতে একবার পড়ে যায়, সে ডোবাই হোক কিংবা সমুদ্র, তা হলে তাকে সাঁতার অবশ্যই কাটতে হয়।

খুবই সত্য কথা।

আমাদেরও সে-অবস্থা। সাঁতার আমাদের কাটতেই হবে; সাঁতার কেটে তীরে পৌঁছার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আমরা কেবল আশা করব আমাদের এই সংকটে আরিয়নের বাহন[১] কিংবা অলৌকিক অপর কোনো শক্তি আমাদের উদ্ধার করে দেবে।

---

১. আরিয়নের বাহন ঃ সঙ্গীতপিপাসু আরিয়ন কোরিন্থের নাবিকদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বাঁচার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এক মৎস্যকন্যার সাহায্যে তীরে পৌঁছতে সমর্থ হয় [লী'র অনুবাদ ঃ পৃ ঃ ২০৭]

হ্যাঁ, আমরা তা-ই আশা করব।

বেশ, তা হলে এসো, আমরা দেখি উদ্ধারের কোনো উপায় আছে কি না। একথা আমরা বলেছিলাম যে, যার যেমন প্রকৃতি বা গুণ তার তেমন কাজ করা সঙ্গত। আমরা স্বীকার করি, একথা আমরা বলেছি। আর একথাও সত্য, পুরুষ এবং মেয়েদের প্রকৃতি পৃথক। কিন্তু এখন আমরা কী বলছি? আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এখন আমরা বলছি, ভিন্ন গুণ বা প্রকৃতির মানুষ একইরকম কাজ করবে। এভাবে আমরা পরস্পরবিরোধী কথা বলছি। এই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ। তা-ই নয় কি?

ঠিকই। এটাই অভিযোগ।

গ্লকন, পরস্পরবিরোধী কথা বলার শক্তিটি কিন্তু খেলো নয়। এ এক মহতী শক্তি!

একথা কেন বলছ, সক্রেটিস?

কারণ, অনেক মানুষ আছে যারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এই পদ্ধতিটির মধ্যে আটকা পড়ে যায়। ফলে সে যখন মনে করছে সে সঠিক যুক্তি দিচ্ছে তখন সে আসলে নিজের যুক্তিরই বিরুদ্ধতা করছে। কারণ যে-ক্ষমতাটি তার নেই সে হচ্ছে বিচার্য বিষয়ের সংজ্ঞানির্ধারণ করা এবং তাকে পৃথক করা। ফলে সে আর জানে না, সে আসলে কোন্ বিষয় নিয়ে কথা বলছে। পরিণামে তার যুক্তি, প্রতিযুক্তি সঙ্গত আলোচনার মূল সুর হারিয়ে শাব্দিক বাদ-প্রতিবাদে পর্যবসিত হয়ে পড়ে।

গ্লকন বললেন : হ্যাঁ, এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের যুক্তির কী সম্পর্ক আছে?

বেশ সম্পর্ক আছে। কারণ, আমাদের জন্য বিপদ হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনুরূপ শাব্দিক বাদ-প্রতিবাদে জড়িত হয়ে পড়া।

কেমন করে?

কারণ আমরাও খুব 'সাহসিকতা'র, সঙ্গে এবং কলহপ্রিয়ের স্বভাব নিয়ে শাব্দিক সত্যের উপর জোর দিয়ে বলছি : যার যেরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি তার সেরূপ কাজ। কিন্তু এই বলার সঙ্গে আমরা কখনো চিন্তা করে দেখিনি, স্বভাবের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য বলতে সত্যিকারভাবে কী বোঝায় এবং আমরা যখন প্রকৃতি বা গুণ অনুযায়ী সদৃশ স্বভাবে সদৃশ দায়িত্ব এবং ভিন্ন স্বভাবে ভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলাম তখন কী কারণে আমরা তাদের পৃথক ভেবেছিলাম।

হ্যাঁ, একথা ঠিক। এভাবে আমরা চিন্তা করিনি।

দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি প্রশ্ন করা যাক ঃ টাক মাথা এবং সচুল মাথার মধ্যে স্বভাবগত কোনো পার্থক্য আছে কি নেই? যদি বলি তাদের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য আছে তা হলে টাক মাথা যদি জুতাসেলাইকারী চর্মকার হয় তা হলে সচুল মাথা আর চর্মকার হতে পারবে না। কথাটা আমরা বিপরীতভাবেও বলতে পারি।

তুমি কি পরিহাস করছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, পরিহাসেরই কথা বটে। কারণ আমরা যখন আমাদের রাষ্ট্র গঠন করেছি তখন স্বভাবের বা গুণের পার্থক্যের কথা বলতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রত্যেকটি পার্থক্য বোঝাতে চাইনি। পার্থক্য বলতে ব্যক্তির দায়িত্বপালন যে-গুণের উপর নির্ভর করে সেরূপ পার্থক্যই আমরা বোঝাতে চেয়েছি। আমাদের বলা উচিত ছিল ঃ একজন পুরুষ এবং মেয়ে এদের উভয়ের যদি চিকিৎসার দক্ষতা থাকে তা হলে এদের উভয়কে আমরা একই স্বভাবের বলে আখ্যায়িত করব। অপরদিকে দুজন পুরুষের মধ্যে এক জনের চরিত্রে যদি জন্মগতভাবে চিকিৎসকের গুণ দৃষ্ট হয় এবং অপরজনের মধ্যে জন্মগতভাবে সূত্রধরের গুণ, তা হলে আমরা এই দুজন পুরুষকে ভিন্ন স্বভাবের বলে অভিহিত করব।[১]

যথার্থ।

কারণ, চিকিৎসক এবং সূত্রধর—এদের প্রকৃতি আলাদা।

অবশ্যই।

কাজেই কোনো নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ এবং মেয়ের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য দেখা যায় তা হলে সে-কাজের দায়িত্ব হয় পুরুষের উপর, নয়তো মেয়ের উপর আমরা ন্যস্ত করব। কিন্তু তাদের পার্থক্যটি যদি কেবল এই হয় যে, পুরুষ সন্তানের জন্মদান করে এবং মেয়ে সন্তানকে ধারণ করে, তা হলে এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারিনে যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়ের শিক্ষা পুরুষ থেকে পৃথক হবে। কাজেই আমাদের অভিভাবক বা শাসকগণ এবং তাদের স্ত্রীগণ যে একই কাজের উপযুক্ত—এ-নীতিটি আমরা পরিত্যাগ করতে পারিনে। এ-নীতির পক্ষেই আমরা কথা বলব।

খুবই সত্য কথা সক্রেটিস।

---

১. কর্নফোর্ডের ইংরেজি অনুবাদ।

আমরা বরঞ্চ আমাদের প্রতিপক্ষকে জিজ্ঞেস করব, কোন্ দায়িত্বের ক্ষেত্রে তারা মেয়েকে পুরুষ থেকে পৃথক বলে বিবেচনা করে।

হ্যাঁ, আমরা সঙ্গতভাবেই এ-প্রশ্ন করতে পারি।

এবং গ্লকন, আমাদের প্রতিপক্ষ তোমার ন্যায়ই বলতে পারে : 'মুহূর্তমধ্যে এ-প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়'। মুহূর্তের মধ্যে না হলেও খানিক চিন্তা করে প্রশ্নের জবাবদান কঠিন নয়।

তা ঠিক।

মনে করো আমাদের প্রতিপক্ষকে আমাদের যুক্তির সঙ্গী করে নিলাম। আমাদের আশা আছে তাকে আমরা দেখিয়ে দিতে পারব যে, মেয়েদের গঠনে এমন অদ্ভুত কিছু নেই যা তাকে রাষ্ট্রশাসনের কোনো দায়িত্বপালনে অক্ষম করতে পারে।

একথা যথার্থ সক্রেটিস।

আমরা আমাদের প্রতিবাদীকে বলব : এসো, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি : তুমি যখন কারও স্বভাব বা প্রকৃতিকে বিশেষ গুণে গুণী কিংবা গুণী নয় বলে পৃথক করতে চেয়েছিলে, তখন কি তুমি এই বোঝাতে চেয়েছিলে যে, গুণী ব্যক্তি কোনো বিষয়কে সহজে শিখে ফেলে কিন্তু যে গুণী নয় তার পক্ষে সে-বিষয় আয়ত্ত করা কঠিন হয়? এদের একজন যেখানে অল্প শিখেই অনেক কিছু সাধন করতে পারে সেখানে অপর ব্যক্তি বহু অধ্যয়ন এবং চর্চাতেও সে-সাফল্য অর্জন করতে পারে না, সে শিখতে-না-শিখতে বিষয়কে ভুলে যায়? অথবা তোমার বক্তব্য ছিল এই যে, এদের একের ক্ষেত্রে তার দেহ যেখানে মনের বশীভূত, তার মনের উত্তম দাস, সেখানে অপর ব্যক্তির দেহ তার মনের একটি প্রতিবন্ধকস্বরূপ? স্বভাবগতভাবে গুণী এবং নির্গুণের মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি কি এরূপ নয়?

এ-যুক্তি কেউই অস্বীকার করতে পারে না।

মোটকথা, এমন কোনো কাজ কি আছে যেটি পুরুষ, মেয়ের চেয়ে উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারে না? এমনকি বস্ত্রবয়ন এবং রন্ধন যেখানে মেয়েদেরই দক্ষতা থাকার কথা সেখানেও পুরুষ যখন মেয়েকে অতিক্রম করে যায় তখন মেয়েরা হাসির পাত্র হয়ে ওঠে।

গ্লকন বললেন : সক্রেটিস, মেয়েজাতির নিকৃষ্টতার যে-কথা তুমি বলছ সাধারণভাবে তা সত্য। অবশ্য এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা উত্তম। তবু পুরুষ এবং মেয়েকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে তোমার কথা সত্য।

তা-ই যদি হয়, গ্লকন, তা হলে আমরা বলতে পারিনে যে, রাষ্ট্রশাসনের এমন কোনো ক্ষেত্র আছে যেটা মেয়ে হিসাবে কেবল মেয়েদেরই করায়ত্ত অথবা পুরুষ হিসাবে পুরুষের করায়ত্ত। প্রকৃতির দান উভয়ের মধ্যেই বণ্টিত। পুরুষের যা কাজ, মেয়েদেরও সেই কাজ। কেবল পার্থক্য এই যে, কার্যকারিতায় পুরুষের চেয়ে মেয়েরা সাধারণত কম দক্ষ।

খুবই সত্য কথা।

তা হলে আমাদের যা-কিছু বিধান সে সব কি কেবল পুরুষের জন্যই নির্দিষ্ট হবে, মেয়েদের জন্য নয়?

না, তা কিছুতেই হতে পারে না।

মেয়েদের মধ্যে আমরা হয়তো দেখব, একের মধ্যে যেখানে নিরাময়ের গুণ আছে, অপরের মধ্যে তা নেই; একজনের চরিত্রে সঙ্গীতের গুণ আছে, অপরজনের চরিত্রে সঙ্গীতের কোনো গুণ নেই।

হ্যাঁ, এরূপই বটে।

কোনো মেয়ের মধ্যে শরীরচর্চার এবং সামরিক কুচকাওয়াজের প্রবণতা আছে, আর একজনের চরিত্রে এর অভাব আছে এবং সে শরীরচর্চার প্রতি বীতরাগ।

এ কথাও সত্য।

আবার এক মেয়ে হয়তো দার্শনিক, অপর মেয়ে দর্শনের শত্রু; একের মধ্যে যেখানে তেজ আছে, অপরের মধ্যে তেজের অভাব আছে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তা হলে আমরা বলতে পারি, এক মেয়ের মধ্যে অভিভাবক বা শাসকের গুণ থাকতে পারে; অপরজনের মধ্যে সে-গুণ নাও থাকতে পারে। পুরুষ-শাসকদের নির্বাচনও তো আমরা এই চিন্তার ভিত্তিতেই করেছি। নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা তা-ই করেছি।

অভিভাবক বা শাসক হওয়ার যে-গুণ তা পুরুষ মেয়ে উভয়েরই আছে। তাদের পার্থক্য কেবল তুলনামূলক শক্তি এবং দুর্বলতার ক্ষেত্রে।

নিঃসন্দেহে, সক্রেটিস।

তা হলে যে-মেয়েদের শাসক হওয়ার গুণ আছে তাদের অবশ্যই আমরা যে পুরুষদের সে-গুণ আছে এবং যাদের সঙ্গে তাদের ক্ষমতা ও চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে তাদের সহকর্মী হিসাবে নিযুক্ত করব।

অবশ্যই।

আর একই রকম স্বভাবের তো একই রকম দায়িত্ব থাকা সঙ্গত। নয় কি?

হ্যাঁ, তাদের একই রকম দায়িত্ব থাকা সঙ্গত।

তা হলে, আমরা পূর্বে যে-কথা বলেছি, শাসকদের স্ত্রীদের জন্য সঙ্গীত এবং শরীরচর্চার দায়িত্ব স্থির করা তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিষয়টির আমরা আবার উল্লেখ করছি।

না, তাদের জন্য এ-দায়িত্ব স্থির করা অস্বাভাবিক নয়।

যে-বিধান আমরা তখন প্রণয়ন করেছিলাম সে-বিধান প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। আর তাই সে-বিধান আমাদের কোনো অসম্ভব কল্পনার বিষয় ছিল না। বরং আমরা বলব, এক্ষেত্রে যে-প্রথা বর্তমানে প্রচলিত আছে সেই প্রথাই প্রকৃতির বিরোধী।

তোমার একথাই সত্য মনে হচ্ছে সক্রেটিস।

আমাদের দুটি প্রশ্ন বিবেচনার ছিল ঃ প্রথমতঃ আমাদের প্রস্তাবগুলি সম্ভব কি না; দ্বিতীয়তঃ এগুলি মঙ্গলজনক বা উত্তম কি না।

হ্যাঁ, তা-ই আমাদের বিবেচ্য ছিল।

এর সম্ভাব্যতাকে আমরা প্রমাণ করেছি। নয় কি?

অবশ্যই।

এবার আমাদের প্রমাণ করতে হবে, এরা উত্তম কি না।

হ্যাঁ, আমাদের তা-ই করতে হবে।

গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যে-শিক্ষা একজন পুরুষকে উত্তম অভিভাবক বা শাসকে পরিণত করে সে-শিক্ষা একজন মেয়েকেও উত্তম শাসকে পরিণত করবে। কারণ, পুরুষ এবং মেয়ের মূল চরিত্র এক। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক।

কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে গ্লকন।

কী প্রশ্ন সক্রেটিস?

পুরুষের বেলা তুমি কী বলবে? সকল পুরুষকে কি তুমি সমানভাবে গুণী বলবে, না একজনকে অপরজনের চেয়ে উত্তম মনে করবে?

অবশ্যই একজন অপরজনের চেয়ে উত্তম হবে।

তা হলে, আমরা যে-রাষ্ট্রকে তৈরি করছি এবং সে-রাষ্ট্রের যে-শাসকদের আমরা একটি আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত করছি তাদের তুমি রাষ্ট্রের সর্বোত্তম

মানুষ বলবে, কিংবা যে-চর্মকারদের শিক্ষা পাদুকা সেলাই-এর শিক্ষায় সীমাবদ্ধ তাদের তুমি সর্বোত্তম মানুষ বলবে?

তোমার প্রশ্নটি তো বড় অদ্ভুত সক্রেটিস!

ঠিক আছে, তোমার এই জবাবেই আমার চলবে। কিন্তু আমরা কি এও বলব না যে, আমাদের শাসকরাই হচ্ছে আমাদের নাগরিকদের মধ্যে সর্বোত্তম নাগরিক?

অবশ্যই তারা সর্বোত্তম নাগরিক।

তা হলে তাদের স্ত্রীরা কি সর্বোত্তম মেয়ে বলে বিবেচিত হবে না?

হ্যাঁ, তারাও সর্বোত্তম মেয়ে।

একটি রাষ্ট্রের পুরুষরা এবং মেয়েরা যতদূর সম্ভব উত্তম হবে—এর চেয়ে এই রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য মঙ্গলকর আর কিছু কি হতে পারে?

না। এর চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে না।

এবং সঙ্গীত ও শরীরচর্চার বিষয়ে আমরা যেরূপ বলেছি সেরূপে তাদের চর্চা করা হলে আমাদের রাষ্ট্রে এই সর্বোত্তমই সাধিত হবে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক, সক্রেটিস।

তা হলে আমরা এবার বলতে পারি যে, এমন বিধান আমরা প্রণয়ন করেছি যে-বিধান কেবল সম্ভব নয়, যে-বিধান রাষ্ট্রের জন্য উত্তমও বটে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে আমরা বলব, আমাদের শাসকদের স্ত্রীগণ নগ্ন হোক। তাতে ক্ষতি নেই। কারণ, ধর্মই তাদের আবরণ। যুদ্ধ এবং দেশরক্ষার পরিশ্রমে পুরুষদের তারা সমঅংশীদার হবে। কেবল কাজের বণ্টনে যে-কাজ পরিশ্রমের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে হালকা সে-সমস্ত কাজ মেয়েদের দেওয়া হবে। কারণ দৈহিক গঠনে তারা দুর্বলতর। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হবে পুরুষদের সঙ্গে এক। এবং উত্তম উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে যে-মেয়ে নগ্নদেহে শরীরচর্চা এবং সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিচ্ছে তার দর্শনে কোনো মানুষ যদি পরিহাস করে তা হলে আমরা বলব তার পরিহাসের দণ্ড দিয়ে, 'অপরিপক্ব জ্ঞানের ফলকেই' সে আহরণ করছে। কারণ, সে কাকে পরিহাস করছে তা সে জানে না; তার পরিহাসের কী উদ্দেশ্য সে-সম্পর্কেও সে অজ্ঞ। এক্ষেত্রে যে-প্রবাদ বলে ঃ 'যা কাজের তা-ই উত্তম এবং যা অ-কাজের এবং ক্ষতিকর তাই অধম'—সে-প্রবাদই সর্বকালের সর্বোত্তম বাণী বলে বিবেচিত হবে। ঠিক নয় কি গ্লকন?

অবশ্যই ঠিক, সক্রেটিস।

তা হলে মেয়েদের ক্ষেত্রে বিধানের ব্যাপারে একটা অসুবিধাকে আমরা কাটাতে পেরেছি, বলা যায়। অভিভাবক শাসকদের মধ্যে পুরুষ এবং মেয়ে উভয়েরই দায়িত্ব হবে একই রকম—এ-বিধানের জন্য সমুদ্রতরঙ্গে আমরা একেবারে ডুবে যাইনি। এ-বিধানের প্রয়োজনীয়তা এবং কার্যকারিতা যুক্তির সঙ্গতি দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে।

তুমি ঠিকই বলেছ সক্রেটিস। এ-বিধানের তরঙ্গ কম জোরদার ছিল না। তুমি তাকে অতিক্রম করতে পেরেছ, এটি কম কথা নয়।

আমি বললাম ঃ কিন্তু গ্লকন, যে-তরঙ্গ আসছে তার জোর আরও বেশি। সেই তরঙ্গকে যখন তুমি দেখবে তখন এটি তোমার নিকট তুচ্ছ বলেই বোধ হবে।

গ্লকন বললেন ঃ তুমি অগ্রসর হও। আসুক সে-ঢেউ। তাকে আমরা প্রত্যক্ষ করব।

আমি বললাম ঃ আমাদের পূর্ববিধানের পরিণাম হিসাবে এখন যে-বিধান আসছে তাকে আমি এভাবে বলতে পারি ঃ 'আমাদের অভিভাবক বা শাসকদের স্ত্রীদের উপর সমষ্টিগত স্বামিত্ব প্রবর্তিত হবে এবং তাদের সন্তানরাও হবে সকলের সমষ্টিগত সন্তান এবং কোনো জনক-জননী যেমন জানবে না কোন্ সন্তান তার, তেমনি কোনো শিশুও জানবে না, তার পিতামাতা কে।'

গ্লকন বললেন ঃ এ-ঢেউ আগের চেয়েও মারাত্মক বটে! আর এ-বিধানের উপকারিতা এবং সম্ভাব্যতা প্রমাণ করা পূর্বের চেয়ে দুরূহ নিশ্চয়ই।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমষ্টিগত স্বামিত্ব যে বিশেষভাবে উপকারী সে-সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে। তবে এর সম্ভাব্যতার প্রশ্ন আলাদা এবং এ-সম্পর্কে আপত্তি তোলা সম্ভব।

গ্লকন বললেন ঃ আমার তো মনে হয় উভয় প্রশ্নে একাধিক আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে।

আমি বললাম ঃ তার মানে তুমি বলছ, দুটো প্রশ্নকে যুক্ত করা আবশ্যক? আমার কিন্তু আশা ছিল, তুমি আমাদের প্রস্তাবটির উপযোগিতাকে স্বীকার করবে। তা হলে একটা সমস্যা থেকে আমি রেহাই পেতাম। তখন প্রস্তাবটির সম্ভাব্যতার দিকটিই আমাদের বিবেচ্য হত।

এভাবে তোমার বিপদ এড়াবার চেষ্টাটি আমরা ধরে ফেলেছি। কাজেই দুটো প্রশ্নের জবাবই তোমাকে দিতে হবে, সক্রেটিস।

অধ্যায় ঃ ১৩
[৪৫৮—৪৬৬]

যৌথ পরিবার ও বিবাহ

রাষ্ট্রের ঐক্যের জন্য এবং শাসক এবং সৈন্যবাহিনী অর্থাৎ অভিভাবক যেন নিঃস্বার্থভাবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে পারে সে-কারণে অভিভাবকদের ব্যক্তিগত পরিবার এবং সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তাই ব্যক্তিগত পরিবারকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

কিন্তু স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে ঃ পরিবার বিলুপ্ত হলে মানুষ কি দেবতা হয়ে যায়? মেয়ে এবং পুরুষ একই জীবনযাপন করবে। যৌথভাবে বসবাস করবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যৌথ জীবনযাপনে তাদের দেহের চাহিদা কীভাবে মেটানো হবে। সমস্যাটি সম্পর্কে সক্রেটিস সচেতন। বলা চলে তিনি সতর্ক। কারণ পরিবার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে এবং যৌথ জীবনযাপনের প্রস্তাবের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে এরূপ ধারণা করা সম্ভব যে, মেয়ে-পুরুষের দৈহিক চাহিদার ক্ষেত্রে এবার শৃঙ্খলাহীন স্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান হয়ে উঠবে। সমস্যাটি সক্রেটিস পুরোপুরিই আলোচনা করেছেন এবং গোড়া থেকে শুরু করেছেন ঃ "মেয়ে এবং পুরুষ সকলে সম্মিলিতভাবে বাস করবে; সম্মিলিতভাবে তারা প্রতিপালিত হবে, সম্মিলিতভাবে তারা শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করবে। মেয়ে এবং পুরুষেরা এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই তাদের প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একের সঙ্গে অপরে দৈহিকভাবে মিলিত হবে।" সে মিলন নিয়ম কিংবা নীতিহীন মিলন নয়। এর পরে আমরা এই যৌথজীবনে মেয়ে-পুরুষের মিলন তথা বিবাহের সুবিস্তারিত নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের বিবরণ পাই। সক্রেটিস এ-ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন ঃ 'তোমার কথা যথার্থ গ্লকন। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি শৃঙ্খলার আবশ্যকতা আছে। এ-প্রয়োজনও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। কারণ উত্তমের যে-রাষ্ট্র সেখানে নিয়ন্ত্রণহীন মিলন পাপ বলেই পরিগণিত হবে এবং শাসকগণ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে।" এই নিয়ন্ত্রণপ্রণালী অর্থাৎ বছরে মিলনের জন্য নির্দিষ্ট যৌথ বিবাহ উৎসবের ব্যবস্থা লটারির মাধ্যমে মিলনের

জোড় নির্ধারণ; বিবাহ উৎসবের পরে সপ্তম কিংবা দশম মাসে জাত সকল সন্তান যৌথভাবে সকল পিতা-মাতার সন্তান; সকল সন্তান পরস্পরের ভাই এবং ভগ্নী, মেয়েরা বিশ থেকে চল্লিশ এবং পুরুষেরা পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন বছরের মধ্যেই মাত্র সন্তান উৎপাদন করবে; তার পূর্বে কিংবা পরে নয়; রাষ্ট্রের বিনা অনুমতিতে কোনো মিলন ঘটতে পারবে না; অননুমোদিত মিলনজাত সন্তানের বাঁচার কোনো অধিকার থাকবে না, তাকে ভ্রূণাবস্থায় কিংবা শিশু অবস্থায় বিনষ্ট করতে হবে—ইত্যাদি প্রস্তাব আমাদের কাছে অদ্ভুত এবং অবাস্তব বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু প্লেটো বিষয়টি যেমন বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থিত করতে সক্ষম হয়েছেন তেমনি এ-সকল প্রস্তাব যে রাষ্ট্রের ঐক্য এবং শক্তির জন্য অপরিহার্য একথাও যুক্তির যথেষ্ট জোরের সঙ্গে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন—তা আমাদের স্বীকার করতে হয়।

এই আলোচনার শেষে সক্রেটিস যুদ্ধপরিচালনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। যুদ্ধ অবাঞ্ছিত বটে, কিন্তু মানুষের স্বভাব যদি সর্ব রাষ্ট্রে পরিবর্তিত না হয়, অর্থাৎ আদর্শ রাষ্ট্র যদি সর্বত্র বাস্তবায়িত না হয় (আদর্শ রাষ্ট্র যে বাস্তব হতে পারে না সে-তত্ত্বের আভাস বাস্তব রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ এবং যুদ্ধপরিচালনার কৌশলের আলোচনার মধ্যেই ধরা পড়ে) তা হলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ যে একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি তা আমাদের স্বীকার করতে হয়। যে-আদর্শ রাষ্ট্র সক্রেটিস রচনা করেছেন সেটিও তো যুদ্ধকামী রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে পারে। তাই আদর্শ রাষ্ট্রের রচনায় সৈন্যবাহিনী তৈরি করার যেমন প্রয়োজন পড়েছে, তাদের যুদ্ধপরিচালনার বিষয়টির আলোচনারও তাই আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে সক্রেটিসের প্রস্তাব যে, গ্রীসের কোনো নগরী অর্থাৎ রাষ্ট্র অপর কোনো গ্রীসীয় রাষ্ট্রকে দাসে পরিণত করতে পারবে না—কারণ তা হলে গ্রীসের সকল রাষ্ট্র পরিণামে বর্বর জাতির (অর্থাৎ পারস্যের) দাস হয়ে যাবে, কিন্তু বর্বরদের দাসে পরিণত করা যাবে প্রভৃতি অভিমতে সংকটগ্রস্ত গ্রীক নগররাষ্ট্রসমূহকে বৈদেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার আগ্রহ যে প্লেটো পোষণ করতেন তার আভাস প্রকাশিত হয়েছে—একথা বলা যায়।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। ভাগ্যের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। তবু তোমাদের নিকট অনুরোধ, আমার একটি আবেদন তোমরা মঞ্জুর করো ঃ আমি স্বপ্নের ভূরিভোজে আমার মনকে তৃপ্ত করতে চাই। দিবাস্বাপ্নিকেরা যেরূপ পদচারণা করতে করতে স্বপ্ন দেখে, আমি তেমনি দিবাস্বাপ্নিক হতে চাই। এই স্বাপ্নিকেরা তাদের স্বপ্নের সম্ভাব্যতা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করে না। কী উপায়ে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে, সে-চিন্তা তাদের নয়। স্বাপ্নিকেরা মনে করে তাদের ইচ্ছামতোই বাস্তব পরিবর্তিত হবে। আর এই ধারণা নিয়ে তারা তাদের পরিকল্পনা আরও বিস্তারিত করতে শুরু করে, যেন তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। এভাবে স্বাপ্নিক তারা মনের আলস্যকে কল্পনার যোগান দিয়ে উৎসাহিত করে তোলে। কিন্তু এখন তো আমি হতোদ্যম হয়ে পড়ছি। তোমরা অনুমতি দিলে আমি বরঞ্চ সম্ভাব্যতার প্রশ্নটিকে আপাতত স্থগিত রেখে দেব। কাজেই আমাদের প্রস্তাব বাস্তবায়িত করা সম্ভব—একথা ধরে নিয়ে আমি স্থির করব এই প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং আমি দেখাব সেই ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে আমাদের রাষ্ট্র এবং তার অভিভাবক তথা শাসকদের জন্য কেমন করে এ-প্রস্তাব সর্বাধিক উপকার সাধন করে। কাজেই তোমাদের আপত্তি না থাকলে প্রথমত আমি প্রস্তাবের উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রস্তাবটির কার্যকারিতার প্রশ্নটি পরে বিবেচনা করা যাবে।

গ্লকন বললেন ঃ আমার কোনো আপত্তি নেই। তুমি অগ্রসর হও, সক্রেটিস।

প্রথমত আমি মনে করি আমাদের শাসক এবং তাদের সৈন্যবাহিনী যদি তাদের নামের মর্যাদা রক্ষা করতে চায় তা হলে তাদের একের মধ্যে যেমন আদেশ পালনের প্রবণতা থাকতে হবে, অপরের চরিত্রে তেমনি আদেশ দানের ক্ষমতা থাকতে হবে। শাসকরা আদেশ দানের সময়ে আমাদের বিধানকে যেমন মেনে চলবে তেমনি যে-ক্ষেত্রে বিধানের পরিবর্তে তাদের বিবেচনার উপর নির্ভর করতে হবে সেখানেও আমাদের বিধানের অন্তর্নিহিত ভাবকেই তারা অনুসরণ করবে।

গ্লকন বললেন ঃ একথা ঠিক।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, বিধান প্রণয়নকারী হিসাবে আমাদের কাজ হচ্ছে আমাদের নির্বাচিত পুরুষ-শাসকদের জন্য মেয়েদের নির্বাচিত করে তাদের সঙ্গিনী করে দেওয়া। এ-নির্বাচনে লক্ষ রাখতে হবে যেন উভয়ের চরিত্র যথাসম্ভব সদৃশ হয়। তারা উভয়ে যৌথ বাসগৃহে বাস করবে, যৌথ আহারস্থানে

তারা আহার গ্রহণ করবে। মেয়ে কিংবা পুরুষ কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা পরিবার বলতে কিছু থাকবে না। তারা সকলে সম্মিলিতভাবে বাস করবে; সম্মিলিতভাবে তারা প্রতিপালিত হবে; সম্মিলিতভাবে তারা শরীরচর্চায় অংশগ্রহণ করবে। মেয়ে এবং পুরুষের এই সম্মিলিত জীবনের মধ্যেই প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একের সঙ্গে অপরের দৈহিক সম্পর্কে তারা মিলিত হবে। 'প্রাকৃতিক প্রয়োজন' কথাটি কি আমি বেশি বললাম, গ্লকন?

গ্লকন বললেন ঃ প্রয়োজনই বটে। তবে এ-প্রয়োজন জ্যামিতিক বা আঙ্কিক প্রয়োজন নয়। এ এক ভিন্ন ধরনের প্রয়োজন যার পরিচয় প্রেমিকরাই জ্ঞাত। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য এ-প্রয়োজনের অনিবার্যতা অপর যে-কোনো যুক্তির চেয়ে অধিক শক্তিশালী, সক্রেটিস।

তোমার কথা যথার্থ, গ্লকন। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি শৃঙ্খলার আবশ্যকতা আছে। এ-প্রয়োজনও শৃঙ্খলার ভিত্তিতে পূরণ করতে হবে। কারণ উত্তমের যে-রাষ্ট্র সেখানে নিয়ন্ত্রণহীন মিলন পাপ বলেই পরিগণিত হবে এবং শাসকগণ তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাদের রাষ্ট্রে বল্গাহীন কাম নিষিদ্ধ হওয়াই সঙ্গত।

তা হলে আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন হচ্ছে বিবাহকে আমাদের রাষ্ট্রে যতদূর সম্ভব পবিত্র ব্যবস্থায় পরিণত করা। কেননা পবিত্র বিবাহের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই।

তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে ঃ কী উপায়ে আমরা বিবাহকে সর্বোত্তম মঙ্গলপ্রসূ করে তুলতে পারি। প্রশ্নটা আমি তোমাকেই করছি, গ্লকন। তুমি এর জবাব দিতে পার। কেননা তোমার বাড়িতে তুমি শিকারের জন্য কুকুর পোষ। শিকারি পাখির সংখ্যাও তোমার গৃহে কম নয়। আমার অনুরোধ তুমি আমাদের বলো, এদের যৌনমিলন এবং শাবক প্রজননকে তুমি কি কখনো খেয়াল করে দেখছ?

এ ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে খেয়ালের কথা বলছ, সক্রেটিস?

আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো সবই ভালো বটে। তবু এদের মধ্যে কোনোটিকে কি তুমি অপরটির চেয়ে অধিক সুন্দর বলে মনে কর না?

অবশ্যই তা করি।

কিন্তু প্রজননের ক্ষেত্রে তুমি কি এদের যেমন খুশি তেমন মিলিত হতে এবং শাবক প্রসব করতে দাও, কিংবা তুমি খেয়াল রাখ যাতে সবচেয়ে ভালো

যেগুলি সেগুলি থেকে তুমি নূতন শাবক পেতে পার?

সবচেয়ে ভালোগুলি থেকেই আমি শাবক উঠাই।

এবং এজন্য তুমি কি এদের মধ্যে যেগুলোর বয়স বেশি সেগুলোকে মিলিত কর, কিংবা সবচেয়ে অল্প বয়স যাদের তাদের; অথবা বয়সে যারা পরিপক্বতা লাভ করেছে তাদের মিলিত কর?

বয়সে যারা পরিপক্ব আমি তাদেরই এজন্য বাছাই করি।

এদের শাবক-প্রজননে এই সতর্কতা যদি তুমি না রাখতে তা হলে তোমার কুকুর এবং পাখিদের বংশের ধারা নিশ্চয়ই ক্রমান্বয়ে নিকৃষ্ট হতে থাকত, নয় কি?

অবশ্যই সক্রেটিস।

একথা অশ্ব এবং অপরাপর পশুদের সম্পর্কেও সাধারণভাবে সত্য?

নিঃসন্দেহে সত্য।

প্রিয় গ্লকন, এ-নীতি যদি মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য হয় তা হলে তা কার্যকর করতে আমাদের শাসকদের অবশ্যই অধিকতর সতর্কতা এবং দক্ষতার আবশ্যক হবে। নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ মানুষের ক্ষেত্রেও একই নীতি সত্য, সক্রেটিস। কিন্তু এ জন্য বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন কিসে?

কারণ, যে-ঔষধের কথা আমি পূর্বে বলেছি আমাদের শাসকদের প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রের উপর সেই ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করা।[১] যে-রোগীর ঔষধ অনাবশ্যক, কেবল পথ্যের প্রয়োজন, তার জন্য তেমন দক্ষ চিকিৎসকের আবশ্যকতা নেই। যে-কোনো সাধারণ চিকিৎসকই তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ঔষধ যখন প্রয়োগ করতে হয় তখন চিকিৎসকেরই প্রয়োজন। ঠিক নয় কি?

একথা আবশ্যই ঠিক। কিন্তু তুমি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছ?

গ্লকন, আমি বলতে চাচ্ছি, শাসিতের মঙ্গলের জন্য আমাদের শাসকদের বেশ পরিমাণ মিথ্যা এবং প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। আমরা বলেছি, এগুলিকে ঔষধ হিসাবে গণ্য করলে এরা আমাদের উপকার সাধন করতে পারে।

আমাদের সে কথা বলা ঠিক ছিল, সক্রেটিস।

---

১. ৩ ঃ ৩৮৯ দ্রষ্টব্য ঃ মিথ্যা বলার অধিকার কেবল শাসকের

আমি তাই বলছি, আমাদের রাষ্ট্রে বিবাহ এবং সন্তান জন্মদান নিয়ন্ত্রণের জন্য মিথ্যা এবং প্রতারণারূপ ঔষধ প্রয়োগের বেশ প্রয়োজন হবে।

কেমন করে?

আমি বললাম ঃ এক্ষেত্রের নীতি আমরা ইতিপূর্বেই নির্দিষ্ট করেছি। আমরা যদি আমাদের শাসকদের বংশধারাকে সর্বোত্তম পর্যায়ে রাখতে চাই তা হলে আমাদের নীতি হবে, মেয়ে এবং পুরুষদের মধ্যে সর্বোত্তমের সঙ্গে সর্বোত্তমের যত অধিকবার সম্ভব মিলন ঘটানো এবং নিকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্টের মিলন যত কম হয় তার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র সর্বোত্তমের মিলনজাত সন্তানকেই পালন করবে, নিকৃষ্টের মিলনজাত সন্তানকে নয়। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অবশ্যই গোপনে সম্পাদিত হতে হবে। কেবল শাসকরাই মাত্র এই সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। অন্যথায় শাসককুলের বিপদ বৃদ্ধি পাবে। বিদ্রোহ দেখা দেবে। ঠিক নয় কি?

খুবই ঠিক, সক্রেটিস।

আমরা বরঞ্চ এজন্য কিছুসংখ্যক উৎসব নির্দিষ্ট করে দেব। উৎসবে বর এবং কনেদের আগমন হবে। দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গিত হবে। আমাদের কবিরা উৎসবের জন্য উপযুক্ত বিবাহসঙ্গীত রচনা করবেন। শাসকরা বিবাহের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেবেন। আর এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য হবে নগরীর লোকসংখ্যার গড় যাতে রক্ষিত হয়। এজন্য লোকসংখ্যার উপর যুদ্ধ, রোগ এবং অনুরূপ অন্যান্য আপদের প্রভাবের কথা তাদের বিবেচনা করতে হবে। মোটকথা, রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা অত্যধিক বেশি কিংবা অত্যধিক কমে পরিণত হয়ে না যায় তার যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ্লকন বললেন ঃ অবশ্যই।

মিলনের ব্যাপারে যারা নিকৃষ্ট ধরনের তাদের জন্য আমাদের অভিনব কোনো লটারি ব্যবস্থার আয়োজন করতে হবে। এতে যার ভাগ্যে যে সঙ্গী কিংবা সঙ্গিনী জুটবে তার সঙ্গে সে মিলিত হবে। অসন্তুষ্টির কোনো কারণ ঘটলে এ-ব্যবস্থায় তারা নিজ ভাগ্যকেই দায়ী করবে, শাসকদের নয়।

নিশ্চয়ই।

তবে আমাদের যুবকদের মধ্যে যারা অপরের চেয়ে সাহসী এবং উত্তম তাদের সাহসিকতার জন্য পুরস্কার এবং সম্মানদান ব্যতীত নির্দিষ্ট সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলনের অধিকতর সুযোগ তাদের দেওয়া যেতে পারে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হবে যাতে এরূপ সাহসিক পিতা যত অধিকসংখ্যক সম্ভব পুত্রের জন্মদান করতে পারে।

হ্যাঁ, এটিও উত্তম ব্যবস্থা।

আর এই মিলনজাত সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এজন্য নিযুক্ত কর্মচারীবৃন্দ। এরূপ কর্মচারী হিসাবে মেয়ে এবং পুরুষ উভয়কে নিযুক্ত করা যাবে। কারণ আমরা বলেছি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে উভয়েরই সমান অধিকার।

অবশ্যই।

এই কর্মচারীগণ উত্তম অভিভাবক বা শাসকদের সন্তানদের নগরীর ভিন্ন অংশে বাসকারী নির্দিষ্ট ধাত্রীদের হস্তে প্রতিপালনের জন্য অর্পণ করবে। অভিভাবক বা শাককদের নিকৃষ্ট এবং বিকলাঙ্গ সন্তানদের নিঃশব্দে অপসারিত করার ব্যবস্থা করা হবে।[১]

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, শাসকদের বংশধারা বিশুদ্ধ রাখতে হলে এ-কাজটি অবশ্যই করতে হবে।

ধাত্রীগণ শিশুদের প্রতিপালন করবে। শিশুদের জননীদের স্তন্য যখন দুগ্ধপূর্ণ হবে তখন তারা শিশু-আগারে সমবেত হয়ে শিশুদের স্তন্যদান করবে। কিন্তু এ-সময়ে সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন কোনো জননী তার নিজের সন্তানকে চিহ্নিত করতে না পারে। শিশুদের স্তন্যদানের জন্য জননীদের সংখ্যা যথেষ্ট না হলে স্তনদায়িনী অধিকসংখ্যক ধাত্রী নিযুক্ত করা যাবে। দৃষ্টি রাখা হবে যেন সন্তানদের জননীগণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় ধরে শিশুদের স্তন্যদান করতে না পারে। এই ব্যবস্থার একটা সুবিধা এই যে শিশুদের জন্য রাত্রিজাগরণ কিংবা অপর কোনো কষ্ট জননীদের ভোগ করতে হবে না। এ-সমস্ত কাজ ধাত্রী এবং অন্যান্য পরিচালকের উপর ন্যস্ত হবে।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার এ-ব্যবস্থায় শাসকদের স্ত্রীদের জন্য সন্তানধারণ তা হলে বেশ সহজ ব্যাপারই হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তাই তো হওয়া সঙ্গত গ্লকন। সে যাহোক; আমরা বলছিলাম, জন্মদান পিতামাতার পরিপূর্ণ বয়সে হতে হবে।

অবশ্যই।

কিন্তু পরিপূর্ণ বয়স আমরা কোনটাকে বলব? পরিপূর্ণ বয়সের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা কি বলব যে, মেয়েদের ক্ষেত্রে বিশ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে ত্রিশই হবে তাদের যৌবনের পরিপক্ব বয়স?

---

১. এখানে অবাঞ্ছিত ও নিকৃষ্ট শিশুদের বিনষ্ট করার প্রস্তাবের আভাস পাওয়া যায়।

সক্রেটিস, কোন্ বয়সকে তুমি নির্দিষ্ট করতে চাও?

আমি বললাম ঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েরা বিশ বৎসর বয়সে রাষ্ট্রের জন্য সন্তানধারণ করতে শুরু করবে এবং চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সন্তানধারণ করবে। পুরুষদের বেলা পঁচিশ বৎসর যখন তার জীবনের দ্রুততম স্পন্দনের মুহূর্ত অতিক্রান্ত হয়েছে তখন থেকে পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত পুরুষ, সন্তানের জন্মদান করতে পারবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ এই সময়টাই পুরুষ এবং নারী—উভয়ের জীবনের দৈহিক এবং মানসিক শক্তির সর্বোৎকৃষ্ট সময়।

আমাদের নির্দিষ্ট এই বয়ঃসীমার পূর্বে কিংবা পরে কেউ যদি রাষ্ট্রের বিবাহ উৎসবে যোগদান করে তা হলে তাকে অপবিত্র এবং অন্যায় কার্যসাধনের দায়ে দায়ী করা হবে। এরূপ নিষিদ্ধ মিলনের সন্তানকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হবে। অনুমোদিত মিলনের ক্ষেত্রে যেখানে পুরোহিতগণ বলি উৎসর্গ করবে, সমগ্র নগরী যেখানে এই মিলনজাত সন্তান যেন তাদের জনক-জননীর চেয়ে উত্তম হয় তার জন্য প্রার্থনা করবে, সেখানে নিষিদ্ধ মিলনের সন্তানকে তারা অন্ধকার এবং লালসার সন্তান বলে গণ্য করবে।

খুবই ঠিক কথা।

এবং এই নির্ধারিত বয়সের মধ্যেও শাসকদের অনুমোদন ব্যতীত কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীর সঙ্গে মিলিত হয় তা হলে তার ওপরও এই বিধান প্রয়োগ করা হবে। তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযোগ হবে, সে রাষ্ট্রের জন্য অবৈধ, অননুমোদিত এবং অপবিত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে।

তোমার এ কথাও সত্য, সক্রেটিস।

আমাদের নির্ধারিত বয়স সীমার মধ্যে নরনারীর মিলনের এই হবে আমাদের বিধান। এই বয়স সীমা অতিক্রান্ত হলে মিলনের ব্যাপারে আমরা কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করব না। তারা ইচ্ছামতো পরস্পর মিলিত হতে পারবে। কেবল শর্ত হবে, কোনো পুরুষ তার কন্যা কিংবা তার কন্যার কন্যা কিংবা তার জননী বা তার জননীর জননীর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েরাও তাদের পুত্র কিংবা পুত্রের পুত্র বা পিতার পিতার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে না। এই অনুমতির সঙ্গে আর-একটি শর্ত হচ্ছে এরূপ মিলনে কোনো সন্তান উৎপাদিত হতে পারবে না। এমন মিলনে কোনো ভ্রূণের সৃষ্টি হলে তাকে জন্মের পূর্বে অবশ্যই বিনষ্ট করতে হবে। এই নিষেধ সত্ত্বেও যদি কোনো অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে এমন সন্তানকে যে, রাষ্ট্র প্রতিপালন

করবে না, এ-সত্য পিতামাতার উপলব্ধি করতে হবে। এবং এ-সন্তান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তাদের গ্রহণ করতে হবে।[১]

তোমার এ প্রস্তাবও যুক্তিসঙ্গত, সক্রেটিস। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এদের কারোর পক্ষে পিতা, মাতা, কন্যা প্রভৃতিকে চিনতে পারা কেমন করে সম্ভব হবে?

না, এদেরকে চেনা সম্ভব হবে না। ব্যাপারটি এরূপ হবে ঃ নির্দিষ্ট বিবাহউৎসবে মিলনের পরে সপ্তম এবং দশম মাস অতিক্রমে যে-সকল পুত্রসন্তান জন্মলাভ করবে তাদের সকলকেই উক্ত বিবাহ উৎসবে বর হিসাবে আগত পুরুষ, পুত্র বলে সম্বোধন করবে এবং যে-সকল কন্যাসন্তান জন্মলাভ করবে তাদের সকলকে সে কন্যা বলে সম্বোধন করবে। এই সময়ে জাত সকল সন্তানও এদের পিতা বলে সম্বোধন করবে। এই সন্তানদের সন্তানকে সে পৌত্র বলে সম্বোধন করবে এবং এই সন্তানরাও বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের পিতামহ এবং পিতামহী বলে সম্বোধন করবে। আবার এই সময়ে তাদের পিতা-মাতার মিলন থেকে যত সন্তান জাত হবে তারা সকলে পরস্পরকে ভাই এবং বোন বলে সম্বোধন করবে। এরূপ হলে মিলনের যে-নিষেধ আমরা প্রণয়ন করেছি তা পালন করা সম্ভব হবে। অবশ্য ভাই এবং বোনের মিলনকে একেবারে নিষিদ্ধ করে কোনো বিধান থাকবে না। অনুষ্ঠানে ভাগ্যের খেলায় তারা জোটবদ্ধ হলে এবং ডেলফীর দেবীর অনুমোদন থাকলে তাদের মিলন সিদ্ধ হবে।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, এ-ব্যবস্থাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, এই হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবকগণ[২] যৌথভাবে তাদের সকল স্ত্রী এবং পরিবারের মালিক হবে। এবার আমরা দেখাব যে, পরিবারের উপর এই সমষ্টিগত স্বামিত্ব আমাদের রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এ-ব্যবস্থার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। তুমি কি এবার যুক্তির এ দিকটিই প্রত্যাশা কর না?

অবশ্যই, সক্রেটিস।

কিন্তু কীভাবে আমরা অগ্রসর হব? এই সকল ব্যবস্থার মধ্যে ঐক্যসূত্রের জন্য প্রথমে কি আমরা বিধানের এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য কী সেই

---

১. এখানে প্লেটো অননুমোদিত ভ্রূণের গর্ভপাত এবং অননুমোদিত শিশুর জীবননাশের প্রস্তাব করছেন।—লী'র ইংরেজি অনুবাদ. পৃঃ ২১৭।

২. শাসক এবং সৈন্যবাহিনী।

প্রশ্নটি তুলব? অর্থাৎ চরম উত্তম এবং চরম অধম কী? এই প্রশ্নের পরেই কি আমরা বিবেচনা করব, আমাদের বর্ণিত ব্যবস্থা—উত্তম কিংবা অধম, কিসের স্বাক্ষর বহন করে?

হ্যাঁ, এরূপেই আমরা অগ্রসর হব।

বেশ, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে ঐক্যের আধিপত্য থাকা আবশ্যক সেখানে দ্বন্দ্ব, বিক্ষিপ্ততা এবং বহুত্বের চেয়ে ক্ষতিকর কিছু কি হতে পারে? অন্য কথায় ঐক্যের চেয়ে উত্তম কী হতে পারে?

না, ঐক্যের চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে না।

কিন্তু ঐক্যের অবস্থান কোথায়? যেখানে আনন্দ এবং বেদনার সমভোগ—অর্থাৎ যেখানে সকল নাগরিক একই আনন্দ এবং বেদনাতে সমভাবে আনন্দিত এবং বেদনার্ত হয়, ঐক্যের অবস্থান তো সেখানে?

নিঃসন্দেহে।

হ্যাঁ, তা-ই ঠিক। কিন্তু যেখানে সমষ্টিগত কোনো বোধ নেই, কেবল ব্যক্তিগত বোধ আছে সেখানে রাষ্ট্র অসংগঠিত হয়ে যায়। একই ঘটনায় যে-নগরীর অর্ধাংশ আনন্দ-আহ্লাদে উৎফুল্ল এবং অপর অংশ বেদনায় নিমজ্জিত—সে-নগরীকে আমরা সংগঠিত বলতে পারিনে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই, সক্রেটিস।

এরূপ পার্থক্যের মূল হচ্ছে 'আমার' এবং 'আমার নয়', 'তার' এবং 'তার নয়'—এরূপ শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে অনৈক্য।

ঠিক বলেছ।

তা হলে আমরা কি সেই রাষ্ট্রকেই সর্বোত্তমরূপে সংগঠিত রাষ্ট্র বলব না যে রাষ্ট্রের সর্বাধিকসংখ্যক মানুষ একই দ্রব্য সম্পর্কে একইভাবে 'আমার' এবং 'আমার নয়' শব্দকে ব্যবহার করতে পারে?

খুবই সত্য কথা।

দেহের ক্ষেত্রে এ-বিষয়টি আমরা প্রত্যক্ষ করি। কারণ আমাদের শরীরের একটি অঙ্গুলি যদি আহত হয় তা হলে আত্মার শাসনে সংগঠিত দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই একটি অঙ্গের আঘাতে সমভাবে আহত বোধ করে। আর এই বোধের প্রকাশ ঘটে যখন আমরা বলি, লোকটির আঙুলটি আহত হয়েছে। দেহের অপর যে-কোনো অঙ্গের বেদনা কিংবা আনন্দবোধ সম্পর্কে এই কথাই সত্য। নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস। আমি তোমার সঙ্গে একমত। আমিও মনে করি, একটি উত্তমরূপে সংগঠিত রাষ্ট্র আনন্দ ও বেদনাবোধের ক্ষেত্রে তোমার বর্ণিত দেহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তুল্য।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে কোনো একজন নাগরিকের যখন মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলের কিছু ঘটবে তখন সমগ্র রাষ্ট্র তাকে তার মঙ্গল কিংবা অমঙ্গলের বিষয় বলে বিবেচনা করবে এবং তার সঙ্গে সমভাবে আনন্দ কিংবা বেদনা বোধ করবে। ঠিক নয় কি?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রে তেমনটিই ঘটবে।

এবার তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। সেখানে আমরা দেখব আমাদের বর্ণিত ব্যবস্থাপনা এই সকল মৌলিক নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না?

উত্তম কথা, সক্রেটিস।

যে-কোনো রাষ্ট্রের ন্যায় আমাদের রাষ্ট্রেও তো শাসক আছে এবং শাসিত আছে। নয় কি?

অবশ্যই।

এরা সকলেই তো সকলের নিকট নাগরিক?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে জনসাধারণ কি তাদের শাসককে অন্য নামে অভিহিত করে না?

সাধারণত তারা শাসককে প্রভু বলে অভিহিত করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসককে শুধুমাত্র শাসকই বলা হয়।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে শাসককে নাগরিক বলা ব্যতীত অপর কী নামে অভিহিত করা চলে?

আমাদের রাষ্ট্রে শাসকদের আমরা ত্রাণকর্তা এবং সাহায্যকারী বলে অভিহিত করব।

এবং শাসকগণ শাসিতকে কী বলবে?

শাসকগণ বলবে যে তারা তাদের রক্ষাকারী এবং পালকপিতা।

কিন্তু অন্য রাষ্ট্রে শাসকগণ শাসিতকে কী বলে?

তাদের দাস বলে।

অন্য রাষ্ট্রে শাসকগণ পরস্পরকে কী বলে?

তারা পরস্পরকে সহশাসক বলে।

আমাদের রাষ্ট্রে শাসকগণ পরস্পরকে কী বলবে?

সহ-অভিভাবক।

গ্লকন, তুমি কি কোনো রাষ্ট্রের এমন দৃষ্টান্ত দিতে পার যেখানে শাসকগণ এক সহ-শাসককে বন্ধু বলছে কিন্তু অপর একজনকে তার বন্ধু বলতে অসম্মত হচ্ছে?

হ্যাঁ, এরূপ তো প্রায়ই ঘটে।

আসলে সে মিত্র বলে তাকে যার সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক, এবং অ-মিত্র বলে তাকে যার সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক নেই।

খুবই সত্য কথা।

কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের কোনো শাসক কি তার সহশাসককে অ-মিত্র বলে ভাবতে পারে? কিংবা তাকে অ-মিত্র বলতে পারে?

না, তা সে ভাবতে পারে না। কারণ অপর সকলকেই সে হয় ভাই কিংবা বোন, পিতা কিংবা মাতা, পুত্র কিংবা কন্যা অথবা যাদের সঙ্গে সে এই সম্পর্কে সম্পর্কিত তাদেরই সন্তান বা পিতামাতা বলে গণ্য করবে।

আমি বললাম ঃ চমৎকার বলেছ, গ্লকন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ আমাদের শাকসকগণ কি নামে মাত্র একটি পরিবার হবে, না কার্যের মাধ্যমে তাদের এই নামের যথার্থতা তারা প্রমাণ করবে? যেমন ধরো 'পিতা' কথাটি। এই কথা বলতে কি বিধান অনুযায়ী পিতার প্রতি ভক্তি, বাধ্যতা এবং করণীয় কর্তব্য বোঝাবে না? এবং যে এগুলি ভঙ্গ করবে তাকে কি আমরা অপবিত্র এবং অন্যায়কারী বলে বিবেচনা করব না? আমরা কি মনে করব না যে, এরূপ লোক বিধাতা কিংবা মানুষ কারও নিকট থেকেই কোনো মঙ্গল লাভ করতে পারে না? আমাদের শিশুদের নিকট যাদেরকে পিতা এবং আত্মজন বলে পরিচিত করে দেওয়া হবে তাদের সম্বন্ধে এই সমস্ত সম্ভ্রমমূলক কথা কি আমরা সদা-সর্বদা উচ্চারণ করব না?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। এরূপ কথাই শিশুদের নিকট উচ্চারণ করতে হবে; অপর কোনো কথা নয়। কারণ সত্যিকার অর্থে না বলে কেবল মৌখিকভাবে পারিবারিক সম্পর্কের কথা উচ্চারণ করার চেয়ে অদ্ভুত বিষয় আর কী হতে পারে?

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রে অপর যে-কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে কথা এবং কাজের সঙ্গতি এবং ঐক্য অধিক দৃষ্ট হবে। এবং পূর্বে আমি যেরূপ বলেছিলাম সেরূপে কেউ যখন সুস্থ কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন অপর সকলে তার সেই সুস্থতা কিংবা অসুস্থতাকে নিজের সুস্থতা এবং অসুস্থতা বলে গণ্য করবে।

খুবই সত্য কথা।

এবং চিন্তা এবং বাক্যালাপের এই ধারাতেই তাদের আনন্দ এবং বেদনা হবে সমষ্টিগত। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক।

যে-কোনো বিষয়ে তাদের স্বার্থ হবে সমষ্টিগত স্বার্থ। একটি দ্রব্যকে সকলেই 'আমার দ্রব্য' বলে সমভাবে অভিহিত করতে পারবে। এই সমষ্টিগত স্বার্থ থেকেই তাদের সকলের মধ্যে একই রূপ আনন্দ এবং বেদনাবোধের সৃষ্টি হবে।

হ্যাঁ, অন্য রাষ্ট্র থেকে আমাদের রাষ্ট্রে এই বোধ অধিক সৃষ্টি হবে।

এবং এর কারণ হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের সাধারণ সুব্যবস্থা ব্যতীত আমাদের শাসকদের স্ত্রী এবং সন্তানরা সমষ্টিগতভাবে সকলের স্ত্রী এবং সন্তান বলে বিবেচিত হয়।

হ্যাঁ, এটাই প্রধান কারণ।

একটি সুসংগঠিত রাষ্ট্রকে বেদনা কিংবা আনন্দে আলোড়িত অঙ্গপ্রত্যঙ্গময় দেহের সঙ্গে তুলনা করে তাই আমরা বলেছিলাম, রাষ্ট্রের মধ্যে অনুভূতির এই ঐক্যের চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছিলাম এবং সঠিকভাবেই বলেছিলাম।

তা হলে স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমষ্টিগত মালিকানা রাষ্ট্রের জন্য মহত্তম মঙ্গলের উৎস।

অবশ্যই।

আর এ-নীতি আমাদের অপর নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপর নীতিতে আমরা বলেছিলাম, রাষ্ট্রের অভিভাবকদের কোনো ব্যক্তিগত গৃহ, কিংবা জমি কিংবা অপর কোনো সম্পত্তি থাকবে না। অপর নাগরিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত খাদ্যই তাদের মাহিনা হবে; সমষ্টিগতভাবে এই খাদ্য তারা গ্রহণ করবে এবং তাদের কোনোরূপ ব্যক্তিগত ব্যয় থাকবে না। কারণ আমাদের অভিভাবকদের যথার্থভাবে অভিভাবকের চরিত্র রক্ষা করতে হবে।

তোমার এ কথা ঠিক, সক্রেটিস।

সম্পত্তি এবং পরিবার—উভয়ের উপর সমষ্টিগত মালিকানা আমাদের অভিভাবকদের যথার্থ অভিভাবকে পরিণত করবে; এবার আর তারা 'আমার'

এবং 'আমার নয়' দাবির পরস্পরবিরোধী ব্যবহারে আমাদের নগরীকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলবে না; এবার আর তারা তাদের আহৃত দ্রব্যমাত্রকে নিজের ব্যক্তিগত গৃহে বহন করে ব্যক্তিগত পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আনন্দ এবং বেদনার ভোগে নিজেদের লিপ্ত করবে না। কারণ, কি তাদের প্রিয় এবং আপনার এ-সম্পর্কে সকলে ঐকমত্য পোষণ করে। ফলে তাদের সকলের লক্ষ্য অভিন্ন।

যথার্থ, সক্রেটিস।

তা ছাড়া এখন আর তাদের দেহ ব্যতীত নিজেদের এবং ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই। এ-কারণে বিচারালয়ে আইনগত অভিযোগ এবং নালিশেরও অস্তিত্ব থাকবে না। ব্যক্তিগত সন্তান, সম্পত্তি এবং সম্পর্ক যে-বিরোধের সৃষ্টি করে সে-বিরোধ থেকে আমাদের শাসকগণ এবার মুক্ত হবে।

হ্যাঁ, অবশ্যই তারা এরূপ বিরোধ থেকে মুক্ত হবে।

আক্রমণ এবং আঘাতের জন্য বিচারেরও কোনো আবশ্যকতা থাকবে না। আমাদের বিধান অনুযায়ী সমবয়স্কের অধিকার থাকবে সমবয়স্কের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার। এরূপ আত্মরক্ষাকে আমরা সম্মানজনক এবং সঠিক বলে বিবেচনা করব। নিজেকে রক্ষা করা যে-কারোর জন্য দায়িত্ব বলে আমরা নির্দিষ্ট করব।

এ-ব্যবস্থা উত্তম।

হ্যাঁ, এ-বিধান উত্তম এ-কারণেও বটে যে, কারোর যদি অপর কারোর সঙ্গে বিরোধের কোনো ব্যাপার থাকে তা হলে বিরোধের মুহূর্তেই তার ফয়সালা তারা করে ফেলবে। এ নিয়ে অধিকতর বিপজ্জনক কোনো পর্যায়ের দিকে তারা ধাবিত হবে না।

নিশ্চয়ই।

বয়োজ্যেষ্ঠদের উপর দায়িত্ব থাকবে বয়ঃকনিষ্ঠদের শাসনের এবং ভর্ৎসনার।

অবশ্যই।

আর এটাও নিঃসন্দেহ যে, কনিষ্ঠ যারা তারা জ্যেষ্ঠদের রাষ্ট্রের নির্দেশ ব্যতীত কোনো আঘাত করতে পারবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ জ্যোষ্ঠের প্রতি কোনোরূপ তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করবে না। কারণ তাদের জন্য অভিভাবক দুজন, একথা আমরা বলতে পারি। এক হচ্ছে লজ্জা। অপর হচ্ছে ভয়। এরা উভয়েই

শক্তিশালী। জনক-জননীর সম্পর্কিত যারা তাদের আঘাত করা লজ্জাজনক। এ-লজ্জাই তাদের নিবারিত করবে এরূপ অন্যায় থেকে। ভয়ও তাকে নিবারিত করবে। কারণ তার আঘাতে আহতদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে অপর সকলে, অর্থাৎ ভাই, পুত্র, পিতা।

এ কথা সত্য।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আইন সর্বতোভাবে নাগরিকদের মধ্যে শান্তিরক্ষার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে।

হ্যাঁ, শান্তির কোনো অভাব হবে না।

অভিভাবকদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের যখন আর অবকাশ থাকবে না তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে কিংবা বিদ্রোহে রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে আমরা মুক্ত থাকতে সক্ষম হব।

না, আমাদের সেরূপ কোনো বিপদ আর থাকবে না।

অপর যে-সকল ছোটখাটো এবং লক্ষ্যের অযোগ্য ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে আমাদের রাষ্ট্র মুক্ত হবে তার উল্লেখ আমি করলাম না। কেবল দৃষ্টান্ত হিসাবে ধনবানের প্রতি দরিদ্রের চাটুকারিতা, পরিবার-প্রতিপালনের দুঃখ এবং কষ্ট, গৃহের দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য অর্থসংস্থানের চিন্তা, অর্থ ধার করা এবং তাকে অস্বীকার করা, যে-কোনো প্রকারে অর্থসংগ্রহ করে মেয়েদের হাতে তা অর্পণ করা, দাস নিযুক্ত করা ইত্যাকার যে-সমস্ত দুর্ভোগে মানুষ ভোগে তার কথা বলা যায়। এদের থেকে মুক্তির ব্যাপার যেমন স্পষ্টতই ক্ষুদ্র, তেমনি উল্লেখের অযোগ্য।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। এগুলো দেখার জন্য চোখের আবশ্যক হয় না।

এই সমস্ত অমঙ্গল থেকে আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিকগণ মুক্ত হবে। তাদের জীবন অলিম্পিক বিজয়ীদের চেয়েও অধিক স্বর্গীয় এবং সুখী হবে।

কেমন করে?

কারণ অলিম্পিক বিজয়ী তো আমাদের নাগরিকদের সুখের অংশবিশেষই মাত্র লাভ করতে পারে। আমাদের নাগরিকদের বিজয় তো অলিম্পিক বিজয়ের চেয়েও মহৎ। কারণ তাদের বিজয় তো সমগ্র রাষ্ট্রের মুক্তি অর্জন। আর এ-বিজয়ের মুকুট হচ্ছে তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্ততিদের জীবনের পূর্ণ বিকাশ। এ-বিজয়মুকুট তারা রাষ্ট্রের হাত থেকে লাভ করে। মৃত্যুর পরে তারা লাভ করে রাষ্ট্রের হাতে সম্মানজনক সমাধি।

হ্যাঁ সক্রেটিস, এগুলি অবশ্যই মহৎ পুরস্কার।

তোমার হয়তো স্মরণ আছে গ্লকন, আমাদের পূর্বের আলোচনায় কোনো একজন (আমি তার নামের উল্লেখ করতে চাইনে) আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে, আমরা আমাদের অভিভাবকদের অসুখী করে তুলছি। কারণ তারা যেখানে অধিকারী হতে পারত সবকিছুর, আমরা সেখানে তাদের করে দিয়েছি নিঃস্ব। আমরা এই অভিযোগের জবাবে বলেছিলাম, পরবর্তীকালে এই প্রশ্নের আলোচনার আমরা সুযোগ পাব। কিন্তু বর্তমানে আমরা আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবকদের যথার্থরূপে অভিভাবক করতে চাই। আমরা রাষ্ট্রকে গঠন করছি সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বাধিক সুখের জন্য, কোনো বিশেষ শ্রেণীর সুখের জন্য নয়।

হ্যাঁ, সেকথা আমার স্মরণ আছে সক্রেটিস।

কিন্তু এখন আমাদের রাষ্ট্রের অভিভাবকদের জীবন যখন অলিম্পিয়ার বিজয়ীদের চেয়ে অধিক উত্তম এবং মহৎ, তখন তুমি কী বলবে? তুমি কী পাদুকানির্মাণকারী কিংবা ক্ষেত্রকর্ষণকারী অথবা অপর কোনো কারিগরের জীবনের সঙ্গে আমাদের অভিভাবকদের জীবনকে তুল্য মনে করবে?

নিশ্চয়ই না, সক্রেটিস।

এবং আমাদের আলোচনায় পূর্বে কোথাও যা আমি বলেছি আবার আমাকে তা বলতে হচ্ছে ঃ এদের কারোর ন্যায় আমাদের কোনো অভিভাবক যদি সুখী হতে চায় তা হলে সে আর অভিভাবক নামের উপযুক্ত থাকবে না। অভিভাবকের সুসঙ্গতিপূর্ণ জীবনই হচ্ছে সর্বোত্তম জীবন। কিন্তু সে যদি কারোর যৌবনের অহংকারী সুখের মোহে মোহিত হয়ে সমগ্র রাষ্ট্রকে নিজের স্বার্থে করায়ত্ত করতে চায় তা হলে তাকে পরিণামে হিসিয়ডের জ্ঞানী বাণীকেই শিখতে হবে। হিসিয়ড বলেছেন ঃ 'আসলে অর্ধেকেই পুরাটার চাইতে বেশি।'

এমন কাজ করার পূর্বে এই অভিভাবক আমার অভিমত জিজ্ঞেস করলে আমি বলব ঃ জীবনে যা পেয়েছ তাতে সন্তুষ্ট থাকো।

অধ্যায় ঃ ১৪
[৪৬৭—৪৭৩]

আদর্শ এবং বাস্তবের প্রশ্ন

সক্রেটিস আদর্শ রাষ্ট্র রচনা করেছেন—এটি উত্তম ব্যাপার। গ্লকন বললেন ঃ কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা কি বাস্তবায়িত করা সম্ভব? সাধারণ মানুষের এ-প্রশ্ন স্বাভাবিক। আদর্শ যদি বাস্তবায়িত না হয় তা হলে সে-আদর্শে আমাদের কী লাভ? আদর্শকে কল্পনায় রেখে আমাদের কী উপকার? কিন্তু সক্রেটিস সেরূপ মনে করেন না। আদর্শের সার্থকতা বাস্তব হওয়ার মধ্যে নয়। আদর্শ বাস্তব হলে আর সে আদর্শ থাকে না। আদর্শের সার্থকতা আদর্শ থাকায়। আদর্শ হচ্ছে আকর্ষণ; আদর্শ হচ্ছে পরিমাপদন্ড। আদর্শ বাস্তবায়িত হতে পারে না বলে আদর্শ বাস্তবের চেয়ে কম 'বাস্তব' অর্থাৎ কম সত্য বা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আদর্শ বাস্তবের চেয়ে অধিক 'বাস্তব', অধিক সত্য। কারণ, আদর্শহীন হলে আমরা স্থাণু হয়ে পড়ি। আদর্শ দিয়ে আমরা আমাদের বাস্তবের সম্পূর্ণতা অসম্পূর্ণতাকে পরিমাপ করি। যে-অস্তিত্ব আদর্শের যত নিকটবর্তী হতে পেরেছে সে-অস্তিত্ব তত সম্পূর্ণ। যে আদর্শ থেকে যত দূরে সে তত অসম্পূর্ণ। কাজেই মানুষের প্রয়োজন আদর্শকে বাস্তব করে তোলা নয়, বাস্তবকে যত অধিক সম্ভব আদর্শ করে তোলা। কাজেই আমাদেরও প্রয়োজন হচ্ছে স্থির করা, কোন্ কোন্ পরিবর্তনের মাধ্যমে বাস্তব অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রকে আমরা অধিকতর সম্পূর্ণ অর্থাৎ আদর্শ রাষ্ট্রের অধিকতর নিকটবর্তী করে তুলতে পারি। তাই সক্রেটিস বললেন ঃ "আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল ঃ পরিপূর্ণ পরম ন্যায়ের প্রকৃতি কী? ... এ-জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল ঃ আমরা একটি আদর্শকে পেতে চেয়েছিলাম, যেন আমরা আমাদের বাস্তব সুখ এবং অ-সুখকে এই আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করতে পারি। আদর্শের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য কতখানি। আদর্শ যথার্থভাবে বাস্তবে থাকতে পারে—একথা প্রমাণের জন্য আমরা আদর্শের অন্বেষণ করিনি।"

সে যাহোক, গ্লকন, তুমি আমার সঙ্গে একমত; আমরা যেরূপ বলেছি, আমাদের রাষ্ট্রে পুরুষ এবং মেয়েদের জীবনপদ্ধতি হবে একই। একই প্রকার শিক্ষা তারা লাভ করবে, তাদের সন্তান হবে যৌথ সন্তান এবং নগর রক্ষায় কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের উভয়ের দায়িত্ব এক। একসঙ্গেই তারা নগর প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে, কুকুরের ন্যায় একসঙ্গেই তারা শিকারের সন্ধানে বহির্গত হবে। মোটকথা শারীরিক গঠনে যতদূর সম্ভব মেয়েদের দায়িত্ব পুরুষের সমান হবে, এবং যৌথ জীবনে যা মহৎ তা তারা উভয়েই সাধন করবে। মেয়ে এবং পুরুষের সম্পর্কের স্বাভাবিকতাকে তারা রক্ষা করবে। তাকে তারা ভঙ্গ করবেনা।

গ্লকন বললেন ঃ তোমার সঙ্গে আমি একমত, সক্রেটিস।

আমাদের অনুসন্ধানের আর একটি দিক অবশ্য এখনও বাকি ঃ পশুর মধ্যে যেমন দেখা যায়, মানুষের মধ্যে মেয়ে ও পুরুষের এরূপ যৌথজীবন সম্ভব কি না।

হ্যাঁ, তোমাকে এই প্রশ্নটিই আমি করতে যাচ্ছিলাম।

আমি বললাম ঃ তারা যুদ্ধ কেমন করে পরিকল্পনা করবে সে-বিষয়টি অবশ্যই বোঝা তেমন কঠিন কিছু নয়।

কেমন করে?

কেন? তারা একসঙ্গেই যুদ্ধযাত্রা করবে। তাদের সন্তানদের মধ্যে যারা সবল তাদের তারা সঙ্গে নেবে। কারণ, শিল্প-কারিগরের সন্তানরা পিতার কাজ অল্প বয়স থেকেই পর্যবেক্ষণ করে। কারণ, পরবর্তীকালে তারাও পিতার কাজ গ্রহণ করবে। অভিভাবকের সন্তানকেও তাদের পিতামাতার কাজ কারিগরের সন্তানদের মতো দেখতে হবে। কেবল দেখা নয়, যুদ্ধের বিষয়ে পিতামাতাকে তারা সাহায্য করবে, তাদের পরিচর্যা করবে। তুমি কুম্ভকারের সন্তান দেখেছ? তুমি দেখনি কেমন করে সে পিতার কাজকে দেখে এবং তার পাত্র তৈরির চক্রে হাত লাগাবার বয়সের বহু পূর্ব থেকে পিতাকে সে সাহায্য করে?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি তাদের দেখেছি।

কিন্তু আমাদের অভিভাবকদের চেয়ে কুম্ভকারগণ কি তাদের সন্তানের শিক্ষাদানের বিষয়ে, তাদের পেশা দেখাবার এবং তা হাতেকলমে শেখাবার বিষয়ে অধিক যত্মবান হতে পারে?

না, এরূপ মনে করা অদ্ভুত হবে।

তা ছাড়া, পশুর ক্ষেত্রে যেমন, মানুষের ক্ষেত্রেও পিতামাতার উপরও সন্তানের প্রভাব পড়ে। সন্তানের সঙ্গে তাদের সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবে।

সে কথা সত্য। কিন্তু ধরো তারা যুদ্ধে পরাজিত হল। তখন কি বিপদ বেশি হবে না? পিতামাতা এবং সন্তানগণ—সবাই নিহত হবে। এরূপ ক্ষতিকে পূরণ করা রাষ্ট্রের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে না।

সত্য কথা গ্লকন। কিন্তু তাই বলে তুমি কি তাদের কখনো বিপদের ঝুঁকি নিতে দেবে না?

না, আমি সে কথা মোটেই বলছি না।

কিন্তু বিপদের ঝুঁকি যদি নিতে হয় তা হলে তাদের এমন উপলক্ষে সে-ঝুঁকি নেওয়া আবশ্যক যে, বিপদ কাটাতে পারলে তার লাভ যেন তাদের বিরাট হয়।

অবশ্যই।

যারা আগামীতে যোদ্ধা হবে যৌবনে তাদের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করা অবশ্যই আবশ্যক। এ-কারণে এরূপ ঝুঁকি আমাদের নিতে হবে।

হ্যাঁ, এরূপ ঝুঁকি নেওয়ার গুরুত্ব আছে।

তা হলে আমাদের প্রথম পদক্ষেপ হবে এটি ঃ সন্তানেরা যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করবে। তবে আমাদের দেখতে হবে, তাদের নিরাপত্তার যেন ব্যবস্থা থাকে। তা হলেই ব্যাপারটি উত্তম হবে।

ঠিক।

পিতামাতা নিশ্চয়ই যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে অন্ধ হবে না। তাদের অনুমানশক্তি দ্বারা তারা স্থির করবে সন্তানদের জন্য কোন্ অভিযান নিরাপদ হবে এবং কোন অভিযান বিপজ্জনক।

হ্যাঁ, একথা আমরা ধরে নিতে পারি।

কাজেই তারা সন্তানদের নিরাপদ অভিযানেই নিয়ে যাবে; বিপজ্জনক অভিযান সম্পর্কে তারা সাবধান থাকবে।

অবশ্যই।

সন্তানদের তারা অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের অধিনায়কত্বে স্থাপন করবে। এরা তাদের নেতা এবং শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বপালন করবে।

হ্যাঁ, তা-ই ঠিক হবে।

অবশ্য যুদ্ধের বিপদের সব কথা পূর্ব থেকে অনুমান করা চলে না। তার অনেক কিছু আকস্মিকতার উপর নির্ভর করে।

একথা ঠিক।

এরূপ আকস্মিকতার বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ছোটদের এমনভাবে সজ্জিত করতে হবে যেন তারা বিপদের সময়ে দ্রুত সরে পড়ে বিপদকে এড়াতে পারে।

কেমন করে?

আমরা তাদের শৈশব থেকে অশ্বারোহণে শিক্ষিত করব। অশ্বারোহণে যখন তারা শিক্ষিত হবে আমরা তখন তাদের অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাব যেন তারা যুদ্ধকে দেখতে পায়। অবশ্য অশ্বগুলি যুদ্ধের অশ্ব হবে না। সেগুলো বাধ্য এবং দ্রুতগতির হবে। এভাবে আমাদের কিশোরেরাও যুদ্ধের নিকটদৃশ্য দেখতে পাবে। যে-পেশা পরবর্তী জীবনে তারা গ্রহণ করবে তার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা তারা লাভ করবে। বিপদ আসন্ন হলে তারা তাদের জ্যেষ্ঠদর অনুসরণ করবে এবং বিপদ থেকে পরিত্রাণলাভের চেষ্টা করবে।

তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

এবার যুদ্ধের কথায় আসা যাক। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের সঙ্গে সৈনিকের এবং সৈনিকের সঙ্গে শত্রুর সম্পর্ক কীরূপ হবে? আমার তো মনে হয়, যে-সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে দলত্যাগী হবে কিংবা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে কিংবা অপর কোনো কাপুরুষতার পরিচয় দেবে তার পদাবনতি ঘটিয়ে তাকে কৃষক বা শিল্প-কারিগরের শ্রেণীতে নামিয়ে দেওয়া উচিত। তোমার কী মনে হয়, গ্লকন?

আমিও তা-ই মনে করি সক্রেটিস।

আর কেউ যদি স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে বন্দি হয় তা হলে তাকে আমরা শত্রুর নিকট পাঠানো উপঢৌকন হিসাবে গণ্য করব। যে শত্রুর শিকারে পরিণত হয়েছে তাকে নিয়ে শত্রু যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারে।

অবশ্যই।

কিন্তু যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তার বিষয়ে আমাদের কী সিদ্ধান্ত হবে? প্রথমত তার তরুণ সাথিদের তরফ থেকে তাকে সম্মানিত করা হবে। সাথিগণ একের পর এক তার মাথায় জয়ের মুকুট পরিয়ে দেবে। তুমি কী বল, গ্লকন?

তোমার এ-প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

সকলের সঙ্গে তার করমর্দনের প্রস্তাবটিও থাকা উচিত?

সে-প্রস্তাবও আমি সমর্থন করি।

কিন্তু আমার পরবর্তী প্রস্তাবটি নিশ্চয়ই তুমি সমর্থন করবে না?

কী তোমার প্রস্তাব?

আমার প্রস্তাব হচ্ছে বীরকে সবাই চুম্বন করবে এবং বীর সকলকে চুম্বন করবে।

অবশ্যই আমি এ-প্রস্তাব সমর্থন করি। আমি বরঞ্চ আরও বলব ঃ অভিযানের অবশিষ্ট সময়ে বীর যাকে চুম্বন করতে চাইবে তার পক্ষে তাকে প্রত্যাখান করা চলবে না। কেননা বীরের যদি কোনো প্রেমিক কিংবা প্রেমিকা থাকে তা হলে তাকে জয় করার জন্য অধিকতর বীরত্ব-প্রদর্শনে সে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

আমি বললাম ঃ আহা, চমৎকার বলেছ। বীরের পত্নীসংখ্যা যে অপরের চেয়ে অধিক হবে, সে-সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই গৃহীত হয়েছে। তা ছাড়া এ-ব্যাপারে নির্বাচন করার প্রথম অধিকার তারই। কারণ আমরা চাই সে সর্বাধিকসংখ্যক সন্তানের জনক হোক।

এ-প্রস্তাবও আমি স্বীকার করি।

তা ছাড়া বীরকে সম্মান করার আরও উপায় আছে। হোমার তা বর্ণনা করেছেন। হোমার বলেছেন, এ্যাজাক্স যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করলে তাকে ভোজের উৎসবে পশুর মেরুদণ্ড খেতে দিয়ে সকলে তাকে সম্মানিত করল।[১] এটা বীরের প্রতি যেমন সম্মানের স্মারক, তেমনি তাকে বলশালী করারও উপায়।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তা হলে এক্ষেত্রে আমরা হোমারকে আমাদের শিক্ষক বলে মানতে পারি। আমরাও বলির উৎসবে আমাদের বীরদের বীরত্বের পরিমাণ অনুযায়ী তাদের উদ্দেশে স্তোত্র-কীর্তন করে কিংবা অন্য উপায়ে তাদের সম্মানিত করব; ভোজনের সারিতে প্রথম আসনের অধিকার হবে তাদের, ভোজনের পাত্র তাদের মাংসপূর্ণ হবে; সুরাভাণ্ডও তাদের শূন্য থাকবে না। এমনিভাবে পুরুষ এবং নারী-নির্বিশেষে আমাদের বীরদের আমরা সম্মান জানাব। এই সম্মান জানাবার মাধ্যমে আমরা তাদের শিক্ষিত করেও তুলব।

তোমার প্রস্তাবটি উত্তম।

এবং যারা সমরক্ষেত্রে গৌরবময় মৃত্যুবরণ করবে আমরা বলব তারা 'সোনার মানুষ' ছিল।

অবশ্যই।

---

১. হোমার ঃ ইলিয়াড।

কারণ হিসিয়ডে আমরা দেখেছি, 'মৃত্যুর পরে তারা পবিত্র দেবদূতে পরিণত হয়; তারা সৎকর্ম সাধন করে, অপদেবতাকে নিবৃত্ত করে এবং ভাষাময় মানুষকে তারা রক্ষা করে।'

হ্যাঁ, হিসিয়ডে এরূপ আছে। তাঁর কথাকেই আমরা স্বীকার করব। আর দেবতার কাছ থেকে আমরা নির্দেশ নেব, এই বীরদের সমাহিত করার পদ্ধতি কী। তাদের কী বিশেষ সম্মানে ভূষিত করতে হবে। এ-বিষয়ে দেবতার নির্দেশ আমরা পালন করব।

দেবতার নির্দেশ অবশ্যই আমরা পালন করব।

এবং অনাগত যুগেও আমরা তাদের সম্মান করব। আমরা বীরদের সমাধির সম্মুখে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করব। কেবল এই বীরদের নয়, যারা বিশেষভাবে মহৎ তারা বার্ধক্য কিংবা অন্যভাবে পরলোকগমন করলে তাদের প্রতিও আমরা সম্মান জানাব।

হ্যাঁ, তা করাই আমাদের উচিত হবে।

তা হলে এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে : আমাদের সৈনিকরা তাদের শত্রুদের প্রতি কীরূপ আচরণ করবে? এ-ব্যাপারে তোমার কী মত?

কোন্ ব্যাপারের কথা বলছ, সক্রেটিস?

প্রথমত দাসত্ব সম্পর্কে। তুমি কি মনে কর, গ্রীসীয় কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে অপর গ্রীসীয় রাষ্টকে দাসে পরিণত করা সঙ্গত? কিংবা অপর কাউকে গ্রীসীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাহায্য করা সঙ্গত? একটি গ্রীসীয় রাষ্ট্রের কি উচিত নয় অপর গ্রীসীয়কে দাসত্ব থেকে এরূপ বিবেচনায় রেহাই দেওয়া যে, অন্যথায় পরিণামে একদিন সমগ্র গ্রীক জাতি বৈদেশিকদের দাসে পরিণত হতে পারে?

রেহাই দেওয়া অবশ্যই উত্তম।

তা হলে আমাদের বিধান হবে : কোনো গ্রীসীয় অপর কোনো গ্রীসীয়কে দাসে পরিণত করতে পারবে না। আমাদের সৈন্যগণ এই বিধান মেনে চলবে। এবং অপর গ্রীসীয়কেও এ-নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেবে।

অবশ্যই, সক্রেটিস। এরূপে তারা বর্বরদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে এবং পরস্পরের উপর আক্রমণ থেকে বিরত থাকবে।

তারপর প্রশ্ন হচ্ছে নিহতদের সম্পর্কে। এক্ষেত্রে বিজয়ীরা কী করবে? নিহতের বর্ম ব্যতীত অপর কিছু কি বিজয়ীর পক্ষে নেওয়া সঙ্গত? নিহত শত্রুর সবকিছু অপহরণ করা কি অনেক সময়ে যুদ্ধকে পরিহার করার অজুহাত হিসাবে

প্রদত্ত হয় না? বস্তুত কাপুরুষ সৈনিক নিহতদের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু তারা কৈফিয়ত পেশ করে, তারা একটি কর্তব্য সম্পাদন করছে। প্রকৃতপক্ষে, অতীতে বহু বাহিনী লুণ্ঠনের এই প্রবৃত্তি থেকে পরাজিত হয়েছে।

তোমার একথা সত্য।

তা ছাড়া একটা মৃতদেহ লুণ্ঠনের মধ্যে লুণ্ঠনকারীর লোভ এবং নীচতার প্রকাশ ঘটে। লুণ্ঠনকারীর এরূপ ব্যবহার নারীসুলভও বটে। কারণ, সংগ্রামকারী শত্রু যেখানে তার দেহটি রেখে সরে পড়েছে, কাপুরুষ সৈনিক সেখানে সেই মৃতদেহের সঙ্গে লড়াই করার ভাব দেখাচ্ছে। এ প্রায় সেই কুকুরের ন্যায় যে তার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপকারীর বদলে প্রস্তরখণ্ডকে লক্ষ্য করে মুখব্যাদান করতে থাকে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, এ প্রায় কুকুরের ব্যবহার।

কাজেই নিহতকে বিকৃত করা এবং তাকে সমাধিস্থ হতে না দেওয়ার আচরণ থেকে আমাদের অবশ্যই বিরত হতে হবে।

গ্লকন বললেন ঃ অবশ্যই এরূপ আচরণ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে।

দেবতার মন্দিরে অস্ত্র অর্পণের প্রথাও আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয়। বিশেষ করে অপর গ্রীসীয়দের সঙ্গে উত্তম সম্পর্ক রাখতে চাইলে তাদের অস্ত্র অর্পণ মোটেই সঙ্গত নয়। আত্মজনের লুণ্ঠিত দ্রব্যের এরূপ অর্পণের প্রথা মন্দিরকে কলুষিত করে। দেবতার আজ্ঞা ব্যতীত এরূপ প্রথা আমাদের অনুসরণ করা উচিত নয়।

যথার্থ কথা, সক্রেটিস।

তদুপরি প্রশ্ন হচ্ছে গ্রীসের অপর কোনো রাষ্ট্রের ধ্বংস এবং তার গৃহসমূহ অগ্নিদগ্ধ করার প্রশ্ন। এক্ষেত্রে কী আচরণ সঙ্গত?

তোমার অভিমতটি শুনি, সক্রেটিস।

আমার মতে উভয় প্রথাকে নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। আমরা কেবলমাত্র তাদের বাৎসরিক ফসলই নিতে পারি, অপর কিছু নয়। তোমাকে এ-প্রস্তাবের কারণের কথা বলব?

অবশ্যই।

কারণ, আমার মতে 'বিরোধ' এবং 'যুদ্ধ' একথা দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। এদের প্রকৃতি পৃথক। একটিকে বলব আমি অভ্যন্তরীণ এবং ঘরোয়া;

অপরটিকে বৈদেশিক। এ-কারণে এদের প্রথমটিকে বলা হয় 'বিরোধ' এবং দ্বিতীয়টিকে মাত্র 'যুদ্ধ'।

তোমার পার্থক্যকরণটি যথার্থ হয়েছে।

এবং অনুরূপ উপযুক্ততা নিয়েই আমি বলব ঃ গ্রীসীয় জাতির মধ্যে আছে রক্ত এবং বন্ধুত্বের বন্ধন, বিদেশী এবং বর্বরদের বিরুদ্ধে তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ।

ঠিক।

এবং তাই কোনো গ্রীসীয় রাষ্ট্র যখন বর্বরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বর্বরগণ গ্রীসীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে তখন তারা পরস্পর যুদ্ধে রত থাকে এবং তারা পরস্পর শত্রু। এই লড়াইকে আমরা বলব 'যুদ্ধ'। কিন্তু গ্রীসীয় যখন গ্রীসীয়র বিরুদ্ধে লড়াই করে তখন আমরা বলব গ্রীসীয় রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধ দেখা দিয়েছে। কারণ তারা পরস্পরের বন্ধু। এরূপ লড়াইকে আমরা বলব 'বিরোধ'।

আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস।

এখন ধরো, যাকে আমরা বিরোধ বলেছি সে-বিরোধ আমাদের রাষ্ট্রে দেখা দিল। বিরোধে নগর বিভক্ত হয়ে গেল। বিভক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ একে অপরের জমি ধ্বংস করতে লাগল এবং গৃহাদি অগ্নিদগ্ধ করতে লাগল। এমন হলে বিরোধ কি মারাত্মক আকার ধারণ করবে না? যে যথার্থ দেশপ্রেমিক, যে তার দেশকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসে সে কখনো তারই জননী এবং প্রতিপালককে এমনিভাবে নখরাঘাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে না। বিরোধে বিজয়ীপক্ষ পরাজিতের ফসল দখল করতে পারে। কিন্তু অন্তরে তাদের শান্তিস্থাপনার উদ্দেশ্য থাকতে হবে। চিরকাল তারা লড়াই করতে থাকবে—এরূপ তাদের চিন্তা করা সঙ্গত নয়।

হ্যাঁ, তাদের শান্তির কথাই স্মরণ রাখতে হবে। ধ্বংসকারী মনোভাবের চেয়ে এটি উত্তম মনোভাব।

এবং আমরা যে-নগর রচনা করছি সে তো গ্রীসেরই একটি নগর?

হ্যাঁ, তা-ই হওয়াই তো সঙ্গত।

তা হলে আমাদের এ রাষ্ট্রের নাগরিককে কি উত্তম এবং সভ্য হতে হবে না?

অবশ্য। তাদের অবশ্যই সভ্য হতে হবে।

তা ছাড়া তারা কি গ্রীসকে ভালোবাসবে না? তারা কি গ্রীসকে তাদের

নিজেদের দেশ বলে বিবেচনা করবে না? সকল নগরীর দেবমন্দিরকে কি তারা নিজেদের মন্দির বলে গণ্য করবে না।

অবশ্যই।

তা হলে তাদের নিজেদের মধ্যে যে-পার্থক্য সে হচ্ছে বিরোধ। এ হচ্ছে বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়া। একে যুদ্ধ বলা চলে না। ঠিক নয় কি?

ঠিক। একে যুদ্ধ বলা চলে না।

তাই তারা যখন ঝগড়া করবে তখন পরিণামে আপোসের মনোভাব নিয়েই ঝগড়া করবে।

নিশ্চয়ই, তাদের আপোসের মনোভাব থাকতে হবে।

মিত্রসুলভ সংশোধনকে তাদের গ্রহণ করতে হবে। তারা পরস্পরকে দাসে পরিণত করবে না। অপরকে ধ্বংস করার ইচ্ছা তাদের থাকবে না। তারা পরস্পরের সংশোধক হবে, শত্রু নয়।

তাদের এরূপই হতে হবে।

আর তাই বিবদমান পক্ষদ্বয় যখন উভয়ই গ্রীসের, তখন গ্রীসকে ধ্বংস করা তাদের লক্ষ্য হতে পারে না। তারা একে অপরের গৃহ অগ্নিদগ্ধ করতে পারে না কিংবা তারা এরূপ বিবেচনা করত পারে না যে, একটি নগরীর নারী পুরুষ শিশু সকলে তাদের শত্রু। কারণ, তাদের স্মরণ রাখতে হবে, যুদ্ধের অপরাধ মাত্র কতিপয়ের, সকলের নয়। নগরীর অধিকাংশকে বন্ধু বলে গণ্য করতে হবে। এই কারণে বিবদমান পক্ষের কেউ অপরপক্ষের জমিকে বিনষ্ট করতে পারে না, তাদের গৃহকে ধ্বংস করতে পারে না। নিরপরাধ ক্ষতিগ্রস্ত সকলে অপরাধী কতিপয়কে তাদের কৃতকর্মের জন্য দণ্ডিত না করা পর্যন্তই মাত্র তাদের বিরোধ স্থায়ী হতে পারে, তার অধিক নয়।

সক্রেটিস, তোমার সঙ্গে আমি একমত। নিজেদের বিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের নাগরিকগণের অর্থাৎ গ্রীসবাসীর প্রতি গ্রীসবাসীর আচরণ এরূপ হওয়াই উচিত। কিন্তু বৈদেশিক শত্রুর সঙ্গে আচরণ বর্তমানের ন্যায়ই হবে।

তা হলে আমাদের অভিভাবকদের জন্য আমাদের বিধান হবে ঃ একজন গ্রীসবাসী অপর গ্রীসবাসীর জমিকে ধ্বংস করতে পারবে না; তার গৃহকে সে অগ্নিদগ্ধ করতে পারবে না।

গ্লকন বললেন ঃ আমি একমত। এবং আমরা এও বলব যে, আমাদের অপর সকল বিধানের ন্যায় বর্তমান বিধানও উত্তম। কিন্তু সক্রেটিস, আমার বক্তব্য

হচ্ছে, তুমি এই ধারাতে অগ্রসর হলে এই আলোচনার গোড়াতে যে-প্রশ্নকে তুমি সরিয়ে রেখেছিলে তাকে তুমি একেবারেই ভুলে যাবে। প্রশ্নটি ছিল ঃ এরূপ ব্যবস্থা কি বাস্তবায়িত করা সম্ভব? এবং যদি সম্ভব হয় তা হলে কেমন করে তা সম্ভব? কারণ, একথা আমি স্বীকার করছি, তুমি যেরূপ প্রস্তাব করেছ তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হলে রাষ্ট্রের মহৎ কল্যাণ সাধিত হবে। এক্ষেত্রে তুমি যা বলনি আমি তাও বলছি ঃ এ-রাষ্ট্রের নাগরিকগণ অবশ্যই সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা হিসাবে নিজেদের প্রমাণিত করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে দলত্যাগ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা সকলে সকলের পিতা, ভ্রাতা এবং পুত্র। তা ছাড়া তুমি যেমন বলেছ, মেয়েরাও যদি সৈন্যবাহিনীতে শত্রুর আতঙ্ক হিসাবে সম্মুখসারির যোদ্ধা অথবা পশ্চাৎসারির সহায়ক হিসাবে যোগদান করে তা হলে আমাদের বাহিনী একেবারেই অপরাজেয় হয়ে উঠবে। তা ছাড়া তোমার প্রস্তাবে সাংসারিক অনেক সুবিধার বিষয়ও আছে। কিন্তু এই সকল এবং অন্য যা-কিছু সুবিধা, তা সম্ভব কেবলমাত্র তোমার প্রস্তাবিত এ-রাষ্ট্র যদি বাস্তবায়িত হয়। এ-সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। চিন্তার দিক থেকে আমাদের এ-রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে আমি স্বীকার করছি। এবার তার সম্ভাব্যতার বিষয় নিয়ে—তাকে বাস্তবায়িত করার উপায় নিয়ে, এসো আমরা আলোচনা করি।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, এ তোমার ভারি নির্দয় ব্যবহার। আমি একটু এদকি-ওদিক হলেই তুমি আমাকে আক্রমণ করে বস। প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউ-এর আঘাত কাটাতে-না-কাটাতে, তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি আমাকে তৃতীয় এবং সবচেয়ে মারাত্মক ঢেউয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছ। এই তৃতীয় ঢেউ যখন তুমি দেখবে তখন তুমি নিজেও আমার আতঙ্ক এবং দ্বিধার কারণটি অনুধাবন করত সক্ষম হবে। তুমি তখন বুঝতে পারবে, যে-অভিনব প্রস্তাবের কথা আমাকে এখন বলতে হবে এবং যে-সমস্যার সমাধান আমাকে অন্বেষণ করতে হবে তার চিন্তায় আমার পক্ষে ভীত এবং দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস এরূপ আবেদন তুমি যতই করবে, তোমার কাছ থেকে জবাবের দাবি আমাদের ততই প্রবল হবে। এরূপ রাষ্ট্র কেমন করে বাস্তবায়িত করা যায় তা তোমাকে বলতে হবে। বিলম্বের চেষ্টা বৃথা। তাই বিলম্ব না করে সক্রেটিস, সোজা তুমি আলোচনাটি শুরু করো।

আমি বললাম, তা হলে একটি কথা তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিই। আমরা এখানে কেমন করে এলাম? ন্যায় এবং অন্যায়ের অন্বেষণের মধ্য দিয়েই আমরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। ঠিক নয় কি গ্লকন?

ঠিক, সক্রেটিস। কিন্তু তাতে কী?

না, আমি জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম ঃ যদি আমরা ন্যায় এবং অন্যায়কে পেয়ে থাকি, তা হলে একজন ন্যায়বান লোকের কাছে আমাদের কী দাবি হবে? আমরা কি বলব ঃ তাকে পুরোপুরি ন্যায়বান হতে হবে—অর্থাৎ ন্যায়কে পরিপূর্ণরূপে তার মধ্যে থাকতে হবে—তার একচুল কম হলে চলবে না? অথবা যদি তাকে ন্যায়ের কাছাকাছি হতে দেখি—অর্থাৎ অপরের মধ্যে ন্যায়ের যে-পরিমাণ দৃষ্ট হয় তার চেয়ে তার ন্যায়ের পরিমাণ যদি অধিক হয় তা হলেই আমরা সন্তুষ্ট বোধ করব?

হ্যাঁ, ন্যায়ের কাছাকাছি হলেই যথেষ্ট।

আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল ঃ পরিপূর্ণ বা পরম ন্যায়ের প্রকৃতি কী? পরম ন্যায়বানের বৈশিষ্ট্য কী? তেমনি অপরদিকে অন্যায়ের চরিত্র কী এবং চরম অন্যায়ীর বৈশিষ্ট্য কী? এ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য ছিল ঃ আমরা একটি আদর্শকে পেতে চেয়েছিলাম। এই আদর্শলাভের কারণ ছিল, যেন আমরা আমাদের বাস্তব সুখ অ-সুখকে এই আদর্শের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করতে পারি, আদর্শের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য কতখানি। আদর্শ যথার্থভাবে বাস্তবে থাকতে পারে—একথা প্রমাণের জন্য আমরা আদের্শের অন্বেষণ করিনি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক সক্রেটিস।

তা হলে, একজন শিল্পী সম্পর্কে আমরা কী বলব? শিল্পী পরিপূর্ণ সুন্দর মানুষের ছবি অঙ্কন করেছে। তার দক্ষতার কোনো ত্রুটি নেই। আদর্শ সুন্দরের ছবি। কিন্তু এমন আদর্শ সুন্দর মানুষ কোথাও অস্তিত্বমান কখনো ছিল—একথা সে প্রমাণ করতে পারে না। এ-কারণে কি আমরা এই শিল্পীকে নিকৃষ্ট শিল্পী বলে অভিহিত করব?

অবশ্যই না। এ-কারণে সে আদৌ নিকৃষ্ট হবে না।

আমরাও কি সর্বোত্তম রাষ্ট্রের একটি আদর্শ রচনা করছিলাম না?

নিশ্চয়ই।

কিন্তু যদি সে-রাষ্ট্রের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণে আমরা অসমর্থ হই তা হলে আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের তাতে কি কোনো হানি ঘটবে?

অবশ্যই না।

আমি বললাম ঃ সেটাই যথার্থ সত্য। তবু তোমার অনুরোধে আমি যদি দেখাবার চেষ্টা করি, কোন্ অবস্থাতে আমাদের রাষ্ট্রের বাস্তবায়িত হওয়ার

সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি তা হলে তোমাকেও তোমার পূর্ব-স্বীকৃতিগুলোকে পুনরায় ঘোষণা করতে হবে।

কী স্বীকৃতি?

আমি জানতে চাচ্ছি, আদর্শ কি কখনো বাস্তবে রূপায়িত হয়? কারণ, যা আদর্শ তা বাস্তবের চেয়ে অধিক। সাধারণে যা-ই মনে করুক, আসলে বাস্তব আদর্শের খুব নিকটে যেয়ে পৌছতে পারে না। তুমি কী মনে কর গ্লকন?

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

তা হলে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তুমি আমাকে বলতে পার না যে, বাস্তব রাষ্ট্রকে প্রতিটি বিষয়ে আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন বলে আমাকে দেখাতে হবে। একটি বাস্তব রাষ্ট্র কেমন করে এবং কত অধিক পরিমাণে আমাদের আদর্শ অনুসারে সংগঠিত হতে পারে—কেবল এই সত্যটির যদি আমরা সন্ধান পাই তা হলে তুমি যে-সম্ভাব্যতার কথা বলেছ, সে-সম্ভাব্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে—একথা আমরা বলতে পারব। আমি তাতেই সন্তুষ্ট হব। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে না?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমিও তাতে সন্তুষ্ট হব।

তা হলে এবার আমি দেখাতে চেষ্টা করব, বাস্তব রাষ্ট্রগুলির বর্তমান দুঃশাসনের কারণ কী এবং কী পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র অধিকতর উত্তম রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে। একটি পরিবর্তনে এ-উন্নতি হতে পারে; একটি যথেষ্ট না হলে দুটি পরিবর্তনে হতে পারে। মোটকথা, কত কম পরিবর্তনে রাষ্ট্রের এই উন্নতিসাধন সম্ভব সেটা নির্দিষ্ট করাই আমাদের কাজ হবে। তুমি কী বল?

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

অধ্যায় ঃ ১৫

[৪৭৩—৪৮০]

দার্শনিক শাসক ঃ দার্শনিকের সংজ্ঞা

কাজেই বাস্তবকে পরিবর্তন করাই বড় প্রয়োজন; আদর্শকে বাস্তব করা নয়। কিন্তু সে-পরিবর্তনের উপায় কী? "আমার মনে হয় গ্লকন, রাষ্ট্রের সংস্কার একটিমাত্র পরিবর্তন-সাধনের মাধ্যমেও হতে পারে। অবশ্য এ-পরিবর্তনটি সামান্য বা সহজ, একথা আমি বলছিনে। তবু এ-পরিবর্তন সম্ভব বলেই আমি মনে করি।" গ্লকন বললেন ঃ "কিন্তু কী সে পরিবর্তন?" প্রথমে সঙ্কোচ সক্রেটিসের। ভয়। কেননা সমাধানের সে-প্রস্তাব অদ্ভুত হবে। সঙ্কোচ কাটিয়ে পরিশেষে তিনি বললেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের রাজা অর্থাৎ শাসক না হবে, কিংবা রাষ্ট্রের 'রাজাগণ' দার্শনিকের ভাব এবং শক্তিতে সমৃদ্ধ না হবে—অর্থাৎ যতক্ষণ শক্তি এবং প্রজ্ঞা একই ব্যক্তির মধ্যে সম্মিলিত না হবে ... ততক্ষণ কোনো নগরী যেমন তার বর্তমান দুঃশাসন থেকে মুক্ত হবে না, তেমনি মানব জাতিরও মঙ্গল সাধিত হবে না।" উক্তিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে দার্শনিক কে, সে-প্রশ্ন এসে পড়ে। দার্শনিক সমগ্র জ্ঞানের প্রেমিক, তার অংশ মাত্রের নয়; সত্য বা পরম উত্তম সম্পর্কে দার্শনিকের কেবল 'ধারণা' থাকলে হবে না, তার থাকতে হবে 'জ্ঞান'। সত্য বা পরম উত্তম হচ্ছে অপরিবর্তনীয় নিত্য সত্তা। দার্শনিক সেই পরম সত্যের জ্ঞানী। দার্শনিকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'জ্ঞান' এবং 'ধারণার' পার্থক্যের তত্ত্ব এখানে উপস্থিত করেছেন।

আমার মনে হয় গ্লকন, রাষ্ট্রের সংস্কার একটিমাত্র পরিবর্তন-সাধনের মাধ্যমেও হতে পারে। অবশ্য এ-পরিবর্তনটি সামান্য বা সহজ, একথা আমি বলছিনে। তবু এ-পরিবর্তন সম্ভব বলেই আমি মনে করি।

কিন্তু কী সে পরিবর্তন?

সেকথা বলতে হলে আমাকে সবচেয়ে মারাত্মক সেই ঢেউ-এরই মোকাবেলা করতে হয়। তবু আমাকে সেকথা বলতে হবে। আমি জানি না সেকথা বলার জন্য আমি পরিহাস এবং অসম্মানের ঢেউ-এ নিমজ্জিত হয়ে যাব কি না। আমার কথাগুলো খেয়াল করো, গ্লকন।

তুমি বলো, সক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের 'রাজা' না হবে কিংবা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের 'রাজাগণ' যতক্ষণ দার্শনিকের ভাব এবং শক্তিতে সমৃদ্ধ না হবে—অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রাজনীতিক শক্তি এবং প্রজ্ঞা একই ব্যক্তির মধ্যে সম্মিলিত না হবে—এবং যারা রাষ্ট্রকে শাসন করতে যেয়ে এই দুই গুণের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির চর্চা করার নীতি অনুসরণ করে, তাদের যতক্ষণ রাষ্ট্রশাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা না হবে, ততক্ষণ কোনো নগরী যেমন তার বর্তমান দুঃশাসন থেকে মুক্ত হবে না, তেমনি মানবজাতিরও মঙ্গল সাধিত হবে না। এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই মাত্র যে-রাষ্ট্রের আমরা কল্পনা করেছি সে-রাষ্ট্রের জীবন লাভ সম্ভব হবে। তখনই মাত্র আমাদের সে-রাষ্ট্র বাস্তবজগতের আলোর সাক্ষাৎলাভ করতে সক্ষম হবে। প্রিয় গ্লকন, আমার এই চিন্তাটিকেই তোমাদের সম্মুখে উচ্চারণ করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু এর অত্যধিক অভিনবত্বই আমাকে আতঙ্কিত করেছে, আমার সাহসকে বিনষ্ট করেছে। কারণ, অপর কোনো রাষ্ট্রে ব্যক্তি বা সমাজের মুক্তি নেই, একথা বিশ্বাস করা খুবই কঠিন।

গ্লকন বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন ঃ সক্রেটিস, এই যদি তোমার কথা হয় তা হলে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না যদি সম্মানীয় ব্যক্তিগণও উত্তেজিত হয়ে তাদের গাত্র-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে নিকটস্থ যে-কোনো অস্ত্র হাতে নিয়ে তোমার ওপর মারাত্মক কোনো আঘাত হানার জন্য তোমাকে ধাওয়া করতে শুরু করে। উপযুক্ত কোনো যুক্তি দিয়ে এদের গতি রোধ করে পলায়নে যদি তুমি সক্ষম না হও তা হলে সক্রেটিস, পরিহাসের যথার্থ অর্থ কী তা তোমাকে বিশেষ মূল্যের বিনিময়েই শিখতে হবে—একথা আমি বলে দিচ্ছি।

কিন্তু এপথে তুমিই তো আমাকে নিয়ে এসেছ, গ্লকন।

আমি কাজটি খারাপ করিনি। যাহোক, আমি তোমাকে রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তোমার জন্য আমার সদিচ্ছা আছে। তবে তোমাকে আমি সৎ পরামর্শই মাত্র দিতে পারি। হয়তো অন্যের চেয়ে তোমার প্রশ্নের জবাবদানে

আমার আগ্রহ অধিক হবে। এই সাহায্য নিয়েই তোমাকে এবার এই অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের উপযুক্ত যুক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। তুমি অগ্রসর হও, সক্রেটিস।

আমি সে-চেষ্টা করব, গ্লকন। তোমার অমূল্য সাহায্য আমাকে অবশ্যই উৎসাহিত করে তুলছে। আমার পরিত্রাণের যদি কোনো সুযোগ থাকে তা হলে আমি তাদের কাছে নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বলব, 'দার্শানিকগণ শাসক হবে' একথার অর্থ কী? এ-ব্যাখ্যা আমাদের রক্ষা করবে। আমরা দেখতে পাব রাষ্ট্রের মধ্যে এমন ধরনের মানুষ আছে যাদের দর্শন অধ্যয়ন করা উচিত এবং যারা রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু আবার এমন ধরনের মানুষের সাক্ষাৎও আমরা পাব যাদের চরিত্রে দার্শনিকের গুণ নেই, যাদের জন্ম দার্শনিক হওয়ার জন্য নয়, যারা নেতৃত্বদানের উপযুক্ত নয়, যারা উপযুক্ত কেবল অনুগমনের।

তা হলে দার্শনিকের সংজ্ঞাটি এবার দাও, সংক্রেটিস।

আমি বললাম ঃ অনুধাবন করো গ্লকন। আমি আশা করি, তোমাকে আমি একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যাদানে সক্ষম হব।

তুমি অগ্রসর হও, সক্রেটিস। আমি তোমাকে অনুসরণ করব।

গ্লকন, আমার বিশ্বাস একটি কথা তোমার স্মরণ আছে। বস্তুত তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আবশ্যক হয় না। কথাটি প্রেমিককে নিয়ে। যে যথার্থ প্রেমিক সে তার প্রেমাস্পদকে সামগ্রিকভাবেই ভালোবাসে,—তার কোনো অংশকে মাত্র নয়। ঠিক নয় কি?

সক্রেটিস, আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে। তুমি আমার স্মৃতিকে একটু সাহায্য কর।

এমন জবাব তোমার মতো রসিক মানুষের সাজে না, গ্লকন। অপর কেউ এমন জবাব দিতে পারত। তোমার নিশ্চয়ই জানা উচিত যে, যৌবনের কুসুম প্রেমিকের মনে একটা আর্তি এবং আবেগের সঞ্চার করে যার ফলে তার প্রেমাস্পদের অনুরাগের চিন্তায় সে বিভোর হয়। সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের এই তো সম্পর্ক। প্রেমাস্পদের নাকটি হয়ত খাঁদা। তুমি প্রেমিক বললে ঃ আহা! কী চম ৎকার মুখখানি! অপর একজনের নাকটি বড়শীর মতো বাঁকা। তুমি প্রেমিক বলছ ঃ আহা! কী রাজকীয় দৃশ্য! আর যার নাক খাঁদাও নয়, বাঁকাও নয় তার সম্পর্কে প্রেমিক বলে ঃ আহা! সমতলের কী মাধুর্য! যে কৃষ্ণবর্ণ সে তার কাছে পুরুষোচিত; যে গৌরবর্ণ সে দেবতার সন্তানের ন্যায় শুভ্র। আর 'মধুময় পাণ্ডুরতা'—এরূপ বাক্য প্রেমিক বই অপর কার সৃষ্টি! তার প্রেমাস্পদের চিবুকের

পাণ্ডুরতা তাকে উদ্বেল করে তোলে। মোটকথা, কুসুমিত যৌবনের প্রশংসার অন্ত নেই।

সব প্রেমিকের আচরণকে যদি তুমি আমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাও সক্রেটিস, তা হলেও আমাদের যুক্তির স্বার্থে আমি তার কোনোটিকে অস্বীকার করব না।

আহা! এ তো সুরা-প্রেমিকেরই কথা। যতপ্রকার সুরা আছে তা পান করার সুযোগ পেলে যে-কোনো উপলক্ষতেই সে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

উত্তম কথা।

উচ্চাভিলাষী মানুষ সম্পর্কেও একই কথা সত্য। তারা সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্বের কামনা করে; সেটি পেতে ব্যর্থ হলে তারা নিম্নতর অপর কোনো বাহিনীর অধিনায়ক হতে চায়; মান্য লোকের কাছ থেকে তারা সম্মান চায়। না পেলে হীনতরের সম্মানেও তারা খুশি। মোটকথা, সম্মান তাদের পেতেই হবে।

একথা তোমার খুবই ঠিক, সক্রেটিস।

আমার আর-একটি প্রশ্ন গ্লকন ঃ কেউ যখন কোনো উত্তম দ্রব্য পেতে চায় তখন কি সে এই ধরনের সকল দ্রব্যকেই পেতে চায়, না এই শ্রেণীর কোনো অংবিশেষকে পেতে চায়?

সে সবটাই পেতে চায়।

তা হলে দার্শনিক সম্পর্কেও কি আমরা বলতে পারিনে, সে যখন জ্ঞানের প্রেমিক তখন সে সমগ্র জ্ঞানেরই প্রেমিক, তার অংশমাত্রের নয়।

হ্যাঁ, সে সমগ্র জ্ঞানের প্রেমিক!

আবার যে বিদ্যাকে অপছন্দ করে, বিশেষ করে যে-তারুণ্যে ভালো এবং মন্দ বিচারের কোনো ক্ষমতা জাগ্রত হয় না, সে-বয়সেও যে বিদ্যার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করে তাকে আমরা দর্শন বা জ্ঞানের প্রেমিক বলে অভিহিত করতে পারিনে। যেমন, খাদ্যে যার বিরাগ বা অরুচি তার হয় ক্ষুধা নেই, নয়তো তার অগ্নিমান্দ্যের অসুখ আছে—একথাই আমাদের বলতে হয়?

খুবই সত্য কথা।

তেমনি আবার যার সব রকম জ্ঞানের জন্য আগ্রহ, যে জানতে চায়, শিখতে চায়, যে অনুসন্ধিৎসু এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সর্বদা অতৃপ্ত তাকে আমরা সঠিকভাবেই একজন দার্শনিক বলে অভিহিত করতে পারি। আমি কি ঠিক বলিনি, গ্লকন?

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, কৌতূহলই যদি একজনকে দার্শনিক করে দিতে পারে তা হলে দার্শনিকের সংখ্যা কিংবা বৈচিত্র্য কোনোটিরই তোমার অভাব হবে না। তা হলে দৃশ্য-প্রেমিককেও তোমার দার্শনিক বলতে হবে। সঙ্গীতের অর্বাচীনগণও বাদ পড়বে না। এরা দর্শনিক কোনো আলোচনায় আগ্রহবোধ করার লোক আদৌ নয়। কিন্তু গ্রাম কিংবা নগরীর কোনো সঙ্গীত-উৎসবেই তারা অনুপস্থিত নয়। সমস্ত রকম সঙ্গীতকেই তারা শ্রবণ করে—যেন শ্রবণ করার দায়িত্বে তারা চুক্তিবদ্ধ; তা হলে আমাদের কি বুঝতে হবে এরা সবাই এবং নগণ্য অপর সকল কলার পণ্ডিতগণই দার্শনিক?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই না। তারা দার্শনিকের অনুকারী মাত্র।

তা হলে যথার্থ দার্শনিক কে?

সত্য দর্শনকে যারা ভালোবাসে।

ভালো কথা। কিন্তু তোমার একথার অর্থ কী?

একথার অর্থ অপর কারও নিকট ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন হত। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে, আমি তোমার নিকট যে-প্রস্তাবটি করব তা তুমি স্বীকার করবে।

কী প্রস্তাব, সক্রেটিস?

আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে ঃ সুন্দর যখন অসুন্দরের বিপরীত তখন তারা পৃথক।

অবশ্যই।

এবং যেহেতু তারা পৃথক, তাদের প্রত্যেকেই একটি সত্তা?

একথাও ঠিক।

একথা ন্যায় এবং অন্যায়, মঙ্গল এবং অমঙ্গল এবং অপর সব অস্তিত্ব সম্পর্কে সত্য। পৃথকভাবে এরা প্রত্যেকেই একটি সত্তা। কিন্তু বিভিন্ন বস্তু এবং কর্মের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের সম্মিলনে এরা বহু এবং বিচিত্র বলে বোধ হয়।

খুবই সত্য কথা।

এই পার্থক্যের কথাই আমি বলছি। দৃশ্যপ্রেমিক এবং শিল্পপ্রেমিক এবং কর্মী এবং ভাবুক অর্থাৎ যারা দার্শনিক নামের উপযুক্ত তাদের আমি এভাবে পৃথক বলে মনে করি।

তুমি কেমন করে এদের পৃথক করতে চাও, সক্রেটিস?

আমি বললাম : শব্দ এবং দৃশ্যের যারা প্রেমিক তারা কেবল শব্দ এবং বর্ণ এবং শিল্পকর্মের বহিরাবরণকেই ভালোবাসে—কিন্তু তাদের মন সুন্দরের যথার্থ সত্তার উপলব্ধিতে অক্ষম। সুন্দর যথার্থ সত্তায় আনন্দবোধের ক্ষমতা তাদের নেই।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তাই চরম সুন্দরের কাছে যারা যেতে পারে এবং তার আপন সত্তায় যারা তাকে অবলোকন করতে পারে তাদের সংখ্যা অবশ্যই কম।

হ্যাঁ, তাদের সংখ্যা অবশ্যই কম হওয়ার কথা।

তা-ই যদি হয়, তা হলে সুন্দর বস্তুর প্রতি যার আকর্ষণ আছে কিন্তু চরম সুন্দর সম্পর্কে যার কোনো ধারণা নেই এবং অপর কেউ যদি তাকে চরম সুন্দরের জ্ঞান দানের চেষ্টা করে সে-জ্ঞানকেও যে অনুধাবন করতে পারে না—এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আমরা কী বলব? সে কি জাগ্রত? কিংবা স্বপ্নের মাঝে নিদ্রামগ্ন? তুমি চিন্তা করে দ্যাখো : যে স্বাপ্নিক সে জাগ্রত কিংবা নিদ্রামগ্ন যা-ই হোক-না কেন, সে বিরুদ্ধ বস্তুতে ঐক্যের সন্ধান করে এবং আসল বস্তুর স্থানে তার প্রতিচ্ছবিকে স্থাপিত করে।

আমি বলব, এরূপ লোক নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু অপর ব্যক্তির কথা ধরো : এ মানুষ চরম সুন্দরের অস্তিত্বকে জানে এবং বস্তু এবং ভাবের মধ্যে, অর্থাৎ বস্তু এবং যে-ভাব নিয়ে বস্তু তৈরি তার পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে। এ যেমন বস্তুকে ভাবের স্থানে স্থাপিত করে না, তেমনি ভাবকেও বস্তুর স্থানে বসায় না। তুমি এরূপ ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলবে? এ কি স্বপ্ন দেখছে, না জাগ্রত আছে?

এ অবশ্যই জাগ্রত আছে।

তা হলে আমরা কি বলতে পারিনে যার মন সত্যিকারভাবে জানে তার জ্ঞান আছে এবং যার মন জানে না, কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, তার জ্ঞান নেই, মাত্র ধারণা আছে?

অবশ্যই আমরা তা-ই বলব।

কিন্তু ধরো এই দ্বিতীয় ব্যক্তি আমাদের এ-অভিমতে ক্ষুণ্ন হল, আমাদের সঙ্গে সে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হল, তা হলে আমরা কেমন করে তাকে শান্ত করব? তার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটেছে, একথা প্রকাশ না করে আমরা কি তাকে শান্ত করতে পারি?

তাকে কোনো উত্তম উপদেশ আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।

বেশ, এসো, তা হলে আমরা চিন্তা করি, কী তাকে বলা যায়। আমরা কি তাকে এই আশ্বাস দিয়ে শুরু করব যে, তার যে-কোনো জ্ঞানকেই আমরা স্বাগত জানাই। বস্তুত তার জ্ঞান আছে দেখে আমরা বেশ উৎফুল্ল। কিন্তু আমরা তাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই ঃ যার জ্ঞান আছে সে কি কিছু জানে, অথবা সে কিছু জানে না? গ্লকন, এর পক্ষ হয়ে তোমাকেই জবাব দিতে হবে।

হ্যাঁ, আমি তার জবাব দিচ্ছি ঃ যার জ্ঞান আছে সে অবশ্যই কিছু জানে।

সে যা জানে, তা কি অস্তিত্বময়, না অস্তিত্বহীন?

অবশ্যই তার অস্তিত্ব আছে। কারণ যার অস্তিত্ব নেই, তাকে সে জানবে কী করে?

তা হলে আমরা কি বলব, যেদিক থেকেই আমরা দেখি-না কেন, যা পরিপূর্ণরূপে অস্তিত্বময় তা পরিপূর্ণরূপে জ্ঞেয়? এবং যা পরিপূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন তা পরিপূর্ণরূপেই অজ্ঞেয়?

হ্যাঁ, এর চেয়ে নিশ্চিত সত্য আর কী হতে পারে?

উত্তম কথা। কিন্তু এমন কিছু যদি থাকে যা না অস্তিত্ব, না অনস্তিত্ব, তা হলে তার অবস্থান পূর্ণ অস্তিত্ব এবং পূর্ণ নাস্তিত্বের মাঝখানে হবে?

হ্যাঁ, এই দু-এর মাঝখানেই তার অবস্থান হবে।

এবং জ্ঞানী যখন অস্তিত্বের প্রতিরূপ এবং অজ্ঞান অনস্তিত্বের, তখন যার অবস্থান অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্বের মধ্যখানে তার জন্য জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার মধ্যবর্তী একটা প্রতিরূপ আমাদের আবিষ্কার করতে হয়। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

কিন্তু আমরা কি ধারণার অস্তিত্বকে স্বীকার করি?

হ্যাঁ, তাকে আমরা স্বীকার করি।

কিন্তু 'ধারণা' কি জ্ঞান? কিংবা সে জ্ঞান থেকে পৃথক?

সে একটা পৃথক প্রতিরূপ।

তা হলে 'জ্ঞান' এবং 'ধারণা' ভিন্নরূপ অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত?

হ্যাঁ, তা-ই।

জ্ঞানের সঙ্গে অস্তিত্বের সম্পর্ক। জ্ঞান অস্তিত্বকে জানে। কিন্তু অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আমি একটি বিভাগকরণের কাজ সমাধা করতে চাই, গ্লকন।

কীরূপ বিভাগ, সক্রেটিস?

আমি আমাদের সকল ক্ষমতাকে একটি শ্রেণীভুক্ত করতে চাই। এগুলি আমাদের কর্মক্ষমতা। এই ক্ষমতা বা শক্তির মাধ্যমেই আমরা বিভিন্ন কর্ম সমাধা করি। দৃষ্টি এবং শ্রবণ, এরাও আমাদের শক্তি। শক্তির শ্রেণী বলতে আমি কী বোঝাতে চাই, আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ, গ্লকন?

হ্যাঁ, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি সক্রেটিস।

এখন এই শক্তির শ্রেণী সম্পর্কে আমার বক্তব্যটি আমি বলছি। শক্তির কোনো বিশিষ্টাত্মক গুণ নেই। বস্তুর বর্ণ, আকার ইত্যাদি গুণ আছে। এইসব গুণের ভিত্তিতে আমরা একটি বস্তুকে অপর বস্তু থেকে পৃথক করি। কিন্তু শক্তির এরূপ কোনো গুণ নেই। একটি শক্তিকে আমরা কেবল তার কর্ম এবং লক্ষ্য দ্বারাই নির্দিষ্ট করতে পারি। এই ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, একটি শক্তির কর্ম এবং লক্ষ্য এই; এবং আর-একটি শক্তির কর্ম এবং লক্ষ্য ঐ। তুমি কী বল গ্লকন? তুমি এক্ষেত্রে কী করবে?

তুমি যেমন করছ, আমিও তেমন করব, সক্রেটিস।

তা হলে আবার একটু পেছনে যাওয়া যাক। গ্লকন, তুমি বলো, জ্ঞানকে কি তুমি একটি শক্তি বলে বিবেচনা কর না? জ্ঞানকে কি ভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে?

না, একে ভিন্নভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। জ্ঞান সকল শক্তির সেরা শক্তি।

কিন্তু ধারণাকে কি আমরা একটি শক্তি বলব?

হ্যাঁ, ধারণাও একটি শক্তি। কারণ ধারণার মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস করি।

কিন্তু গ্লকন, একটু পূর্বে তুমি স্বীকার করেছিলে যে জ্ঞান এবং ধারণা ভিন্ন ব্যাপার?

হ্যাঁ, তা আমি করেছিলাম। কারণ, কোনো যুক্তিপূর্ণ মানুষই 'অভ্রান্তি' এবং 'ভ্রান্তি'কে অভিন্ন বলবে না।

খুবই উত্তম কথা, গ্লকন। তা হলে এ-বিষয়ে আমরা নিশ্চিতরূপে একমত যে, ধারণা এবং জ্ঞান ভিন্ন, ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা একমত। জ্ঞান এবং ধারণা ভিন্ন।

উভয়ের লক্ষ্য এবং কর্ম ভিন্ন। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, এটি তো অনুসিদ্ধান্ত।

জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে অস্তিত্ব এবং এর কর্ম হচ্ছে অস্তিত্বকে জানা।

হ্যাঁ।

কিন্তু ধারণার কাজ হচ্ছে বিশ্বাস করা। এ কথাই তো আমরা বলেছিলাম। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা তা-ই বলেছিলাম।

কিন্তু তার লক্ষ্য এবং জ্ঞানের লক্ষ্য কি এক? এদের কর্মের ক্ষেত্র? তাও কি জ্ঞান এবং ধারণার অভিন্ন? না, এদের অভিন্ন হওয়া অসম্ভব?

যে-নীতির ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি, তার ভিত্তিতে এদের অভিন্ন হওয়া অসম্ভব। কারণ, বিভিন্ন শক্তির যদি বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে এবং জ্ঞান ও ধারণা যদি দুটি ভিন্ন শক্তি হয়, যে কথা আমরা ইতিপূর্বে স্বীকার করেছি, তা হলে এ কথাও আমাদের বলতে হয় যে, জ্ঞান এবং ধারণার ক্ষেত্র অবশ্যই বিভিন্ন।

তা-ই যদি হয়, তা হলে জ্ঞানের লক্ষ্য যেখানে অস্তিত্ব, সেখানে ধারণার লক্ষ্য অবশ্যই ভিন্ন কিছু?

হ্যাঁ, ধারণার লক্ষ্যকে ভিন্ন হতে হয়।

তা হলে আমরা কি বলব যে, অনস্তিত্ব হচ্ছে ধারণার লক্ষ্য? কিন্তু অনস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ কোনো ধারণা কেমন করে সম্ভব? চিন্তা করে দ্যাখো, গ্লকন ঃ কোনো মানুষের যখন কোনো ধারণা থাকে, তখন তার সে ধারণাও তো কোনো বিষয় সম্পর্কে। তার কি এমন কোনো ধারণা থাকা সম্ভব যে-ধারণা কোনো বিষয় সম্পর্কে নয়?

না, তা অসম্ভব।

কারণ, যার কোনো ধারণা থাকে, তার সে-ধারণা কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে ধারণা।

হ্যাঁ, তা ঠিক।

কিন্তু অনস্তিত্বকে আমরা বিষয় বা বস্তু বলতে পারিনে। সঠিকভাবে বললে অনস্তিত্ব হচ্ছে 'কিছু না'।

ঠিকই।

অনস্তিত্বের প্রতিরূপ হল অজ্ঞানতা। অস্তিত্বের প্রতিরূপ জ্ঞান। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক।

তা হলে ধারণার লক্ষ্য অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব—এর কোনোটাই নয়?

না এর কোনোটার সঙ্গেই ধারণা সম্পর্কিত নয়।

তা হলে ধারণাকে আমরা অজ্ঞানতা বা জ্ঞান—এর কোনোটাই বলতে পারিনে?

হ্যাঁ, তা-ই তো ঠিক বলে মনে হয়।

তা হলে ধারণার সন্ধান আমরা কোথায় পাব? তার অবস্থান কি জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার বাইরে, জ্ঞান এবং অজ্ঞানতাকে অতিক্রম করে? ধারণা কি জ্ঞানের চেয়ে স্বচ্ছ? না, সে অজ্ঞানতার চেয়ে অন্ধকার? কোথায় তার অবস্থান?

কোথাও নয়।

তা হলে গ্লকন, তুমি কি মনে কর ধারণা জ্ঞানের চেয়ে অন্ধকার কিন্তু অজ্ঞানতার চেয়ে স্বচ্ছ?

হ্যাঁ, ধারণা এই দুটোই। এবং তাদের পরিমাণও কম নয়।

এবং তার অবস্থানও এই উভয়ের মধ্যে?

হ্যাঁ, তা-ই বটে।

তা হলে তোমার অনুমান হচ্ছে, ধারণা জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার মধ্যবর্তী অবস্থা?

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু আমরা পূর্বে বলেছিলাম ঃ এমন কিছু যদি থাকে যা একই সঙ্গে 'অস্তিত্ব' এবং 'অনস্তিত্ব' তা হলে তার অবস্থান হবে পরিপূর্ণ অস্তিত্ব এবং পরিপূর্ণ অনস্তিত্বেরই মধ্যভাগে। জ্ঞান কিংবা অজ্ঞানতা কারুর লক্ষ্যই এ নয়। জ্ঞান এবং অজ্ঞানতার মধ্যবর্তী অপর কোনো শক্তির লক্ষ্য হচ্ছে এটি। ঠিক নয় কি?

ঠিক, আমরা একথা বলেছিলাম।

এখন সেই মধ্যবর্তী স্থলে আমরা ধারণার অবস্তান নির্দিষ্ট করছি?

হ্যাঁ, তার অবস্থান এই মধ্যবর্তী স্থলেই।

তা হলে এবার আমাদের করণীয় হচ্ছে এমন কোনো বিষয়কে আবিষ্কার করা যার মধ্যে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব—উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান; অর্থাৎ যাকে বিনা শর্তে অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব—কোনোরূপে অভিহিত করা চলে না। এই

অজানিত 'বিষয়কে' আমরা যদি আবিষ্কার করতে পারি তা হলে আমরা যথার্থভাবে তাকে ধারণার 'বিষয়' বলে অভিহিত করতে পারব। এই কার্য সিদ্ধ হলে আমরা যার যা বিষয় তা স্থির করে দিতে সক্ষম হব। তখন চরমের বিষয় যেমন চরম হবে, তেমনি দুই চরমের মধ্যবর্তী মধ্যমের বিষয়ও মধ্যম হবে।

সত্য কথা।

এই যদি আমাদের সিদ্ধান্ত হয় তা হলে আমরা সেই ভদ্রমহোদয়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করব যার ধারণা, পরম সুন্দরের অপরিবর্তনীয় কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব ঃ আপনি তো সুন্দরের প্রেমিক এবং আপনার সুন্দর বিচিত্র এবং আপনি বিশ্বাস করেন না যে সুন্দর কিংবা ন্যায় হচ্ছে এক, বহু নয়। আপনি বলুন আপনার বিচিত্র সুন্দরের মধ্যে কেউ কি কখনো অসুন্দর বলে মনে হতে পারে না? ন্যায়ের মধ্যে কেউ কি অন্যায় বলে বোধ হতে পারে না?

এ-প্রশ্নের জবাব কী হবে?

গ্লকন বললেন ঃ অবশ্যই বলতে হবে সুন্দর অপর কোনো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসুন্দরও বোধ হতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এ কথাই সত্য।

এবং যে-সংখ্যা দ্বিগুণ, তা কি আবার অর্ধেক হতে পারে না? অর্থাৎ একটি বিশেষ সংখ্যার তুলনায় একটি সংখ্যা যখন দ্বিগুণ, তখন আর-একটি সংখ্যার তুলনায় সে অর্ধেক। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক।

এবং যে-সকল বস্তুকে আমরা বড় এবং ছোট, ভারী এবং হালকা ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করি তারা আবার এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যেও কি আখ্যায়িত হয় না?

যথার্থ। এ-সকল বস্তুর উভয় রকম বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে।

তা হলে এই বিচিত্র বস্তুর কাউকেই কি কেবল একটি নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বলা যায় যে, এর বিপরীত নাম কখনো এদের ওপর প্রযোজ্য হবে না?

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, এগুলো হচ্ছে সেই সমস্ত ধাঁধার মতো যেগুলোকে আমরা বিভিন্ন উৎসবে বা ছোটদের খেলার আসরে শুনতে পাই। যেমন ঃ 'মানুষ হলেও মানুষ নয় সে, ছুড়েছিল একটি পাখির গায়ে, যে-পাখি পাখি নয়, একটি প্রস্তরখণ্ড যা প্রস্তর নয়'। অর্থাৎ এরা যেমন একটি বিশেষ অস্তিত্ব তেমনি সে বিশেষ অস্তিত্ব নয়।[১] ফলে কারোর পক্ষে এদের কাউকে

১. একজন খোজা (যে না পুরুষ না মেয়ে) একটি বাদুড়ের গায়ে (যে না পাখি না পশু) একটি লাভাখণ্ড (যে না পাথর না মাটি) নিক্ষেপ করেছিল।

অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব এবং এদের উভয়ই অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব কিছুই নয়—এর কোনোটাই ভাবা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এদের সম্পর্কে অধিক উত্তম কিছু কি চিন্তা করা যায়, যার ফলে আমরা এদের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের মধ্যভাগে স্থাপন করতে পারি? কারণ, এরা যেরূপ অনস্তিত্বের চেয়ে এত অধিক অন্ধকার নয় যে অনস্তিত্বের চেয়েও অধিক অনস্তিত্ব বলে এদের অভিহিত করা যায়, তেমনি আবার অস্তিত্বের চেয়ে অধিক স্বচ্ছ নয় যাতে এদের অস্তিত্বের চেয়ে অধিক অস্তিত্বময় বলা চলে।

তোমার একথা সত্য, সক্রেটিস।

তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ঃ সাধারণ মানুষ সুন্দর এবং এরূপ অন্যান্য সত্তা সম্পর্কে যে-প্রচলিত ধারণা পোষণ করে তা চরম অস্তিত্ব এবং চরম অনস্তিত্বের মধ্যভাগে দোদুল্যমান বিশ্বাস বই অপর কিছু নয়।

হ্যাঁ, এটিই আমাদের সিদ্ধান্ত।

হ্যাঁ, এটিই আমাদের সিদ্ধান্ত হবে। কারণ, আমরা পূর্বে স্থির করেছি এরূপ মধ্যবর্তী বিষয় যদি কিছু আবিষ্কৃত হয় তা হলে আমরা তাকে 'ধারণা' বলে নির্দিষ্ট করব, 'জ্ঞান' বলে নয়। আর এই মধ্যবর্তী বিষয়ের ধারণা মধ্যবর্তী শক্তি দ্বারাই মানুষ লাভ করে।

ঠিকই বলেছ।

তা হলে যারা কেবল বিচিত্র সুন্দরকে দেখে কিন্তু পরম সুন্দরকে উপলব্ধি করতে পারে না, কিংবা পরম সুন্দরের পথপ্রদর্শককে অনুসরণ করতেও অক্ষম, যারা বহু ন্যায়কে দেখে কিন্তু পরম ন্যায়কে উপলব্ধি করতে পারে না—এরূপ লোকের 'ধারণা' আছে, কিন্তু 'জ্ঞান' নেই।

অবশ্যই।

কিন্তু যারা পরম, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয় সত্তাকে অবলোকন করতে সক্ষম তাদের যথার্থ জ্ঞান আছে, কেবল ধারণা নয়—একথা আমরা বলব। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, এ-সত্যও অনস্বীকার্য।

তা হলে এদের একজন যেখানে জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করে, অপরজন সেখানে ধারণার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। আর তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে গ্লকন, এই শেষোক্ত মানুষ হচ্ছে তারা যারা সুন্দর শব্দের এবং দৃশ্যের বৈচিত্র্যে বিমোহিত হয়ে পড়ে কিন্তু পরম সুন্দর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথা সইতে পারে না।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমার স্মরণ আছে।

তা হলে এদের যদি আমরা 'জ্ঞানের প্রেমিক' না বলে 'ধারণার প্রেমিক' বলি তবে নিশ্চয়ই আমরা কোনো অন্যায় করব না। এ-কারণে আমাদের উপর কি তারা খুব ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে বলে তুমি মনে কর?

আমি তাদের ক্রোধান্বিত না হওয়ারই পরামর্শ দেব। কারণ যা সত্য তার প্রতি কারও ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত নয়।

এবং যারা প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে ভালোবাসে আমরা তাদের 'জ্ঞানের প্রেমিক' বলব, 'ধারণার প্রেমিক' নয়।

অবশ্যই সক্রেটিস।

ষষ্ঠ পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১৬
[৪৮৪—৪৯৭]

দর্শনের দুর্নামের কারণ

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এ্যাডিম্যান্টাসের অভিযোগ, 'সক্রেটিস তার শব্দের দাবা খেলায় সকলকে হারিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয়ে যায় না যে, দার্শনিকরাই একমাত্র উত্তম ব্যক্তি এবং শাসক হওয়ার উপযুক্ত'। 'তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পেরে উঠতে না পারুক তবু একথা সত্য যে, ... যারা দর্শনের চর্চা করে তাদের অধিকাংশই কেবল যে চরম দুরাত্মায় পরিণত হয় তা-ই নয়, তারা অদ্ভুত এক জীবে পরিণত হয়ে যায়। ... যারা উত্তম তারাও এই 'মহান' দর্শনের চর্চায় জগতের জন্য অপদার্থ প্রাণীতে পর্যবসিত হয়' [৪৮৭] দার্শনিক তথা জ্ঞানের সাধকদের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগ প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সাধারণ অভিযোগ। সক্রেটিস এ-অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেন না। তাঁর জবাব হচ্ছে ঃ এই অভিযোগের কারণ দুটো ১. সত্যকার দার্শনিক যারা তারা অপদার্থ বলে পরিচিত, কারণ প্রচলিত সমাজ হচ্ছে কলুষিত। প্রচলিত সমাজের পরিচালনভার অনধিকারীর হাতে। এ-সমাজ তথা রাষ্ট্র দার্শনিকের মূল্য বুঝতে অক্ষম। দার্শনিকের চরিত্র এবং এই রাষ্ট্রের চরিত্র পরস্পরবিরোধী। একজন হচ্ছে জ্ঞানী। অপরটি হচ্ছে অজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত। আর এ-কারণে যে-তরুণরা একদিন সম্ভাবনাময় ছিল তারাও এই রাষ্ট্রে কলুষিত হয়ে পড়ে। ২. দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, দর্শনের যথার্থ অর্থ অনুধাবন না করে, যারা এর অনুপযুক্ত তারাও দর্শনের অধ্যয়নে সাময়িককালের জন্য যোগ দেয়। এদের অস্থির চরিত্র এবং দর্শনকে হালকাভাবে গ্রহণ করার মনোভাবই প্রচলিত সমাজে দর্শনের দুর্নামের কারণ।

এ-প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা চলে। প্রথমত প্লেটো এথেন্সের প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা এবং সমালোচনা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ এবং বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে আদর্শ রাষ্ট্রের বিচ্যুতির বাস্তব দৃষ্টান্ত সহযোগে প্লেটো উপস্থিত করেছেন। এখানে প্লেটো এই বিকৃত শাসনব্যবস্থাকে বিরাটকায় একটা হিংস্র পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই রাষ্ট্রের যারা শাসক কিংবা

শিক্ষক তারা যথার্থ সত্যের অন্বেষণ করে না। তারা এই হিংস্র পশুর মনস্তুষ্টিসাধনের চেষ্টা করে। তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাই তারা লাভ করে এবং তাকেই যথার্থ জ্ঞান বলে প্রচার করে।

দ্বিতীয়তঃ দর্শনকে হালকাভাবে অধ্যয়ন বা শিক্ষাদানের অভিযোগের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্লেটোর সমালোচনার আভাস পাওয়া যায়। প্লেটোর যেমন নিজস্ব একাডেমি ছিল এবং শিক্ষার বিষয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট দর্শন ছিল তেমনি তার একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানও ছিল। তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শিক্ষাবিদ আইসোক্রাটিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৩৬—৩৩৮)। আইসোক্রাটিস সফিস্টদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার ধারাই বহন করতেন। সফিস্টদের শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো দর্শন ছিল না। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁদের নিকট যে-তরুণরা, বিশেষ করে ধনবান পরিবারের যে-শিক্ষার্থীরা শিক্ষালাভ করতে আসত কিংবা সফিস্টরা যাদের গৃহে যেয়ে শিক্ষাদান করতেন তাদেরকে বাস্তব জীবনের উপযোগী করে তোলা। এজন্য প্রয়োজনবোধে তাঁরা ধর্ম, রাষ্ট্র, দর্শন, শিক্ষা—জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ধ্যানধারণা বিশ্বাস বা অভিমতকে যেমন সমালোচনা করতে দ্বিধা করতেন না, তেমনি বাস্তব জীবনের যে নীতি ফলদায়ী সে-নীতি যতই কেননা অধম বা সুবিধাবাদী বা উপদলীয় স্বার্থবাহক হোক, তার শিক্ষাদানেও তাঁরা কম উৎসাহী ছিলেন না। এদিক থেকে তাঁদের প্রয়োগিক বলা চলে। অর্থাৎ বাস্তব জীবনে যা প্রয়োগযোগ্য এবং ব্যক্তির স্বার্থবাহক তা-ই সত্য। ব্যক্তির স্বার্থ-নিরপেক্ষ কোনো সত্য নেই—সফিস্টদের আচরণে এই নীতিটি স্পষ্ট হয়ে উঠত। প্লেটো এই নীতির সমালোচক ছিলেন। আইসোক্রাটিসকেও তিনি এই নীতির ধারক এবং প্রচারকারী বলে মনে করতেন। তাই প্লেটো আইসোক্রাটিসের শিক্ষানীতিকে অগভীর বলে অভিযুক্ত করেন। অপর দিকে আইসোক্রাটিস প্লেটোকে অবাস্তব এবং কল্পনাবিলাসী বলে আখ্যায়িত করতেন।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, দীর্ঘ কষ্টকর পথ আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। তবু যথার্থ দার্শনিকের সঙ্গে কৃত্রিম দার্শনিকের পার্থক্যটি আমাদের নিকট ধরা পড়েছে—এটিই বড় কথা।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, পথের দৈর্ঘ্য কমাবার কোনো উপায় ছিল না।

হ্যাঁ, আমি তা-ই মনে করি। যথার্থ দার্শনিক সম্পর্কে আমরা অধিকতর উত্তম পরিচয় পেতে পারতাম, যদি হাতে আমাদের সময় থাকত এবং যদি এই বিষয়টিই আামদের একমাত্র আলোচনার বিষয় হত। কিন্তু আলোচনার বিষয় আমাদের সম্মুখে আরও পড়ে আছে। ন্যায়বান এবং অন্যায়ী—এদের জীবনকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে এ-সমস্ত আলোচনা সম্পূর্ণ করতে হবে।

তা হলে আমাদের পরবর্তী আলোচনা কী হবে?

আমি বললাম ঃ আলোচনার ধারায় যুক্তিসঙ্গতভাবে যে-প্রশ্ন আসবে তাকেই আমাদের আলোচনা করতে হবে, গ্লকন। আমরা দেখেছি, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয় সত্যের একমাত্র দ্রষ্টা হচ্ছে যথার্থ দার্শনিক। কিন্তু যারা কেবল বৈচিত্র্য এবং অনিত্যের জগতেই জীবনযাপন করে, তাকেই সত্য বলে মনে করে, তারা যথার্থ দার্শনিক নয়। তা-ই যদি হয়, তা হলে, গ্লকন, এবার তুমি বলো, আমাদের রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার যোগ্য এদের মধ্যে কে?

কিন্তু এ প্রশ্নের সঠিক জবাব আমরা কেমন করে দেব?

এর জবাব নিশ্চয়ই কঠিন নয়। যে আমাদের রাষ্ট্রের বিধিবিধান এবং তার সংস্থাসমূহকে সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করতে পারবে, তাকেই আমাদের শাসক বানাতে হবে।

হ্যাঁ, একথা টিক।

আর তা ছাড়া এ-বিষয়েও কোনো প্রশ্ন নেই যে, এমন যে রক্ষাকারী বা প্রহরী তার অবশ্যই চোখ থাকতে হবে। তাকে অন্ধ হলে চলবে না।

না, এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

কিন্তু পরম সত্য সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, শিল্পীর সম্মুখে মডেল বা প্রতিরূপের ন্যায় যাদের সম্মুখে সুস্পষ্ট কোনো আদর্শ নেই যার ভিত্তিতে ন্যায্য বা উত্তম বিধান কী ত়া তারা নির্ধারণ করতে পারবে এবং অভিভাবক হিসাবে, যে-বিধান আছে তাকে তারা রক্ষা করত পারবে—তাদের আমরা অন্ধ ব্যতীত আর কি বলতে পারি?

হ্যাঁ, তারা অন্ধ বই আর কী?

তা হলে আমরা এদের কি আমাদের শাসক করব? যখন এমন লোক আছে যাদের অভিজ্ঞতা এদের চেয়ে কম নয়, যাদের কোনো উত্তম গুণের অভাব নেই

এবং যারা সকল রকম অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত সত্যকে জানে তখন অন্ধের সমান ব্যক্তিকে আমাদের শাসক করা কি সঙ্গত?

না, অপর কোনো ক্ষেত্রে তাদের কোনো ব্যর্থতা না থাকলে আমরা গুণান্বিত ব্যক্তিদেরই শাসক করব। শাসক হওয়ার ব্যাপারে তাদেরই অগ্রাধিকার থাকবে।

তা হলে আমাদের এবার বিবেচ্য হওয়া উচিত, জ্ঞানের সঙ্গে অপর সকল উত্তম গুণের সম্মেলন কেমন করে ঘটানো যায়। জ্ঞানী কেমন করে সকল উত্তম গুণে গুণী হয়ে উঠতে পারে।

হ্যাঁ, আমাদের তা-ই বিবেচ্য হওয়া উচিত।

তা হলে প্রথমত দার্শনিকের চরিত্র আমাদের নির্ধারণ করতে হবে। দার্শনিকের চরিত্র সঠিকভাবে বুঝতে পারলে আমরা দেখব তার মধ্যে সকল উত্তম গুণের সম্মেলন সম্ভব। আর এরূপ গুণের সম্মেলন যে-চরিত্রে ঘটবে তাকেই আমাদের রাষ্ট্রের শাসক করব।

একটু ব্যাখ্যা করে বলো, সক্রেটিস।

দার্শনিকের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য তো আমরা ধরে নিতে পারি। দার্শনিকের থাকবে তেমন জ্ঞানের প্রতি প্রেম যে-জ্ঞান তাকে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দেবে, যে-সত্যের কোনো পরিবর্তন কিংবা ক্ষয় নেই। দার্শনিক সমগ্র সত্যের প্রেমিক। সাধারণ যে-উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা প্রেমিকের কথা আমরা পূর্বে বলেছি[১] তাদের ন্যায় সত্যের কোনো অংশের জন্যই তার উপেক্ষা থাকবে না।

হ্যাঁ, একথা আমরা ধরে নিতে পারি।

বেশ, দার্শনিক যদি এরূপ হয় তা হলে তার আর-একটি গুণও থাকা আবশ্যক। নয় কি?

কী গুণ?

সত্যবাদিতা। স্বেচ্ছাক্রমে দার্শনিক কখনো অসত্যকে গ্রহণ করবে না। অসত্যকে সে ঘৃণা করবে। সত্যবাদিতাকে সে ভালোবাসবে।

হ্যাঁ, দার্শনিকদের এরূপ হওয়াই সম্ভব।

না, শুধু 'সম্ভব' বললে চলবে না। দার্শনিককে অবশ্যই এরূপ হতে হবে। কারণ সে যদি সত্যকারভাবে প্রেমিক হয় তা হলে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনোকিছুই তার কাছে উপেক্ষণীয় হবে না।

১. ২৩৬-২৩৭ দ্রষ্টব্য।

ঠিক বলেছ।

এবং জ্ঞানের সঙ্গে সত্যের চেয়ে অধিক সম্পর্কিত আর কী হতে পারে?

না, আর কী হতে পারে?

কিন্তু যে-চরিত্র জ্ঞানের প্রেমিক, সে কি একই সঙ্গে অসত্যের প্রেমিক হতে পারে?

না, তা কখনো সম্ভব নয়।

তা হলে জ্ঞানের সত্যকার প্রেমিককে তার শৈশবকাল থেকেই যথাসম্ভব সমস্ত সত্যের আকাঙ্ক্ষী হতে হবে।

অবশ্যই।

কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জানি, যার একদিকে প্রবণতা অধিক তার অপরদিকে প্রবণতা কম থাকে। যেমন ধরো একটি ছোট নদী। তার পানি অপর কোনো শাখায় বইলে সে নিজে শুকিয়ে যাবে।

একথা সত্য।

তেমনি যার সমস্ত ইচ্ছা সকলরকম জ্ঞানের ইচ্ছায় মিলিত হয়েছে তার আনন্দের একমাত্র লক্ষ্য হবে আত্মা। দেহের আনন্দ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। অবশ্য সে যদি যথার্থ দার্শনিক হয়, যদি সে কৃত্রিম না হয়, তা হলেই তার চরিত্রে এই গুণের আমরা সাক্ষাৎলাভ করব। ঠিক নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

এমন লোক অবশ্যই সংযমী হবে। সে অর্থগৃধ্নু হবে না। কারণ, যে-প্রবণতা অপর মানুষকে অর্থলোভী এবং অমিতব্যয়ী করে তোলে সে-প্রবণতা যথার্থ দার্শনিকের চরিত্রে থাকতে পারে না।

খুবই সত্য কথা।

তা ছাড়া দার্শনিক-চরিত্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের লক্ষ করা আবশ্যক। যে আত্মা সত্যসন্ধানে ব্রতী তার মধ্যে হীনতার কোনো স্থান হতে পারে না।

অবশ্যই।

তা হলে যার আত্মা উদার, যে সকল কাল এবং অস্তিত্বের দ্রষ্টা তার পক্ষে সাধারণ মানবিক জীবনকে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা কি সম্ভব?

না, তা সম্ভব নয়।

কিংবা এরূপ লোক কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হতে পারে?

না, তা পারে না।

তা হলে যথার্থ দার্শনিকের চরিত্রে কাপুরুষতা কিংবা হীনতার কোনো স্থান নেই।

না, এদের কোনো স্থান হতে পারে না।

তা হলে যার চরিত্র সঙ্গতিময়, যে অর্থগৃধ্নু, হীন, আত্মগর্বী কিংবা কাপুরুষ নয় তেমন চরিত্র কি অন্যায়কারী হতে পারে? অপরের সঙ্গে ব্যবহারে তার পক্ষে কি রূঢ় হওয়া সম্ভব?

অসম্ভব।

তা হলে কোন চরিত্র ন্যায় এবং নম্র এবং কোন্ চরিত্র রূঢ় এবং অসামাজিক তা নির্ধারণ করতে তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। এমনকি কৈশোরেও এই গুণের ভিত্তিতে দার্শনিক-চরিত্র অ-দার্শনিক চরিত্র থেকে পৃথক বলে দৃষ্ট হবে।

তোমার কথা সত্য, সক্রেটিস।

আর-একটি বিষয়।

কী?

এমন চরিত্রের মধ্যে কোনোকিছু শেখার আগ্রহ আছে কি নেই? কারণ, যে-বিষয় ক্লেশকর এবং পরিশ্রম সত্ত্বেও যাতে উন্নতি কম, তেমন বিষয় শেখার জন্য সে নিশ্চয়ই আগ্রহবোধ করবে না?

একথা সত্য।

আবার তার স্মৃতিশক্তি যদি দুর্বল হয় অর্থাৎ যা সে শেখে তার অল্পই সে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয় তা হলে সে একটি শূন্যকুম্ভ বই আর কিছু নয়।

একথাও সত্য।

তেমন হলে বৃথা পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে সে পরিণামে নিজের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠবে। নিজেকে এবং তার এই নিষ্ফল চেষ্টাকে সে 'ঘৃণা করতে শুরু করবে।'

তা-ই সে করবে।

তা হলে, যে-চরিত্র স্মরণশক্তিতে দুর্বল তাকে আমরা যথার্থ দার্শনিক-চরিত্র বলে গ্রহণ করতে পারিনে। আমাদের দার্শনিককে অবশ্যই উত্তম স্মৃতিধর হতে হবে।

অবশ্যই।

আমরা আবার বলছি ঃ অসঙ্গতিপূর্ণ এবং বিসদৃশ চরিত্র কেবল বিষমানুপাতেরই সৃষ্টি করতে পারে। ঠিক নয় কি?

নিঃসন্দেহে, সক্রেটিস।

তা হলে অপর গুণ ছাড়াও উত্তম চরিত্রের মধ্যে আমাদের সুসঙ্গতির অন্বেষণ করতে হবে। এমন চরিত্রের মহৎ অন্তঃকরণ থাকবে। এই মহৎ অন্তঃকরণ নিয়ে সে সকল অস্তিত্বের সারসন্ধানে নিয়োজিত হবে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত সক্রেটিস।

তা হলে এরূপ যে-চরিত্রের মধ্যে আমরা স্মৃতিশক্তি, বিদ্যার আগ্রহ, দৃষ্টির উদারতা, মনের সর্বময়তা—অর্থাৎ সব মহৎ গুণের সমন্বয়ের সাক্ষাৎ পাই, সে-চরিত্র যে-কাজসাধনে উদ্যত হবে সে-কাজে ত্রুটি অন্বেষণ করা কি আমাদের পক্ষে সম্ভব?

না, মোমাসদেবের[১] পক্ষেও এমন চরিত্রে ছিদ্রান্বেষণ সম্ভব নয়।

তা হলে এমন চরিত্র যখন শিক্ষায় সমগ্র এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হয়েছে তখন তার উপরই মাত্র আমরা রাষ্ট্রকে ন্যস্ত করতে পারি।

এ্যাডিম্যান্টাস এই স্থানে আমাদের বাধা দিয়ে বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার এ কথার কোনো জবাব নেই সত্য, কিন্তু তোমার কথা শুনতে শুনতে তোমার শ্রোতাদের মনে একটি প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার না হয়ে পারে না। তারা মনে করে, তোমার এই প্রশ্নোত্তরের কৌশলে তারা দক্ষ নয় বলে তুমি যুক্তি দিয়ে একটু একটু করে তাদের পথভ্রষ্ট করে ফেল। অবশেষে তাদের প্রতিপদের স্বীকৃতি যখন একত্র করা হয় তখন তারা দেখতে পায়, তাদের পরাজয় বিরাট আকার ধারণ করেছে। এবার নিজেদের কাছেই তাদের সব পুরনো ধারণা মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারা দেখতে পায়, তাদের নিজেদের সব অভিমতকেই তারা অস্বীকার করেছে। দাবাখেলায় দক্ষ প্রতিপক্ষের চালে যেমন প্রতিযোগী গুটি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তার যেমন অগ্রসর হওয়ার কোনো পথ থাকে না, তেমনি এই শব্দের দাবাখেলায় তোমার প্রতিযোগী নিজেকে পরিণামে শব্দহীন, নিরস্ত্র দেখতে পায়। অথচ সে-প্রতিযোগী সারাক্ষণ সঠিকই ছিল। তোমার সঙ্গে ব্যাপারটা আমাদের যা ঘটছে তা দেখে আমার এই কথাই মনে হচ্ছে। কারণ আমাদের কেউ তোমাকে বলতে পারে, তোমার সঙ্গে কথায় কেউ পেরে উঠতে না পারুক তবু একথা সত্য যে, তোমার দর্শনের প্রবক্তাদের মধ্যে যারা কেবল

১. হিসিয়ডের 'থিওগনিতে বর্ণিত ছিদ্রান্বেষণ এবং বিদ্রূপের দেবতা মোমাস অন্ধকারের সন্তানরূপে কল্পিত।

তরুণ বয়সে তাদের শিক্ষার অংশ হিসাবেই নয়, পরিণত বয়সেও যারা দর্শনের চর্চা করে, তাদের অধিকাংশই কেবল চরম দুরাত্মায় পরিণত হয় তা-ই নয়, তারা অদ্ভুত এক জীবে পরিণত হয়ে যায়। আর এদের মধ্যে যাদের উত্তম বলে বিবেচনা করা যায় তারা তোমার এই 'মহান' দর্শনের চর্চায় জগতের জন্য অপদার্থ প্রাণীতে পর্যবসিত হয়।

বেশ, কিন্তু তুমি কি এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে কর?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমি বলতে পারিনে এ-অভিযোগ সত্য কি না। এ-ব্যাপারে আমি তোমার অভিমত শুনতে চাই।

আমি বললাম ঃ ঠিক আছে। আমার জবাব তুমি শোনো। আমি মনে করি এ-অভিযোগ তাদের যথার্থ।

তা হলে যে-দার্শনিকরা অপদার্থ বই আরকিছু নয়, তুমি কেমন করে বলছ সেই দার্শনিকগণ শাসক না হওয়া পর্যন্ত আমাদের নগরীগুলি দুঃশাসনের সংকট থেকে মুক্ত হতে পারবে না?

এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার প্রশ্নটি এমন যার জবাব কেবল একটি গল্পের মাধ্যমেই দেওয়া সম্ভব।

বেশ, তা-ই দাও। কিন্তু আমার মনে হয় এমন জবাবে তুমি অভ্যস্ত নও।

আমি বললাম ঃ আমাকে একটি অসম্ভব অবস্থার মধ্যে টেনে আনতে তোমার আনন্দের ব্যাপারটি আমি বুঝতে পারছি, এ্যাডিম্যান্টাস। যাহোক, গল্পটি শোনো। আমার গল্প শুনে আমার কল্পনার বহরে তোমার কৌতুক আরও বৃদ্ধি পাবে, একথা আমি বলতে পারি। কারণ, আমাদের সমস্ত রাষ্ট্রে উত্তম লোকের যে-দুর্দশা তাতে জগতের কোনোকিছুকেই তাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। কাজেই তাদের পক্ষে কিছু বলতে হলে আমাকে কল্পকাহিনীর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এর মাধ্যমে আমাকে সেই ছবির ছাগ এবং হরিণের মিলিত আকৃতির ন্যায় একাধিক উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করে দুর্দশাগ্রস্ত দার্শনিককে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা করতে হবে। এবার তা হলে এমন একটি জাহাজের কল্পনা করো যার কর্ণধারটি তার নাবিকদের চেয়ে দীর্ঘ এবং সবল বটে কিন্তু কানে সে কিছুটা খাটো এবং দৃষ্টিশক্তিতে ক্ষীণ এবং সে জাহাজচালনার জ্ঞানেও অজ্ঞ। জাহাজের হাল তার হাতে। নাবিকের দল তাকে ঘিরে কোলাহলে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সকলেরই দাবি জাহাজের হাল ধরার অধিকার তারই। কিন্তু নাবিকদের কেউ নৌচালনার জ্ঞানে জ্ঞানী নয়। নৌচালনার কৌশল আদৌ জানা যায়—এ-বিশ্বাসও তারা কেউ পোষণ করে না। যদি কেউ বলে,

নৌচালনা একটি শিল্প এবং একে শেখা যায় তা হলে ক্ষিপ্ত হয়ে এমন লোককে হয়তো তারা হত্যা করে ফেলবে। তারা সকলেই জাহাজচালককে ঘিরে ধরেছে। প্রত্যেকেই বলছে তার হাতে জাহাজের হাল তুলে দেওয়া হোক। উপদলেও তারা বিভক্ত। কোনো উপদল যদি শক্তিশালী হয়ে কর্ণধারের কাছ থেকে হাল তুলে নেওয়ার উপক্রম করে তা হলে অপর উপদল নিশ্চয়ই তাদের কেটেকুটে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দেবে এবং সরল জাহাজচালককে সুরা কিংবা ঔষধ প্রয়োগে বাধ্য করে জাহাজচালনার দায়িত্ব তুলে নিয়ে সুরামত্ত উল্লাসকারীর ন্যায় যেমন ইচ্ছা তেমন আচরণ করতে শুরু করবে। এই পরিস্থিতিতে যে-জ্ঞানী কোনোপ্রকারে জাহাজচালককে কাবু করে সঠিক জাহাজচালনায় সাহায্য করবে তাকে তখন সবাই প্রশংসা করবে। তার নৌচালনার এবং সমুদ্রের জ্ঞানের প্রশংসায় এবং অপর সকলের অজ্ঞতার নিন্দায় তখন তারা উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠবে। কিন্তু তারা জানে না, যথার্থ যে নাবিক তাকে বৎসরের ঋতুপরিক্রমের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। তাকে আকাশ এবং তার তারকারাজি, হাওয়ার গতি এবং আনুষঙ্গিক সব বিষয়কে আয়ত্ত করতে হয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই মাত্র নাবিকের পক্ষে নৌপোত সঠিকভাবে চালনা করা সম্ভব। কিন্তু এ কথা তারা বিশ্বাস করতে চাইবে না। নৌচালন-শিল্পে দক্ষতা অর্জনকে তারা অসম্ভব মনে করে। এবার বল এ্যাডিম্যান্টাস, এরূপ জাহাজের নাবিকরা একজন যথার্থ নৌচালক সম্পর্কে কী মনোভাব পোষণ করবে? তারা সকলে কি যথার্থ নাবিককে আকাশচারী এবং আদার্থ বলে গণ্য করবে না?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, তারা তাকে তা-ই মনে করবে।

তা হলে এ-রূপকের ব্যাখ্যা ছাড়াই তুমি বুঝতে পারছ, যথার্থ দার্শনিকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী?

হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।

তা হলে, যে-ভদ্রলোক দার্শনিকদের প্রতি সমাজের এরূপ আচরণে বিস্ময় বোধ করে তাকে তুমি এই কাহিনীটি শুনিয়ে দিও এবং তাকে বরঞ্চ বুঝিয়ে বোলো যে, দার্শনিকদের প্রতি এরূপ আচরণ না করাটাই অধিকতর বিস্ময়কর হত।

আমি তা-ই করব, সক্রেটিস।

তুমি তাকে বোলো, একথা সত্য যে, উত্তম দার্শনিকদের তাদের সহগামীগণ অপদার্থ বলে গণ্য করে। কিন্তু এজন্য দায়ী দার্শনিক নয়, দায়ী তারা যারা তার জ্ঞানকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ জাহাজচালক নাবিকদের অনুনয়

করে বলবেনা যেন তাকে জাহাজ চালাতে দেওয়া হয়; জ্ঞানীও ধনবানের প্রাসাদে যেয়ে ধরনা দেবে না (এ-কাহিনী যে তৈরি করেছে, সে ভ্রান্ত)। এরূপ বলা স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক হচ্ছে এই সত্য যে, যে রুগি সে ধনী কিংবা নির্ধন হোক, তাকেই যেতে হবে চিকিৎসকের নিকট। যাদের শাসিত হওয়া প্রয়োজন তারাই যাবে যে শাসন করতে জানে তার নিকট। বর্তমানে যে-রাজনীতিকগণ শাসন করছে তাদের যদি তুমি আমাদের কাহিনীর জাহাজের অজ্ঞ নাবিকের সঙ্গে তুলনা কর এবং যাদের এরা আকাশচারী অপদার্থ বলে আখ্যায়িত করে তাদের যদি যথার্থ নৌচালক বলে মনে কর তা হলে তোমার সে-তুলনা খুব ভ্রান্ত হবে না।

তোমার একথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

এসমস্ত কারণে এরূপ লোকের নিকট দর্শনের ন্যায় মহৎ বিষয়ের কোনো মূল্য হবে না। তার বিরোধী উপদল তার কোনো মর্যাদা দেবে না; কিন্তু দর্শনের সর্বাধিক ক্ষতি তার বিরোধীদের দ্বারা সাধিত হয় না; তার সর্বাধিক ক্ষতি সাধিত হয় তার কৃত্রিম অনুসারীদের হাতে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথা উল্লেখ করে তুমি বলেছিলে যে, তারা দুরাত্মা কিংবা অপদার্থ জীবে পরিণত হয় এবং আমি সে-অভিযোগকে স্বীকার করেছিলাম।

তোমার এ-ব্যাখ্যা যথার্থ, সক্রেটিস।

তা হলে উত্তম কেন অপদার্থ হয় তার ব্যাখ্যাটি তুমি পেয়েছ?

হ্যাঁ, সে-ব্যাখ্যা আমি পেয়েছি।

কিন্তু আমি আর-একটু বলব। আমি বলব, দর্শনের ক্ষেত্রে অধিকাংশের এই বিকারকে আমরা এড়াতে পারিনে আর এজন্য পূর্বের দৃষ্টান্তে যেমন বলেছি, দর্শনকে দায়ী করা চলে না।

অবশ্যই।

এসো, আমরা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই অগ্রসর হই। আমরা বলেছিলাম ঃ যে মহৎ তাকে সর্বক্ষেত্রে সত্যকে অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় সে প্রতারকে পরিণত হবে এবং যথার্থ দর্শনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছিলাম।

তাই যদি হয়, তা হলে অন্য গুণের কথা ছেড়ে দিলেও এই গুণের ক্ষেত্রে তার সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার কি সে বিপরীত চরিত্র নয়?

অবশ্যই।

তা হলে তার পক্ষে আমরা অবশ্যই বলব, জ্ঞানের যথার্থ যে প্রেমিক তার সর্বক্ষণের লক্ষ্য হচ্ছে 'সত্য'। সত্যকে সে অন্বেষণ করে। এই সত্যঅন্বেষণই তার স্বভাব। আর সে-কারণে সাধারণের ধারণায় সে তৃপ্ত হতে পারে না। ক্লান্তিহীনভাবে সত্যের সন্ধানে সে অগ্রসর হতে থাকে। আত্মার যে-শক্তিতে অস্তিত্বের যথার্থ সত্য অনুধাবন করা সম্ভব, যে-শক্তি সত্যের নৈকট্যে এবং সাদৃশ্যে ভাস্বর, সত্যের সম্মেলনের যে-শক্তি প্রজ্ঞা এবং যাথার্থ্যের জন্মদান করে সেই শক্তিতে সত্যের সন্ধানী যতক্ষণ-না সকল অস্তিত্বের মূলকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় ততক্ষণ তার যাত্রার বিরাম নেই, ততক্ষণ তার আত্মার তৃপ্তি নেই।

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

এবার তা হলে আমাদের দেখাতে হবে দর্শনের বিকরগুলি কী এবং কী কারণে অধিকসংখ্যক মানুষ দর্শনের ক্ষেত্রে বিকারদুষ্ট হয়ে পড়ে, কী কারণে খুব অল্প সংখ্যকই এই বিকারকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। আমরা অবশ্য এখন তাদের কথাই বলছি যাদের অপদার্থ বা অকাজের বলা হয়, যারা দুরাত্মা তাদের কথা নয়। এ-অপদার্থদের আলোচনা সম্পন্ন হলে আমরা দর্শনের অনুকারীদের কথা ধরব ঃ কী প্রকারের লোক তারা যারা এমন লক্ষ্যকে সাধন করতে চায় যে-লক্ষ্য তাদের সাধ্যের ঊর্ধ্বে, যার যোগ্য তারা নয়—ফলে যারা দর্শনের গায়ে সংখ্যাহীন অসঙ্গতির কলঙ্ক লেপন করে এবং তাকে সর্বজনীন নিন্দার পাত্র করে তোলে।

এ্যাডম্যান্টাস বললেন ঃ কী এই বিকারগুলি?

দেখি, তোমাকে আমি এদের কথা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারি কি না। একথা তো সত্য, এ্যাডিম্যান্টাস, সর্ব-মহৎগুণ-সমন্বিত যে-চরিত্র আমরা দার্শনিকের ওপর আরোপ করেছি সে-চরিত্র মানুষের মধ্যে খুবই দুষ্প্রাপ্য।

হ্যাঁ, এমন চরিত্র অবশ্যই দুষ্প্রাপ্য।

আর এই দুষ্প্রাপ্য চরিত্রকে বিনষ্ট করার জন্য কত সংখ্যাহীন কারণ ক্রিয়াশীল রয়েছে, তাও আমরা জানি।

কী কারণের কথা বলছ তুমি?

প্রথমত আমি বলব দার্শনিকদের নিজেদের গুণই অর্থাৎ তাদের সাহস, সংযম এবং অন্য যে-গুণকে আমরা প্রশংসার্হ বলেছি সেই গুণই তাদের আত্মাকে 'দর্শন' থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে। এটা অবশ্যই বিস্ময়কর ব্যাপার।

অবশ্যই বিস্ময়কর, সক্রেটিস।

তারপর দৈনন্দিন জীবনের আকর্ষণ—যেমন সুন্দরের মোহ, সম্পদের কামনা, শক্তির ইচ্ছা, পদের লোভ এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সম্পর্ক—এগুলি রয়েছে। এগুলির বিভ্রান্তিকর প্রভাবের কথা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে।

হ্যাঁ, এগুলোকে আমি বুঝতে পারি। তবুও এ-সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে আর-একটু সঠিকভাবে আমি শুনতে চাই।

এ্যাডিম্যান্টাস, সত্যকে সমগ্রভাবে এবং সঠিকভাবে অনুভব করার চেষ্টা করো। তা হলে আমার পূর্বের অভিমতটি বোঝা তোমার পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না। সে-বক্তব্য তোমার নিকট অদ্ভুত বলেও বোধ হবে না।

সে কাজ আমি কেমন করে করব?

কেন, আমরা কি জানিনে যে, উদ্ভিদই বল আর জন্তুই বল, জীবনমাত্রেরই বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক হচ্ছে উপযুক্ত পুষ্টি, পরিবেশ এবং জলবায়ু আর এই জীবনের বীজ যত স্বাস্থ্যবান হবে, এই উপাদানের অভাব সে তত বেশি বোধ করবে। কারণ অধম এবং উত্তমের বৈপরীত্য অধম এবং মধ্যমের চেয়ে অধিক। তা হলে উত্তম বীজ যে প্রতিকূল পরিবেশে অধমের চেয়ে অধিকতর খারাপ হবে—সে-অনুমান যুক্তিসঙ্গত।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য।

তা হলে, এ্যাডিম্যান্টাস, এ-নীতির ভিত্তিতে আমরা কি বলতে পারিনে যে, সবচেয়ে গুণময় যে-চরিত্র সে যদি প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা হলে পরিণামে সে অধিক অধম চরিত্রের লোকে পরিণত হবে? কারণ যত পাপ এবং অপরাধের মনোভাব, তার উদ্ভব কুশিক্ষায় বিনষ্ট চরিত্র থেকে যত, অধম চরিত্র থেকে তত নয়। কারণ, দুর্বল চরিত্রের অধিক ভালো কিংবা মন্দ, কোনটা করারই তেমন ক্ষমতা থাকে না।

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

আমাদের দার্শনিকের ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত সত্য। দার্শনিকও একটি চারাগাছ সদৃশ। উপযুক্ত পরিবেশ এবং পরিচর্যা পেলে সে সবগুণের আধার হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রতিকূল ভূমিতে যদি তুমি তাকে বপন কর তা হলে সে সর্বাধিক ক্ষতিকারক বুনো বৃক্ষে পরিণত হয়ে যাবে। তুমি কি মনে কর, যারা বলে, আমাদের যুবকদের বিনষ্টির কারণ হচ্ছে সফিস্টগণ, তাদের অভিমত ঠিক? ব্যক্তিগত শিক্ষকগণ কি যুবকদের চরিত্র মারাত্মকরূপে নষ্ট করতে

পারে? যে-জনসাধারণ এরূপ অভিমত পোষণ করে তারাই কি সবচেয়ে বড় সফিস্টের ভূমিকা পালন করে না? তারাই কি আমাদের তরুণ, বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ সকলকে তাদের ইচ্ছামাফিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে যেরূপ চরিত্র তাদের আবশ্যক, সেরূপ চরিত্রে তাদের পরিণত করে না?

কখন তারা এরূপ কার্য সাধন করে, সক্রেটিস?

যখন তারা সম্মিলিত হয়, সাধারণ সভার যখন অধিবেশন বসে কিংবা বিচারকমণ্ডলীর সভা বসে কিংবা রঙ্গালয়ে বা শিবিরে সকলে সমাগত হয় তখন। তখন কেউ যদি কিছু বলে এবং তা জনতার পছন্দসই হয় তা হলে চারদিকে তুমুল কলরোলের সৃষ্টি হয়, করতালি ধ্বনিত হয়। প্রশংসার সে-ধ্বনি চারিপার্শ্বের প্রস্তরগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে প্রতিধ্বনিত হয়। যা তাদের নিন্দার্হ তাকেও তারা এমনি করে নিন্দার ধ্বনিতে নিমজ্জিত করে দেয়। প্রশংসা এবং নিন্দা—উভয়ের প্রকাশ বিপুল আকার গ্রহণ করে। এমন অবস্থায় কোনো তরুণের অন্তর কি উৎফুল্ল না হয়ে পারে? জনমতের এরূপ প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো শক্তি যোগানো কোনো ব্যক্তিগত শিক্ষকের পক্ষে কি সম্ভব? উত্তম কিংবা অধমের বিষয়ে এরূপ জনতার যে-অভিমত, তরুণরাও কি সেই অভিমতই পোষণ করবে না? তারা যেরূপ আচরণ করবে একটি তরুণও তো সেরূপ আচরণই করবে? এবং এই জনতা যেরূপ, তরুণরাও সেরূপই হবে। ঠিক নয় কি?

অনিবার্যভাবে তারা তা-ই হবে।

অনিবার্যতার কথা যদি বল, তা হলে এর চেয়েও বড় অনিবার্যতা আছে যার কথা আমি এখনও উল্লেখ করিনি।

কী সে অনিবার্যতা?

কলঙ্ক, বাজেয়াপ্তি এবং মৃত্যুর অনিবার্যতা। এই জনতাই হচ্ছে শিক্ষক। এই জনতাই হচ্ছে নূতন সফিস্ট। অপরকে বশ করতে তাদের হর্ষধ্বনি যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ে, তখন তারা অবাধ্যের উপর কলঙ্ক লেপন করে, তার ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত করে কিংবা তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

হ্যাঁ, তা-ই তারা করে। এবং এ ক্ষেত্রে তারা নির্মম।

কোনো সফিস্ট বা ব্যক্তিগত শিক্ষকই কি প্রতিযোগিতায় এই জনতাকে অতিক্রম করতে পারে?

না, তা পারে না।

কেউই এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না। জনমতের বাইরে ভিন্নতর শিক্ষায় ভিন্নতর চরিত্র গঠন করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। সেরূপ চেষ্টা করা মূর্খতার নামান্তর বই আর কিছু নয়। অলৌকিক ক্ষমতার কথা না ধরলে, মানুষের সাধ্যের ভিত্তিতে বললে, এরূপ কখনো সম্ভব হয়নি এবং কখনো হবে না। এ্যাডিম্যান্টাস, একটি কথা ভুলে যেও না। আমাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কারোর পক্ষে বিপদকে এড়িয়ে ন্যায়পথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যথার্থই অলৌকিক ঘটনা।

তোমার কথা ঠিক, সক্রেটিস।

তা হলে আর-একটি বিষয়ও তোমাকে স্বীকার করতে হয়।

কী?

প্রশ্ন হচ্ছে, জনতা যাদের ভাড়াটে শিক্ষক বলে, যাদের তারা সফিস্ট বলে অভিহিত করে এবং নিজেদের প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করে, তারা কেন এই জনতা বা সংখ্যাধিকের অর্থাৎ তাদের সাধারণ সভার পছন্দসই অভিমতকেই শিক্ষা দেয়? এই সফিস্টরা জনতার অভিমতকেই নিজেদের অভিজ্ঞান বলে মনে করে। কিন্তু কেন? এদের তুমি সেই মানুষের সঙ্গে তুলনা করতে পার যে একটা বিরাটাকার হিংস্র পশুকে পালন করছে। এ হচ্ছে সেই পশুর পালক। এই পালক তাকে আহার করায়। তার আচরণকে সে পর্যবেক্ষণ করে। কেমন করে তার সঙ্গে ঘেঁষা যায় তা সে অধ্যয়ন করে। কিসে সে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে, কিংবা কিসে খুশি হয়ে ওঠে কিংবা তার কোন্ গর্জনের কী অর্থ এবং কোন্ আওয়াজে সে শান্ত হয় এবং কোন্ আওয়াজে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—এ-সবকিছুতে এই লোক অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। এই হিংস্র পশুর পালনে সে যখন দক্ষ হয়ে উঠেছে তখন তার এই ক্ষমতাকে সে জ্ঞান বলে অভিহিত করে এবং এই জ্ঞানকে সে শিল্প এবং কলারূপে মানুষকে শিক্ষা দিতে শুরু করে। তবু যথার্থভাবে সে কিন্তু জানে না, এই হিংস্র পশুর কোন্ রুচি বা ইচ্ছা ভালো কিংবা মন্দ, ন্যায় কিংবা অন্যায়, উপকারক কিংবা ক্ষতিকারক। তার যা জ্ঞান তা শুধু এই পশুটার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে। যাতে পশু খুশি হয় তা এই 'জ্ঞানীর' কাছে ভালো এবং যাতে পশু ক্ষিপ্ত হয় তাকেই সে বলে মন্দ। এ শিক্ষকের বিচারের আর কোনো মানদণ্ড নেই। পশুর প্রয়োজনই এর ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ বিচারের মানদণ্ড। ন্যায়-অন্যায়ের যথার্থ পার্থক্য সম্পর্কে সে জ্ঞানহীন। এমন শিক্ষককে অবশ্যই তুমি একজন অদ্ভুত শিক্ষক বলবে। নয় কি?

অবশ্যই সে একজন অদ্ভুত শিক্ষক।

তা হলে যে মনে করে বিচিত্র জনতার রুচি এবং মেজাজ বোঝাটাই হচ্ছে জ্ঞান; চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং সর্বোপরি রাজনীতিতে জনতার মনমেজাজ বুঝতে পারাই হচ্ছে জ্ঞান, তার সঙ্গে আমাদের একটু পূর্বে বর্ণিত শিক্ষকের কী পার্থক্য? কারণ, কোনো অনিবার্যতা ব্যতিরেকেই কেউ যখন তার কাব্য কিংবা কলা কিংবা রাষ্ট্রীয় সেবার নমুনা নিয়ে এই জনতার দরবারে হাজির হয় যেন জনতাই তার বিচারক, তখন পরিণামে ডায়োমিডের[১] অনিবার্যতা জনতার যা মনোরঞ্জক কেবলমাত্র সেই কর্ম সাধনেই তাকে বাধ্য করবে। আর এরূপ মনোরঞ্জক-সৃষ্টির যথার্থ কোনো গুণ আছে, একথা কেউ কি কখনো গুরুত্বসহকারে প্রমাণ করতে পেরেছে?

না, কেউ পারেনি। আর আমি পারব, এমনও আমি মনে করিনে।

আমি যা এতক্ষণ বলেছি তার যথার্থতা তুমি তা হলে স্বীকার করছ এ্যাডিম্যান্টাস? তা হলে আর-একটি বিষয়ও ভেবে দ্যাখো। এই যদি হয় অবস্থা, তা হলে জনতাকে কারও পক্ষে কি একথা বিশ্বাস করানো কখনো সম্ভব হবে যে, সুন্দরের বৈচিত্র্য নয়, একমাত্র পরম সুন্দরই অস্তিত্বময়, কিংবা যে-কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত একক সত্তাই হচ্ছে অধিকতর সত্য?

না, তাদের এ-বিশ্বাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে না।

তা হলে জনতা দার্শনিক হবে—একথা চিন্তা করা অসম্ভব?

হ্যাঁ, এ অসম্ভব।

তা হলে দার্শনিকরা অনিবার্যভাবেই জনতা দ্বারা নিন্দিত হবে?

তা-ই হবে।

শুধু জনতা নয়, যেসব ব্যক্তি জনতার অনুগমন করে এবং তাকে খুশি রাখতে উদ্‌গ্রীব থাকে তাদের কাছেও দার্শনিক নিন্দার পাত্র।

তাও পরিষ্কার।

তা হলে এমন কী পথ আছে যে-পথে দার্শনিক তার জ্ঞানের চর্চায় অবিচল থাকতে পারে? দার্শনিকের যে-গুণ আমরা স্থির করেছিলাম সে-গুণের কথা নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি। আমরা বলেছিলাম, তার যেমন বুদ্ধির প্রাখর্য, স্মৃতির

---

১. গ্রীসীয় পুরাণের থ্রেসের রাজা ডায়োমিড। ডায়োমিড তার অশ্বকে নরমাংস খেতে দিত এবং প্রতিরোজ প্রজাদের একজনকে ধরে এনে অশ্বের জন্য হত্যা করত। কেবলমাত্র হারকিউলিসই ডায়োমিডকে পরাভূত করতে পেরেছিল। হারকিউলিস ডায়োমিডকে পরাভূত করে তারই নরখাদক অশ্বের সামনে নিক্ষেপ করলে অশ্ব তাকে ভক্ষণ করে ফেলে।

শক্তি এবং সাহস থাকতে হবে, তেমনি তাকে উদারহৃদয়ও হতে হবে। দার্শনিকের এই হবে যথার্থ গুণ।

হ্যাঁ, একথা আমার মনে আছে।

এরূপ যে-ব্যক্তি সে তো তার শৈশব থেকে সর্বক্ষেত্রেই প্রথম হবে। বিশেষ করে তার শারীরিক গুণ যদি মানসিক গুণের অনুরূপ হয় তা হলে এমন কৃতিত্ব সে স্বাভাবিকভাবেই অর্জন করবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক।

এবং এরা যত অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হবে তত তার সুহৃদ এবং সহনাগরিকগণ তার গুণাবলীকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাইবে।

নিঃসন্দেহে।

তারা সকলে তার সম্মুখে নতজানু হয়ে তাকে অনুরোধ করবে, তাকে স্তোকবাক্যে তৃপ্ত করতে চাইবে। কারণ, যে শক্তি সে অর্জন করেছে, যা একদিন সমগ্রভাবে তার করায়ত্ত হবে তার উপকার তারাও লাভ করতে চাইবে।

পৃথিবীর এটাই রীতি।

এরূপ অবস্থায় এমন তরুণ কী করবে? বিশেষ করে সে যদি একটি বৃহৎ নগরীর নাগরিক হয়, যদি সে ধনবান এবং অভিজাত বংশীয় হয়, তা হলে তার মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে? তার মনে সীমাহীন আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হবে। গ্রীসীয় নগরী এবং বর্বর জাতি সকলকেই সে শাসন করতে পারে, এই মনোভাব তার মধ্যে সৃষ্টি হবে। এবং এই মনোভাব পোষণ করে সে নিজেকে অসীম শক্তির আধার মনে করবে এবং অসার আড়ম্বর এবং গর্বে স্ফীত হয়ে উঠবে।[১] ঠিক নয় কি?।

নিশ্চিতরূপেই সে এরূপ করবে।

এ্যাডিম্যান্টাস, এখন মনে করো, তার মনের এমনি অবস্থায় কেউ তার কাছে গিয়ে বিনম্রভাবে সত্য কথাটি বলল। তাকে বলল, তার যথার্থ জ্ঞানের অভাব আছে। তাকে সেই জ্ঞান লাভ করতে হবে। এবং জ্ঞানের দাস হয়ে

১. অনেকে মনে করেন প্লেটোর এই মন্তব্যের লক্ষ্য হচ্ছেন এ্যালসিবিয়াডিস। এ্যালসিবিয়াডিস (খ্রিঃ পূঃ ৪৫০–৪০৪) ছিলেন এথেন্সের অন্যতম জননেতা এবং সামরিক অধিনায়ক। তাঁর জীবন ছিল ঘটনাবহুল। পিলোপনেশীয় যুদ্ধে এ্যালসিবিয়াডিস অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে একবার সক্রেটিস তাঁর জীবনরক্ষা করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এ্যালসিবিয়াডিস ক্ষমতার দ্বন্দ্বে একাধিকবার এথেন্সের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষীয় রাষ্ট্রের সঙ্গেও যোগদান করেন।

সাধনা না করলে এই জ্ঞান সে লাভ করতে সক্ষম হবে না। এরূপ যদি তাকে বলা হয়, তুমি কি মনে কর এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তার পক্ষে সত্যকে গ্রহণ করা সহজ হবে?

না, তার পক্ষে এ-কাজ আদৌ সহজ হবে না।

এমনকি তার সহজাত গুণ এবং স্বাভাবিক যুক্তিবোধের কারণে তার সত্যদৃষ্টি যদি ঈষৎ উন্মুক্তও হয় এবং দর্শনের প্রতি যদি সে আকৃষ্ট হয় তা হলে তার সেই বন্ধুগণ যখন দেখবে তারা তার কাছ থেকে যে-সুবিধা লাভের আশা করেছিল সে-আশা বিনষ্ট-প্রায় তখন তার প্রতি তাদের ব্যবহার কীরূপ হবে বলে তুমি মনে কর? তারা কি তখন তাকে সর্বপ্রকারে সত্যের দর্শন এবং তার শিক্ষার প্রভাব থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে না? আর এই উদ্দেশ্যসাধনে তারা গোপন ষড়যন্ত্র কিংবা প্রকাশ্য বিচার এবং দণ্ডদান—কোনো পন্থা গ্রহণ থেকেই বিরত থাকবে না। ঠিক নয় কি?

এ-সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই সক্রেটিস।

কিন্তু যে এমনি করে প্রতিরুদ্ধ তার পক্ষে কি দার্শনিক হওয়া সম্ভব?

না সক্রেটিস, তা সম্ভব নয়।

তা হলে আমরা যখন বলেছিলাম, যে-গুণে একজন মানুষ দার্শনিক হতে পারে সে-গুণেরও যদি সুশিক্ষা না ঘটে, তা হলে ধনসম্পদ কিংবা অপর জাগতিক আকর্ষণ যেমন তাকে তার সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে, তেমনি পারে তার এই সকল গুণও, তখন কি আমরা সঠিক কথাই বলিনি?

হ্যাঁ, আমরা সঠিক কথাই বলেছিলাম।

প্রিয় বন্ধু, তা হলে দেখতে পাচ্ছ সর্বগুণে গুণান্বিত যে-চরিত্র, যে-চরিত্র বলতে গেলে দুর্লভ, সে-চরিত্রও এমনিভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবং এরূপ গুণী চরিত্র একদিকে যেমন সমাজ এবং ব্যক্তির সর্বাধিক ক্ষতিসাধন করতে পারে, তেমনি আবার মঙ্গলসাধনের ইচ্ছা থাকলে সে সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলও সাধন করতে পারে। যে-চরিত্র ক্ষুদ্র, দুর্বল, গুণহীন তার মঙ্গল কিংবা অমঙ্গল কোনোকিছু সাধনেরই ক্ষমতা থাকে না।

খুবই যথার্থ কথা।

তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, আমাদের দার্শনিক কিংবা বলি 'দার্শনিকা' এখন পরিত্যক্ত। যে-বিবাহঅনুষ্ঠানের সূচনা ঘটেছিল সে-অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। কারণ তার প্রেমাস্পদগণ তাকে বিস্মৃত হয়েছে। তারা যখন দর্শনকে

পরিত্যাগ করে অসত্য অসম্মান এবং অযোগ্যের জীবনযাপন করছে তখন হীনতর লোক তাকে অরক্ষিতা দেখে তার বাসগৃহে প্রবেশ করে তাকে অসম্মানিত করে যাচ্ছে। এখন নিন্দুকরা দর্শনের গায়ে নানা অপবাদের মোড়ক মুড়ে দিচ্ছে। তারা বলছে দর্শনের যারা সঙ্গী তাদের এক অর্ধেক অপদার্থ, অপর অর্ধেক নরাধম, দুরাত্মা।

হ্যাঁ, দর্শনের বিরুদ্ধে এমন অপবাদই সচরাচর দেওয়া হয়।

এর অন্যথা তুমি আশা করতে পার না। কারণ দর্শনের ন্যায় মহৎ নামের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল একটি ক্ষেত্রকে উন্মুক্ত এবং অবারিত দেখতে পেয়ে বন্দিশালার শেকলভাঙা অপরাধীর ন্যায় হীনতর ক্ষেত্রের দক্ষ লোকগুলো সব যখন দলেদলে তাকে একটি অরক্ষিত মন্দিরের ন্যায় দখল করে ফেলে তখন তুমি তার সম্পর্কে এমন অপবাদ ছাড়া আর কী আশা করতে পার? কারণ দর্শনের অপব্যবহার যা-ই থাকুক-না কেন, অপর কোনো ক্ষেত্রের চেয়ে দর্শন এখনও উচ্চতর সম্মান বহন করে। আর এরই আকর্ষণে পতঙ্গের মতো, দৈহিক পীড়নে বিকলাঙ্গ ওদের দেহের ন্যায়, যান্ত্রিক জীবনের পীড়নে বিকৃতমনের অধিকারী এই হীন চরিত্রগুলো দর্শনের দিকে ধেয়ে আসে। আর তারই ফলে দর্শনের এই পরিণতি ঘটে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক সক্রেটিস।

এরা সব সেই কয়েদখানা থেকে ছাড়-পাওয়া মুণ্ডিতমস্তক ক্ষুদ্রকায় ঝালাইকারের ন্যায়, যার হাতে বেশ অর্থ এসে গেছে এবং যে সেই অর্থ দিয়ে বরের ন্যায় নূতন পোশাকে নিজেকে আচ্ছাদিত করে তার দুর্দশাগ্রস্ত মনিবের কন্যাকে বিয়ে করতে উদ্যত হয়েছে।

সক্রেটিস, এর চেয়ে সঠিক উপমা আর কিছু হতে পারে না।

কিন্তু এমন মিলন থেকে কী সন্তান জাত হবে? এদের যে-সন্তান হবে তারা অবশ্যই ঘৃণ্য এবং অবৈধ হবে। নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

ঠিক তেমনি, যারা শিক্ষার অযোগ্য তারা তখন দর্শনের আশ্রয় নেয় এবং যে-দর্শন তাদের স্তরের চেয়ে উচ্চতর স্তরের, সে-দর্শনের সঙ্গে ভাবগত সম্পর্ক স্থাপন করে তখন এই সম্পর্কে কী ভাব এবং অভিমতের সৃষ্টি করতে পারে? সে-ভাব অবশ্যই শ্রবণের জন্য আকর্ষণীয়, কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে যথার্থ কোনো সাদৃশ্যশূন্য ভ্রান্ত যুক্তিজাল ব্যতীত অপর কিছু হতে পারে না। তুমি কী বল?

খুবই সত্য কথা।

এ্যাডিম্যান্টাস, তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দর্শনের যথার্থ অনুসারীর সংখ্যা খুব কমই হবে। যে-কতিপয় তার যথার্থ অনুসারী হবে তাদের মধ্যে হয়তো থাকবে সুশিক্ষিত অভিজাত কোনো ব্যক্তি, দেশ সেবার কারণে যে নির্বাসিত হয়েছে এবং দূষিত আবহাওয়ার বাইরে থাকার জন্য যার পক্ষে দর্শনের প্রতি অনুগত থাকা সম্ভব হয়েছে; এবং দূষিত কোনো নগরীর মধ্যেও মহৎ আত্মা যে রাজনীতিকে ঘৃণা করে এবং তার প্রতি যে ভ্রূক্ষেপহীন। এ ছাড়া ধীশক্তিসম্পন্ন যারা কূটকলাকে ঘৃণা করতে সক্ষম হয়েছে তারাও দর্শনের আশ্রয়ে এসে মিলিত হতে পারে। আমার বন্ধু থিজেস্-এর ন্যায়ও কেউ থাকতে পারে যার দর্শন পরিত্যাগের আকর্ষণ ছিল বহু, কিন্তু দেহের অসুস্থতার কারণে রাজনীতিতে যোগদান যার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমার নিজের কথা হিসাবে আনছিনে। আমার ভেতরে একটি ঐশ্বরিক হুঁশিয়ারি আছে যা হয়তো অপর কারুর মধ্যে নেই।[১] অতি অল্পসংখ্যক যাদের কথা আমরা উল্লেখ করলাম তারা যখন দর্শনের আনন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় এবং জনতার উন্মত্ততাকে প্রত্যক্ষ করে তখন তারা সম্যকভাবে বুঝতে পারে, রাজনীতির মধ্যে কোনো সুস্থতা নেই, ন্যায়ের সংগ্রামে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তাদের পাশে এসে কেউ দাঁড়াবে না। তারা যদি দুরাচারের স্রোতে নিজেরা যোগদান না করে, আর যখন নিঃসঙ্গভাবে ন্যায়ের সংগ্রাম পরিচালনে তারা সক্ষম নয়, তখন হিংস্র পশুর মুখে নিক্ষিপ্ত অসহায় ব্যক্তির ন্যায় সুহৃদ কিংবা সমাজ কারও কোনো উপকারসাধন করার পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত তাদের গত্যন্তর নেই। এই উপলব্ধি নিয়ে তারা নীরব এবং নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। তাদের এ-জীবন যাপনকে তুলনা করা চলে সেই পথিকের সঙ্গে যে ধূলিঝড় এবং শিলাপাতে আক্রান্ত হয়ে একটি প্রাচীরের পাশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তারা দেখছে, জগৎ অন্যায় কর্মে পূর্ণ। তাদের কামনা, যেন তারা এই অন্যায়ের স্রোতে ভেসে না যায়, অন্যায়ের স্পর্শশূন্য হয়ে জীবন ধারণ করে পরিশেষে আনন্দ এবং আশাপূর্ণ চিত্তে এ-পৃথিবী থেকে যেন তারা তাদের যাত্রা শুরু করতে পারে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তাদের এ-নীতিও কম মহৎ নয়। তাদের এ কাজের মূল্যও অনেক।

---

১. ঐশ্বরিক হুঁশিয়ারি ঃ আমরা একে সক্রেটিসের বিশেষ বিবেক বলে মনে করতে পারি। সক্রেটিস তাঁর 'জবানবন্দিতে' বিচারকদের লক্ষ্য করে এই ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ করে বলেছিলেন ঃ "যে-ঐশিক শক্তি আমার অন্তর্বাণীর উৎস সে ... আমার বিন্দুমাত্র পদস্খলন কিংবা ভ্রান্তি থেকে আমাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।"—সক্রেটিসের জবানবন্দি ঃ প্লেটোর সংলাপ ঃ সরদার ফজলুল করিম, পৃ. ৩৯, প্রথম সংস্করণ।

হ্যাঁ, তাদের এ-দানও কম নয়। কিন্তু উপযুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রে তাদের গুণের পূর্ণতর বিকাশ ঘটতে পারত। আর সে-বিকাশে তার নিজের এবং সমাজের মুক্তি সাধনে সক্ষম হত। যাহোক, দর্শনের দুর্নামের কারণ এবং এ-দুর্নাম যে অন্যায় সে সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এ-সম্পর্কে তোমার কি আর কিছু বলার আছে?

না সক্রেটিস, আমার এ-বিষয়ে যোগ করার কিছু নেই। আমি জানতে চাচ্ছি প্রচলিত সরকারের মধ্যে কোনটিকে তুমি দর্শনের জন্য উপযুক্ত বলে গণ্য কর।

আমি বললাম ঃ না, প্রচলিত কোনো রাষ্ট্রই দর্শনের উপযুক্ত নয়। আমার অভিযোগও সেখানেই। এদের কোনো রাষ্ট্রই দর্শনের স্বভাবের যোগ্য নয়। তাই দর্শনের চরিত্র এখানে বিদেশী জমিতে উপ্ত বীজ থেকে জাত চারার ন্যায় বিকৃত এবং পরিবর্তিত হয়ে যায়। দর্শন এখানে তার সঠিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং এর স্বভাবের বহির্ভূত বৈশিষ্ট্য তার স্বভাবের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু নিজের সর্বোত্তম চরিত্র অনুযায়ী আদর্শ রাষ্ট্রের পরিবেশ লাভে সক্ষম হলে দর্শন যে যথার্থই ঐশ্বরিক এবং অপর যা-কিছু চরিত্র বা সংগঠন সব যে কেবলমাত্র সাধারণ মানবিক, সে সত্য সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমি বুঝতে পারছি, এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি হয়তো আমাকে এর পরে জিজ্ঞেস করবে সেই আদর্শ রাষ্ট্রটি কীরূপ?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ না সক্রেটিস, তোমার সে-ধারণা ভুল। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, আমরা যে-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করছি, কিংবা বলো যে-রাষ্ট্রকে আমরা আবিষ্কার করছি, তোমার আদর্শ রাষ্ট্র কি সেই রাষ্ট্র? না অপর কোনো রাষ্ট্রের কথা তুমি বলতে চাচ্ছ?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, প্রায় সর্বক্ষেত্রে তা-ই। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমরা বলেছিলাম, আমাদের এ-রাষ্ট্রের এমন একটি লোকের আবশ্যক হবে যে বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা যে-ধারণা পোষণ করি সেরূপ ধারণাই সে পোষণ করে।

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছিলাম।

হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তখন সন্তোষজনকভাবে বলতে পারিনি। কারণ তুমি আপত্তি তুলে আমাদের ভীত করে তুললে। আলোচনা দীর্ঘ এবং কঠিন হবে বলেই তখন আমাদের ধরণা হল। কিন্তু সে আলোচনার যা অবশিষ্ট রয়েছে তাও কঠিন বই সহজ নয়।

অধ্যায় ঃ ১৭
[৪৯৭—৫০২]

'দার্শনিক শাসক' কেবল কল্পনা নয়

কিন্তু বাস্তবজীবনে দার্শনিক যদি অপদার্থ বলে পরিচিত হয় এবং দর্শনের শিক্ষা যদি অযোগ্য শিক্ষকের হাতেই ন্যস্ত থাকে তা হলে বাস্তব রাষ্ট্রে 'দার্শনিক-শাসক' কি একেবারে দুষ্প্রাপ্য থেকে যাবে? দার্শনিক-শাসক কি কেবলই কল্পনা? প্লেটো শুধুমাত্র কল্পনা বিলাসী? প্লেটো কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। তাঁর রাষ্ট্রীয় দর্শন যতই কাল্পনিক বলে বোধ হোক-না কেন, আসলে এ কেবল বাস্তব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমালোচনা নয়। এ-দর্শনকে প্লেটো বাস্তব রাষ্ট্রীয় জীবনে নিজের সাধ্যমতো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। এথেন্স তাঁর দর্শনপ্রয়োগের উপযুক্ত নগরী ছিল না বটে, কিন্তু প্লেটোর সমসাময়িককালে এথেন্সই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র ছিল না। এথেন্স অবশ্য সেকালের জ্ঞানালোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল। ক্রিট, কার্থেজ, সাইরাক্যুজ—বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে শিক্ষার্থী এবং রাজনীতিজ্ঞ এথেন্স আসত জ্ঞান অর্জনের জন্য। এবং জ্ঞানচর্চা-শেষে তারা ফিরে যেত নিজ নিজ রাষ্ট্রে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য। প্লেটো তাঁর একাডেমিকে তেমনি জ্ঞানদানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে এথেন্সের শাসনব্যবস্থাকে তাঁর আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করতে সক্ষম না হলেও তাঁর আশা ছিল, তাঁর একাডেমির জ্ঞানচর্চা মানুষের চরিত্র-পরিবর্তনে কার্যকর প্রভাব বিস্তার করবে। কেবল একাডেমির শিক্ষাদানেই প্লেটো নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, সাইরাক্যুজের শাসকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে প্লেটো প্রত্যক্ষভাবে চেষ্টা করেছিলেন সাইরাক্যুজের শাসককে 'দার্শনিকে' পরিবর্তিত করতে (৩৮৮ খ্রিঃ পূঃ)। সে-চেষ্টার বাস্তব ব্যর্থতা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে প্লেটোর বিশ্বাস যে, সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় জীবনেও তাঁর পরিকল্পনা প্রয়োগ করা সম্ভব। তাই 'দার্শনিকের শাসক হওয়ার' অবাস্তবতার অভিযোগের জবাবে সক্রেটিস বলছেন ঃ দার্শনিককে বাঁচিয়ে রাখা যে সহজ নয়, তা আমরাও অস্বীকার করিনে। কিন্তু

কোনোকালেই এদের মধ্যে একটি ব্যক্তির পক্ষেও কলুষমুক্ত থাকা সম্ভব হবে না—এমন কথা কে বলতে পারে!

না, তা কেউ বলতে পারে না।

আমি বললাম ঃ বেশ। একটি বেঁচে থাকলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একজন দার্শনিক-শাসকেরও যদি এমন একটি নগর থাকে, যে-নগর তার ইচ্ছার বাধ্য, তা হলে যে-আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ পৃথিবী এত অবিশ্বাসী সে-আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে [৫০২]।

আলোচনার কী অবশিষ্ট রয়েছে, সক্রেটিস?

প্রশ্ন হচ্ছে ঃ রাষ্ট্র নিজের ধ্বংসের কারণ না হয়ে দর্শনচর্চাকে কেমন করে সংগঠিত করতে পারে, তা নির্ধারণ করা। কাজটি অবশ্যই কঠিন। কারণ সমস্ত বৃহৎ কাজই কঠিন। প্রবাদের কথাই সত্য, যা মূল্যবান তা কখনো সহজ নয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তবু প্রশ্নটির মীমাংসা আবশ্যক। তা হলেই আমাদের আলোচনাটি সম্পূর্ণ হবে।

আমি বললাম ঃ আমার শক্তিতে কুলালে আলোচনার জন্য আমার ইচ্ছার অভাব হবে না। আলোচনায় আমার উৎসাহ তুমি এখনই দেখতে পাবে। সে যাক, তুমি খেয়াল করো এ্যাডিম্যান্টাস। আমি সাহস করে একথাই বলতে চাই যে, দর্শনচর্চার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি বর্তমানের চেয়ে ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক।

কী প্রকারে সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ বর্তমানে দর্শনের যারা ছাত্র তারা বয়সে খুবই তরুণ। শৈশব পার না হতেই তারা সংসারের আর্থিক এবং অপর কাজে ব্যয়িত সময় থেকে রক্ষিত সময়টুকু দর্শনচর্চার ন্যায় জ্ঞানচর্চায় ব্যবহার করে। এবং এদের মধ্যে যারা দর্শনভাবাপন্ন বলে প্রশংসিত হয় তারাও যখন এর কঠিন স্থানটি অর্থাৎ দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বে আসে তখন আর টিকে থাকে না। দর্শনচর্চা ছেড়ে দেয়। পরবর্তী জীবনে কোনো দর্শন আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়ে এরা দুএকটি বক্তৃতা শ্রবণ করে এবং একেই বাহাদুরির সঙ্গে প্রচার করে। কারণ দর্শনকে এরা নিজেদের জীবনের কোনো গুরুতর বিষয় বলে মনে করে না। পরিশেষে বৃদ্ধ হয়ে

তারা হিরাক্লিটাসের সূর্যের ন্যায়[১] চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়। কারণ দ্বিতীয়বার তাদের উদয় ঘটে না।

তা হলে তাদের অধ্যয়ন পদ্ধতি কী হওয়া সঙ্গত?

এর বিপরীতটিই হওয়া সঙ্গত। শৈশবে এবং কৈশোরে যে-দর্শন তারা শিক্ষালাভ করবে, সে-দর্শন তাদের কাঁচা বয়সের উপযোগী হতে হবে। এটি শিশুদের বৃদ্ধির বয়স। তারা বৃদ্ধি পেয়ে বয়স্ক মানুষে পরিণত হবে। এ-বয়সে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে তাদের দেহের গঠনের প্রতি, যেন পরবর্তীকালে দর্শনের সেবায় তাদের শরীরকে তারা নিয়োজিত করতে পারে। তাই বয়স যত তাদের বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং বুদ্ধি তাদের পরিপক্ক হতে থাকবে তত আত্মার চর্চা তাদের অধ্যয়নের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে। পরে যখন তারা বৃদ্ধ হবে, বেসামরিক এবং সামরিক দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের সময় যখন এসে যাবে, যখন তারা শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে তখন আর তাদের জন্য কোনো গুরুভার পরিশ্রমের কাজ আমরা নির্দিষ্ট করব না। তারা এবার শান্তিতে জীবন কাটাক এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনে অনুরূপ শান্তির কল্পনা করুক।

তুমি বেশ সাহসের সঙ্গে কথাটি বলেছ, সক্রেটিস। তোমার এ-অভিমত সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তবু আমার ধারণা তোমার শ্রোতাদের অধিকাংশই, অধিকতর সাহসের সঙ্গে তোমার বিরোধিতা করবে। তারা, এবং বিশেষ করে থ্র্যাসিমেকাস, তোমার এ-অভিমতে আস্থা স্থাপন করবে না।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি থ্র্যাসিমেকাসের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধিয়ে দিও না। খুবই সম্প্রতি আমরা একটা মিটমাট করেছি এবং সুহৃদে পরিণত হয়েছি। অবশ্য আমি বলব না আমরা কখনো শত্রু ছিলাম। আমার চেষ্টাটি আমি শক্তিমতো চালিয়ে যাব যতক্ষণ-না আমি তাদের মনে প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারি কিংবা এমন কিছু তাদের জন্য করতে পারি যা তাদের পরবর্তী জীবনে, তাদের অস্তিত্বের অপর কোনো পর্যায়ে, এরূপ আলোচনায় তাদের সাহায্য করতে পারবে।

---

১. হিরাক্লিটাস বলতেন কোনোদিনই পুরনো সূর্যের উদয় ঘটে না। প্রতি সন্ধ্যায় দিনের সূর্য নিভে যায়। প্রতি সকালে নূতন সূর্যের দীপকে জালানো হয়। কথাটির দার্শনিক তাৎপর্য আছে। হিরাক্লিটাস মনে করতেন নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বজগতের মূল সত্য। একটি নদীতে কেউ দ্বিতীয়বার নামতে পারে না। কারণ প্রতি মুহূর্তের নদীই নূতন নদী—একথাও হিরাক্লিটাসের। হিরাক্লিটাস প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁর জীবনকাল ছিল ঃ খ্রিঃ পূর্ব ৫৩৫ থেকে ৪৭৫।

তাদের অস্তিত্বের সে-পর্যায়টি আসতে বেশ বিলম্ব আছে, সক্রেটিস।

সত্য, এ্যাডিম্যান্টাস। কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় সে বিলম্বের দৈর্ঘ্য কতটুকু? তা হলেও এটা আমার জন্য বিস্ময়ের ব্যাপার কিছু নয় যে, তারা আমাকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করছে। কারণ যার সম্পর্কে আমরা বর্তমানে আলোচনা করছি তাকে বাস্তবায়িত হতে তারা কখনো দেখেনি। তারা শব্দের কৃত্রিম যোজনার ভিত্তিতে দর্শনের প্রচলিত অনুকরণকেই মাত্র দেখেছে[১]—তারা আমাদের আলোচিত বিষয় অর্থাৎ শব্দের যথার্থ ঐক্যকে প্রত্যক্ষ করেনি। কিংবা তারা তেমন মানুষকে দেখেনি, যে আমাদের আদর্শ অনুসরণ করে জীবনযাপন করেছে এবং যার কথায় ও কাজে পূর্ণ সঙ্গতি ঘটেছে। এরূপ সঙ্গতিময় মানুষ তারই মতো সঙ্গতিপূর্ণ একটি নগরকে শাসন করছে—এ-দৃশ্য তাদের কেউ কখনো দেখেনি। তুমি কী বল এ্যাডিম্যান্টাস?

না, এ-দৃশ্য তারা কখনো দেখেনি।

না, এরূপ তারা দেখেনি। এবং মুক্ত এবং মহৎ চিন্তার আলোচনা—যে-আলোচনার উৎস জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা এবং সত্য আবিষ্কার, যে-আলোচনায় মানুষের সকল ইন্দ্রিয়কে কেন্দ্রীভূত হতে হয়, সে-আলোচনাও তারা খুব কমই শুনেছে। যে-আলোচনার সঙ্গে আদালত কিংবা বক্তৃতামঞ্চের বক্তৃতার কলাকৌশলের কোনো সম্পর্ক নেই সে-আলোচনাও তারা খুব কমই শ্রবণ করেছে। তাদের পরিচয় আদালত এবং জনসম্মেলনের বক্তৃতার সঙ্গে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কূটকৌশলে জনমতকে প্রভাবান্বিত করা এবং নিজের পক্ষকে জয়যুক্ত করা।

তোমার একথা সত্য, সক্রেটিস।

এ-সমস্ত কারণের জন্য এবং এই পরিস্থিতি স্মরণ রেখে, ভীত হলেও সততার স্বার্থে আমাকে বলতে হয়েছে যে, যাদের আমরা সংখ্যালঘু বলছি কলুষতামুক্ত সেই কতিপয় দার্শনিক, যাদের এখন অপদার্থ বলা হচ্ছে, তারা যতক্ষণ শাসন করতে বাধ্য না হবে, যতক্ষণ তারা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ না করবে, এবং সমাজকে তাদের কথা শুনতে বাধ্য না করবে কিংবা যতক্ষণ বিধাতা আমাদের বর্তমান শাসকদের মনে কিংবা তাদের সন্তানদের মনে যথার্থ দর্শনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ সকল ত্রুটিশূন্য সর্বোত্তম রাষ্ট্র কিংবা সমাজ বা ব্যক্তি কখনো জগতে বাস্তব রূপ লাভ করতে পারবে না। এ

১. এ-সমালোচনার লক্ষ্য আইসোক্রাটিসের একাডেমিতে অনুসৃত শিক্ষাপদ্ধতি হতে পারে। আইসোক্রাটিস (৪৩৬—৩৩৮ খ্রিঃ পূঃ) প্লেটোর সমকালীন প্রখ্যাত শিক্ষক।

কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এদের কোনোটাই সম্ভব হবে না। তাদের কোনোটিই যদি সম্ভব না হয় তা হলে অবশ্য দিবাস্বপ্নের জন্য পরিহাস এবং বিদ্রূপই আমাদের যুক্তিসঙ্গত প্রাপ্য হবে। তুমি কী বল?

হ্যাঁ, তা-ই আমাদের প্রাপ্য হবে।

আমরা বরঞ্চ বলব যে, সেই অনন্ত অতীতে কিংবা ভবিষ্যতে কিংবা বর্তমানে কোথাও, হোক না সে আমাদের পরিচিত দিগন্তের বাইরে অপর কোনো দেশে, যথার্থ দার্শনিক যদি রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে থাকে তা হলে যে-রাষ্ট্রের বর্ণনা আমরা করেছি সে-রাষ্ট্র অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়েছে কিংবা সে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তখন দর্শনই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়াবে। এর মধ্যে কোনো অসম্ভবতা নেই। যা আমরা বলেছি তা অবশ্যই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

আমি তোমার সাথে একমত, সক্রেটিস।

হ্যাঁ, কিন্তু মনে কোরো না যে জনতা আমাদের সঙ্গে একমত হবে?

সম্ভবত তারা আমাদের সঙ্গে একমত হবে না।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, জনতার বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করা আমাদের সঙ্গত নয়। কেননা জনতার উপর জবরদস্তি না করে, তাদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করলে তারা সহজেই তাদের মত পরিবর্তন করে। তুমি যদি তাদের বুঝিয়ে বল যে, দার্শনিক বলতে তারা যা বুঝেছিল তা ঠিক নয়, তুমি যদি দার্শনিকদের চরিত্র এবং আচরণকে একটু পূর্বে যেরূপ ব্যাখ্যা করেছ অনুরূপভাবে জনতার নিকট ব্যাখ্যা কর তা হলে জনতা দার্শনিক সম্পর্কে তাদের মত পরিবর্তন করবে। অথবা তুমি কি মনে কর, তুমি যদি অভদ্র আচরণ না কর তা হলে নম্রস্বভাবের লোকও তোমার প্রতি অভদ্র আচরণ করবে? আমি কিন্তু মনে করি না যে, অধিকসংখ্যক মানুষই এরূপ বিকৃতমনা। এই বিকার অধিকসংখ্যকের নয়; এরূপ বিকৃতি তুলনামূলকভাবে অল্পসংখ্যকেরই বৈশিষ্ট্য।

এক্ষেত্রেও আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

তা হলে এ-বিষয়েও নিশ্চয়ই তুমি একমত হবে যে, অধিকসংখ্যক মানুষের দর্শনের প্রতি এই যে বিরাগ এবং বিরূপ ধারণা তার মূল রয়েছে সেই উচ্ছৃঙ্খল অনধিকার-প্রবেশকারীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা এবং আদর্শ পরিত্যাগ করে ব্যক্তিকে সকল চিন্তার কেন্দ্রে পরিণত করার প্রবণতা। ঠিক নয় কি?

খুব ঠিক কথা।

কারণ, এ্যাডিম্যান্টাস, যে যথার্থ দার্শনিক তার মন সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচুস্তরে বিচরণ করে। সাধারণ মানুষের ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, কলহপূর্ণ জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার সময় দার্শনিকের থাকতে পারে না। দার্শনিকের দৃষ্টি শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সত্যের প্রতি নিবদ্ধ। তার লক্ষ্যের সেই রাজ্যে অন্যায়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। সে-রাজ্যের সবকিছু যুক্তি এবং সঙ্গতির সূত্রে বাঁধা। আর এই যুক্তি এবং সঙ্গতির আদর্শ হচ্ছে দার্শনিকের আরাধ্য। একেই সে নিজের চরিত্রে বাস্তবায়িত করে তোলে। কারণ, যে-মানুষ যাকে ভালোবাসে তার অনুকরণে কোনোকিছুই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এ-কাজে কেউ কি তাকে বাধা দিতে পারে?

না, এরূপ বাধাদান অসম্ভব।

আর ঐশ্বরিক সেই সঙ্গতির একাত্মতায় দার্শনিক নিজেও সঙ্গতি এবং শৃঙ্খলার আকর হয়ে ওঠে। নানা আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও একজন মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব, আমাদের দার্শনিক ততখানি ঐশ্বরিক চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে উঠবে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

এখন তার উপর যদি দায়িত্ব পড়ে, শুধু নিজের চরিত্র গড়ার নয়, রাষ্ট্র এবং মানুষের চরিত্র পরিবর্তন করার, তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি কি মনে কর সে ন্যায়, সংযম এবং অপর সব গুণের অদক্ষ কারিগর বলে প্রমাণিত হবে?

না, সে অদক্ষ কেন হবে?

আর পৃথিবীর মানুষ যখন দেখবে, দার্শনিক সম্পর্কে আমরা যা বলছি তা যথার্থ, তখন কি জনতা দর্শনের উপর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠবে? আমরা যদি তাদের বলি, যে নগরের নকশা ঐশ্বরিক পরিকল্পনার জ্ঞানে জ্ঞানী শিল্পী অঙ্কন করে না, সে-নগরী কখনো সুখী হতে পারে না, তা হলে কি তারা আমাদের অবিশ্বাস করবে? কিংবা আমাদের উপর ক্রোধান্বিত হবে?

না, তারা বুঝতে পারলে আমাদের উপর অবশ্যই ক্রোধান্বিত হবে না। কিন্তু রাষ্ট্রের যে-রূপরেখার কথা তুমি বলছ, তা কেমন করে তারা অঙ্কিত করবে?

আমি বলব তাদের করণীয় হবে রাষ্ট্র এবং তার মানুষকে ধুয়েমুছে তাকে নিষ্কলঙ্ক বা নি-দাগ এক-একটি প্লেটে পরিণত করা। কাজটি অবশ্যই সহজ নয়। কিন্তু কঠিন কিংবা সহজ যা-ই হোক, তাদের সঙ্গে অন্য বিধানকারীর এই

হবে পার্থক্য। আমাদের রাষ্ট্রের দার্শনিক শিল্পীরা যতক্ষণ তাদের ছবি আঁকার পটকে পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক করতে না পারছে ততক্ষণ ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্র কারোর জন্যই তারা কিছু করবে না কিংবা কোনো বিধানও তারা প্রণয়ন করতে সম্মত হবে না।

এক্ষেত্রে তাদের সিদ্ধান্ত সঠিক।

এই কাজ সম্পন্ন হলে তারা রাষ্ট্রের সংবিধান বা সংগঠনের রূপরেখাটি তৈরি করবে।

হ্যাঁ, এবার তা-ই তাদের করণীয়।

আর এই কাজটি যখন তারা সম্পূর্ণ করতে থাকবে তখন তাদের দৃষ্টিকে নিয়ত উর্ধ্বে এবং নিম্নে চালনা করতে হবে। অর্থাৎ এ-কাজের জন্য যেমন প্রথমে তাদের পরম ন্যায়, সুন্দর এবং সংযমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, তেমনি আবার এই পরম সত্তার সঙ্গে তাদের মানবিক প্রতিরূপকে তুলনা করতে হবে। বিভিন্ন উপাদান তাদের গ্রহণ করতে হবে। সকল উপাদানকে সঙ্গতির সূত্রে মিশ্রিত করে তারা পরম ন্যায়ের মূর্ত রূপের আদর্শে এমন মানুষ তৈরি করবে যাকে আমরা হোমারের ভাষায় বলতে পারব ঃ 'এ হচ্ছে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি।'

তোমার কথাটি খুবই ঠিক।

তাদের এই শিল্পকর্মে কখনো তারা একটি বৈশিষ্ট্যকে মুছে অপর একটি বৈশিষ্ট্যকে স্থাপন করবে। যতক্ষণ তাদের সাধ্যমতো তাকে ঈশ্বরের সকল বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট করে তুলতে তারা সক্ষম না হচ্ছে ততক্ষণ এই প্রচেষ্টায় তারা নিরত থাকবে, ঠিক নয় কি।

অবশ্যই ঠিক। অপর কোনো উপায়ে তাদের পক্ষে সুন্দরের কোনো ছবি অঙ্কন করা সম্ভব হবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার কী মনে হয়? এবার কি সেই বিক্ষুব্ধ প্রতিপক্ষ একটু শান্ত মূর্তি ধারণ করবে? আমাদের প্রশংসিত শিল্পীর হাতে রাষ্ট্রের সংবিধানের ছবি-অঙ্কনের দায়িত্ব অর্পণ করায় তারা ক্রোধান্বিত হয়েছিল। শিল্পীর এই সুসম্পন্ন কর্ম দেখে এবার কি একটু শান্ত ভাব তারা ধারণ করবে?

হ্যাঁ সক্রেটিস, তাদের মধ্যে কোনো জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তারা অনেকটা শান্ত হয়ে আসবে।

'অনেকটা' কেন? তাদের কি এখনও আপত্তির কোনো কারণ আছে বলে তুমি মনে কর? দার্শনিক জ্ঞান এবং সত্যের প্রেমিক, এ-বিষয়ে কি তারা এখনও সন্দেহ পোষণ করবে?

না, তারা এতটা যুক্তিহীন হবে, এরূপ আমি মনে করিনে।

আমরা কি বরঞ্চ বলতে পারিনে যে, আমরা যেরূপ বর্ণনা করেছি তাতে দার্শনিকের চরিত্র পরম উত্তমেরই সদৃশ হবে?

এ-বিষয়েও তারা আর সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

কিংবা তারা একথাও কি অস্বীকার করতে পারবে, উপযুক্ত পরিবেশে এই দার্শনিক সর্বোত্তম দার্শনিকে পরিণত হবে? এর বদলে যাদের আমরা নাকচ করেছি তাদেরকেই কি তারা অধিক পছন্দ করবে?

না, তা হতে পারে না।

তা হলে আমরা যদি আবার বলি : দার্শনিকরা যতক্ষণ শাসক না হবে ততক্ষণ রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি কারোরই অমঙ্গল থেকে মুক্তি নেই কিংবা আমাদের কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রেরও বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তবে আমাদের প্রতিপক্ষ কি এখনও আমাদের প্রতি বিরাগ পোষণ করব?

না, আমার তো মনে হয় তাদের বিরাগ অনেকটা প্রশমিত হবে।

বরঞ্চ, আমরা কি বলতে পারিনে, তাদের বিরাগ কেবল যে অনেকটা প্রশমিত হবে তা-ই নয়, তারা বেশ পরিমাণে সুজন হয়ে উঠবে? আমরা বলব, তাদের আস্থা সৃষ্টিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। এবার অপর কোনো কারণ না থাকলে কেবল লজ্জার কারণে তারা আমাদের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারে না। তুমি কী বল?

অবশ্যই।

ঠিক আছে। ধরা যাক, আমাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপিত হয়ে গেছে। এবার আমাদের অন্য কথাটিতে আসা যাক। রাজকুমার অর্থাৎ শাসকের সন্তানরাও যে স্বভাবগতভাবে দার্শনিক হতে পারে—একথাটিতে কি কারোর আপত্তি হতে পারে?

না, কারোরই এতে আপত্তি হতে পারে না।

আমরা ধরে নিলাম, এই দার্শনিক-শাসকরা জন্মগ্রহণ করেছে। তারা অস্তিত্বময় হয়েছে। এবার কি কেউ বলবে, এদের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়?

অনিবার্যভাবে এরা কলুষিত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে? তাদের বাঁচিয়ে রাখা যে সহজ নয়, তা আমরাও অস্বীকার করিনে। কিন্তু কোনোকালেই এদের মধ্যে কোনো একটি ব্যক্তির পক্ষেও কলুষমুক্ত থাকা সম্ভব হবে না—এমন কথা কে বলতে পারে?

না, তা কেউ বলতে পারে না।

আমি বললাম ঃ বেশ! একটি বেঁচে থাকলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। একজন দার্শনিক-শাসকেরও যদি এমন একটি নগর থাকে যে-নগর তার ইচ্ছার বাধ্য, তা হলে যে-আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণ পৃথিবী এত অবিশ্বাসী সে-আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

হ্যাঁ সক্রেটিস, এরূপ একটি লোকই যথেষ্ট।

আমরা যে-সমস্ত বিধান এবং সংগঠনের কথা আলোচনা করেছি আমাদের এই শাসক তাদের প্রবর্তন করবে। নাগরিকগণ এই সমস্ত বিধানকে স্বেচ্ছায় মেনে চলবে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই, সক্রেটিস।

আর আমরা যা বলছি তাতে অপরের সম্মত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু কি আছে?

আমার তো মনে হয়, না। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

যাহোক, আমরা উপযুক্তভাবেই দেখিয়েছি যে, আমাদের পরিকল্পনা যদি বাস্তবায়িত হয়, তা হলে সে অবশ্যই সর্বোত্তম হবে।

হ্যাঁ, আমরা উপযুক্তভাবেই দেখিয়েছি।

আমরা তা হলে বলব, যেসব বিধানের কথা আমরা বলেছি তাদের যদি প্রবর্তন করা যায় তা হলে তারা যে কেবল সর্বোত্তম হবে তা-ই নয়, তাদের প্রবর্তন কঠিন হলেও অসম্ভব হবে না।

উত্তম কথা।

তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, বহু কষ্ট এবং শ্রমের মধ্য দিয়ে একটি বিষয়ের উপান্তে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু আলোচনার বিষয় আরও রয়েছে ঃ আমাদের রাষ্ট্রের এই যে পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা—কোন্ অধ্যয়ন এবং পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের আমরা গঠিত করে তুলব? তাদের কোন্ বয়সের অধ্যয়নের বিষয় কী হবে?

হ্যাঁ, এ-প্রশ্ন তো রয়েছেই।

অধ্যায় ঃ ১৮
[৫০৩—৫১১]

দার্শনিক-শাসকের শিক্ষা

'দার্শনিক-শাসক' যদি অবাস্তব কল্পনা না হয় তা হলে বাস্তব ক্ষেত্রে দার্শনিকের শাসক হতে হলে তাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হতে হবে। অপর যে-কেউ ক্ষমতা দখল করে শাসক হতে পারে। কিন্তু দার্শনিকের সর্বোত্তম জ্ঞান অর্জন না করে শাসক হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কাজেই যখন ধরে নেওয়া হয়েছে, বাস্তবে দার্শনিক শাসক হতে পারে তখন তার জ্ঞান তথা শিক্ষার প্রশ্নটি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। দার্শনিক-শাসকের শিক্ষা অবশ্যই ভিন্ন ধরনের অর্থাৎ উচ্চতর ধরনের হতে হবে। আঠার বছর পর্যন্ত নাগরিক-মাত্রের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। সে-শিক্ষার জোর ছিল শরীর চর্চা এবং সঙ্গীতের উপর। দার্শনিক-শাসককে বাছাই করতে হলে এবার উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। আঠারো থেকে কুড়ি বছর—অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার পরে আরও দুবছর তার শরীরচর্চা চলতে পারে। কিন্তু বিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত তার চলবে উচ্চতর দর্শনের চর্চা। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে জানতে হবে পরম উত্তম কাকে বলে, পরম সত্য কী, ধারণা এবং জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী, বহু এবং এক-এর মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি কী, ভাব কী এবং মূল এবং প্রতিরূপের সম্পর্ক কি?

আমি প্রথমে স্ত্রীদের স্বামিত্ব, সন্তানপ্রজনন, শাসকদের নিযুক্তি ইত্যাদি প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রকে ঈর্ষার চোখে দেখা হবে। আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের সমস্যার দিকটিও আমার স্মরণে ছিল। তাই আমি তাদের আলোচনা এড়াতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার সে-চাতুর্য কোনো কাজে আসেনি। কারণ, সেসব প্রশ্ন আমাকে আলোচনা করতে হয়েছে।

যাক, মেয়েদের এবং সন্তানদের সমস্যা শেষ হয়েছে। কিন্তু অপর প্রশ্ন হচ্ছে শাসকদের। এ-প্রশ্নকে গোড়া থেকেই আমাদের আলোচনা করতে হবে। এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমরা বলেছিলাম, শাসকদের দেশপ্রেমিক হতে হবে। আনন্দ কিংবা বেদনায়, কষ্টে কিংবা বিপদে কিংবা অপর যে-কোনো সংকটে তাদের দেশপ্রেমকে তারা হারাতে পারবে না। এই পরীক্ষায় তাদের সফল হতে হবে। যে ব্যর্থ হবে তাকে নাকচ করা হবে। কিন্তু নিষ্কলুষ স্বর্ণের মতো, যে অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসবে তাকে আমরা শাসক করব। সে মৃত্যুর এপারে এবং ওপারে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত হবে। এ-পর্যন্ত আমাদের আলোচনা ভালোই চলছিল। কিন্তু এর পরেই আলোচনায় সংকট ঘটেছে। যে-প্রশ্ন এখন উঠে আসছে তাকে এতক্ষণ আমরা স্বীকার করতে চাইনি।

হ্যাঁ, আলোচনার ধারাটি আমার স্মরণ আছে।

হ্যাঁ, আর তখন কথাটি আমি সাহস করে বলতে পারিনি। কিন্তু এখন আমাকে সাহস করে বলতে হয় ঃ উত্তম শাসককে অবশ্যই দার্শনিক হতে হবে।

হ্যাঁ, সে কথাটি এবার বলা অবশ্যক।

কিন্তু তাদের সংখ্যা কি অধিক হবে? তেমন মনে কোরো না। কারণ এজন্য যে সকল গুণকে আমরা অপরিহার্য মনে করেছি তাদের সম্মিলন কদাচিত ঘটে। তাদের একত্র পাওয়ার চেয়ে বিচ্ছিন্নভাবেই অধিক পাওয়া যায়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বললাম ঃ তুমি নিশ্চয়ই জান এ্যাডিম্যান্টাস, তীক্ষ্নবুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি, বিচক্ষণতা, প্রাখর্য—এইসব এবং অনুরূপ অন্য গুণ একখানে মেলা ভার। কিন্তু যদি কারও এই সকল গুণ থাকে এবং একই সঙ্গে সে যদি তেজি এবং অকৃপণ হয় তা হলে সে-চরিত্র খুব স্থিরতা, শান্তি এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না। তারা সর্বক্ষণ তাদের প্রবণতা দিয়ে তাড়িত হয় এবং তাদের উত্তমনীতি সব বিনষ্ট হতে থাকে।

তোমার কথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

অপরদিকে, যারা স্থির, বিশ্বাসী এবং নির্ভরযোগ্য তারা যেমন বুদ্ধি কিংবা বিপদে ভীত হয় না, তেমনি কোনোকিছু শেখার প্রতিও তাদের কোনো আগ্রহ থাকে না। এ ক্ষেত্রেও তারা যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায়ই অনড় এবং অভেদ্য। তারা সব সময়েই জড়ের অবস্থায় বাস করে। মানসিক কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হলে তারা হাই তুলতে থাকে এবং অচিরে নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ে।

যথার্থ বলেছ।

তবু আমরা বলেছি, যাদের উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে, যাদের সরকার-পরিচালনার কিংবা সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্বদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে তাদের মধ্যে এই উভয় প্রকার গুণের অস্তিত্বই আবশ্যক।

অবশ্যই।

কিন্তু এমন শ্রেণীর লোক কি দুর্লভ হবে না?

অবশ্যই দুর্লভ হবে।

তা হলে এই দয়িত্বের যে আকাঙ্ক্ষী তাকে কেবল যে আনন্দ, কষ্ট, ভয়, বিপদ—এই সব পরীক্ষায়ই পরীক্ষিত হতে হবে, তা-ই নয়, তাকে ভিন্নতর পরীক্ষাতেও কৃতকার্য হতে হবে। এ-বিষয় আমরা পূর্বে উল্লেখ করিনি। তাকে বহুবিধ জ্ঞানের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হতে হবে। চরম জ্ঞানলাভে সে সক্ষম কি না কিংবা অপরে যেমন কঠিন দৈহিক শ্রমে চেতনা হারিয়ে ফেলে তেমনি চরম জ্ঞানের চাপে তার আত্মা সংবিৎ হারিয়ে ফেলবে অথবা দৃঢ় থাকতে সক্ষম হবে সে-পরীক্ষারও প্রয়োজন হবে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস। শাসককে পরীক্ষিত হতে হবে। কিন্তু 'চরম জ্ঞান' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?

তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, এ্যাডিম্যান্টাস, আত্মাকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করেছিলাম এবং তার পরে পৃথকভাবে আমরা ন্যায়, সংযম, সাহস এবং জ্ঞানের চরিত্র নির্ধারণ করেছিলাম।

হ্যাঁ, এ কথা আমার মনে আছে। কারণ, একথা ভুলে গেলে এ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করারই আমার কোনো অধিকার থাকে না।

কিন্তু সে-আলোচনার পূর্বে আমি যে সাবধানবাণীটি উচ্চারণ করেছিলাম সেটি কি তোমার স্মরণ আছে?

তুমি কিসের উল্লেখ করছ, সক্রেটিস?

আমার নিজেরও যদি সঠিক স্মরণ থাকে তা হলে আমি বলব আমরা বলেছিলাম, যে এই গুণকে তাদের পরম সত্তায় প্রত্যক্ষ করতে চায় তাকে দীর্ঘতর এবং জটিলতর পথ অতিক্রম করতে হবে। এই দীর্ঘ এবং জটিল পথের শেষে আমরা এইসব গুণের সম্যক পরিচয় লাভ করতে পারব। অবশ্য একটি সাধারণ পরিচয়ও এদের দেওয়া হয়। কিন্তু সেটি হবে অসম্পূর্ণ। এ-প্রস্তাবে তুমি তখন বলেছিলে, এরূপ ব্যাখ্যাতেই তোমার চলবে। আর সে-কারণেই আমি এই

গুণগুলির একটি আলোচনা তোমাদের কাছে উপস্থিত করেছিলাম। কিন্তু সে-আলোচনার অসম্পূর্ণতার দিকটি আমি ভুলিনি। এখন তুমি বলতে পার, সে-আলোচনায় তুমি সন্তুষ্ট হতে পেরছিলে কি না?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন : হ্যাঁ সক্রেটিস, আমিও যেমন, তেমনি আমার অপর সঙ্গীরাও মনে করেছেন, সে-আলোচনায় সত্যের বেশ পরিমাণ পরিচয়ই তুমি আমাদের দিয়েছিলে।

আমি বললাম : কিন্তু প্রিয় বন্ধু, এসব বিষয়ে বেশ পরিমাণও সমগ্র সত্যের চেয়ে কম। এবং যে-আলোচনা আমাদের নিকট সমগ্র সত্যকে প্রকাশ করে না, সে আলোচনাকে আমরা যথেষ্ট বলতে পারিনে। সাধারণ মানুষ অবশ্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে অল্পতেই তুষ্ট। তারা মনে করে, অধিক অনুসন্ধানের আর আবশ্যকতা নেই। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো অসম্পূর্ণতাই সম্পূর্ণতার পরিমাপক হতে পারে না।

সাধারণ মানুষ পরিশ্রমে বিমুখ। কাজেই তাদের পক্ষে এরূপ ভাবা স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। কিন্তু রাষ্ট্র এবং বিধানের যে অভিভাবক তার চরিত্রে এর চেয়ে ক্ষতিকর কোনো ত্রুটি আর হতে পারে না।

খুবই ঠিক কথা।

তা হলে যে অভিভাবক, যে শাসক, তাকে সত্যের দীর্ঘতর পথই গ্রহণ করতে হবে। তাকে বুদ্ধির বিকাশ এবং শরীরের চর্চা—উভয়ক্ষেত্রে পরিশ্রম করতে হবে। অন্যথায় যে চরম জ্ঞানে তাকে অবশ্যই পৌঁছতে হবে সে-চরম জ্ঞান কখনো সে লাভ করতে পারবে না।

কিন্তু ন্যায় এবং অপর যে-গুণের আমরা আলোচনা করেছি তার চেয়ে উচ্চতর জ্ঞান কি কিছু হতে পারে?

হ্যাঁ, তার চেয়ে উচ্চতর জ্ঞান হতে পারে। কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে কোনো গুণের কেবল আভাস পেলে আমাদের চলবে না। তার সত্তার পরিপূর্ণ ছবিই আমাদের তৈরি করতে হবে। কত ক্ষুদ্র বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ তৈরির পেছনে অসীম পরিশ্রম এবং কষ্ট আমরা ব্যয়িত হতে দেখি। এমনি পরিশ্রমে তাদের অস্তিত্ব পরিপূর্ণ সৌন্দর্য এবং স্পষ্টতায় প্রকাশিত হয়। গুরুত্বহীন বিষয়ের ক্ষেত্রে যদি এরূপ হতে পারে তা হলে পরম সত্যকে চরম নির্ভুলতায় প্রকাশ করার চেষ্টায় আমাদের কার্পণ্য কি হাস্যকর নয়?

অবশ্যই হাস্যকর। কিন্তু তা হলেও তুমি কি মনে কর যে, এই চরম জ্ঞানের বিষয়ে আমরা তোমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকব?

না, আমি তা বলিনে। প্রশ্ন করতে চাও, তোমরা প্রশ্ন করো। কিন্তু প্রশ্নের জবাব আমি পূর্বেও বহুবার দিয়েছি। এখন দেখতে পাচ্ছি, হয় তোমরা তা বোঝনি কিংবা আমার মনে হচ্ছে তোমরা এখন একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে চাচ্ছ। কারণ, আমি বহুবার বলেছি যে, উত্তমের জ্ঞানই হচ্ছে চরম জ্ঞান। আমদের যা-কিছু প্রয়োজনীয় এবং উপকারী তা সবই এই জ্ঞানের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। তুমি নিশ্চয়ই জান, আমি এ বিষয়ের আলোচনাটিই শুরু করতে যাচ্ছিলাম। এটি তোমার না-জানার কথা নয়। আর এ কথাও আমি একাধিকবার বলেছি যে, এই বিষয়ে যেমন আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য তেমনি আবার এই জ্ঞান ব্যতিরেকে অপর কোনো জ্ঞানই আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। যা-ই আমাদের থাকুক-না-কেন, উত্তমকে যদি আমরা লাভ করতে না পারি তা হলে সবই কি নিরর্থক নয়? জ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরম সুন্দর এবং পরম উত্তমের জ্ঞান ব্যতীত সব জ্ঞানই নিরর্থক। নয় কি?

নিঃসন্দেহে, সক্রেটিস।

তা ছাড়া, এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি এ কথাও জান, অধিকসংখ্যক লোক আনন্দকেই উত্তম বিবেচনা করে। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা জ্ঞানকে উত্তম মনে করে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু আবার একথাও ঠিক, যারা জ্ঞানকে উত্তম বলে, তারা ব্যাখ্যা করে বলতে পারে না 'জ্ঞান' বলতে তারা কী বোঝাতে চায়। যুক্তির ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে কেবল বলে, উত্তমের জ্ঞানকে তারা বোঝাতে চায়।

এরূপ বলা নিশ্চয়ই হাস্যকর।

হ্যাঁ, হাস্যকরই বটে। কারণ তারা শুরু করে এই অভিযোগ নিয়ে যে, আমরা উত্তমের ব্যাপারে অজ্ঞ। কিন্তু তাদের যখন প্রশ্ন করা হয়, উত্তম কাকে বলে, তখন তারা জবাব দেয় ঃ উত্তম কাকে বলে তা তো তোমরা জানই। তারা উত্তমকে উত্তমের জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করে। তাদের ভাব, যেন তাদের পক্ষে 'উত্তম' কথাটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট, কেননা উত্তমকে আমরা জানি। এটা হাস্যকরই বটে।

তোমার একথা খুবই সত্য।

এবং 'আনন্দ'কে যারা উত্তম মনে করে তাদের অবস্থাও একইরূপ। তারাও এমনি বিভ্রমের মধ্যে বাস করে। কারণ যুক্তির ধারায় তারা এ কথা স্বীকারে বাধ্য হয় যে, আনন্দ কেবল এক প্রকার নয়। আনন্দের উত্তম আছে। আনন্দের অধমও আছে।

অবশ্যই।

কিন্তু আনন্দকে উত্তম বলার অর্থ—উত্তম এবং অধমের কোনো পার্থক্য নেই। দু'টিই এক।

হ্যাঁ, তা-ই দাঁড়ায়।

একটা বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রশ্নটির মধ্যে অনেক অসুবিধা আছে।

হ্যাঁ, সক্রেটিস, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তা ছাড়া একটি বিষয় তো আমরা জানি যে, অনেকে যথার্থরূপে ন্যায়বান কিংবা সম্মানীয় না হয়েও এরূপ গুণে গুণী বলে বাহ্যিকভাবে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু কেউ যথার্থ উত্তমকে বাদ দিয়ে কেবল উত্তম বলে যা বোধ হয় তাতে সন্তুষ্ট হতে পারে না। উত্তমের ক্ষেত্রে যথার্থ উত্তমেরই সবাই সন্ধান করে। উত্তমের অলীক রূপকে সকলে ঘৃণা করে। সত্য নয় কি?

খুবই সত্য।

তা হলে আত্মার সকল অনুসন্ধানের লক্ষ্য হচ্ছে 'উত্তম'। আমরা সকলে ধরে নিই যে, উত্তম আছে। উত্তম অস্তিত্বময়। সে-কারণেই আমরা তার অনুসন্ধান করি। কিন্তু আমরা কেউ জানিনে সে-উত্তম কী? তার রূপ কী? আমরা সে-উত্তমকে ধরতে কিংবা ছুঁতে পারিনে, যেমন আমরা জাগতিক অন্য সব বস্তুকে ধরতে পারি, ছুঁতে পারি। বস্তুর নিশ্চয়তা আমরা বোধ করি। কিন্তু বস্তুর ন্যায় উত্তমের নিশ্চয়তা আমরা বোধ করিনে। এ হচ্ছে সাধারণ মানুষের কথা। কিন্তু আমরা কি ভাবতে পারি আমাদের মধ্যে মহত্তম যে-নাগরিক, যাদের উপর আমরা ন্যস্ত করব রাষ্ট্রের সমস্ত দায়িত্ব, তারাও উত্তম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ন্যায় অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাস করবে?

কোনোক্রমেই আমরা এরূপ ভাবতে পারিনে।

মোটকথা, যে-লোক সুন্দর এবং ন্যায়ের উত্তমকে জানে না, যে জানে না কী কারণে সুন্দর এবং ন্যায়—উভয়ই উত্তম, সে নিশ্চয়ই সুন্দর এবং ন্যায়ের খুব উত্তম শাসক নয়। আর যে উত্তম সম্পর্কে অজ্ঞ তার পক্ষে সুন্দর এবং ন্যায়ের যথার্থ জ্ঞান অর্জনও সম্ভব নয়।

তোমার এ-সন্দেহ ভিত্তিহীন নয়।

কিন্তু এমন শাসক আমরা যদি পাই যার এ-জ্ঞান আছে তা হলে আমাদের রাষ্ট্র কি আদর্শ রাষ্ট্ররূপে গঠিত হবে না?

নিঃসন্দেহে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ তোমার নিজের কী মত সক্রেটিস? তুমি কি উত্তমকেই জ্ঞান বলবে? না জ্ঞান হচ্ছে আনন্দ? কিংবা তুমি বলতে চাও, জ্ঞান এদের উভয় থেকেই ভিন্নতর কিছু?

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললাম ঃ চমৎকার লোক তুমি এ্যাডিম্যান্টাস। আমি জানতাম তোমার মতো কঠিন 'ভদ্রলোক' অপরের কোনো কথায় সন্তুষ্ট হতে পারে না।

সত্য কথা, সক্রেটিস। কিন্তু আমি বলব, তোমার মতো লোক, যে তার সমস্ত জীবন দর্শনের অধ্যয়নে ব্যয় করেছে তার পক্ষে নিজের অভিমত প্রকাশ না করে অপরের মতামতকে বারংবার বলা শোভা পায় না।

ঠিক কথা। কিন্তু যে-লোক যে-বিষয় সম্পর্কে জানে না তার কি সে-বিষয়ে জোর করে কিছু বলা শোভনীয়?

না, জোর করে বলবে এমন কথা আমি বলছিনে। কিন্তু সে-বিষয়ে তার কি ধারণা তা তো সে একটি মত হিসাবে বলতে পারে।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি কি জান না, কেবল ধারণা কিছু ভালো জিনিস নয়? কারণ জ্ঞান বাদে ধারণা মূল্যহীন। বড় জোর তুমি তাকে অন্ধের সঙ্গে তুলনা করতে পার। জ্ঞান বাদে যার শুধু ধারণা আছে, সে হচ্ছে অন্ধ। এমন লোকের যদি সত্য ধারণাও থাকে তবু সে হবে অন্ধ লোকের সত্য ধারণা। সঠিক রাস্তার উপর অন্ধ লোকের হাতড়ে চলার মতো।

খুবই সত্য কথা।

কিন্তু অপরে যেখানে তোমাকে জ্ঞানের আলো এবং সৌন্দর্য দান করতে পারবে তুমি কি সেখানে আমার মতো অন্ধ, পঙ্গু এবং অধমের ধারণাকে জানতে চাও?

এবার গ্লকন বললেন ঃ তবু আমার অনুরোধ, সক্রেটিস, আমরা যখন প্রায় আমাদের লক্ষ্যের কাছে উপনীত হয়েছি তখন তুমি আর অস্বীকার কোরো না। ন্যায়, সংযম এবং অপর সব গুণ সম্পর্কে যেরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছ, তেমনি ব্যাখ্যা উত্তম সম্পর্কে দিলেই আমরা সন্তুষ্ট হব।

বন্ধুবর! কেবল তোমরা নও, সেরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারলে আমি নিজেও সন্তুষ্ট হব। কিন্তু আমার ভয়, আমি তাতেও ব্যর্থ হব এবং আমার এই হঠকারী উৎসাহের জন্য আমি উপহাসের পাত্র হয়ে উঠব। কাজেই বন্ধুগণ! সে কাজ করে লাভ নেই। উত্তমের সঠিক প্রকৃতি কী, সে-প্রশ্ন এখন তুলে লাভ নেই। সে-প্রশ্নের জবাবদান এখনও আমার শক্তির বাইরে। তবে উত্তমের সন্তান অবশ্যই উত্তমের মতো। তোমরা যদি চাও, তা হলে উত্তমের সন্তান সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি। তোমরা না চাইলে অবশ্য আমি সে-চেষ্টা করব না।

গ্লকন বললেন ঃ ঠিক আছে, তুমি আপাতত সন্তান সম্পর্কেই বলো। জনকের ঋণটা বাকি থাকুক।

আমার পক্ষে সম্ভব হলে কেবল সন্তান নয়, জনকের ঋণও আমি তোমাদের পরিশোধ করে দিতাম। যাহোক, সন্তানের দেয়টিই এখন মূলের সুদ হিসাবে গ্রহণ করো। তবে খেয়াল রেখো, আমার পরিশোধটা যেন অচল টাকায় না হয়। অবশ্য আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তোমাদের প্রতারণা করব, একথা আমি বলছিনে।

তুমি অগ্রসর হও, সক্রেটিস। আমরা যতটা পারি সতর্ক থাকব।

ঠিক আছে। তবে তোমাদের সঙ্গে প্রথমে আমার একটা বন্দোবস্ত আবশ্যক। এই আলোচনার মধ্যে এবং অন্যত্র আমি যে-কথা তোমাদের বহুবার বলেছি তাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

কিসের কথা বলছ তুমি?

সে পুরনো কথা ঃ সুন্দরের বৈচিত্র্য আছে। উত্তমেরও বৈচিত্র্য আছে। এমনি করেই আমরা সুন্দর, উত্তম, কিংবা অপর সব সত্তার সংজ্ঞা প্রকাশ করি। আমরা বলি উত্তম, সুন্দর—সকলের ওপরই 'বহু' কথাটি প্রযোজ্য।

হ্যাঁ, এরূপ আমরা বলি।

কিন্তু যে-সকল বস্তু বা সত্তার উপর আমরা 'বহু' কথাটি প্রয়োগ করি তাদের প্রত্যেকেরই একটি চরম সত্তা আছে। বহু সুন্দরের এক পরম সুন্দর আছে। বহু উত্তমের এক পরম উত্তম আছে। কারণ বহুকে আমরা তাদের অপরিহার্য গুণ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি ভাব কিংবা শ্রেণীতে বদ্ধ করি। এই ভাবকেই আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর মূল বা সার বলে অভিহিত করি।

খুবই সত্য কথা।

আমরা বলতে পারি ঃ বহুকে আমরা দেখি কিন্তু জানি না; এবং ভাবকে আমরা জানি কিন্তু দেখি না।

যথার্থ।

আচ্ছা, দৃশ্যবস্তুকে আমরা আমাদের কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখি?

গ্লকন জবাব দিলেন ঃ আমরা চোখ দিয়ে দেখি।

ঠিক। এবং আমরা কান দিয়ে শুনি। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়, বস্তুকে এমনিভাবে অনুভব করে। সব বস্তুই এমনিভাবে ইন্দ্রিয়গোচর হয়।

ঠিক।

কিন্তু একটা জিনিস তুমি খেয়াল করেছ, গ্লকন? সব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দৃষ্টি বা চোখ হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল ইন্দ্রিয়। দেহের কারিগর চোখকেই সবচেয়ে জটিল কারিগরি দিয়ে তৈরি করেছেন।

না সক্রেটিস, বিষয়টি আমি খেয়াল করিনি।

তা হলে আর একটা বিষয়ে চিন্তা করে দ্যাখো। কান বল কিংবা কণ্ঠস্বর বল—এদের কি কার্যকর হতে কোনো তৃতীয় ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক হয়? অর্থাৎ কানকে শোনার জন্য এবং স্বরকে শ্রুত হওয়ার জন্য তৃতীয় কোনো শক্তির উপর কি তাদের নির্ভর করতে হয়?

না, অপর কিছুর আবশ্যক হয় না।

তোমার কথা ঠিক। অপর কিছুর আবশ্যক হয় না। এ কথা সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে সত্য না হলেও বেশির ভাগ ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। এদের কারোরই অপর কোনো শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয় না।

না, তা হয় না।

কিন্তু দৃষ্টির বেলা ব্যাপারটি ভিন্ন। অন্য কোনোকিছুর সাহায্য ব্যতীত কিছু দেখা কিংবা দৃষ্ট হওয়া ঃ এর কোনোটাই সম্ভব নয়।

কীভাবে?

দৃষ্টি বলতে আমরা চোখকে বুঝি। যার দৃষ্টি আছে সে দেখতে চায়। ধরো, সে রংকে দেখতে চায়। দেখার জন্য রংও আছে। কিন্তু তবু উপযুক্ত তৃতীয় কোনোকিছু না হলে চোখের মালিক কিছুই দেখবে না। রং তার কাছে অদৃশ্য থাকবে।

কিন্তু তৃতীয় কিসের কথা তুমি বলতে চাচ্ছ?

আমি বললাম ঃ যাকে তুমি আলো বল। তৃতীয় বস্তু হচ্ছে আলো।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

চোখ এবং দৃশ্যের মধ্যে আলো হচ্ছে একটি বন্ধন। আমরা বলব একটি মহৎ বন্ধন। অপর বন্ধনের সঙ্গে এর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কারণ আলোকে তুমি অবজ্ঞা করতে পার না।

না সক্রেটিস, আলো অবজ্ঞেয় নয়। বরঞ্চ তার বিপরীত।

বেশ। কিন্তু স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে কে এই মহৎ শক্তির উৎস? কার আলোতে আমরা বস্তুকে দেখি এবং বস্তু দৃশ্যমান হয়ে ওঠে?

তুমি নিশ্চয়ই সূর্যের কথা বলবে? আমরা সকলে তা-ই বলি।

তা হলে দৃষ্টির সঙ্গে আলোর দেবতার সম্পর্কটি কি আমরা নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করতে পারিনে?

কীভাবে?

চোখ কিংবা—দৃশ্য—যার মধ্যে দৃষ্টি আছে বলে আমরা মনে করি তাদের কারোর অবস্থানই কিন্তু সূর্যের মধ্যে নয়।

না। এরা কেউ সূর্যের মধ্যে থাকে না।

কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সূর্যের সঙ্গে চোখের সাদৃশ্যই সবচেয়ে বেশি।

হ্যাঁ, চোখ সূর্যের মতো।

এবং চোখের যে-শক্তি তাকে আমরা সূর্যের বিচ্ছুরিত শক্তির প্রতিফলন বলতে পারি। ঠিক নয় কি?

ঠিক কথা।

তা হলে সূর্যকে আমরা দৃষ্টি বলব না। সূর্য হচ্ছে দৃষ্টির উৎস।

দৃষ্টি সে উৎস অর্থাৎ সূর্যকে দেখে।

এ কথাও সত্য।

একেই আমি বলতে চেয়েছি উত্তমের সন্তান। উত্তম নিজের প্রতিকৃতিতে তার সন্তানকে দৃশ্যমান জগতের জন্য তৈরি করেছে। মানসিক জগতে বুদ্ধির সঙ্গে বোধ্যের যে সম্পর্ক, দৃষ্টির ক্ষেত্রে, দৃশ্যের সঙ্গে দৃষ্টিরও সেই সম্পর্ক।

আর-একটু পরিষ্কার করে বলো সক্রেটিস।

কেন, তুমি কি খেয়াল করনি, চোখ যখন কোনো বস্তুকে দেখতে চায়—যে-বস্তুর উপর সূর্যের আলো নেই কিন্তু চাঁদ এবং তারার আলো মাত্র পড়েছে, তখন চোখ তাকে আবছাভাবে মাত্র দেখতে পায়। চোখের মধ্যে এমন অবস্থায় দৃষ্টির কোনো স্পষ্টতা থাকে না। সে প্রায় অন্ধ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, এ তো সত্য।

কিন্তু চোখ যখন এমন বস্তুকে দেখতে চায় যার উপর সূর্যের আলো পড়েছে তখন সে তাকে স্পষ্ট দেখতে পায়। চোখে তখন দৃষ্টি থাকে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

তা হলে আত্মাকে আমরা চোখের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। আত্মা হচ্ছে চোখ। আত্মা যখন এমন বস্তুকে দেখতে চায় যার উপর সত্যের আলো পড়েছে এবং সে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তখন আত্মা তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে আত্মা ভাস্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু আত্মার দৃষ্টি যখন প্রদোষ-আঁধারে অস্থির এবং ক্ষীয়মাণ বস্তুর উপর নিবদ্ধ হয় তখন আত্মা স্পষ্ট দেখতে পায় না। তখন, আমরা বলব, আত্মার জ্ঞান নেই, আত্মার কেবল ধারণা আছে। তাকে বুদ্ধিহীন বলে বোধ হয়।

হ্যাঁ, এমন অবস্থায়, আত্মা এরূপই হয়।

তা হলে জ্ঞাত এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের ক্ষমতাকে যে সত্য করে তোলে তাকেই আমরা বলব উত্তমের ভাব ঃ উত্তমের জ্ঞান। এই ভাবই হচ্ছে জ্ঞান এবং সত্যের মূল। একে একদিকে যেমন আমরা স্বজ্ঞান, তেমনি অপর দিকে তাকে জ্ঞান এবং সত্যেরও অধিক বলে কল্পনা করতে পারি। এবং আলো এবং দৃষ্টিকে যেমন আমরা সূর্যসদৃশ মনে করেছি, কিন্তু সূর্য মনে করাকে ভুল বলেছি, এখানে জ্ঞান এবং সত্যকেও আমরা পরম উত্তম সদৃশ বলতে পারি। কিন্তু জ্ঞান কিংবা সত্য—কাউকেই পরম উত্তম বলে মনে করা ভুল হবে। যে পরম উত্তম, তার স্থান জ্ঞান এবং সত্যের চেয়েও উচ্চতর এবং সম্মানীয়।

গ্লকন বললেন ঃ যে-সত্তা জ্ঞান এবং সত্যের মূল এবং যে-সৌন্দর্যে জ্ঞান এবং সত্যেরও অধিক, তার সৌন্দর্য যে কী বিস্ময়কর তা কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, সক্রেটিস, কেবল আনন্দকে নিশ্চয়ই তুমি পরম উত্তম বলবে না?

বিধাতা আমাকে রক্ষা করুন। কিন্তু উত্তমের প্রতিকল্পকে অন্য দিক থেকেও তো দেখা যায়।

কোন্‌দিক থেকে?

সূর্যকে তুমি কী বলবে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে সূর্য কেবল দৃশ্যের মূল নয়; সূর্য, বস্তুর সৃষ্টি, পুষ্টি এবং বৃদ্ধিরও কারণ। কিন্তু সূর্য নিজে সৃষ্টি নয়। ঠিক নয় কি?

তোমার একথা অবশ্যই ঠিক।

ঠিক তেমনিভাবে আমরা বলতে পারি, পরম যে উত্তম সে কেবল সকল জ্ঞাত বস্তুর জ্ঞানের মূল নয়, বস্তুর অস্তিত্বের সে মূল, বস্তুর সারেরও সে মূল—কিন্তু পরম উত্তম নিজে সার নয়। মর্যাদা এবং শক্তির দিক থেকে সে সারকেও অতিক্রম করে যায়।

গ্লকন এবার অদ্ভুত একাগ্রতায় বলে উঠলেন ঃ বাপরে বাপ! কী বিস্ময়করভাবে বিরাট!

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আধিক্য যদি কিছু এতে থাকে তার কারণ তুমি। কারণ তুমিই আমার কল্পনার দুয়ার খুলে দিয়ে এসব বলতে বাধ্য করেছ।

কিন্তু তবু তুমি থেমো না সক্রেটিস। অন্তত সূর্যের সাদৃশ্য সম্পর্কে যদি আরও কিছু বলার থাকে, আমরা তা শুনতে চাই।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, বলার অনেক কিছু আছে।

যা-ই থাকুক-না কেন, এবং সে যত ক্ষুদ্র হোক-না কেন, তুমি সব বলো। কোনো কিছু বাদ দিও না।

গ্লকন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু অনেক কিছুকেই বাদ দিতে হবে। তোমাকে এবার কল্পনা করতে হবে ঃ দুটো নিয়ন্ত্রকশক্তি আছে। এর একটি মনো-জগতে। অপরটি দৃশ্যজগতে। আমি অন্তরীক্ষ বা স্বর্গের কথা বললাম না। তেমন বললে তুমি ভাববে আমি শব্দ নিয়ে খেলা করছি।[১] যা-ই হোক, দৃশ্য এবং মনো-জগতের বা বুদ্ধি জগতের পার্থক্যটি আশা করি তুমি ধরতে পেরেছ?

হ্যাঁ, এ পার্থক্যটিকে আমি বুঝি।

বেশ। এবার তুমি একটি রেখাকে কল্পনা করো। রেখাটিকে তুমি দুটি অসম ভাগে বিভক্ত করো। এর একটি ভাগকে আমরা বলব দৃশ্যজগতের সূচক এবং অপরটিকে বলব মনোজগতের সূচক। এবার এই দুটো ভাগকে পূর্বের অনুপাতে আবার ভাগ করো। এই ভাগের অংশগুলি স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার সূচক হবে। এবার তুমি দেখতে পাবে দৃশ্য ভাগ তৈরি হয়েছে প্রতিরূপ নিয়ে। প্রতিরূপ বলতে আমি বোঝাতে চাই প্রথমত ছায়াকে; দ্বিতীয়ত পানি কিংবা

১. 'শব্দ নিয়ে খেলা করার' কথাটি এসেছে এই কারণে যে গ্রীক ভাষায় 'দৃশ্য' এবং 'স্বর্গ' শব্দ দুটির মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ের অর্থের মধ্যেও সম্পর্ক থাকতে পারে—লীর অনুবাদ; পৃঃ ২৭৫।

জমাট বস্তু, মসৃণ এবং সমতল ইত্যাকার বস্তুর উপর পতিত প্রতিবিম্বকে। আমার বক্তব্যটি তুমি বুঝতে পারছ, গ্লকন?

হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি।

এবার অন্য ভাগটির কথাও চিন্তা করো। এই ভাগটি হচ্ছে প্রতিরূপের মূল নিয়ে—যেমন জন্তু, গাছপালা এবং সকল রকম তৈরি-করা দ্রব্য।

ভালো কথা।

কিন্তু তুমি কি এবার এ কথা বলতে রাজি আছ, এই ভাগগুলি সত্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে পৃথক? এবং প্রতিরূপ ও মূলের মধ্যে যে-সম্পর্ক সে-সম্পর্কটি ধারণা এবং জ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কেরই অনুরূপ?

হ্যাঁ, আমি একথা স্বীকার করি।

তা হলে এবার বুদ্ধিগত ভাগটির কথা ধরা যাক। এটিকে আমরা কীভাবে ভাগ করতে পারি?

তুমি বলো, কেমন করে ভাগ করতে পারি?

এখানে দুটি উপবিভাগ আছে। এর মধ্যে নিম্নতর উপবিভাগটিতে আত্মা প্রথম বিভাগের প্রতিরূপকে ব্যবহার করে। কিন্তু এর পদ্ধতিটিকে আমরা বলতে পারি অনুমানমূলক। কেননা একটি অনুমান বা ধারণা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছি ঃ সিদ্ধান্ত থেকে কোনো সাধারণ সূত্রে নয়। কিন্তু অপর ভাগটিতে আমরা ধারণা থেকে স্বতঃসিদ্ধের দিকে অগ্রসর হই। এখানে প্রতিরূপের কোনো ব্যবহার নেই। এখানে আমরা কেবল ভাবের ভিত্তিতেই সত্যে পৌছার চেষ্টা করি।

তোমার কথাটি আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে।

তা হলে আমি আবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু তোমার বোঝার সুবিধার জন্য প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কথা বলে নিই। তুমি নিশ্চয়ই জান জ্যামিতি, গণিত এবং জ্ঞানের অনুরূপ শাখার শিক্ষার্থীমাত্রই জোড় এবং বেজোড় সংখ্যা, জ্যামিতিক চিত্র, কোণের ত্রিবিভাগ এবং অনুরূপ কতকগুলি সূত্রকে গোড়া থেকেই ধরে নিয়ে অগ্রসর হয়। এগুলি হচ্ছে তাদের দত্ত সত্য। তারা ধরে নেয়, এগুলিকে তারা জানে। এগুলি হচ্ছে তাদের মৌলিক সূত্র। এগুলির ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এরা স্বতঃসিদ্ধ। এই দত্ত সূত্র থেকে শুরু করে সঙ্গতিপূর্ণ ধারাবাহিক স্তর বা পর্যায়ের মাধ্যমে তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।[১]

---

১. এখানে যুক্তির অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হচ্ছে।

হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।

কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়। যদিও এখানে শিক্ষার্থী দৃশ্যচিত্রকে[১] ব্যবহার করে যুক্তি প্রদর্শন করে, কিন্তু তাদের চিন্তা এই চিত্র নিয়ে নয়। তাদের চিন্তা এই চিত্রগুলির মূল নিয়ে, যে-মূলের সাদৃশ্যে চিত্রগুলিকে তৈরি করা হয়েছে। কাজেই শিক্ষার্থীগণ যখন বর্গক্ষেত্র কিংবা চতুর্ভুজের কর্ণ নিয়ে আলোচনা করে তখন তাদের আলোচ্য তাদের অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র কিংবা চতুর্ভুজের কর্ণ নয় ঃ অর্থাৎ চিত্রগুলি যা-ই হোক-না কেন, চিত্রগুলি তাদের আলোচ্য নয়, তাদের আলোচ্য হচ্ছে চিত্রের মূল। যে-চিত্র তারা অঙ্কন করে কিংবা গঠন করে—এগুলির প্রতিছায়া থাকতে পারে, যেমন পানিতে তাদের ছায়া পড়তে পারে। কিন্তু এগুলি দৃষ্টান্তমাত্র। শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানের যথার্থ বিষয় দৃশ্য, কোনো গঠন নয়। সে হচ্ছে এদের মূল। এবং মূল মনের চোখেই মাত্র প্রত্যক্ষ।

তোমার এ কথা সত্য, সক্রেটিস।

আর তাই আমি যখন আমাদের উল্লিখিত রেখাটির বুদ্ধিগ্রাহ্য বিভাগের কথা বলি তখন বুঝতে হবে, আমি তাকেই বোঝাতে চাচ্ছি যাকে বুদ্ধি বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারে। এখানে বুদ্ধি অনুমান বা ধারণাকে কোনো সূত্র হিসাবে গণ্য করে না। ধারণা এখানে সার্বিক এবং স্বতঃসিদ্ধ সূত্রে আরোহণের প্রয়োজনীয় সূচনা এবং স্তর মাত্র। সেই স্বতঃসিদ্ধ সূত্রে পৌঁছার পরে সূত্রের ফল বা অনুবন্ধকে অনুসরণ করে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাও সম্ভব। এই সমগ্র পদ্ধতিটিই ভাবগত ব্যাপার, দৃশ্যগত নয়। ভাবই এর আলোচ্য। ভাব দিয়ে এর শুরু; ভাবের মধ্য দিয়ে এর অগ্রগমন এবং ভাবেই এর সমাপ্তি।

তোমাকে আমি বুঝতে পারছি, সক্রেটিস। যদিও সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমাদের জন্য একটি বিরাট দায়িত্বের কথা ব্যাখ্যা করছ। আমি বুঝতে পারছি, তুমি বলতে চাচ্ছ ঃ বিশুদ্ধ চিন্তার বিষয় হচ্ছে জ্ঞান এবং সত্তা। আর এই জ্ঞান এবং সত্তা কেবল ধারণার উপর নির্ভরশীল, বুদ্ধির অপর বিভাগ থেকে অধিকতর নিঃসন্দেহ এবং নিশ্চিত। বুদ্ধির নিম্নতর বিভাগও চিন্তার ব্যবহার করে। কিন্তু যেহেতু এখানে আমরা কেবল ধারণার উপর নির্ভর করি এবং কোনো সূত্রে আরোহণ করি না, সে-কারণে তোমার মতে এখানে উচ্চতর প্রজ্ঞার কোনো ব্যবহার ঘটে না। অবশ্য এর সঙ্গে মৌলিক সূত্রের যোগ ঘটলে প্রজ্ঞার নিকট এ বোধ্য হয়ে ওঠে। এবং জ্যামিতিক যুক্তির বিষয়ে

১. জ্যামিতিক চিত্রঃ যেমন রেখা কোণ, বর্গক্ষেত্র, ব্যাস প্রভৃতি।

তুমি বলছ, এখানে বোধের ব্যবহার আছে, কিন্তু বুদ্ধির নয়। বোধ বলতে তুমি এখানে ধারণা এবং বুদ্ধির মধ্যবর্তী কোনো স্তরকে বোঝাতে চাচ্ছ।

গ্লকন, তুমি আমার কথা বেশ সঠিকভাবেই অনুধাবন করেছ। এবার আমি বলব, আমাদের উল্লিখিত রেখাটির যে-চারটি ভাগ আছে সে-চারটি ভাগ বরাবর আমাদের মনেরও চারটি ভাগ আছে ঃ ঊর্ধ্বতম ভাগে রয়েছে জ্ঞান; দ্বিতীয় ভাগ বোধ; তৃতীয় ভাগে ধারণা এবং চতুর্থ ভাগে ভ্রম। এগুলিকে তুমি এদের সত্যের পরিমাণ এবং বিষয়ের বাস্তবতার ভিত্তিতে পরিমাপ রেখায়ও বিন্যস্ত করতে পার।

গ্লকন বললেন ঃ আমি বুঝতে পারছি। তোমার এ প্রস্তাবটির সঙ্গেও আমি একমত, সক্রেটিস।

সপ্তম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ১৯
[৫১৪—৫৪১]

জ্ঞানের চারটি স্তর

দার্শনিকের উচ্চতর শিক্ষার যে-প্রসঙ্গ ষষ্ঠ পুস্তকের শেষের দিকে উপস্থাপিত হয়েছে তারই বিস্তারিত আলোচনা সমগ্র সপ্তম পুস্তক জুড়ে করা হয়েছে। এদিক দিয়ে সপ্তম পুস্তককে প্রধানত উচ্চতর দর্শন বা যথার্থ জ্ঞান কাকে বলে তার আলোচনার পুস্তক বলা চলে।

জ্ঞানের প্রকৃতি কী, তার আলোচনা ষষ্ঠ পুস্তকের শেষে সক্রেটিস একটি রেখার অসম ভাগের মাধ্যমে উত্থাপন করেছেন। "এবার তুমি একটি রেখাকে কল্পনা করো। রেখাটিকে তুমি দুটি অসম ভাগে বিভক্ত করো। এর একটি ভাগকে আমরা বলব দৃশ্য জগতের সূচক এবং অপরটিকে বলব মনো-জগতের সূচক।" ... এই দুটি ভাগেরও অপর দুটি উপবিভাগ আছে। এইভাবে সক্রেটিস জ্ঞানের চারটি স্তর চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। এই চারটি স্তরকে যথাক্রমে জ্ঞান, বোধ, ধারণা এবং ভ্রম বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই আলোচনাটির জোর হচ্ছে এখানে যে, সকল ধারণাই জ্ঞান নয়। আমাদের প্রচলিত 'জ্ঞানের' অধিকাংশ হচ্ছে অলীক। দার্শনিকের সাধনা হবে মূল সত্যের জ্ঞান-লাভ করা। জ্ঞান ও ধারণার মধ্যকার পার্থক্য প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'গুহার রূপকে'র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গুহার মধ্যে শৃঙ্খলিত বন্দিরা কেবল ছায়াকেই জানতে পারে, জ্ঞানকে নয়, সত্যকে নয়। সেই ছায়াকেই তারা জ্ঞান বলে মনে করে। কিন্তু যে-বন্দি মুক্ত হয়ে গুহার বাইরে সূর্যের আলোকে এসেছে সে যথার্থ জ্ঞানের সাক্ষাৎলাভ করে। কিন্তু সেই যথার্থ জ্ঞানের সাক্ষাৎ সরাসরি হতে পারে না। তার স্তর আছে। অন্ধকার হতে তীব্র আলোতে এসে প্রথমে সে অন্ধের মতো হয়ে যাবে। তার মনে হবে গুহাতেই সে ভালো ছিল। সেখানেই সে সত্যকে জেনেছে। কিন্তু চোখ যখন আলোতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে তখন সে জ্ঞানের সাক্ষাৎলাভ করতে থাকবে এবং সত্য এবং গুহার ছায়ার পার্থক্য তখন সে উপলব্ধি করতে পারবে। সকল মানুষই এই সত্য জ্ঞান লাভ করতে পারে না। অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে গুহার বন্দি। তারা ছায়াকেই সত্য মনে করে। এটা তাদের জ্ঞান নয়, এটা তাদের ধারণা। খুব অল্পসংখ্যকেরই গুহা থেকে মুক্তির সৌভাগ্য জোটে। কিন্তু সকলেরই

কামনা হবে সেই মুক্তির। অন্ধকার থেকে আলোতে আসার। প্রতিবিম্বের বদলে প্রতিবিম্বের উৎসকে জানার। গণিত, সরল জ্যামিতি, ঘন জ্যামিতি, জ্যোতিষ, সঙ্গতি এবং দ্বান্দ্বিকতা বা উচ্চতর দর্শনের মাধ্যমেই মাত্র এই চরম জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। কাজেই দার্শনিক-শাসকের জন্য যে-শিক্ষা, তাতে উল্লিখিত জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। কিন্তু কারোর পক্ষে পরম সত্যের জ্ঞানলাভই যথেষ্ট নয়। কেবল জ্ঞানী হলেই চলবে না। তাকে দায়িত্বও পালন করতে হবে। গুহা থেকে মুক্তি পেয়ে সূর্যের আলোতে যদি সে আগমনের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে, তবে তাকে আবার গুহার মধ্যে বন্দিদের কাছে ফিরে যেতে হবে। বন্দিদের আত্মাকেও আলোর দিকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা তাকে করতে হবে। অর্থাৎ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দার্শনিককে শাসক হতে হবে, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে। কোনো শ্রেণীবিশেষের জন্য নয়, সকলের সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য তাকে রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। "তাদের শুরু করতে হবে নগরীর অধিবাসী, যাদের বয়স দশ বৎসরের অধিক হয়েছে তাদের সকলকে নগরীর বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে।—অবশিষ্ট নিষ্কলঙ্ক শিশুদের শিক্ষিত করতে হবে রাষ্ট্রের আদর্শ, বিধিবিধান এবং অভ্যাসে।" রাষ্ট্রগঠন এবং পরিচালনার কর্তব্যপালন করে নিজেদের উত্তরপুরুষ সৃষ্টি করে দার্শনিক-শাসকগণ জীবনের শেষে পরলোকের শান্তির দ্বীপে যাত্রা করবে।

প্লেটো শিক্ষার যে-ক্রম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার বিভিন্ন স্তরকে নিম্নোক্তভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করা চলে ঃ

১. ১৮ বৎসর পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং প্রাথমিক গণিত হবে এই প্রাথমিক স্তরের পাঠ্য বিষয়। এই প্রাথমিক শিক্ষাকে কিশোরদের নিকট আনন্দময় করে তুলতে হবে। জবরদস্তি যত কম হয় তত উত্তম। কারণ "যে-জ্ঞানে জবরদস্তি সে-জ্ঞান মনের কোনো উন্নতিসাধন করতে পারে না। ... তাই জ্ঞানদানে কোনো জবরদস্তি কোরো না। শৈশবের শিক্ষা আনন্দের বিষয় হোক। তা হলেই তুমি যার মধ্যে যে-স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।" [৫৩৭]

২. ১৮ থেকে ২০ বৎসর ঃ এ-পর্যায়ের প্রধান জোর হবে শরীরচর্চা এবং সামরিক কৌশলের গভীর প্রশিক্ষণ। ফলে এই সময়ে অপর কোনো বিষয় অধ্যয়নের অবকাশ থাকবে না।

৩. ২০ থেকে ৩০ বৎসর ঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তর পর্যায়ক্রমে যারা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে তাদের এই তৃতীয় স্তরে উচ্চতর গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, সঙ্গীত আত্যন্তিকভাবে শিক্ষাদান করা হবে। গণিত এবং বাস্তবের সম্পর্ক অনুধাবন করানো হবে এই পর্যায়ের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

৪. ৩০ থেকে ৩৫ বৎসর ঃ তৃতীয় পর্যায়কে যারা সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে পারবে, সংখ্যা তাদের যত অল্পই হোক, বাছাই-করা সেই কৃতী শিক্ষার্থীদের ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ—এই পাঁচ বছর একাগ্রভাবে উচ্চতর দর্শন অধ্যয়ন করতে হবে। উত্তম কাকে বলে তার অনুধাবন এবং সকল জ্ঞানের মধ্যকার ঐক্যসূত্রের উপলব্ধি হবে এই পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্য। উচ্চতর দর্শনপাঠের একটা সময় আছে। তার পূর্বে দর্শনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটলে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা অধিক। পরিপক্ক বয়স ব্যতীত দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়।

৫. ৩৫ থেকে ৫০ বৎসর পর্যন্ত পূর্ববর্তী স্তরের সফল শিক্ষার্থীকে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ করে তোলা হবে। নিম্নতর রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপালনের মাধ্যমে তারা শাসনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

৬. ৫০ বৎসর বয়সে পূর্ববর্তী স্তরসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে যারা সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয়েছে তারা এবার তাদের সমগ্র শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরম উত্তমের জ্ঞানলাভ করবে। পরম উত্তমের জ্ঞানই হচ্ছে শাসক হওয়ার একমাত্র শর্ত। এবার এই সর্বোত্তমগণ রাষ্ট্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তাদের একমাত্র চিন্তা হবে রাষ্ট্রের সুশাসন। উত্তমের অধ্যয়ন এবং রাষ্ট্রের সুশাসন—এই হবে সর্বোত্তমদের একমাত্র করণীয়।

আমি বললাম ঃ এসো, এবার আমরা একটি রূপকের মাধ্যমে দেখি আমরা কতখানি জ্ঞানী এবং কতখানি অজ্ঞ। গ্লকন, কল্পনা করো, সমগ্র মনুষ্যজাতি মাটির নিচে একটা গুহার মধ্যে বাস করছে। পৃথিবীপৃষ্ঠের আলোর দিকে গুহার একটি মুখ আছে। মুখটি ভূপৃষ্ঠ থেকে গুহা পর্যন্ত দীর্ঘ। এই গুহার মধ্যে সব মানুষ তাদের শৈশবকাল থেকেই রয়েছে। তাদের পা এবং গলা শেকল দিয়ে আবদ্ধ। ডানে, বাঁয়ে কিংবা পেছনে মুখ ফেরাতে তারা অক্ষম। শেকল তাদের মাথার এরূপ সঞ্চালনকে আটকে রাখে। গুহার দেয়ালের দিকেই তাদের মুখ

ঘোরানো। তাদের সম্মুখের দেয়ালকেই মাত্র তারা দেখতে পায়। এবার কল্পনা করো, তাদের পশ্চাতে মাটির উপরে গুহার বাইরে কিছুদূর আগুন জ্বলছে। বন্দি মানুষ এবং বাইরের আগুন—এ দুই-এর মধ্যভাগে রয়েছে উঁচু একটি পথ। তুমি খেয়াল করলে দেখতে পাবে এই পথ ধরে তৈরি হয়েছে একটি নিচু দেয়াল, একটি পর্দার মতো,—যেমন ছায়ানৃত্যের নৃত্যশিল্পীর সামনে থাকে, যে-পর্দার উপর শিল্পীরা তাদের পুতুলদের নাচ দেখায়। ছবিটি তুমি দেখতে পাচ্ছ গ্লকন?

হ্যাঁ, আমি দেখছি।

এবার তুমি খেয়াল করো। দেখবে নিচু দেয়ালটির পথ ধরে একদল লোক চলে যাচ্ছে। তাদের হাতে বিভিন্নরকম বস্তু আছে ঃ পাথর, কাঠ কিংবা অন্যকিছুতে তৈরি নানা পাত্র, মূর্তি, পশুর প্রতিকৃতি। এরা কেউ-কেউ কথা বলছে। কেউ নীরবে অগ্রসর হচ্ছে। আর এই শোভাযাত্রার ছবিটি আগুনের আলোতে গুহার ভিতরে তার দেয়ালে এসে প্রতিফলিত হচ্ছে।

এ তো এক অদ্ভুত ছবি তৈরি করেছ, সক্রেটিস। তোমার বন্দিরাও অদ্ভুত ধরনের বন্দি।

আমি বললাম ঃ বন্দিরা আমাদেরই মতো। তাদের মুখ দেয়ালগাত্রে ফেরানো। আলোর প্রতিভাসে তারা কেবল তাদের কিংবা একে অপরের ছায়াই দেখতে পায়।

একথা সত্য। তাদের মাথা যদি তারা আদৌ সঞ্চালন করতে না পারে তা হলে ছায়া বই অপর কিছু তারা কেমন করে দেখবে?

বাইরে জনতার মিছিল যেসব দ্রব্য হাতে করে নিচ্ছে তারও ছায়াই মাত্র তারা দেখতে পাচ্ছে।

হ্যাঁ, তা-ই হবে।

এখন ধরো, বন্দিরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করছে। এই আলাপে তারা তাদের সম্মুখে দেয়ালের ছায়াকেই কি সত্য বস্তু বলে পরস্পরের নিকট উল্লেখ করবে না?

অবশ্যই তারা তা-ই করবে।

তা ছাড়া মনে করো, গুহার মধ্যে শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। তা হলে বাইরের মিছিলের যে-শব্দ গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হবে, সে-শব্দকে কি তারা তাদের সম্মুখের ছায়াদের উচ্চারিত শব্দ বলেই মনে করবে না?

নিঃসন্দেহে।

তা হলে তাদের কাছে সত্য হচ্ছে প্রতিকৃতির ছায়ামাত্র।

অবশ্যই তা-ই।

বেশ, এবার দ্যাখো, বন্দিরা যদি মুক্তি পায় এবং তাদের ভুল ভাঙে তা হলে কী ঘটে। মনে কর, এদের মধ্যে কেউ-একজন হঠাৎ মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়াল এবং মুখ ঘুরিয়ে আলোর দিকে ছুটে গেল। এমন হলে প্রথমেই সে তীব্র যন্ত্রণা বোধ করবে। আলোর ঝলক তার চোখকে ধাঁধিয়ে দেবে। যে-প্রতিকৃতির ছায়া সে গুহার দেয়ালে দেখে এসেছে তার যথার্থ আকারকে প্রথমে সে দেখতেই পাবে না। এবার মনে করো কেউ তাকে বলল, সে পূর্বে যা দেখেছিল তা ভ্রান্ত এবং এখন চোখের ধাঁধা কেটে যাবার পরে যা দেখছে তা-ই সত্য। এমন কথা বললে তার জবাব কী হবে? আরও মনে করা যাক তার প্রদর্শক তাকে তার সম্মুখের চলমান বস্তু সকলের নাম বলতে বলল। এ-প্রশ্নে সে নিশ্চয়ই বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। তার মনে হবে, যে-ছায়া সে পূর্বে দেখেছে সে-ছায়া বর্তমানের বস্তু থেকে অধিক সত্য।

হ্যাঁ, তাকেই সে অধিকতর সত্য বলে মনে করবে।

এবার সে যদি সোজা আলোর দিকে তাকায় তা হলে তার চোখে আলোর আঘাতে যে-যন্ত্রণা হবে তার ফলে মুখ ফিরিয়ে সে যে-দৃশ্য অধিক স্পষ্ট বোধ হয় তাকে সে দেখবে এবং আলোর ঝলকে প্রদর্শিত বস্তুর চেয়ে এই বস্তুকে অধিক সত্য বলে মনে করবে?

হ্যাঁ, তা-ই করবে।

ঠিক আছে। আর-একটু কল্পনা করো। ধরো, তাকে গুহার মধ্য থেকে জোর করে সেই অমসৃণ পথ দিয়ে উপরে এনে সূর্যের আলোতে ধরে রাখা হল। সূর্যের তীব্র আলোয় চোখে নিশ্চয়ই তার তীব্র জ্বালা হবে। এত আলোতে বাইরের জগতের কোনো বস্তুই সে দেখতে পাবে না।

না, আলোর প্রথম আঘাতে সে কিছুই দেখতে পাবে না।

তার অর্থ, তার চোখকে বাইরের দৃশ্যে অভ্যস্ত হতে হবে। গোড়াতে ছায়াগুলিকেই সে ভালো দেখবে। এবং শেষে বাইরের জগতের বস্তুকে দেখতে পাবে। সে এবার চাঁদের আলো, তারার ঝিকিমিকি এবং নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাবে। দিনের সূর্যের আলোর চেয়ে রাত্রির খচিত আকাশের দিকে তাকাবে। দিনের সূর্যের আলোর চেয়ে রাত্রির আকাশ এবং তারার মালাকে সে ভালো দেখতে পাবে। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

সবশেষে সে সূর্যের দিকেও তাকাতে পারবে। পানিতে তার প্রতিবিম্ব নয়, সূর্যের বাস্তব অস্তিত্বকে সে দেখতে পাবে। তার বিষয়ে সে এবার চিন্তা করবে।

হ্যাঁ, এবার সে সূর্য সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে।

এবার সে সিদ্ধান্ত করতে সক্ষম হবে, এই সূর্যের কারণেই ঋতুর বৈচিত্র্য, বৎসরের পরিক্রমা। সূর্যই হচ্ছে দৃশ্যজগতের সবকিছুর শাসক। সে এবং তার সঙ্গীরা যা-কিছু দেখতে অভ্যস্ত তার কারণ হচ্ছে সূর্য।

গ্লকন বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। সে প্রথমে সূর্যকে দেখবে এবং পরে সূর্য সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে সে পৌঁছবে।

এবার যদি সে গুহায় ফেলে-আসা তার সহবন্দিদের কথা ভাবে, গুহার ভেতরে যে-জ্ঞান তারা লাভ করত তাকে যদি সে স্মরণ করে তা হলে সে কি তার নিজের পরিবর্তনে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবে না এবং গুহার বন্দিদের জন্য করুণা বোধ করবে না?

অবশ্যই, সে তাদের জন্য করুণা বোধ করবে।

গুহার বন্দিদের মধ্যে যদি এই রেওয়াজ থেকে থাকে যে, তাদের দেয়ালগাত্রে কোন্ ছায়া আগে গেল, কোন্ ছায়া পরে গেল, কোন্ ছায়াগুলি পরস্পরসংলগ্ন সে-সম্পর্কে যে-বন্দির পর্যবেক্ষণক্ষমতা অধিক, যে ছায়াদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুমানে পারদর্শী তাকে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত করা হয়, তা হলে গ্লকন তুমি কি মনে কর, আমাদের এই মুক্তবন্দির মনে সেই সম্মান ও পুরস্কার হারাবার জন্য দুঃখ সঞ্চারিত হবে কিংবা গুহার পুরস্কৃত এবং সম্মানিত বন্দিদের জন্য সে ঈর্ষা বোধ করবে? না সে হোমারের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ করবে ঃ

"তার চেয়ে অধিক ভালো দরিদ্র প্রভুর দরিদ্র দাসের ভাগ্য।"

এবং যা-কিছু সহ্য করার তা-ই সে করবে তবুও গুহার বন্দিদের ন্যায় আর সে চিন্তা করবে না, তাদের ন্যায় জীবন আর সে ধারণ করবে না?

আমার তো মনে হয়, সে সহ্য করবে কিন্তু এইসব মিথ্যা ধারণা সে আর পোষণ করবে না এবং দুর্দশার জীবনযাপন করবে না।

গ্লকন, এবার মনে করো এই মুক্তবন্দিকে আবার হঠাৎ তার পুরনো জায়গাতে নিয়ে যাওয়া হল। সূর্যের আলো থেকে হঠাৎ গুহার অন্ধকারে আসায় সে কি আবার 'অন্ধ' হয়ে যাবে না?

অবশ্যই। সে আবার অন্ধ হয়ে যাবে।

এবার গুহার মধ্যে দেয়ালগাত্রের ছায়া চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে যদি বন্দিদের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা হয় তা হলে তার চোখ যখন অন্ধকারে এখনও অভ্যস্ত হয়নি, আর অভ্যস্ত হতে যখন সময় আবশ্যক হবে অনেক, তখন বন্দিদের

নিকট তার অক্ষমতার জন্য সে কি হাসির পাত্র হয়ে উঠবে না? গুহার বন্দিগণ তার সম্পর্কে বলবে ঃ চক্ষু নিয়ে সে উপরে উঠেছিল; অন্ধ হয়ে সে ফিরে এসেছে। তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গুহার মানুষ বলবে ঃ কেউ যেন আর উপরে যাবার চিন্তা না করে। কেউ যদি অপর কাউকে মুক্ত করে গুহার বাইরে আলোতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তা হলে তাকে গুহার মানুষ অপরাধী ঘোষণা করে তাকে ধরতে পারলে মেরেই ফেলবে। ঠিক নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

প্রিয় গ্লকন, এবার এই সমগ্র রূপটিকে তুমি আমাদের আগের যুক্তির সঙ্গে জুড়ে নাও[১] ঃ গুহার বন্দিশালা হচ্ছে আমাদের দৃশ্যজগত; মশালমিছিলের আলো হচ্ছে সূর্য। আর গুহা থেকে উপরে ওঠাকে তুমি আত্মার মুক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির জগতে আত্মার আরোহণ বলে কল্পনা করতে পার। আমার এ-ব্যাখ্যা সত্য কিংবা মিথ্যা, তা বিধাতা জানেন। আমার কৈফিয়ত, তোমরা চেয়েছ বলেই আমার বুদ্ধিমতো আমি কথা বলেছি। এই রূপক সত্য কিংবা মিথ্যা যা-ই হোক আমার বিশ্বাস, জ্ঞানের জগতে উত্তমের ভাব আমরা সবার শেষেই মাত্র লাভ করত পারি। এবং উত্তমের সে-জ্ঞান বিনা আয়াসে লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু উত্তমের জ্ঞান যখন আমরা লাভ করি তখন আমরা উপলব্ধি করি, উত্তমের ভাবই হচ্ছে সবকিছুর মূল। সুন্দর কিংবা ন্যায়ের কারণ হচ্ছে উত্তম। উত্তমই দৃশ্যজগতের আলোর মূল। উত্তমই হচ্ছে সত্য এবং বুদ্ধির মূল। এবং এ-কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সামাজিক সংগঠনে, যে-মানুষ যুক্তির ভিত্তিতে তার জীবনের কর্মসাধন করতে চাইবে তাকে উত্তমের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে।

আমি যতটুকু বুঝতে পারছি তাতে আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

আর তাই যারা উত্তমের এই রূপকে উপলব্ধি করতে পারে তারা মানুষের বৈষয়িক জীবনেও যে নিজেদের জড়িত করতে চাইবে না, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আমাদের গুহার উপাখ্যানের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, বন্দি মানুষের আত্মা নিয়ত সত্যের জগতে উর্ধ্বারোহণ করতে চায় এবং সেই উর্ধ্বজগতে আরোহণ করতে সক্ষম হলে আত্মা স্বাভাবিক ভাবে সেই জগতেই বাস করতে চায়।

হ্যাঁ, উর্ধ্বজগতে বাস করতে চাওয়াই আত্মার পক্ষে স্বাভাবিক।

এবং উত্তমের জ্ঞানলব্ধ মানুষ যখন আবার অজ্ঞানতার গুহার মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে তখন তার আচরণ যদি অদ্ভুত বলে বোধ হয় তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তার চোখ অন্ধকারে এখনও অভ্যস্ত হয়নি। তাই যে-

---

১. পূর্বে প্রদত্ত সূর্য এবং রেখার উপমা (৫১০)।

বন্দি মানুষ চরম ন্যায়ের জ্ঞান লাভ করেনি তার সঙ্গে জাগতিক আদালতে কিংবা অন্যত্র, প্রতিরূপের ছায়ার সত্যতা-অসত্যতা নিয়ে তাকে লড়াই করতে হয়।

না, তার এই আচরণে বিস্ময়ের কিছু নেই।

যার সাধারণ জ্ঞান আছে, সে-ই বুঝতে পারবে চোখের বিভ্রম দুরকমের। দুটি কারণে এর উদ্ভব। একটি কারণ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোতে বেরিয়ে আসা। অপরটি আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া। দেহের চোখের ক্ষেত্রে এ কথা যেরূপ সত্য, মনের চোখের ক্ষেত্রেও এ কথা তেমনই সত্য। এই সত্য যার জানা আছে সে যখন কারুর দৃষ্টিভ্রম দেখে, তখন তার হাসির কোনো কারণ থাকে না। তার প্রশ্ন হবে, যে বিভ্রান্ত সে কি উজ্জ্বল আলো থেকে অন্ধকারে এসেছে এবং তার চোখ এখনও অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়নি? কিংবা অন্ধকার থেকে সে দিনের আলোতে বেরিয়ে এসেছে এবং আলোর আধিক্যে তার চোখ বাধিয়ে গেছে? কেউ যদি তার মতো সত্যের সন্ধান লাভ করে থাকে তাকে সে নিজের মতোই সুখী বলে বিবেচনা করবে। কিন্তু যে আলো থেকে অন্ধকারে গেছে তার জন্য অবশ্যই তার সহানুভূতি থাকবে। কিন্তু সে যদি অন্ধকার থেকে আলোতে অতিক্রান্ত আত্মাকে পরিহাস করতে চায়, তা হলে যে উর্ধ্বদেশ থেকে গুহার অন্ধকারে প্রত্যাবর্তন করেছে তার প্রতি তার পরিহাসের চেয়ে তাকে অধিক হেতুময় হতে হবে।

দুটির পার্থক্য তুমি যথার্থভাবেই প্রকাশ করেছ।

কিন্তু এক্ষেত্রে আমার কথা যদি সত্য হয়, তা হলে আমি সেই পণ্ডিতপ্রবরদের অবশ্যই ভ্রান্ত বলব যারা বলে যে, অন্ধকে যেমন দৃষ্টিদান করা যায়, আত্মাকেও তেমনি জ্ঞানদান করা যায়। কথাটি এমন যেন আত্মার মধ্যে জ্ঞান না থাকলেও তুমি বাইরে থেকে জ্ঞান এনে আত্মার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পার।

হ্যাঁ, পণ্ডিতেরা তা-ই বলে বটে।

কিন্তু আমাদের যুক্তিতে আমরা দেখেছি, জ্ঞানের ক্ষমতা অর্থাৎ শেখার শক্তি আত্মার মধ্যে থাকে। এবং সমস্ত শরীরটাকে না ঘুরিয়ে আমরা যেমন আমাদের চোখটাকে ঘুরিয়ে পিছনদিকে দৃষ্টি দিতে পারিনে, তেমনি আত্মাকেও সমগ্রভাবে নশ্বর জগৎ থেকে অবিনশ্বর জগতের দিকে না ঘুরিয়ে, বিবর্তমান জগৎ থেকে অস্তিত্বের জগতে জ্ঞানের মাধ্যমকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আত্মাকেও আলোতে অভ্যস্ত হতে হবে। অস্তিত্বের দৃশ্য সে ক্রমান্বয়ে দেখতে পাবে। পারিণামে সে উজ্জ্বলতম অস্তিত্ব অর্থাৎ পরম উত্তমকেই দেখতে পাবে।

খুবই যথার্থ।

কিন্তু এমন কোনো উপায় কি আমরা কল্পনা করতে পারিনে, যে-উপায়ে এই অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তরণ অর্থাৎ সত্যের জ্ঞানলাভকে অধিকতর সহজ এবং দ্রুত করা যায়? আমরা দৃষ্টিদানের কথা বলছিনে। চোখকে দৃষ্টিদান করা যায় না। চোখে দৃষ্টি তো রয়েছে। কিন্তু সে-দৃষ্টি ভ্রান্ত পথে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সত্য থেকে তাই সে দূরে সরে গেছে। প্রয়োজন হচ্ছে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনা।

হ্যাঁ, সহজ উপায়ের কথা নিশ্চয়ই আমরা কল্পনা করতে পারি।

আত্মার কতগুলি গুণ আছে যে গুলিকে দেহের গুণ বলেই আমরা চিহ্নিত করতে পারি। কারণ এগুলিকে আত্মার মধ্যে প্রয়োজনমতো অভ্যাস এবং পরিচর্যার মাধ্যমে উপ্ত করা চলে। এরা আত্মার সহজাত গুণ নয়। কিন্তু জ্ঞানের গুণ আত্মার সহজাত। এই গুণের স্ফূর্তি ঘটে যদি আত্মার চোখকে সত্য পথে ফিরিয়ে আনা যায়। না হলে এ-গুণ ক্ষতিকর এবং অসার্থক হয়ে দাঁড়ায়। গ্লকন, তুমি কি কখনো চতুর দুষ্ট লোকের চোখে বুদ্ধির ঝিলিক দেখনি? দেখনি, দুষ্টের আত্মা কেমন করে তার হীন স্বার্থ উদ্ধারের সঠিক পথটি আবিষ্কার করে ফেলে? এমন আত্মাকে আমরা অন্ধ বলতে পারিনে। এ অন্ধের বিপরীত। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। কিন্তু সে-তীক্ষ্ণদৃষ্টি হীন স্বার্থে নিয়োজিত। আর তাই তার যেমন চতুরতা, তেমনি খলতা।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

কিন্তু এই স্বভাবকে যদি শৈশবেই তার নিম্নতর প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যেত, যদি তাকে তার পান, ভোজন ইত্যাকার যে-ইন্দ্রিয়ভোগের প্রবণতা ভারী বস্তুর ন্যায় জন্ম থেকে তার স্বভাবে জড়িত হয়ে তাকে কেবল অধোগামী করতে চায়, সেই প্রবণতাকে তার চরিত্র থেকে কেটে আলাদা করে দেওয়া যেত, তা হলে তার আত্মা তার তীক্ষ্ণ চোখের মতোই সত্যকে দেখতে পেত।

খুবই সম্ভব।

হ্যাঁ, এরূপ সম্ভব। এ-সম্পর্কে অপর একটি সিদ্ধান্তও স্বাভাবিকভাবে পূর্বকথার ভিত্তিতে আমাদের গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তটি এই যে, যারা শিক্ষাহীন এবং সত্যকে জানে না, তারা যেমন উত্তমরূপে রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্বপালনে সক্ষম হবে না; ঠিক তেমনি যারা তাদের শিক্ষাকে কোনোদিন সমাপ্ত করে না তারাও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে ব্যর্থ হবে। প্রথমোক্তরা ব্যর্থ হবে, কারণ, ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে তাদের সকল কর্মের নিয়ন্ত্রক কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। আর শেষোক্তরা ব্যর্থ হবে, কারণ, বাধ্য না হলে তারা কোনো দায়িত্বপালনের ইচ্ছা

পোষণ করে না। তারা মনে করে, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক স্বর্গীয় দ্বীপের তারা অধিবাসী। দায়িত্বপালনের দায় কেন তারা বহন করবে?

খুবই সত্য কথা।

কাজেই রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আমাদের কাজ হবে, উত্তম মনের যারা অধিকারী তাদের সেই সর্বোচ্চ জ্ঞানকে অর্জন করতে বাধ্য করা, যে-জ্ঞানকে আমরা সর্বোত্তম জ্ঞান বলে নির্দিষ্ট করেছি। পরম যে-উত্তম তার সন্নিধানে না পৌঁছা পর্যন্ত জ্ঞানের এই ক্রমারোহণে তাদের বিরমহীনভাবে অগ্রসর হতে হবে। কিন্তু জ্ঞানের চূড়ায় আরোহণের পর আর তাদের বর্তমানের জ্ঞানীদের ন্যায় আচরণ করতে দেওয়া হবে না।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

আমি বলছি, তাদের তখন আর 'ঊর্ধ্ব জগতে' থাকতে দেওয়া হবে না। তাদের বাধ্য করা হবে গুহার মধ্যে বন্দিদের নিকট আবার নেমে যেতে। বন্দিদের শ্রমের, কষ্টের এবং সম্মানের অংশীদার তাদের হতে হবে। এরূপ শ্রম, কষ্ট এবং সম্মানভোগের যোগ্য তারা হোক কিংবা না হোক।

গ্লকন বললেন ঃ কিন্তু এটা কি তাদের প্রতি অন্যায় নয়? যখন তারা একটি উত্তম জীবনের যোগ্য হয়েছে, তখন কি সঙ্গত হবে আবার অধম জীবনে তাদের অবনত করা?

কিন্তু প্রিয় বন্ধু, বিধায়ক হিসাবে আমাদের লক্ষ্যকে তুমি আবার বিস্মৃত হচ্ছ। আমাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোনো একটি শ্রেণীকে অপর সকল শ্রেণীর চেয়ে সুখী করা নয়। সুখ যা তা সমগ্র রাষ্টের। সমগ্র রাষ্ট্রে সুখ অবস্থান করবে। রাষ্ট্রের বিধায়ক বুদ্ধি এবং বিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ রাখবে এবং নিজেরা রাষ্ট্রের উপকারকে পরিণত হবে। এই উপকারসাধনে পরস্পরের উপকারসাধন। বিধানের সৃষ্টি এই কারণে, নিজেদের সুখী করার জন্য নয়। বিধান হবে রাষ্ট্রকে সংঘবদ্ধ রাখতে বিধায়কের উপায় বা মাধ্যম।

গ্লকন বললেন ঃ যথার্থ। লক্ষ্যটি আমি বিস্মৃত হচ্ছিলাম।

কিন্তু আমাদের দার্শনিকদের অপরের যত্নগ্রহণে বাধ্য করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই, গ্লকন। আমরা তাদের বুঝিয়ে বলব, অন্য রাষ্ট্রে তাদের শ্রেণীর লোকেরা রাজনীতির দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয় না। এটা বোধগাম্য। কারণ সেখানে তারা নিজেদের খেয়ালখুশিমতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সরকার এমন লোককে দায়িত্বদানে আগ্রহবোধ করে না। নিজেদের ইচ্ছামতো শিক্ষাগ্রহণের কারণে

তাদের পক্ষে ভিন্নতর শিক্ষার মূল বোঝা সম্ভব নয়। কারণ, এরূপ শিক্ষা তারা লাভ করেনি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের দার্শনিকগণ ভিন্ন ধরনের দার্শনিক। তাদের আমরা রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার জন্য প্রস্তুত করেছি। আমরা অন্য রাষ্ট্রের চেয়ে তাদের উত্তম এবং পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি যেন তারা নিজের শাসন এবং অপরের শাসন—এই উভয় দায়িত্ব উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারে। তারা যেমন নিজের শাসক হবে, তেমনি অপর সকলের শাসক হবে। এবং এ-কারণেই তাদের মধ্যে যার যখন দায়িত্ব পড়বে, তার তখন সাধারণ মানুষের সেই গুহার মধ্যে অবতরণ করতে হবে এবং সেই অন্ধকারে দেখার জন্য দৃষ্টিকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাদের চোখ যখন অভ্যস্ত হবে তখন তারা গুহার অধিবাসীদের চাইতে সকল বিষয়কে সহস্র গুণ অধিক স্পষ্ট দেখতে পাবে। তখন প্রতিকৃতির কোন্‌টি কী এবং কোন্‌টি কিসের প্রতিকৃতি তাও তারা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে। কারণ তারা সুন্দর, সত্য এবং উত্তমকে যথার্থরূপে ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করেছে। তারা এবার উপলব্ধি করবে তাদের রাষ্ট্র এবং আমাদের রাষ্ট্রে কোনো পার্থক্য নেই। আমাদের রাষ্ট্রই তাদের রাষ্ট্র। তাদের দায়িত্বপালনে এ-রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে। তখন আর আদর্শ রাষ্ট্র স্বপ্নের রাজ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এবং অপর রাষ্ট্রে যেখানে ছায়া নিয়ে একে অপরের সাথে লড়াই করে এবং ক্ষমতাকে উত্তম মনে করে এবং তার দ্বন্দ্বে নিজেরা লিপ্ত হয়, সেখানে আমাদের রাষ্ট্রের শাসন সেরকম হবে না। বস্তুত যথার্থ সত্য হচ্ছে এই : যে-রাষ্ট্রের শাসকগণ যত অনিচ্ছুক শাসক, সে-রাষ্ট্র তত উত্তম রাষ্ট্র। সে-রাষ্ট্র তত শান্তিতে শাসিত হয়। এবং যে-রাষ্ট্রের শাসক, শাসক হওয়ার জন্য যত অধিক আগ্রহী সে-রাষ্ট্র তত অধিক অধম।

খুবই সত্য কথা।

এবার ভেবে দেখ আমাদের দার্শনিক শিক্ষার্থীগণ কি এই ব্যাখ্যা শোনার পরে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে আর অসম্মত হবে? তেমন অসম্মতির আর কারণ থাকবে না। কেননা অধিকাংশ সময়ই শাসকগণ পরস্পরের সঙ্গে স্বর্গীয় জ্ঞানের আলোতেই বাস করতে পারবে। তাদের সেরূপ সুযোগ দেওয়া হবে।

না, এরপর তাদের পক্ষে দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব। কারণ তারা হচ্ছে উত্তম নাগরিক। এবং যে-দায়িত্ব আমরা তাদের উপর ন্যস্ত করছি সে হচ্ছে উত্তম দায়িত্ব। এবার আর সন্দেহ নেই, তারা সকলেই রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে গ্রহণ করবে, আমাদের বর্তমান শাসকদের ন্যায় তাকে একটা রীতি অর্থাৎ ক্ষমতার মাধ্যম হিসাবে নয়।

হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। এবং এটাই হচ্ছে মূল কথা। আমাদের ভবিষ্যৎ-শাসকদের জন্য তোমাকে অবশ্যই শুধু শাসনের চেয়ে উত্তম কোনো কর্তব্য স্থির করতে হবে। তা হলেই মাত্র তুমি সম্পদবানকে শাসক হিসাবে পেতে পারবে। এ-সম্পদবান স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সম্পদে সম্পদবান নয়, এ-সম্পদবানের সমৃদ্ধি ন্যায় এবং যুক্তির সম্পদে। অপরদিকে তোমার শাসকরা যদি নৈতিকভাবে এত নিঃস্ব হয় যে, রাষ্ট্রকে দান করার তাদের কোনো সম্পদই নেই; বরঞ্চ তারা তাদের নিঃস্বতাকে রাজনীতিক ব্যবসায়ের লাভ দ্বারা পূরণ করতে উদ্‌গ্রীব, তা হলে তোমার রাষ্ট্র কখনো সুশাসিত হতে পারবে না। কারণ তারা ক্ষমতার জন্য লড়াই শুরু করবে এবং এর পরিণামে রাষ্ট্রের মধ্যে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং আত্মকলহের সূত্রপাত ঘটবে তাতে শাসকগণ নিজেরা এবং রাষ্ট্র—উভয়ই ধ্বংস হয়ে যাবে।

একান্তই সত্য কথা, সক্রেটিস।

এবং রাজনীতিক উচ্চাভিলাষী এই জীবনকে কেবলমাত্র যথার্থ দার্শনিকই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখতে পারে, অপর কেউ না। যথার্থ দার্শনিক ব্যতীত অপর কোনো জীবনের মধ্যে এই দৃষ্টির সাক্ষাৎ তুমি পেতে পার কি?

না, এরূপ অপর কোনো জীবনের কথা আমি জানিনে, সক্রেটিস।

কাজেই যারা শাসক হবে শাসনের প্রতি তাদের কোনো লোভ থাকবে না। কারণ, শাসনের জন্য যদি তারা লোভী অর্থাৎ প্রেমিক হয় তা হলে অবশ্যই শাসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকও থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকগণ তখন নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করবে।

নিঃসন্দেহে।

তা হলে শাসক বা অভিভাবক হতে বাধ্য করব আমরা কাদের? নিশ্চয়ই আমরা বাধ্য করব তাদের যারা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সর্বোত্তমরূপে জ্ঞানী এবং যাদের দ্বারা রাষ্ট্র সর্বোত্তমরূপে শাসিত হবে এবং যাদের রাজনীতির চেয়ে কোনো উত্তম এবং সম্মানীয় জীবন থাকবে।

হ্যাঁ, এদেরকেই আমরা শাসকরূপে নিযুক্ত করব।

তা হলে এবার আমাদের আলোচনা করতে হয়, এই শাসকগণ কেমন করে তৈরি হবে, কী প্রকারে তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসতে আমরা সক্ষম হব। অধোজগৎ থেকে আরোহণ করে উর্ধ্বজগতে দেবতাদের নিকট পৌঁছার দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় তা-ই হবে।

হ্যাঁ, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হয়।

ব্যাপারটি কিন্তু কোনো মুদ্রার 'মাথা না লেজ'-এর খেলা নয়।[1] কাজটি হচ্ছে একটি আত্মাকে প্রত্যুষের অন্ধকার থেকে পুরো দিনের আলোতে নিয়ে আসা। একেই আমরা বলব অধোদেশ থেকে উর্ধ্বদেশে আরোহণ।

হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক।

আমাদের তা হলে স্থির করতে হবে, কোন্ জ্ঞান দ্বারা এই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে?

অবশ্যই।

কোন্ জ্ঞান আত্মাকে পরিবর্তন থেকে অস্তিত্বে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে? আর-একটি বিষয় আমার স্মরণে আসছে। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে গ্লকন, আমাদের তরুণদের যুদ্ধকৌশলীতেও পরিণত হতে হবে?

হ্যাঁ আমার মনে পড়ছে।

তা হলে এই জ্ঞানের একটা নূতন বৈশিষ্ট্য থাকবে?

কী বৈশিষ্ট্য?

অর্থাৎ এ-জ্ঞানকে যুদ্ধক্ষেত্রেরও উপযোগী হতে হবে।

হ্যাঁ, যদি সেরূপ সম্ভব হয়।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ইতিপূর্বে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করেছিলাম। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক। তার দুটো ভাগ ছিল।

শিক্ষার একটি ভাগ ছিল শরীরচর্চা। শরীরকে গঠন করাই এর লক্ষ্য। এদিক থেকে ক্ষয় ও বৃদ্ধি তার আলোচ্য ছিল।

যথার্থ।

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেরূপ জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। আমরা সে-জ্ঞানকে আবিষ্কার করতে যাচ্ছিনে।

না।

---

১. জোয়েট অনুবাদ করেছেন ঃ "এটি ঝিনুকের এপিট ওপিঠেরখেলা নয়।" এবং এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ এটি একটি খেলার উল্লেখ যে খেলায় দুটি দল ঝিনুক আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে পরস্পরকে ধাওয়া করত এবং জয়-পরাজয় ঝিনুকের উজ্জ্বল কিংবা কালো দিকটি উপরের দিকে পড়ার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হত।

—জোয়েট ঃ ডায়ালগস অব প্লেটো ঃ ৩য় ভলিউম।

কিন্তু সঙ্গীতের বিষয়ে তুমি কী বলবে? আমাদের পূর্বের শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীতেরও একটি স্থান ছিল।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সঙ্গীত ছিল শরীরচর্চার পরিপূরক। সঙ্গীত তার স্বভাব দিয়ে, তার ঐক্য এবং ছন্দ দিয়ে অভিভাবকদের জীবন সঙ্গতিপূর্ণ এবং ঐক্যময় করে তুলত। কিন্তু সঙ্গীত তাদের জ্ঞানদান করত না। সঙ্গীতের মধ্যে সাহিত্যও ছিল ঃ বাস্তব কিংবা কল্পনা যা-ই হোক-না-কেন। এ-সাহিত্যও তাদের নৈতিক চরিত্রকে গঠিত করত। কিন্তু যে-পরিবর্তন তোমার বর্তমানের লক্ষ্য, সঙ্গীত সে পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

তোমার স্মৃতি যথার্থই বলেছে। আমরা যা চাই সঙ্গীতে তা পেতে পারিনে। কিন্তু কোথায় আমরা সে-জ্ঞানকে পেতে পারি? বাস্তব দক্ষতাকেও আমরা আত্মার জন্য তেমন মঙ্গলকর বলে ভাবতে পারিনে।

সেকথা ঠিক। কিন্তু শরীরচর্চা এবং সঙ্গীতকে যদি আমরা বাদ দিই এবং বাস্তব দক্ষতাও যদি উপযুক্ত না হয় তা হলে আর কী অবশিষ্ট থাকে?

আমি বললাম ঃ না, বিষয়গুলির মধ্যে আর তেমন অবশিষ্ট থাকে না। আমাদের তা হলে বিষয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ থেকে লাভ নেই। সকল বিষয়ের মধ্যে যদি কোনো চরিত্র সমানভাবে বর্তমান থাকে, তা হলে আমাদের তার প্রতিই নজর দিতে হয়?

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস?

আমি বলতে চাচ্ছি, এমন কিছু আছে কি না যা সকল কলা, জ্ঞান এবং বুদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণ—অর্থাৎ সবার মধ্যেই যে বর্তমান এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে যাকে আমাদের প্রথমেই আয়ত্ত করা আবশ্যক।

কী এমন জিনিস?

না, তেমন বিরাট কিছু না। সে হচ্ছে এক, দুই, তিন ইত্যাকার সংখ্যাকে গণনা করা এবং পৃথক্‌করণের ক্ষমতা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিষয়েই এটা কি প্রাথমিক প্রয়োজন নয়?

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তা হলে যুদ্ধের যা কলা তাতেও এর আবশ্যকতা আছে?

নিঃসন্দেহে।

আচ্ছা গ্লকন, তুমি কি খেয়াল করেছ, এই সংখ্যার অজ্ঞতায় আগামেমনন কীরূপ হাস্যকর চরিত্র হয়ে উঠেছে? পালামেডিস বলছে, সে-ই প্রথম সংখ্যাকে

আবিষ্কার করেছে এবং ট্রয়ে সৈন্য বাহিনীকে সেই-ই সুবিন্যাস্ত করেছে এবং জাহাজের সংখ্যা সে-ই গণনা করেছে। তার এ-দাবির অর্থ দাঁড়ায় তার পূর্বে এগুলির কোনো গণনা হয়নি এবং আগামেমনন জানত না তার নৌবহরের সংখ্যা কত। কারণ আগামেমনন গণনা করতে জানত না। ফলে আগামেমনন একজন কৌতুকজনক সেনাধিনায়কে পরিণত হয়েছে।

হ্যাঁ, এ-কাহিনী সত্য হলে সে অবশ্যই একজন কৌতুকজনক সেনাধিনায়ক ছিল।

তা হলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে গণনা করা এবং হিসাবের শিক্ষাও সৈনিকের অবশ্যক?

অবশ্যই। সেনাবাহিনী গঠন করতে হলে গণনা করা তাদের শিখতে হবে। অর্থাৎ মানুষ হিসাবে এ তাদের শিখতেই হবে।

কিন্তু এই শাস্ত্র সম্পর্কে তোমার মত কি এক?

তোমার মত কী?

আমার তো মনে হয় এরকম বিষয়েরই আমরা অন্বেষণ করছি। কারণ, এই বিষয়টি মানুষকে চিন্তার পথে নিয়ে যায়। কিন্তু এ-শাস্ত্রের সঠিক ব্যবহার এখনও হয়নি। কারণ, সঠিক ব্যবহারের অর্থ হচ্ছে আত্মাকে অস্তিত্বের দিকে আকর্ষণ করা।

একটু ব্যাখ্যা করো, সক্রেটিস।

চেষ্টা করছি। আমার চেষ্টায় তুমিও যোগ দিও গ্লকন। কোন্ বিষয়ের এই আকর্ষণী ক্ষমতা আছে তাকে স্থির করার চেষ্টায় তুমি আমাকে অন্তত 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' বলে অভয় দিও যেন আমি নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, গণিতকে আমি যেরূপ মনে করছি, গণিতশাস্ত্র সেরূপই।

তুমি ব্যাখ্যা করো।

আমি বলতে চাচ্ছি ঃ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু দুই প্রকারের। এদের কিছু আছে এমন যা চিন্তার লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। কারণ এদের অনুধাবনের জন্য ইন্দ্রিয়ই যথেষ্ট। কিন্তু অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, নির্ভরের এত অযোগ্য যে এদের উপর অধিকতর অনুসন্ধান অপরিহার্য।

সক্রেটিস, তুমি কি দূর থেকে দৃষ্ট বস্তুর কথা বলছ?

না, আমার কথা তা নয়।

তা হলে তুমি কী বলতে চাচ্ছ?

আমি বলছি, যে-বস্তু চিন্তার লক্ষ্যে আসে না সে-বস্তুর দৃশ্যে কোনো পরিবর্তন ঘটে না—অর্থাৎ তার মধ্যে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তর ঘটে না। চিন্তার যোগ্য হচ্ছে সেই বস্তু যার মধ্যে দৃশ্যান্তর সংঘটিত হয়। এক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় যখন বস্তুর উপর নিপতিত হয়, সে-বস্তু নিকটবর্তী কিংবা দূরবর্তী যা-ই হোক, তখন ইন্দ্রিয়ের ওপর কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর স্পষ্ট ছাপ তৈরি হয় না। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমার কথার অর্থটি পরিষ্কার হতে পারে। ধরো আমার এই তিনটি আঙুল আছে ঃ একটা কড়ে আঙুল, একটা দ্বিতীয় আঙুল এবং একটা মধ্য আঙুল।

ভালো কথা।

তোমার মনে হবে আঙুল তিনটি পরস্পর খুবই সন্নিবদ্ধ। আর এখানেই হচ্ছে মূল কথা।

কী কথা?

এরা প্রত্যেকেই তোমার কাছে আঙুল বলে বোধ হবে। মধ্যমেই দেখ কিংবা একেবারে পাশে, সাদা কিংবা কালো, মোটা কিংবা চিকন— যেভাবেই দেখ-না কেন। এরা আঙুল। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য আঙুল হিসাবে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করে না। মধ্যম, সাদা কিংবা মোটা ঃ আঙুল হিসাবে প্রত্যেকই আঙুল। এক্ষেত্রে কাউকে তার মনের কাছে জিজ্ঞেস করতে হয় নাঃ আঙুল কী? কারণ আঙুলের দৃশ্য মনের মধ্যে আঙুলকে আঙুল ব্যতীত অপর কিছু বলে বিভ্রম সৃষ্টি করে না। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

আর এ-কারণেই আমি বলেছি, এমন ক্ষেত্রে চিন্তার কোনো আবশ্যক হয় না।

না, এমন ক্ষেত্রে চিন্তার কোনো আবশ্যক হয় না।

কিন্তু আঙুলের ছোটত্ব, বড়ত্বের ক্ষেত্রে কি একথা বলা চলে? দৃষ্টির পক্ষে কি এরূপ বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে অনুভব করা সম্ভব? একটি আঙুল মধ্যস্থানে, কিংবা অপরটি পাশের দিকে আছে—এগুলি কি আঙুলের ছোটত্ব এবং বড়ত্বের বৈশিষ্ট্যকে প্রভাবিত করে না? এমনিভাবে স্পর্শ কি সম্যকভাবে বস্তুর ঘনত্ব, তার কৃশতা কিংবা পেলবতা অথবা তার কাঠিন্যকে অনুভব করতে পারে? অন্য ইন্দ্রিয় সম্পর্কেও একথা বলা যায়। এরা কি বস্তুর সঠিক পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম? এদের কর্মপদ্ধতিটি কি এরূপ নয় যে, স্পর্শ-ইন্দ্রিয় যখন বস্তুর কাঠিন্যকে অনুভব করে, তখন সে তার পেলবতাকেও অনুভব করে। ফলে সে মনের কাছে একই বস্তুর পরিচয় দিতে যেয়ে বলে ঃ বস্তুটি যেমন কঠিন তেমনি নরম।

তুমিই ঠিকই বলছ, সক্রেটিস।

তা হলে মনের অবস্থা কী হবে? যে-বস্তু কঠিন, সে-বস্তু নরম—ইন্দ্রিয়দত্ত এমন পরিচয়ে মন কি বিভ্রান্ত হবে না? তেমনি হালকা এবং ভারী—এরই-বা অর্থ কী? ইন্দ্রিয় যদি বলে, যা হালকা তা ভারী এবং যা ভারী তা-ই হালকা তা হলে মন কী করবে?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক। এরূপ পরিচয় মনের জন্য বিভ্রান্তিকর। কাজেই এদের উপযুক্ত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

হ্যাঁ, এরূপ সংকটে মনকে হিসাবের আশ্রয় নিতে হয়, তার বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হয়। আর এই উপায়ে মন স্থির করে ঃ বস্তুগুলি এক, না বিভিন্ন?

যথার্থ।

যদি দেখা যায়, বস্তু দুটি পৃথক তা হলে এদের উভয়েই ভিন্ন বস্তু হবে। নয় কি?

হ্যাঁ, ভিন্ন বস্তু হবে।

প্রত্যেকেই যদি ভিন্ন অস্তিত্ব হয় এবং পরস্পরবিরোধী দুটো গুণ মিলে দুটি বস্তু হয়, তা হলে মন তখন তাদের দুটি বস্তু হিসাবেই দেখবে—একটি হিসাবে নয়।

একথাও ঠিক।

কিন্তু দৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পার্থক্য স্পষ্ট নয়। দৃষ্টির কাছে ছোট-বড় অনেক সময়ে একাকার হয়ে যায়।

হ্যাঁ, চোখের কাছে ছোটকে বড় এবং বড়কে ছোট বোধ হতে পারে।

কিন্তু মনকে এই জট ছাড়াতে বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় এবং ছোট বড়কে একাকার না করে ছোটকে ছোট হিসাবে এবং বড়কে বড় হিসাবে দেখতে হয়।

খুবই সত্য কথা, সক্রেটিস।

এখানেই কি আমাদের প্রশ্নেরও শুরু নয় ঃ বড় কী? ছোট কী?

অবশ্যই। এখানেই শুরু।

এবং তার ভিত্তিতেই এসেছে দৃশ্য এবং বোধ্য-এর পার্থক্য?

খুবই সত্য কথা।

গ্লকন, আমি যখন বলেছিলাম, এমন বস্তু আছে যার জন্য বুদ্ধির আবশ্যক—অর্থাৎ যা একই সঙ্গে পরস্পরবিরোধী গুণসম্পন্ন বস্তু হিসাবে দৃষ্ট হয়,

তাকে বোঝার জন্য বুদ্ধির আবশ্যক—তখন আমি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। আবার যে পরস্পরবিরোধী বলে বোধ হয় না, তার জন্য বুদ্ধির আবশ্যক হয় না।

আমি তোমাকে বুঝতে পারছি, সক্রেটিস। তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তা হলে ঐক্য এবং সংখ্যাকে আমরা কিসের অন্তর্ভুক্ত করব?

আমি ঠিক জানিনে, সক্রেটিস।

একটু চিন্তা করো গ্লকন। চিন্তা করলে দেখবে, পূর্বে যে-আলোচনা হয়েছে তার মধ্যেই এরও জবাব নিহিত আছে। কারণ সহজ ঐক্য যদি আমাদের দৃষ্টি কিংবা অপর কোনো ইন্দ্রিয়, একটি আঙুলের ন্যায় অনুভব করতে পারে তা হলে আর চিন্তার আবশ্যক হবে না। অস্তিত্বের দিকে তখন অগ্রসর হওয়ার আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি সব সময়েই কোনো পরস্পরবিরোধিতা দেখা দেয়, একটিকে অপরটির বিরোধী বলে বোধ হয় এবং বহুত্বের ভাব এর মধ্যে নিহিত থাকে তা হলে আমাদের মধ্যে চিন্তা আলোড়িত হয়ে ওঠে। চিত্ত তখন সংকটগ্রস্ত হয় এবং সিদ্ধান্তের জন্য সে প্রশ্ন করে ঃ চরম ঐক্য কী? এইভাবেই একক বা ঐক্যের আলোচনার একটা ক্ষমতা আছে মনকে যথার্থ অস্তিত্বের দিকে আকর্ষিত করার।

গ্লকন বললেন ঃ আর এটি বিশেষ করে ঘটে একের প্রশ্নে। কারণ আমরা একই বস্তুকে এক এবং বৈচিত্র্যে অসংখ্য বলে অনুভব করি।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছে। এবং একথা একের সম্পর্কে যেরূপ সত্য, তেমনি সকল সংখ্যা সম্পর্কেই সত্য।

অবশ্যই।

আর গণিত এবং গণনা—সকলকেই সংখ্যা দিয়ে কারবার করতে হয়?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

এবং তারা মনকে সত্যের পথে নিয়ে যায়?

হ্যাঁ, বিশেষভাবেই তারা মনকে সত্যের পথে নিয়ে যায়।

তা হলে, যে-জ্ঞানের আমরা অন্বেষণ করছি সে এই জ্ঞানই হবে—যাকে সামরিক এবং দার্শনিক, উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা চলবে। কারণ, যোদ্ধাকেও গণনার কৌশল জানতে হবে। না হলে তার পক্ষে সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিন্যস্ত করা সম্ভব হবে না। দার্শনিককেও সংখ্যার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, কারণ, তাকে পরিবর্তনের সমুদ্রকে অতিক্রম করে যথার্থ অস্তিত্বের উদ্‌ঘাটন করতে হবে। কাজেই তাকেও গাণিতিক হতে হবে।

তোমার কথা সত্য।

আর আমাদের অভিভাবক তথা শাসক হচ্ছে যোদ্ধা এবং দার্শনিক উভয়ই।

অবশ্যই।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের বিধানকারীকে এরূপ জ্ঞানের বিধান করতে হবে। যে আমাদের রাষ্ট্রের শাসক হবে তাকে গণিতশাস্ত্র অধ্যয়নে সম্মত করতে হবে। কিন্তু সে অধ্যয়ন কোনো শৌখিন ব্যাপার নয়। তাকে গুরুত্বসহকারে সংখ্যার তত্ত্বকে অধ্যয়ন করতে হবে। যতক্ষণ-না তার মন সংখ্যার প্রকৃতিকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, ততক্ষণ এই শিক্ষা তার চলতে থাকবে। তার সংখ্যার শিক্ষা বণিক কিংবা ব্যবসায়ীর মনোভাবে নিয়ে করলে চলবে না। কেননা বেচাকেনায় তার সংখ্যার শিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে না। সংখ্যাশাস্ত্রকে শিখতে হবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে ব্যবহারের জন্য এবং আত্মাকে উন্নত করার জন্য। কারণ আত্মার জন্য, পরিবর্তনের প্রবাহ থেকে অস্তিত্বে উত্তরণের এটিই হচ্ছে সহজতম পথ।

তুমি চমৎকাররূপে বলেছে, সক্রেটিস।

বিষয়টির প্রয়োজনীয়তার কথা আমি বলেছি। এবার আমি বলব, কী চমৎকার জ্ঞানের এই মাধ্যমটি। দোকানির মনোভাব নয়, দার্শনিকের মনোভাব নিয়ে যদি আমরা চর্চা করি তা হলে কত উপায়ে যে এ আমাদের লক্ষ্যসাধনে সাহায্য করে তার ইয়ত্তা নেই।

কেমন করে সাহায্য করে?

আমি আগেই বলেছি, গণিতের একটা বড় রকমের মহৎকরণের প্রভাব আছে। গণিত আত্মাকে বিশ্লিষ্ট সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে এবং যুক্তির মধ্যে দৃশ্যকে টেনে আনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তুমি নিশ্চয়ই জান এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ যখন হিসেব করেন তখন তাঁরা অবিভাজ্য একককে ভাগ করাতে আপত্তি করেন এবং কেউ এরূপ ভাগ করার চেষ্টা করলে তাকে উপহাস করে নিবৃত্ত করার প্রয়াস পান। তুমি যদি 'এক'কে ভাগ কর তখনই তারা তাকে গুণের মাধ্যমে পুরো করে দেবেন। তাঁদের সতর্ক দৃষ্টি ঃ যেন 'একে'র পুরো অস্তিত্ব বজায় থাকে এবং ভগ্নাংশের মধ্যে তার অস্তিত্ব হারিয়ে না যায়।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

এবার মনে করো, কোনো মানুষ এই বিশেষজ্ঞগণকে লক্ষ্য করে বলল ঃ "মহামতিগণ। আপনাদের এই মহাশ্চর্য 'সংখ্যা' বস্তুটি কী যার উপর আপনারা

এত মাথা ঘামাচ্ছেন, যার সম্পর্কে আপনাদের দাবি যে, এর প্রতিটি একক অপর এককের ঠিক সমান, আবার একক হিসাবে এরা কেউই বিভাজ্য নয়?" তা হলে—বিশষজ্ঞগণ এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবেন বলে তুমি মনে কর গ্লকন?

আমার তো মনে হয় তাঁরা জবাবে বলবেন যে, তাঁরা এমন সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছেন যা কেবল চিন্তার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

তা হলে এ-জ্ঞানকে আমরা যথার্থভাবেই প্রয়োজনীয় বলতে পারি, কারণ, বিশুদ্ধ সত্যের দর্শনে এ-জ্ঞান বিশুদ্ধ বুদ্ধির ব্যবহারকে প্রয়োজনীয় করে তোলে।

হ্যাঁ, এটি তার একটি বৈশিষ্ট্য।

তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যাদের মধ্যে হিসাবের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তারা অন্য সব বিষয়ও দ্রুত শিখতে পারে। এমনকি যাদের বুদ্ধি কিছু কম, তাদেরও যদি অঙ্কের শিক্ষা দেওয়া যায় তা হলে অপর কোনো লাভ না হলেও, তাদের বুদ্ধি পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তবে হ্যাঁ, অঙ্কের মতো কঠিন বিষয়ও কম আছে।

একথা খুবই সত্য।

এই সকল কারণে, গণিত এমন একটি জ্ঞান যার শিক্ষায় উত্তম নাগরিককে শিক্ষিত করা আবশ্যক এবং এ-শিক্ষা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

তোমার সঙ্গে আমি একমত।

তা হলে আমাদের শিক্ষাসূচিতে গণিত একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে। এবার গণিতের অনুরূপ অন্য বিষয় সম্পর্কেও আমাদের আলোচনা করতে হয়।

তুমি কি জ্যামিতির কথা বলছ, সক্রেটিস?

তুমি ঠিকই ধরেছ, গ্লকন।

হ্যাঁ, জ্যামিতির যেদিক যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত সেদিক নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। কারণ শিবিরস্থাপন, বাহিনী নিয়ে অবস্থানগ্রহণ অথবা ব্যূহকে চেপে ধরা বা বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি বৃদ্ধি করা কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা অগ্রগতির পথে, অপর কোনো কৌশলের জন্য অধিনায়ককে অবশ্যই জ্যামিতিজ্ঞ হতে হবে। সমর-অধিনায়কের এ-বিষয়ে জ্ঞান থাকা না-থাকার উপর অবস্থার বিপুল ব্যবধান ঘটে যাবে।

তুমি ঠিক বলেছ, গ্লকন। কিন্তু এ জন্য জ্যামিতি বা গণিতের অল্পকিছু জ্ঞান থাকাই যথেষ্ট। কিন্তু আমি বলছি জ্যামিতির উচ্চতর দিকের কথা। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জ্যামিতির সেই দিক আমাদের উত্তমের জ্ঞানকে অধিকতর সহজ করে কি না। আমরা বলেছি, জ্ঞানের যে-কোনো বিষয়ের করণীয় হচ্ছে আত্মাকে আলোর দিকে আকৃষ্ট করা।

যথার্থ।

জ্যামিতি যদি আমাদের সত্যদর্শনে বাধ্য করে তা হলে জ্যামিতি আমাদের অবশ্যই প্রয়োজন; কিন্তু যদি তার লক্ষ্য হয় কেবল পরিবর্তনকে প্রকাশ করা, তা হলে জ্যামিতিতে আমাদের প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, তা-ই আমরা বলব।

কিন্তু যাদের জ্যামিতির সঙ্গে সামান্য পরিচয়ও আছে তারাই বলবে যে জ্যামিতির এরূপ ধারণা জ্যামিতিকদের সাধারণ ভাষার একেবারেই বিরোধী।

কীভাবে?

কারণ, এরা 'বর্গক্ষেত্র', প্রয়োগ' 'যোগ' ইত্যাকার সব কর্মের কথা বলে। এরূপ ভাষার অর্থ হচ্ছে, জ্যামিতির লক্ষ্য যেন কিছু করা। অথচ সমগ্র বিষয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞান ঃ স্থায়ী অস্তিত্বের জ্ঞান। যে-অস্তিত্ব এখন আছে তখন নেই, তার জ্ঞান নয়।

হ্যাঁ, এ-সম্পর্কে ভিন্নমতের কারণ নেই ঃ জ্যামিতি অবশ্যই শাশ্বত অস্তিত্বের জ্ঞান।

তা-ই যদি হয়, তা হলে জ্যামিতি আত্মাকে সত্যের দিকেই আকর্ষণ করবে এবং দার্শনিকবোধের দৃষ্টি বর্তমানে যেখানে জাগতিক বিষয়ে নিবদ্ধ সেখানে জ্যামিতি তাকে ঊর্ধ্বমুখী করে তুলবে।

নিঃসন্দেহে।

তা হলে এ-বিধান আমাদের কঠিনভাবেই প্রণয়ন করতে হবে যে, আমাদের মহৎ নগরীর সকল অধিবাসীকে অবশ্যই জ্যামিতির শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া জ্যামিতির পরোক্ষ ফলও কম নয়।

কীরকমের পরোক্ষ ফল?

আমি বললাম ঃ সামরিক সুবিধার কথা তুমি ইতিপূর্বেই বলেছ। তা ছাড়া অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, সকল বিভাগেই যারা জ্যামিতি

অধ্যয়ন করেছে তাদের অনুধাবনক্ষমতা যারা জ্যামিতি অধ্যয়ন করেনি তাদের চেয়ে বহু গুণ অধিক।

হ্যাঁ, একথা সত্য। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বিরাট।

তা হলে এসো আমরা স্থির করি, তরুণদের জন্য জ্যামিতি দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে আমাদের শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত হবে।

হ্যাঁ, এরূপ সিদ্ধান্তই আমরা করব।

তা হলে আমাদের তৃতীয় বিষয় কী হবে? জ্যোতির্বিজ্ঞান? তুমি কী বল?

এ-প্রস্তাবটি আমি বিশেষভাবেই সমর্থন করি। কারণ ঋতু, মাস এবং বর্ষ-পরিক্রমের পর্যবেক্ষণ যেমন কৃষক এবং নাবিকের জন্য প্রয়োজন, তেমনি সমর-অধিনায়কের জন্যও প্রয়োজন।

পাছে লোকে তোমাকে অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবক মনে করে, তার জন্য যে তুমি বেশ শঙ্কিত বোধ করছ, সেটি আমার নজর এড়ায়নি। বস্তুত, এ-সত্য অনুধাবন করা কঠিন যে, আমাদের প্রত্যেকের আত্মায় এমন একটি চোখ আছে, যে আমাদের সত্যদর্শনের একমাত্র উপায় এবং যার আলো অপর কোনো আকর্ষণে নির্বাপিত কিংবা স্তিমিত হলে এরূপ বিশুদ্ধ বিষয়ের অধ্যয়ন তাকে আবার প্রজ্বলিত করে তোলে। যারা আত্মার এই ক্ষমতাকে স্বীকার করে তারা তোমার প্রস্তাব নির্দ্বিধায় সমর্থন করবে। কিন্তু যারা আত্মার এই ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ, তারা এ-প্রস্তাবকে নিরর্থক গণ্য করবে। কারণ, এরূপ বিষয়ের অধ্যয়নে তারা তাদের স্বার্থসাধনকারী কোনো লাভকে দেখতে পাবে না। কাজেই তোমাকে স্থির করতে হবে, কোন্ পক্ষের তুমি জবাব দেবে। অথবা তুমি বলতে পার, কোনো পক্ষের সঙ্গে যুক্তিপ্রদানের তোমার আগ্রহ নেই। তোমার যুক্তিপ্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজেকে উন্নত করা। অপর কেউ যদি তোমার এ-আলোচনায় উপকৃত বোধ করে তা হলে এ-আলোচনায় তার যোগদানেও তোমার কোনো আপত্তি হবে না।

আমি বলব আমার নিজের জন্যই আমি আলোচনাটি চালিয়ে যেতে চাই।

তা হলে চলো, এক পা আমরা পিছিয়ে যাই। কারণ শিক্ষাসূচিতে বিষয়ের ক্রমে আমরা কিছু ভুল করেছি।

কী ভুল করেছি, সক্রেটিস?

সরল জ্যামিতি থেকে একচোটে আমরা ঘন জ্যামিতির ঘূর্ণ্যমান বস্তুর বিষয়ে চলে গেছি। আমাদের উচিত ঘনবস্তু নিয়েই প্রথমে আলোচনা করা।

কারণ, বস্তুর তৃতীয় মাত্রা তার দ্বিতীয় মাত্রার পরেই আসে। এবং তখনই মাত্র আমরা বস্তুর ঘনক এবং বেধসম্পন্ন অপর সকল গঠন নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

একথা ঠিক। কিন্তু সক্রেটিস, এ-বিষয়টির উপর আলোচনা খুব কমই হয়েছে।

তার কারণ দুটি। প্রথমত, কোনো সরকারই এর পৃষ্ঠপোষকতা করে না। ফলে এর চর্চায় যে-উৎসাহের প্রয়োজন তার অভাব ঘটে। বিষয়টি কঠিন। দ্বিতীয়ত, কোনো ছাত্রের পক্ষে এ-জ্ঞান শিক্ষক ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে কোনো শিক্ষক পাওয়াও কঠিন। এবং বর্তমান অবস্থায় যদিবা শিক্ষক পাওয়া যায় তবু যে-ছাত্রগণ অহংকারী হয়ে উঠেছে তারা এই শিক্ষকের নির্দেশ পালন করবে না। অবশ্য রাষ্ট্র নিজে যদি এই বিষয়ের শিক্ষক হয় এবং এ-বিষয়ের শিক্ষাদাতাকে সম্মানিত করে, তা হলে অবস্থাটির পরবর্তন হবে। তখন শিক্ষার্থীর অভাব হবে না। ছাত্রগণ তখন এ-বিষয়ের শিক্ষায় যোগদান করতে চাইবে, বিষয়ের উপর ধারাবাহিক এবং নিষ্ঠাপূর্ণ অনুসন্ধানও চলবে এবং আবিষ্কারও সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমানে যখন সাধারণ জগৎ একে অবহেলা করছে এবং তার নিজের অবয়বকে বিকৃত করা হয়েছে এবং এর অনুসারীদের কেউ যখন যথার্থভাবে এর উপকারিতার কথা বলতে পারে না, তখন জ্যোতির্বিজ্ঞান তার স্বাভাবিক আকর্ষণশক্তিতে জ্ঞানের মধ্যে নিজের জন্য একটি আসন তৈরি করে নিয়েছে। তাই একথা অবশ্যই বলা যায় যে, রাষ্ট্রের সাহায্য পেলে জ্ঞানের এই বিষয়টি উজ্জ্বল আলোতে বেরিয়ে এসে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত।

হ্যাঁ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটা অদ্ভুত প্রভাব আছে। কিন্তু বিষয়ক্রমে ভুলের কথাটি আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না, সক্রেটিস। তুমি তো প্রথমে সমতলের জ্যামিতি নিয়ে শুরু করেছিলে?

হ্যাঁ, আমি তা-ই করেছিলাম, গ্লকন।

এবং জ্যোতিষকে তুমি তার পরে এনেছিলে। কিন্তু তার পরে দেখছি তুমি এক পা পিছিয়ে গেলে।

হ্যাঁ গ্লকন, এবং ওরূপ তাড়াহুড়া করতে যেয়েই আমি তোমার বিলম্ব ঘটিয়ে দিলাম। স্বাভাবিকভাবে ঘন জ্যামিতির দুরবস্থার বিষয়টি তার পরই আসত। কিন্তু আমি তাকে বাদ দিয়ে সরল জ্যামিতির পরেই ঘূর্ণ্যমান বস্তুর বিজ্ঞান, জ্যোতিষ নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম।

হ্যাঁ, তুমি তা-ই করলে।

যা-ই হোক, রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করলে যে-জ্ঞানকে আমরা বাদ রেখেছিলাম সে নিজের আসন করে নিতে পারবে, একথা ধরে নিয়ে এসো, আমরা জ্যোতিষকে আমাদের শিক্ষাসূচির চতুর্থ স্থানে স্থাপিত করি।

গ্লকন বললেন ঃ এ-ক্রম ঠিকই হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার ইতিপূর্বে স্থূল প্রশংসাকে তুমি ভর্ৎসনা করেছিলে। এবার তা হলে আমি তোমার মনোভাব নিয়েই এই জ্ঞানের প্রশংসা করি। কারণ, আমিও মনে করি, যে-কাউকেই স্বীকার করতে হবে, জ্যোতিষ আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী হতে বাধ্য করে এবং এই লোক থেকে অপর কোনো লোকে আমাদের নিয়ে যায়।

আমি বললাম ঃ আমাকে বাদ দিয়ে অপর সকলকেই সে হয়তো অপর কোনো লোকে নিয়ে যায়। কেননা বিষয়টি অপর সকলের নিকট পরিষ্কার হলেও আমার নিকট পরিষ্কার হয়নি।

তা হলে তুমি কী বলতে চাও, সক্রেটিস?

আমি বরঞ্চ বলব, যারা জ্যোতিষকে দর্শনে পরিণত করে তারা আমাদের অধোমুখীই করে, উর্ধমুখী নয়।

তোমার এমন কথার অর্থ কি?

আমি বললাম ঃ গ্লকন, ঊর্ধ্বলোকের জ্ঞান সম্পর্কে তোমার একটি পবিত্র ধারণা রয়েছে। আমি বলতে পারি, যদি কোনো মানুষ তার মাথাটা পেছনে হেলিয়ে উপরের ক্ষয়গ্রস্ত ছাদকে পর্যবেক্ষণ করে, তবু তুমি বলবে তার চোখ নয়, তার মনই এই ঊর্ধ্বলোককে অবলোকন করছে। হতে পারে তুমিই ঠিক এবং আমি মূর্খ। কিন্তু আমার মতে কেবল সেই জ্ঞানই আমাদের আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী করতে পারে যে জ্ঞান হচ্ছে অদৃশ্যের এবং অস্তিত্বের জ্ঞান। এ ছাড়া কেউ বিস্ময়ান্বিত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে হাঁ করে তাকাল কিংবা নিম্নমুখী হয়ে সে দৃষ্টিকে সংকুচিত করল—এটা আমার নিকট মূল্যবান নয়। বস্তুত, এমনিভাবে দৃশ্যজগতের সে যা কিছুই শিখতে চাক-না কেন, আমি বলব তার পক্ষে কোনোকিছুই শেখা সম্ভব হবে না। কেননা, এর কিছুই জ্ঞান নয়। সমুদ্রে কিংবা ভূমিতে সে ভাসমান কিংবা তার নিজ পৃষ্ঠদেশের উপর সে শায়িত, তার জ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসলে তার আত্মা অধোমুখী, ঊর্ধ্বমুখী নয়।

গ্লকন বললেন ঃ তোমার ভর্ৎসনার যাথার্থ্যকে আমি স্বীকার করি। তবুও আমার প্রশ্ন হচ্ছে, জ্যোতিষকে অধিকতর জ্ঞানদায়ী করে আমরা আর কীরূপে তাকে অধ্যয়ন করতে পারি?

আমি বলছি ঃ নক্ষত্রময় যে-আকাশকে একটা দৃশ্যমান পটভূমিতে আমরা দেখি, সে-আকাশ দৃশ্যমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যতই বিস্ময়কর এবং উৎকৃষ্ট বলে বোধ হোক-না কেন, সে-আকাশ যেহেতু দৃশ্যমান সে-কারণেই যথার্থ সত্যের তুলনায় সে ঢের বেশি নিকৃষ্ট। চরম গতি এবং চরম স্থিতি—যারা কেবল যে পরস্পরনির্ভরশীল তা-ই নয়, যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত সকল গঠন এবং সংখ্যাকেই তাদের গতির সঙ্গে বহন করে, সেই গতি এবং স্থিতির তুলনায় আমাদের দৃশ্যমান আকাশ অনেক বেশি নিকৃষ্ট। কিন্তু এই যথার্থ গতি এবং স্থিতিকে কেবলমাত্র বুদ্ধির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা চলে, দৃষ্টির মাধ্যমে নয়। তুমি কী বল?

তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস।

নক্ষত্রখচিত আকশকে আমরা একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যবহার করব।

আমাদের উদ্দেশ্য হবে এর মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানকে অর্জন করা। তাদের সৌন্দর্য ডিডালাস[১] কিংবা অপর কোনো শিল্পীর হাতে উত্তমরূপে অঙ্কিত চিত্রের সৌন্দর্যের মতো। যে-কোনো জ্যামিতিক সে-ছবি দেখেছে সে-ই তার গঠনের কারিগরি কৌশলের প্রশংসা করবে। কিন্তু তাই বলে সেই গঠনের মধ্যে জ্যামিতিক তার যথার্থ সমতার, কিংবা দ্বিত্বের বা অপর কোনো অনুপাতের সাক্ষাৎলাভ করবে, এরূপ কল্পনাও নিশ্চয়ই কেউ করবে না।

না। এরূপ কল্পনা করা অদ্ভুতই হবে।

এবং যথার্থ জ্যোতির্বিদ সে যখন নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তখন তার মনেও কি অনুরূপ ভাবেরই সৃষ্টি হবে না? তারও মনে হবে, উর্ধ্বাকাশ এবং তার নক্ষত্ররাজির যে স্রষ্টা সে তাদের এমনি পূর্ণ করে তৈরি করেছে। কিন্তু সে নিশ্চয়ই মনে করবে না যে রাত্রি এবং দিনের যে-অনুপাত কিংবা এদের উভয়ের সঙ্গে মাসের এবং মাসের সঙ্গে বৎসরের কিংবা নক্ষত্রের সঙ্গে এদের কিংবা তাদের পরস্পরের কিংবা অপর কোনো বস্তুর যে-অনুপাত, যা আমাদের কাছে দৃশ্য, তাও শাশ্বত এবং তাদের কোনো বিচ্যুতি ঘটতে পারে না। এমন চিন্তা করা স্পষ্টতই অসঙ্গত হবে। এবং এদের যথার্থ সত্যনির্ধারণের জন্য এত পরিশ্রমসহকারে অনুসন্ধানকার্য চালানোকে আমরা সমভাবেই অসঙ্গত বলব।

---

১. ডিডালাস ঃ গ্রীক উপাখ্যানে বর্ণিত বিখ্যাত শিল্পী। ডিডালাস আইকারাসের পিতা ছিলেন। ডিডালাস নিজের দেহে পাখা যুক্ত করে ক্রিটের রাজা মিনোসের রোষ থেকে বাঁচার জন্য পুত্র আইকারাসকে সঙ্গে নিয়ে ইজিয়ান সাগরের উপর দিয়ে ক্রিট থেকে সিসিলি উড়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপেই একমত, সক্রেটিস। তবে এ-সম্পর্কে আমি পূর্বে চিন্তা করিনি।

তা হলে জ্যামিতির ক্ষেত্রে যেমন, জ্যোতিষের ক্ষেত্রেও তেমনি আমরা যদি আমাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে চাই এবং বিষয়টিকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চাই তা হলে ঊর্ধ্বাকাশের বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে জ্যোতিষের সমাধানযোগ্য সমস্যা নির্দিষ্ট করাই আমাদের আবশ্যক।

গ্লকন বললেন ঃ কিন্তু তেমন সমস্যার সমাধান আমাদের বর্তমান জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ক্ষমতার নিশ্চয়ই বাইরে?

হ্যাঁ, একথা ঠিক। কিন্তু বিধায়ক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব যদি পালন করতে চাই তা হলে তাদের জন্য এরূপ সমস্যা আমাদের নির্দিষ্ট করতে হবে। কিন্তু তুমি কি উপযুক্ত অপর কোনো বিষয়ের কথা চিন্তা করছ?

না। এই মুহূর্তে আমার তেমন কোনো বক্তব্য নেই।

আমি বললাম ঃ গতিরও অনেক রূপ আছে, কেবল একটি নয়। দুটি রূপ তো আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছেই স্পষ্ট। অন্য রূপগুলোর অনুধাবনের কাজ অবশ্য অধিকতর জ্ঞানীদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

কিন্তু যে-দুটি রূপের কথা বলছ—সে-দুটি রূপ কী?

দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের উল্লিখিত একটির পরিপূরক।

কী সেটি?

এই দ্বিতীয়টি আমাদের কানের নিকট তেমনই বোধ হবে, প্রথমটি চোখের কাছে যেরূপ বোধ হয়েছে। কারণ, আমি মনে করি চোখ যেমন তৈরি হয়েছে ঊর্ধ্ব নক্ষত্রের দিকে তাকাবার জন্য, তেমনি আমাদের কানও তৈরি হয়েছে সঙ্গতিপূর্ণ গতির জন্য। এবং পাইথাগোরীয়গণ[১] যেভাবে বলেছেন, এ-দুটি জ্ঞান তেমনিভাবে সহযোগী জ্ঞান। এ বিষয়ে পাইথাগোরীয়দের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি, কী বল গ্লকন?

হ্যাঁ, এক্ষেত্রে আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারি।

আমি বললাম ঃ কিন্তু এটি বেশ পরিশ্রমসাধ্য বিষয়। এই আলোচনার পূর্বে আমাদের একে শিখতে হবে। এর শিক্ষকরাই আমাদের বলবেন, এই সমস্ত

---

১. পাইথাগোরীয়গণ ঃ প্রাচীন দার্শনিক পাইথাগোরাস বা পিথাগোরাস (৫৮০–৫০০ খ্রিঃ পূঃ)-এর অনুসারীগণ। পাইথাগোরাসের মতে বিশ্ব-অস্তিত্বের মূল হচ্ছে সংখ্যা। তাঁর অনুসারীগণ সংখ্যার উপর অলৌকিক ক্ষমতাও আরোপ করতেন। সংখ্যা ছিল তাঁদের কাছে শক্তির প্রতীক।

জ্ঞানের অপর কোনো প্রয়োগ সম্ভব কি না। যা-ই হোক আমাদের উচ্চতর লক্ষ্যটিকেও বিস্মৃত হলে চলবে না।

উচ্চতর কোন্ লক্ষ্যের কথা বলছ?

প্রত্যেক জ্ঞানেরই একটা লক্ষ্য থাকবে, সম্পূর্ণতাকে অর্জন করা। আমাদের শিক্ষার্থীদেরও সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ ব্যর্থতা দেখেছি, এক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষার্থীর সেরূপ ব্যর্থ হলে চলবে না। কারণ, তুমি নিশ্চয়ই জান সঙ্গতির জ্ঞানেও একই সমস্যা। জ্যোতিষশাস্ত্রীয়দের মতো, সঙ্গতি বা ঐকতানের যাঁরা শিক্ষক তাঁরাও শব্দ এবং তার শ্রুত মিলকে তুলনা করার বৃথা চেষ্টায় তাঁদের সময় নষ্ট করেন।

গ্লকন বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ, সক্রেটিস। এ-বিষয়ে তাঁদের আলোচনা যথার্থই বালসুলভ। তাঁরা দুই শব্দের মধ্যবর্তী বিষয়কে অন্বেষণ করেন এবং তাকে পাবার জন্য এরূপ একনিষ্ঠতার সঙ্গে কান পেতে থাকেন যেন তাঁরা প্রতিবেশীর কোনো আলোচনাকে আড়ি পেতে শ্রবণ করছেন। এই প্রক্রিয়ায় একদল বলে ওঠেন, তাঁরা একটি অন্তরালকে আবিষ্কার করেছেন এবং শব্দ-পরিমাপের একক হিসাবে ন্যূনতম বিষয়কে তাঁরা স্থির করেছেন। অপরপক্ষ প্রতিবাদ করে বলেন ঃ না, শব্দ দুটি মিলে গেছে—তাদের মধ্যে কোনো বিরাম নেই। এই সমস্যার সমাধানে দু দলই যেন তাঁদের বুদ্ধির দেয়ালে কান পেতে বসে থাকেন।

গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই সেই ভদ্রলোকদের কথা বলছ যারা বীণার তারগুলোর কান মলে মলে তাদের বিরক্তির একশেষ করে ছাড়েন। আমি তোমার উপমাটি আর-একটু বাড়িয়ে নিয়ে ছিলার ওপর ধনুকের আঘাত, তার বিরুদ্ধে করা এবং না-করার অভিযোগ, তার কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা এবং ছিলার দ্বিধাহীন অস্বীকারের কথা বলতে পারি।[1] কিন্তু আমি তা বলব না। আমি শুধু বলব, এদের কথা আমি ভাবিনি। আমি ভেবেছি পাইথাগোরীয়দের কথা। তারাই শব্দের ঐকতান সম্পর্কে আমাদের বলতে পারে। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেমন, এঁরাও তেমনি শ্রুত শব্দের মধ্যে সাংখ্যিক সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। কিন্তু এঁরাও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতোই ভ্রান্ত। কারণ, এঁরা এর কোনো সমস্যা নির্ধারণ করতে পারেন না। অর্থাৎ সংখ্যার স্বাভাবিক সঙ্গতির সত্যকে এঁরা আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। এঁরা বলতে পারেন না, সংখ্যার মধ্যে কতকগুলিকে এঁরা কেন সঙ্গতিময় বলছেন, কেনই-বা অপরগুলিকে সঙ্গতিহীন বলছেন।

---

১. এই উপমাটিতে অভিযোগের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য দাসদের উপর অত্যাচারের প্রচলিত প্রথাটির আভাস পাওয়া যায়।—কর্নফোর্ড

এ-সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই মানুষের সাধ্য নয়।

কিন্তু তবু এরূপ চেষ্টাকে আমরা কাজের চেষ্টা বলতে পারি, একেবারে অকাজের নয়। পরিণামে উত্তম এবং সুন্দরকে লাভ করাই যদি উদ্দেশ্যে হয়, তা হলে এ-চেষ্টা কাজের চেষ্টা। অন্যথায় এ হবে অকাজের চেষ্টা।

খুবই সত্য কথা।

কিন্তু এই সমস্ত বিষয়কে আমাদের সংবদ্ধ করতে হবে। সকল জ্ঞান যখন সুসংবদ্ধ হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যে যখন আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হবে, এবং তাদের পারস্পরিক সাযুজ্যের চরিত্রে যখন আমরা সকল জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারব, তখনই মাত্র আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য সর্থক হবে। অন্যথায় এ-শিক্ষা আমাদের কোনো উপকারসাধন করবে না।

আমিও তাই মনে করি। কিন্তু সক্রেটিস, তুমি এক বিরাট দায়িত্বের কথা বলছ।

কী বলছ গ্লকন! সূচনাকেই তুমি বিরাট বলছ? তুমি কি জান না, যে-বিষয়গুলির আমরা উল্লেখ করেছি তা আমাদের মূল বিষয়ে যাওয়ার সূচনামাত্র। কারণ তুমি নিশ্চয়ই দক্ষ গাণিতিককে একজন দ্বান্দ্বিক বা দার্শনিক বলবে না?

অবশ্যই না। কারণ এমন কোনো গাণিতিককে আমি জানিনে যে একই সঙ্গে যুক্তিবিদও।

কিন্তু যে-মানুষ যুক্তি আদান-প্রদানে দক্ষ নয় তার পক্ষে যে-জ্ঞানের আমরা উল্লেখ করেছি সে-জ্ঞান কি অর্জন করা সম্ভব হবে?

না। এরূপও আমরা আশা করতে পারিনে।

গ্লকন, তা হলে আমরা বলতে পারি যে, আমরা দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শনের[১] স্তব-ক্ষেত্রটিতে উপস্থিত হয়েছি। এ-জ্ঞানের প্রক্রিয়া হচ্ছে, কেবল বুদ্ধির প্রক্রিয়া। অবশ্য দৃশ্যজগতেও এর অনুকারী থাকে। কারণ তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে দৃষ্টি সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম যে, দৃষ্টিও কিছু পরে যথার্থ জন্তু এবং তারকা এবং সবশেষে সূর্যকেও দেখতে পারে। দর্শনের ক্ষেত্রেও তা-ই। যখন কোনো মানুষ কেবলমাত্র যুক্তির আলোতে, ইন্দ্রিয়ের কোনোরূপ সাহায্য ব্যতিরেকে পরম সত্তাকে আবিষ্কারের যাত্রা শুরু করে এবং বিরামহীনভাবে এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে-অভিযানে অগ্রসর হতে থাকে যে, বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা পরম

১. ইংরেজি 'ডায়ালেকটিকস' শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করার জন্য 'দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শন' কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে।

সত্যকে উপলব্ধি না করা পর্যন্ত তার যাত্রা সে থামাবে না, তা হলে দৃষ্টি যেমন দৃশ্যের শেষে সূর্যকে দেখছে, তেমনি যুক্তি তার যাত্রার শেষে পরম সত্তাকে অবলোকন করবে।

যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

তা হলে এই অগ্রগতিকেই তুমি দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শন বলবে?

হ্যাঁ।

আমাদের গুহার বন্দিদের মুক্ত করে দিয়ে তাদের মুখকে ছায়া থেকে প্রতিকৃতির দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে-প্রতিকৃতি ছায়াগুলিকে নিক্ষেপ করেছিল এবং অগ্নির দিকেও তাদের দৃষ্টি পড়েছিল। গুহা থেকে তারপর বন্দিরা সূর্যের আলোতে উঠে এসেছিল। এখানে তারা জন্তু এবং উদ্ভিদ এবং সূর্যকে প্রথম দেখতে পাচ্ছিল না। তখন তারা পানির মধ্যে যথার্থ বস্তুর নিক্ষিপ্ত ছায়ার দিকে তাকাল। এ-ছায়া যথার্থ বস্তুর ছায়া ছিল, আগুনের আলো দ্বারা নিক্ষিপ্ত প্রতিকৃতির ছায়া নয়। এই পরিক্রমেই আমাদের শিক্ষার বিষয়গুলি আত্মার উত্তম চরিত্রকে ধাপে ধাপে পরম সত্য অবলোকনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে—যেমন করে আমাদের দেহের সবচাইতে অনুভবকারী ইন্দ্রিয় দৃশ্যজগতের সার্বাধিক উজ্জ্বল বস্তুকে ক্রমান্বয়ে এবং সর্বশেষে দেখতে সক্ষম হয়েছে।

সক্রেটিস, তুমি যা বলেছ, তার সঙ্গে আমি একমত। যদিও এর কিছু আছে যা গ্রহণ করা শক্ত এবং কিছু আছে যা অস্বীকার করা শক্ত। যাহোক, বিষয়টির আলোচনা এখনই শেষ হবে, এমন আমরা মনে করতে পারিনে। একে বারংবারই আমাদের আলোচনা করতে হবে। তাই আমাদের সিদ্ধান্ত পরিণামে সত্য কিংবা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সে-প্রশ্ন মুলতুবি রেখে আমাদের অভিমতকে সত্য ধরে নিয়ে সূচনা থেকে সরাসরি মূল বিষয়টিতে যাওয়া এবং ভূমিকার মতোই বিস্তৃতভাবে বিষয়টির আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। তুমি আমাদের বলো, এই দ্বান্দ্বিকতার বা দর্শনের শক্তি কী এবং তার বিভাগ কয়টি এবং কী উপায়ে আমরা এই দর্শনে পৌঁছতে সক্ষম হব। কারণ, এই পথ ধরেই আমরা আমাদের এই যাত্রার শেষ লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হতে পারব।

প্রিয় গ্লকন, এর অধিক তুমি আমার সঙ্গে অগ্রসর হতে পারবে না। আমার অনিচ্ছার কারণে নয়, কারণ, এর পর যা তুমি অবলোকন করবে তা আর প্রতিকৃতি হবে না, তা যথার্থ সত্য হবে। আমার দৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কেও আমি

নিশ্চিত নই। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, এবার আমাদের জন্য যথার্থই দর্শনীয় কিছু থাকবে। তুমি কি এরূপ মনে কর না?

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু গ্লকন, তোমাকে আমি একথাও স্মরণ করিয়ে দেব যে, দ্বান্দ্বিকতার শক্তিই মাত্র এই সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে পারে এবং আমরা যেসব জ্ঞানের উল্লেখ করেছি তার অনুসারীদের নিকটই মাত্র এই সত্য উদ্ভাসিত হবে। ঠিক নয় কি?

এ-সম্পর্কে তুমি পূর্বের ন্যায়ই নিশ্চিত হতে পার।

এবং একথা অস্বীকার করা চলে না যে, কেবল দ্বান্দ্বিকতার এই প্রক্রিয়াই বস্তুর অপরিহার্য চারিত্রকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করে। অন্য প্রক্রিয়ার কোনোটি মানুষের ধারণা কিংবা ইচ্ছা বা কোনোকিছুকে তৈরি করা এবং তৈরি হলে কিংবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাদের পরিচর্যা করা—প্রভৃতি প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করে। আবার জ্যামিতির ন্যায় জ্ঞানের অপর বিষয়গুলি যদিও সত্য নিয়ে চিন্তা করে কিন্তু তারাও যতক্ষণ তাদের সূত্রগুলিকে বিনা প্রশ্নে ধরে নেবে এবং তাদের ব্যাখ্যাদানে ব্যর্থ হবে, ততক্ষণ সত্যকে স্বপ্নে দেখার ন্যায় লাভ করা ব্যতীত সত্যকে স্পষ্টভাবে তারা অবলোকন করতে পারবে না। কারণ, যে-প্রতিজ্ঞা বা দত্ত সত্যের কোনো জ্ঞান তোমার নেই তার উপর ভিত্তি করে কেবল যুক্তির শেকল দ্বারা তুমি যখন মধ্যবর্তী স্তর তৈরি কর এবং এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে-স্তর এবং সিদ্ধান্ত অজানার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে তার জ্ঞানও তোমার জানা নেই, তখন এই প্রক্রিয়াটি তোমাকে যথার্থ জ্ঞান কেমন করে দান করতে পারে?

না, এ-প্রক্রিয়া আমাকে জ্ঞানদান করতে পারে না।

দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শনই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞানমাধ্যম যার পদ্ধতি হচ্ছে তার মৌলিক সূত্র বা দত্ত সত্যকে সত্যের মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা যাতে জ্ঞানের পরিক্রম দৃঢ় নীতির ভিত্তিতে শুরু হতে পারে। তাই আমাদের আত্মার চোখ যখন অজ্ঞানতার কাদামাটিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখনই দর্শন তাকে সযত্নে তুলে এনে জ্ঞানমশালের সাহায্যে তাকে সত্যের পথে পথ প্রদর্শন করে এগিয়ে নেয়। আমাদের আলোচিত বিষয়গুলিকে আমরা প্রচলিত রীতিতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বলে অভিহিত করেছি। আদতে আমাদের প্রয়োজন, ভিন্ন কোনো উপযুক্ত শব্দের যার দ্বারা আমরা এদের বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ ধারণার চেয়ে এরা যে স্পষ্টতর এবং জ্ঞানের চেয়ে যে অস্বচ্ছ, সেকথা প্রকাশ করতে পারি। পূর্বে আমরা এজন্য

'বোধ' শব্দকে ব্যবহার করেছি। যা-ই হোক, শব্দ নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই। আমাদের বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে শব্দের তর্ক এখানে অচল।

এ কথা সত্য।

তাই মনের যে-ক্ষমতাকে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি, তাকে যে-শব্দ প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তাকেই আমরা ব্যবহার করব।

তা ঠিক।

এ ক্ষেত্রে আমরা মনের সেই চারটি ভাগেই[১] সন্তুষ্ট থাকব। বুদ্ধির দুটি ভাগ এবং ধারণার দুটি। এদের প্রথমটিকে আমরা বলেছি জ্ঞান, দ্বিতীয়টিকে বোধ, তৃতীয়টিকে ধারণা এবং চতুর্থটিকে ভ্রম। ভ্রমের অনুভব হচ্ছে ছায়া, ধারণার হচ্ছে পরিবর্তন এবং বোধের অস্তিত্ব। এদের অনুপাত বোঝাতে গিয়ে আমরা বলতে পারি ঃ

পরিবর্তনের সঙ্গে অস্তিত্বের যে অনুপাত, জ্ঞানের সঙ্গে ধারণার সেই অনুপাত এবং ধারণার সঙ্গে জ্ঞানের যে অনুপাত ধারণার সঙ্গে বোধের সেই অনুপাত এবং বোধের সঙ্গে ভ্রমেরও তেমনি অভিন্ন অনুপাত। কিন্তু এ-অনুপাতের অধিকতর সম্পর্ক এবং ধারণা ও বুদ্ধির উপভাগের প্রশ্নটি আমাদের স্থগিত রাখা ভালো। কারণ, এ-আলোচনা বর্তমানের চেয়ে অধিকতর দীর্ঘ হওয়ারই আশঙ্কা।

গ্লকন বললেন ঃ আমি যত দূর বুঝতে পারছি তাতে তোমার প্রস্তাবের সঙ্গে আমি একমত সক্রেটিস।

তা হলে তুমি কি আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলবে যে, দ্বান্দ্বিক বা দার্শনিক হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে প্রত্যেক বস্তুর অপরিহার্য সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম? এবং যে-ব্যক্তির বস্তুর এই সত্তার জ্ঞান নেই এবং সে-কারণে সেই জ্ঞানদানে সে অক্ষম, সে-ব্যক্তি তার সেই অক্ষমতার অনুপাতে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও অক্ষম বলে বিবেচিত হবে? এরূপ অভিমত কি তুমি সমর্থন করবে?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একে আমি অস্বীকার করি কী প্রকারে?

উত্তমের ধারণা সম্পর্কেও তোমাকে এই কথাই বলতে হবে। কারণ, যাকে তুমি উত্তমের জ্ঞানী বলতে চাও সে যদি উত্তমের ভাবকে অপর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে যুক্তির ভিত্তিতে উত্তমের সংজ্ঞানির্ধারণ করতে সক্ষম না হয়, যদি

১. দ্রষ্টব্য ঃ ৫১১।

তার সংজ্ঞাকে সকল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে, কেবল ধারণার ভিত্তিতে নয়, যুক্তির ভিত্তিতে রক্ষা করতে এবং তার যুক্তিকে বিজয়ী করতে না পারে, তা হলে তাকে তুমি পরম উত্তমের জ্ঞানে কিংবা কোনো উত্তমের জ্ঞানেই জ্ঞানী বলতে পার না। এরূপ লোকের যা-কিছু 'জ্ঞান' তার ভিত্তি ধারণা, যথার্থ জ্ঞান নয়। তুমি বলতে পার, সে এক স্বপ্নের জগতে বাস করছে এবং করবে। চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার পূর্বে সে আর এই স্বপ্ন থেকে জাগরিত হতে পারবে না।

তুমি যা বলেছ তার সঙ্গে আমি অবশ্যই একমত।

এবং এও তুমি নিশ্চয়ই চাইবে না, তোমার আদর্শ রাষ্ট্রের সন্তানরা অর্থাৎ যাদের তুমি প্রতিপালন করছ এবং শিক্ষিত করে তুলছ, যারা তোমার রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শাসক, তারা যুক্তিশূন্য দণ্ড হয়ে রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্ব বহন করবে?

অবশ্যই না।

তা হলে তোমাকে একটি বিধান করতে হবে যে, তরুণদের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে যাতে তারা প্রশ্নের জিজ্ঞাসায় এবং জবাবে সর্বাধিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, তুমি এবং আমি মিলিতভাবেই এই বিধানও তৈরি করব।

দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শনকে তাই আমরা সকল জ্ঞানের শীর্ষ প্রস্তর বলে আখ্যায়িত করতে পারি। সকল জ্ঞানের উপর এ-প্রস্তর স্থাপিত। কোনো জ্ঞানই একে অতিক্রম করে যেতে পারে না।

একথা ঠিক।

কিন্তু এই শিক্ষার দায়িত্ব আমরা কাদের উপর ন্যস্ত করব? এবং কী প্রকারে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে—এ-প্রশ্নও আমাদের আলোচনা করতে হবে।

হ্যাঁ, এ-আলোচনা আমাদের বাকি রয়েছে।

তোমার নিশ্চয় স্মরণ আছে, শাসকদের আমরা কীভাবে বাছাই করেছিলাম?

হ্যাঁ, সেকথা আমার অবশ্যই স্মরণ আছে।

সেই চরিত্রকে আমাদের এখানেও বাছাই করতে হবে। যারা সবচেয়ে দৃঢ় এবং সাহসী, তাদের এবং সম্ভব হলে যারা সবচেয়ে সুন্দর তাদেরকে আমরা অপর সকলের তুলনায় অগ্রগণ্য বিবেচনা করব। এদের মেজাজ হতে হবে মহৎ এবং উদার এবং এদের মধ্যে এমন সহজাত গুণ থাকতে হবে যে-গুণ তাদের শিক্ষাকে সহজ করে তুলবে।

কোন্ সহজাত গুণের কথা বলছ?

যেমন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং জ্ঞানলাভের ত্বরিত ক্ষমতা। কারণ, মনের জন্য অধ্যয়নের কষ্ট শরীরচর্চার চেয়ে কম নয়। মন অনেক সময়ে অধ্যয়নের কষ্টে সংবিৎ হারিয়ে ফেলে। অধ্যয়নের কষ্ট সমগ্ররূপেই মনের। তার এই কষ্ট দেহ ভাগ করে নিয়ে হ্রাস করতে পারে না। সত্য নয় কি?

খুবই সত্য কথা।

তা ছাড়া যাদের অনুসন্ধান করছি, তাদের স্মরণশক্তিও উত্তম হতে হবে। এবং তাদের ক্লান্তিহীন হতে হবে এবং যে-কোনো প্ররিশ্রমে তাদের আগ্রহী হতে হবে। তা না হলে যে বিরাট পরিমাণ শারীরিক এবং মানসিক শ্রম এবং অধ্যয়নের ভার বহন করতে হবে, তা বহন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

নিঃসন্দেহে। তাদের এই স্বাভাবিক গুণগুলি থাকতে হবে।

বর্তমানের ক্রুটি হচ্ছে এই যে, যারা দর্শন অধ্যয়ন করে তারা কোনো দায়িত্বপালন করে না। আমি পূর্বে বলেছি[১] এ-কারণেই দার্শনিকদের দুর্নাম। আমাদের রাষ্ট্রের যারা উপযুক্ত সন্তান, যারা কলঙ্কজাত নয়, তাদেরই অধিকার থাকবে দর্শনকে বরণ করার।

তোমার একথার কী অর্থ?

প্রথমত, দর্শনের যে ভক্ত তাকে শ্রমে দ্বিধাগ্রস্ত হলে চলবে না। অর্থাৎ কিছুটা পরিশ্রমী এবং কিছুটা অলস—তাকে এমন স্বভাবের হলে চলবে না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই মানুষ যে একদিকে শরীরচর্চা, শিকার এবং অন্যান্য দৈহিক পরিশ্রমে বিশেষ আগ্রহী কিন্তু শিক্ষার পরিশ্রমে কিংবা আলোচনা শ্রবণে বা জিজ্ঞাসায় সে বিমুখ। আবার এর বিপরীত প্রবণতার লোকও রয়েছে।

যথার্থ।

তেমনি সত্যের ক্ষেত্রেও আমরা সেই আত্মাকে অবশ্যই দ্বিধাগ্রস্ত এবং পঙ্গু বল গণ্য করব, যে-আত্মা স্বেচ্ছাকৃত ভুলকে ঘৃণা করে এবং যারা মিথ্যা বলে তাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বটে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত মিথ্যাকে সহ্য করতে যার আদৌ বাধে না এবং যে অক্লেশে মানুষেতর শূকরের ন্যায় অজ্ঞানতার পাঁকে ডুবে থাকতে কোনো সঙ্কোচ বোধ করে না। এবং এরূপ অবস্থায় সে দৃষ্ট হলেও কোনো লজ্জা বোধ করে না।

তোমার সঙ্গে আমি একমত, সক্রেটিস।

---

১. দ্রষ্টব্য ঃ ৪৯৭।

তা ছাড়া সংযম, সাহস, মহানুভবতা এবং অনুরূপ সব গুণের ক্ষেত্রে আমাদের রাষ্ট্রের যথার্থ সন্তান এবং কলঙ্কজাত চরিত্রের মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে পার্থক্য স্থির করতে হবে। কারণ যেখানে এরূপ পার্থক্য নির্দিষ্ট নয় সেখানেই রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির অচেতন ভ্রান্তির জন্ম হয়। ফলে রাষ্ট্র এমন ব্যক্তিকে শাসক তৈরি করে এবং ব্যক্তি এমন লোককে সুহৃদ বলে গ্রহণ করে যে-ব্যক্তি চরিত্রগত ক্রটির কারণে পঙ্গু কিংবা কলঙ্কিত বলেই বিবেচতি হওয়ার যোগ্য।

তোমার একথাও সত্য, সক্রেটিস।

তা হলে এই বিষয়গুলির প্রতি আমাদের সযত্ন দষ্টি রাখতে হবে। যে-বিরাট শিক্ষার পরিকল্পনা আমরা রচনা করেছি তার জন্য যদি আমরা দেহ এবং মনে যারা সুস্থ কেবল তাদেরই নির্দিষ্ট করি তা হলে আমাদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের কোনো অভিযোগ থাকবে না। এ-কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা আমাদের সংবিধান এবং রাষ্ট্রের পরিত্রাতার ভূমিকাই আমরা পালন করব। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীগণ যদি ভিন্ন চরিত্রের হয় তা হলে তার ফল বিপরীত হবে। তখন দর্শন যত-না দুর্নাম পূর্বে ভোগ করেছে, তার চেয় অধিক পরিমাণে সে পরিহাস এবং দুর্নামের পাত্র হয়ে উঠবে।

হ্যাঁ। তা হলে সেটা আমাদের জন্য কোনো প্রশংসার বিষয় হবে না।

অবশ্যই তা প্রশংসার বিষয় হবে না। কিন্তু গ্লকন, আমি হয়তো আমার রসিকতাকে একটু অধিক গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে নিজেকেই পরিহাসের পাত্র করে তুলছি।

কীভাবে, সক্রেটিস?

আসলে আমি ভুলে গেছি যে, আমরা এই কথাটাকে খুব গুরুগম্ভীর ভাবে বলতে চাইনি। সেটি ভুলে গিয়ে আমরা বেশি মাত্রায় উত্তেজনা প্রকাশ করেছি। দর্শনকে অযোগ্যের পায়ের নিচে দলিত হতে দেখে আমি এই দূর্বত্তদের প্রতি বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারিনি। কিন্তু আমার মনের সেই ক্রোধ অমাকে অত্যধিক পরিমাণে উত্তেজিত করে ফেলেছে।

আচ্ছা! তোমার কথা শোনাতেই এত নিবিষ্ট ছিলাম যে ব্যাপারটি আমি লক্ষ করিনি।

কিন্তু বক্তা হিসাবে বলতে বলতে আমি উত্তেজনাটি বোধ করছিলাম। গ্লকন, এখানে একটা জিনিস তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক। যদিও পূর্বে আমরা বৃদ্ধ মানুষকেও বাছাই করেছিলাম, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের

বাছাই করলে চলবে না। সলোন[১] বলেছিলেন মানুষ যখন বৃদ্ধ হয় তখন সে অনেক কিছু শিখতে পারে। আমরা বলব, এমন বক্তব্যে সলোন ভ্রান্ত ছিলেন। কারণ বৃদ্ধবয়সে সে যেমন দৌড়ে পটু নয়, তেমনি সে শিক্ষায়ও পটু হতে পারে না। যৌবনই হচ্ছে শ্রমের সময় ঃ সকল অসাধ্য সাধনের সময়।

নিঃসন্দেহে।

কাজেই গণিত এবং জ্যামিতি এবং শিক্ষাসূচির অপর যেসব বিষয় দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শনের পথকে প্রস্তুত করে তার শিক্ষা শৈশবেই দেওয়া আবশ্যক। অবশ্য এজন্য কোনো জবরদস্তিকে আমরা প্রয়োগ করব না।

কেন?

কারণ, যে স্বাধীন মানুষ সে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রেও দাস হতে পারে না। শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হতে পারে। শরীরচর্চা বাধ্যতামূলক হলে তাতে দেহের কোনো ক্ষতি সাধিত নয় না। কিন্তু যে জ্ঞানে জবরদস্তি, সে জ্ঞান মনের কোনো উন্নতি সাধন করতে পারে না।

খুবই যথার্থ কথা।

আমি বললাম ঃ প্রিয় বন্ধু, তাই জ্ঞানদানে জবরদস্তি প্রয়োগ কোরো না। শৈশবের শিক্ষা আনন্দের বিষয় হোক। তা হলেই তুমি যার মধ্যে যে-স্বাভাবিক প্রবণতা আছে তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে।

তোমার এ-অভিমতটি খুবই যুক্তিসঙ্গত।

আচ্ছা গ্লকন, তোমার কি স্মরণ আছে, আমরা বলেছিলাম তরুণদের অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধক্ষেত্রেও নিয়ে যেতে হবে। এবং বিপদের আশঙ্কা না থাকলে যুদ্ধের সন্নিকটে তাদের নিয়ে যেতে হবে এবং শিকারি কুকুরের ন্যায় তাদের রক্তের স্বাদও পেতে দিতে হবে?

হ্যাঁ, একথা আমার স্মরণ আছে।

সেই একই কৌশল আমাদের এইসব বিষয়ে—শ্রম, শিক্ষা এবং বিপদের ক্ষেত্রে, গ্রহণ করতে হবে। আর এই পরীক্ষায় যে সর্বোত্তম বলে পরিচিত হবে তাকেই আমরা নির্বাচিতদের তালিকাভুক্ত করে নেব।

---

১. সলোন (৬৪০–৫৫৯ খ্রিঃ পূঃ) প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনেতা এবং আইনবিদ। অভিজাত এবং সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ-নিরসনে এবং এথেন্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রগতিমূলক সংস্কার-সাধনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

কিন্তু কোন্ বয়সে?

এর শুরু হবে শরীরচর্চা যখন শেষ হয়েছে তখন। যে-দুতিন বছর এরূপ শিক্ষায় ব্যয়িত হতে পারে সে-সময়টা অন্য কোনো শিক্ষার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ, ব্যায়াম এবং নিদ্রা কোনো বুদ্ধিগত শিক্ষার সহায়ক নয়। এই শিক্ষার সময়ে তাই শারীরিক কসরতে কে প্রথম হতে পারল, সেটাকেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বলে গণ্য করতে হবে।

হ্যাঁ, ব্যায়ামের সময়ে এটাই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা হবে।

এরপর বিশ বৎসর বয়স্ক থেকে যাদের বাছাই করা হবে তাদের উচ্চতর সম্মানে উন্নীত করা হবে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব জ্ঞানশিক্ষায় কোনো ক্রম অনুসরণ করা হয়নি সেসব বিষয়কে সম্মিলিত করা হবে এবং শিক্ষার্থীগণ এবার সকল জ্ঞানের পরস্পরের মধ্যকার স্বাভাবিক সম্পর্ককে যেমন অনুধাবন করতে পারবে তেমনি যথার্থ সত্যের সঙ্গেও সকল জ্ঞানের সম্পর্ক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

হ্যাঁ, এরূপ জ্ঞানই মাত্র দৃঢ়মূল হতে পারে।

হ্যাঁ, এবং এরূপ জ্ঞানের ক্ষমতাই দ্বান্দ্বিক বা দার্শনিক দক্ষতার স্মারক। কারণ দ্বান্দ্বিক ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে সামগ্রিক দৃষ্টির ক্ষমতা। সামগ্রিক মনই দ্বান্দ্বিক বা দার্শনিক মন।

আমি তোমার সঙ্গে একমত।

এই বিষয়গুলি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। যাদের এই সামগ্রিক উপলব্ধির ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, যারা তাদের শিক্ষায় অধিক অবিচল এবং যারা সামরিক এবং অন্য দায়িত্বে অধিকতর দৃঢ় তাদের বয়স যখন ত্রিশে পৌঁছেছে, তখন তাদের বাছাই করে উচ্চতর সম্মানে উন্নীত করতে হবে। এবং দ্বান্দ্বিকতার পরীক্ষায় আমরা নির্দিষ্ট করব তাদের, যারা চোখ কিংবা অপর কোনো ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ সত্তার সত্যকে অনুধাবনে সক্ষম। এখানে আমাদের অতিশয় সতর্কতার সঙ্গেই অগ্রসর হতে হবে।

বিশেষ সতর্কতার কথা কেন বলছ, সক্রেটিস?

গ্লকন, তুমি দ্বান্দ্বিকতার মারাত্মক ক্ষতির দিকটি লক্ষ করনি? এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর মনে যে-ক্ষতি সে সাধন করতে পারে সে-বিষয়টি খেয়াল করনি?

কী ক্ষতির কথা বলছ?

এ-বিদ্যা শিক্ষার্থীর মনকে উচ্ছৃঙ্খলতায় পূর্ণ করে তোলে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, এটা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু একে কি তুমি খুব অস্বাভাবিক বলে ভাবতে পার? শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এরূপ মনোভাব কি ক্ষমার অযোগ্য? না, এদের পক্ষেও বলার কিছু আছে বলে তুমি মনে করবে?

এদের পক্ষে বলার কী থাকতে পারে?

আমি তোমাকে এদের অনুরূপ অপর একটি দৃষ্টান্তকে কল্পনা করতে বলি। মনে করো একটি যুবক প্রচুর ধনসম্পদের মধ্যে বর্ধিত হয়েছে। এরকম ধনবান পরিবারের সংখ্যা কম নয়। এরূপ পরিবারের সন্তান সে। তার স্তাবকের অভাব নেই। কিন্তু যখন সে পূর্ণবয়স্ক হয়ে উঠল, তখন সে শুনতে পেল যারা তার পিতামাতা বলে পরিচিত, আসলে তারা তার পিতামাতা নয়। কিন্তু তার যথার্থ পিতামাতা কে—তা বার করতেও সে অক্ষম। এমন অবস্থায় এই যুবক তার স্তাবকের দল এবং কথিত পিতামাতার প্রতি কীরূপ আচরণ করবে বলে তুমি মনে কর? তার দুটি ব্যবহারের তুলনা করো। প্রথমত, যখন সে তার এই ভিত্তিহীন সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল অর্থাৎ তার এই 'পিতামাতা' যে তার যথার্থ পিতামাতা নয় সেকথা যখন সে জানত না এবং যখন সে জানল যে, এই পিতামাতা তার যথার্থ পিতামাতা নয়—এই দুটি সময়ের আচরণ দুটি তার কী প্রকারের হবে বলে তুমি মনে কর? কিংবা তোমার জবাবটি আমি আন্দাজ করব?

আমার জবাবই তুমি আন্দাজ করো, সক্রেটিস।

তুমি হয়তো বলবে, সম্পর্কের সত্যতার বিষয়ে যখন সে অজ্ঞ, তখন সে তার পিতামাতা এবং আত্মীয়জনদের তার স্তাবকদের চাইতেও অধিক সম্মানের চোখে দেখবে। তাদের অভাবে এবং প্রয়োজনে তাদের প্রতি সেবামূলক মনোভাব তার কমের চেয়ে অধিক হবে এবং তাদের সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য উচ্চারণ করা থেকে সে বিরত থাকবে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের অবাধ্য হওয়ার প্রবণতা তার থাকবে না। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমার তা-ই মনে হয়।

যখন সে সত্যকে আবিষ্কার করল (যখন সে জানতে পারল এই পিতামাতা তার যথার্থ পিতামাতা নয়) তখন তাদের প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধা হ্রাস পাবে। নয় কি? এবার সে তার স্তাবকদেরই অধিক অনুগত হবে। তার উপর তাদের প্রভাবের মাত্রা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই স্তাবকদের জীবনযাত্রাই এখন তার জীবনযাত্রায় পরিণত হবে। সে এবার তাদের সঙ্গদানে অধিকতর নিঃসঙ্কোচ

হয়ে উঠবে এবং তার চরিত্রটি যদি অস্বাভাবিক রকমের উত্তম না হয় তা হলে সে আর তার পূর্বের পিতামাতা এবং অপর আত্মীয়জনদের মঙ্গল-অমঙ্গল নিয়ে মোটেই চিন্তিত হবে না। সে বেপরোয়া হয়ে উঠবে।

সক্রেটিস, এইরূপ হওয়া খুবই সম্ভব। কিন্তু দর্শন-শিক্ষার্থীর উপর এ-উপমার প্রয়োগ তুমি কীভাবে করছ?

আমরা এভাবে তার প্রয়োগ করতে পারি ঃ ন্যায় এবং সম্মানের কতগুলি নীতি আছে। শৈশবে বিদ্যালয়ে এ-সকল নীতি আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং এই নীতির অভিভাবকত্বেই আমরা বর্ধিত হয়ে উঠি। এই সমস্ত নীতির আমরা বাধ্য থাকি এবং এদের সম্মান করি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কিন্তু ভোগের এবং আনন্দের কুনীতিও এর বিপরীতে রয়েছে। তারা আমাদের আত্মাকে আকর্ষণ করতে চায়। কিন্তু যাদের মধ্যে ন্যায়ের বোধ আছে তাদের উপর এ-আকর্ষণ কার্যকর হয় না। এই আকর্ষণ উপেক্ষা করেই তারা তাদের অভিভাবকদের ন্যায়নীতিকে মেনে চলে। তাদের তারা সম্মান করে।

হ্যাঁ, এ কথাও সত্য।

কোনো লোকের এই যখন অবস্থা, তখন যদি তার সামনে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তুলে ধরা হয়, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সম্মানীয় কাকে বলে তখন সে প্রথমে অভিভাকদের শিক্ষা-দেওয়া নীতির ভিত্তিতেই তার জবাব দেয়। কিন্তু সে-নীতিরও প্রতিবাদের অভাব নেই। বিভিন্ন প্রতিযুক্তি তার যুক্তি এবং বিশ্বাসকে খণ্ডন করতে থাকে। এর পরিণামে সম্মান-অসম্মানের পার্থক্য, ন্যায়-অন্যায় কিংবা উত্তম-অধমের পার্থক্য তার কাছে লুপ্ত হয়ে যায় এবং এতদিনকার যেসব ধারণাকে সে মূল্যবান মনে করেছে তাকেও সে বিস্মৃত হয়। কাজেই এমন অবস্থায় সে কি আর তার পুরনো নীতিকে আগের ন্যায় মেনে চলবে? কিংবা তাদের সম্মান করবে? তুমি কী মনে কর?

না। এমন অবস্থায় পুরনো নীতিকে সম্মান করা তার পক্ষে অসম্ভব।

তা হলে, যখন সে পুরনোকে আর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কিংবা সম্মানীয় মনে করে না এবং সত্যকেও সে আবিষ্কারে সক্ষম হয়নি, তখন তার পক্ষে তার ইচ্ছার স্তাবকদের জীবন ব্যতীত অপর জীবনযাপন করা কি সম্ভব?

না, তা সম্ভব নয়।

ফলে, পূর্বে যেখানে সে বিধানের বাধ্য ছিল সেখানে এখন সে বিধানের লংঘনকারীতে পরিণত হয়েছে। ঠিক নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

আমি বলব, দর্শনের ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ সবই যেমন স্বাভাবিক তেমনি ক্ষমার যোগ্য।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি আর-একটু যোগ করে বলব ঃ এদের অবস্থানটি দুঃখজনক।

কাজেই গ্লকন, আমাদের যে-নাগরিকদের বয়স ত্রিশে পৌছেছে তাদের যেন ভবিষ্যতে দুঃখ বোধ না করতে হয় সেজন্য খুবই সতর্কতার সাথে দর্শনের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে।

অবশ্যই, সক্রেটিস।

না হলে বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে, তর্কের স্বাদ তারা উপযুক্ত সময়ের অনেক আগে পেয়ে যেতে পারে। কারণ, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ তরুণদের মুখে তর্কের স্বাদ একবার এলে তারা কেবল আনন্দের জন্য, কেবল তর্কের জন্য তর্ক করতে শুরু করে। কুকুরছানা যেমন নিকটে যা পায় তাকেই টেনে ধরে এবং ছিঁড়ে ফেলে এবং তাতে মহা আনন্দ বোধ করে, তেমনি এই নতুন তার্কিকরা অপরের অনুকরণে সকলের মতের বিরুদ্ধতা করে, সকলের যুক্তিকেই খণ্ডন করে এবং তাতে আনন্দ বোধ করে।

হ্যাঁ। তখন এদের কাছে এর চেয়ে মজার কিছু থাকে না।

তারপর চলতে থাকে তাদের তর্ক-বিতর্কের অভিযান। এ-অভিযানে বেশকিছু জয়-পরাজয়ের পরে তাদের চরিত্র পুরো অবিশ্বাসীর রূপ ধারণ করে। এখন আর তারা তাদের পুরাতন কোনো বিশ্বাসকে পোষণ করে না। পুরনো সব বিশ্বাসকে তারা জেদের সঙ্গেই অবিশ্বাস করতে শুরু করে। ফলে কেবল যে তারা নিজেরা, তা-ই নয়, দর্শন এবং দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছু দুর্নামের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

তোমার এ কথার চেয়ে আর সত্য কী হতে পারে?

কিন্তু মানুষ যখন আরও বয়স্ক হয় তখন তার মধ্যে এই উন্মত্ততা আর থাকে না। তখন সে সত্যের সন্ধানী যথার্থ দার্শনিককে অনুকরণ করতে চায়। তর্কের জন্য যারা তর্ক করে, আমোদের জন্য অপরকে খণ্ডন করে, তেমন লোকের অনুকরণ আর সে করে না। এবং তার চরিত্রের এই সংযম এবার তার অনুসৃত বিদ্যার সম্মান হ্রাস না করে তাকে বৃদ্ধি করতে শুরু করে।

খুবই সত্য কথা।

এ-অবস্থার জন্য আমরা তৈরি ছিলাম। তাই আমরা পূর্বেই বলেছি, দর্শনের অনুসারীকে শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে এবং দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বর্তমানের ন্যায় যে-কোনো অনধিকারীর দর্শনচর্চার কোনো অধিকার থাকবে না।

হ্যাঁ, আমাদের এ-ব্যবস্থা সঠিক।

কিন্তু দর্শনচর্চার দৈর্ঘ্য কী হবে? মনে করো দর্শনকে শরীরচর্চার স্থানে স্থাপন করা হল এবং শরীরচর্চার জন্য যে সময় ব্যয় করা হয়েছে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার দ্বিগুণসংখ্যক বৎসর দর্শনের চর্চা করা হল—তা হলে কি যথেষ্ট হবে বলে তুমি মনে কর?

তার অর্থ কি দুবৎসর না চার বৎসর?

না, ধরো পাঁচ বৎসর। এই সময়ের শেষে তাদের অবশ্যই গুহার মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং তরুণদের উপযোগী সকল সামরিক এবং রাষ্ট্রীয় অপর দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। এইভাবে তারা জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করবে এবং সর্বপ্রকার আকর্ষণের মুখে তারা দৃঢ় থাকবে কিংবা বিচলিত হবে সে-পরীক্ষারও আমাদের সুযোগ ঘটবে।

কিন্তু তাদের জীবনের এই পর্যায়ের দৈর্ঘ্য কী হবে?

আমি বললাম ঃ এ-পর্যায়ের দৈর্ঘ্য পনেরো বছর। এবং এর পরে যারা পঞ্চাশ বৎসরের স্তরে এসে পৌঁছেছে, যারা সকল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে, যারা জীবনের প্রতিটি কর্মে এবং জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছে, তারাই মাত্র যাত্রার লক্ষ্যে এসে উপনীত হতে পারবে। এবার সেই মাহেন্দ্র মুহূর্তটি উপস্থিত হয়েছে যখন এই কৃতী পথিকগণ তাদের আত্মার দৃষ্টিকে, সমস্ত সত্তাকে আলোকিত করে যে-মহৎ আলো, তার পানে তুলে ধরবে এবং পরম উত্তমকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হবে। এই ধারাতেই তারা রাষ্ট্রকে, ব্যক্তির জীবনকে এবং তাদের নিজেদের জীবনের অবশিষ্ট কালকে সংগঠিত করবে। এজন্য দর্শনের চর্চাকে তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বনে পরিণত করতে হবে। কিন্তু পর্যায়ক্রমে যখন তাদের সময় আসবে জনসাধারণের স্বার্থে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্বপালনের, তখন সে-দায়িত্ব তারা পালন করবে—এ-দায়িত্বের সম্মানের জন্য নয়, কর্তব্যপালনের প্রয়োজনীয়তার বোধ থেকেই এবং পরিশেষে তাদের উত্তরপুরুষকে যখন তারা তৈরি করেছে এবং রাষ্ট্রশাসনে তাদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তখন তারা পবিত্র দ্বীপমণ্ডলীর জন্য শেষযাত্রা শুরু করবে এবং সেই শান্তির দ্বীপে পৌঁছে সেখানে নিরবধিকাল বাস করবে। শেষ যাত্রায় আমাদের নগরী তাদের জন্য

প্রকাশ্য স্মৃতিসৌধ প্রস্তুত করবে, তাদের সম্মানিত করবে এবং পিথীয় ভবিষ্যদ্বক্তার অনুমতি হলে দেবতার মতো তাদের উদ্দেশে পশু উৎসর্গ করবে। তেমন অনুমতি না পেলেও তাদের ঋষিপুরুষ হিসাবে সমাহিত করা হবে।

সক্রেটিস, তুমি বক্তা নও, তুমি ভাস্কর! কী বিস্ময়কর ত্রুটিহীন সৌন্দর্যে তুমি আমাদের শাসকবর্গের মূর্তিকে খোদাই করে দিয়েছ!

আমি বললাম ঃ কিন্তু গ্লকন, কেবল শাসনকারীর নয়; বলো শাসনকারিণীরও। কারণ আমি যা বলেছি তা কেবল পুরুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, মেয়েদের স্বভাবে যতখানি সম্ভব ততখানি মেয়েদের উপরও প্রজোয্য নয়—এরূপ মনে করা তোমার ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, একথা তোমার যথার্থ। কারণ আমরা সকল ক্ষেত্রেই মেয়েদের পুরুষদের সমান অংশীদার করেছি।

আমি বললাম ঃ আর গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করবে রাষ্ট্র এবং সরকার সম্পর্কে আমরা যা বলেছি এ কেবল স্বপ্নের ব্যাপার নয়, এর বাস্তবায়ন কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। কিন্তু তার বাস্তবায়ন কেবলমাত্র যে-পথের কথা আমরা বলেছি সে-পথেই সম্ভব। অপর কোনো পথে নয়। অর্থাৎ যখন রাষ্ট্রে এমন দার্শনিক-রাজা কিংবা দার্শনিক-শাসক জন্মগ্রহণ করবে যারা জাগতিক সম্মানকে ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বলে বিবেচনা করবে এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সম্মানকে মহৎ বলে গণ্য করবে এবং ন্যায়কেই যারা মহত্তম এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় বলে বিবেচনা করবে এবং নিজেদের গণ্য করবে সেই ন্যায়েরই সেবক বলে, যে-ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠাকে তারা নিজেদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করবে—এমন যথার্থ দার্শনিক-শাসক যখন নগরীকে সংগঠিত করবে এবং শাসন করবে তখনই মাত্র আমাদের কল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে উঠবে।

কিন্তু এই শাসকদের শাসনের ধারাটি কীরূপ হবে?

তাদের শুরু করতে হবে নগরীর সেই অধিবাসীদের নিয়ে যাদের বয়স দশ অতিক্রম করেনি। যাদের বয়স দশ বৎসরের অধিক হয়েছে তাদের সকলকে নগরীর বাইরে তারা পাঠিয়ে দেবে। এবার তারা সকল শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এই শিশুরা অবশ্যই তাদের পিতামাতার অভ্যাস ও আচরণে এখনও

প্রভাবিত হয়নি। এই নিষ্কলঙ্ক শিশুদের শিক্ষিত করা হবে রাষ্ট্রের আদর্শ বিধি, বিধান এবং অভ্যাসে। অর্থাৎ যে-বিধানের কথা আমরা বলেছি সেই বিধান অনুযায়ী তারা বর্ধিত হবে। এমনি উপায়ে যে-রাষ্ট্র এবং সংবিধানের কথা আমরা বলেছি সে-রাষ্ট্র এবং তার অধিবাসীগণ অচিরে সুশাসন এবং শান্তি লাভ করবে।

হ্যাঁ, শাসনের এই ধারাটিই সর্বোত্তম হবে এবং সক্রেটিস, আমি মনে করি এরূপ রাষ্ট্র কীরূপে জন্মলাভ করতে পারে সে বিষয়টিও তুমি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছ।

তা হলে আদর্শ রাষ্ট্র এবং তার প্রতিকৃতিমূলক মানুষের সম্পর্কে যথেষ্ট বলা হয়েছে। এরূপ মানুষের কী বর্ণনা হবে তা বোঝাও আর আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

গ্লকন বললেন ঃ না। আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। আর তাই আমি তোমার সঙ্গে একমত, এ-সম্পর্কে অধিকতর কিছু বলার আবশ্যকতা নেই।

অধ্যায় ঃ ২০
[৫৪৩—৫৫০]

আদর্শ রাষ্ট্রের পতন

অষ্টম পুস্তকে প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের তুলনায় অসম্পূর্ণ বাস্তব রাষ্ট্রের প্রকারভেদের আলোচনাটিতে ফিরে এসেছেন। পূর্বে এ-প্রসঙ্গ একবার উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মেয়েদের যৌথস্বামিত্বের প্রশ্নটি তোলায় সে-আলোচনা তখন আর অগ্রসর হতে পারেনি। [৪৪৯] প্লেটোর দর্শনে ভাব বা আদর্শের বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা আছে। আদর্শ কতখানি বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল—সেটা প্লেটোর জন্য বড় কথা নয়। আদর্শ বাস্তবে কোথাও দৃষ্ট না হলেও আদর্শই বাস্তবের নিয়ামক। আমরা আদর্শ দিয়ে বাস্তবকে পরিমাপ করি। যে-বাস্তব আদর্শ অনুযায়ী যত সুসম্পূর্ণ আমরা সেই বাস্তবকে তত আদর্শের নিকটবর্তী বলি। এবং যে-বাস্তব আদর্শের পরিমাপে যত অসম্পূর্ণ আমরা তাকে তত আদর্শ থেকে দূরবর্তী বলি। আদর্শ এবং বাস্তবের ব্যবধান সেখানে তত বেশি। কাজেই সক্রেটিসকে যখন প্রশ্ন করা হল ঃ তোমার বর্ণিত আদর্শ রাষ্ট্র কোথায়, তখন সক্রেটিস অক্লেশে জবাব দিতে পারলেন ঃ তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র কোথাও দৃষ্ট হল কি হল না—সেটি বড় কথা নয়। আদর্শ বাস্তবায়িত না হলেও আদর্শের কোনো ক্ষতি নেই। কাজেই আদর্শ কীভাবে বিচ্যুত হয়ে বিভিন্ন বাস্তবে প্রকাশিত বা পর্যবসিত হয়েছে তার ধারাক্রম খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কিন্তু প্লেটো তার আদর্শ রাষ্ট্রকে কেবল কল্পনাতে আবদ্ধ রাখতে চাননি। সে-রাষ্ট্র বাস্তবায়িত হতে পারে। সেই বাস্তবায়িত হওয়ার শর্ত হচ্ছে দার্শনিকের শাসক হওয়া। তা হলে প্রশ্ন আসে ঃ ধরা যাক সেই আদর্শ রাষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু তা হলেও সেই আদর্শ রাষ্ট্র কি চিরকালই আদর্শ থাকতে পারবে? না। মানবিক সেই আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। কারণ উত্তম মানুষসৃষ্টির একটি রহস্য আছে। সেটি হচ্ছে সংখ্যার রহস্য। ৩, ৪ এবং ৫-এর পারস্পরিক মিলন এবং সৃষ্টির রহস্য [৫৪৬], সেই রহস্য মানুষ সব সময় ভেদ করতে পারবে না। আর তা থেকেই শুরু হবে আদর্শ রাষ্ট্রের বিচ্যুতি। প্লেটোর এই সংখ্যার রহস্যকে খুব গুরুত্ব

সহকারে না নিলেও চলে। আসলে এ হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বাস্তব রাষ্ট্রের আলোচনায় উত্তরণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা দেখাবার একটি কৌশল। কিন্তু সে যাহোক, আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বিচ্যুতি একবার শুরু হলে তার আর বিরাম নেই। সে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হয়ে চলে। তবে এই বিচ্যুতির সূচনা এবং ধারাবাহিকতার দিকে খেয়াল করলে আমরা দেখি যে, আদর্শ রাষ্ট্রের বিচ্যুত রূপ হচ্ছে চারটি। অভিজাততন্ত্র অর্থাৎ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শাসক যখন আর তার জ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট হয় না, তখনই সূচনা হয় বিচ্যুতির। ১. এই বিচ্যুতির প্রথম রূপ হচ্ছে 'টিমোক্রাসি' বা উচ্চাভিলাষতন্ত্র। ২. তার দ্বিতীয় বা পরবর্তী রূপ হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র। ৩. তৃতীয় রূপ গণতন্ত্র এবং ৪. চতুর্থ রূপ স্বৈরতন্ত্র। তাই অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র চার প্রকারের ঃ উচ্চাভিলাষতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র, গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। প্রত্যেকটি বিচ্যুত রূপই তার বাহক-চরিত্র সৃষ্টি করে। উচ্চাভিলাষতন্ত্রের বাহক-চরিত্র হচ্ছে উচ্চাভিলাষী। কতিপয়তন্ত্রের কতিপয়ী। গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বৈরতান্ত্রিক। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচয়দানের সাথে প্লেটো তার প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। আদর্শ রাষ্ট্রের বিচ্যুত রূপগুলির পর্যায়ক্রমকে ঐতিহাসিক বলে বোধ হতে পারে। মনে হতে পারে, উচ্চাভিলাষতন্ত্রের পরে কতিপয়তন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের পরে গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের পরে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের উল্লেখ দ্বারা প্লেটো ঐতিহাসিক ক্রমকেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসে এরূপ ধারাবাহিকতা খুব দেখা যায় না। কতিপয়তন্ত্রের মধ্য থেকেও স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব হতে পারে। আবার স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের পরবর্তী পর্যায় না হয়ে ইতিহাসে পূর্ববর্তী পর্যায় হিসাবেও উদ্ভূত হয়েছে। মোটকথা প্লেটো কোনো ঐতিহাসিক ক্রম বর্ণনা করতে চাননি। প্লেটো এই পর্যায়ের মধ্য দিয়ে একটি যৌক্তিক ক্রম প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে উচ্চাভিলাষ মানুষকে সম্পদের লালসায় নিয়ে যায়। সম্পদের লালসা ধনী এবং নির্ধনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। ধনী এবং নির্ধনের দ্বন্দ্ব সংখ্যাগুরু নির্ধনের জয়লাভে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এবং গণতন্ত্রের অবাধ স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব।

উচ্চাভিলাষতন্ত্র ঃ প্রথম বিচ্যুতিকে ইংরেজিতে টিমার্কি বা টিমোক্রাসি বলা হয়। একে অর্থগতভাবে উচ্চাভিলাষতন্ত্র বলা যায়।

এ-ব্যবস্থায় দার্শনিক আর শাসক নয়। এ-রাষ্ট্রের শাসক হচ্ছে বিক্রমশালী বা সম্মান-অভিলাষী। এরূপ রাষ্ট্রের বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে স্পার্টার উল্লেখ করা যায়। উচ্চাভিলাষতন্ত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হচ্ছে উচ্চাভিলাষী যুবক। তার পিতা দার্শনিক ছিল। কিন্তু পুত্রের মধ্যে দর্শনের আর সেই চর্চা নেই। "এই রাষ্ট্রের বাহক চরিত্রে একদিকে যেমন অধিক আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব থাকবে, তেমনি তার পরিশীলনের মান অনেক কম হবে। এমন তরুণের উদ্ভবটি বর্ণনা করে আমরা বলতে পারি যে, প্রায়শ সে একটি সুশাসিত নগরীর সাহসী পিতার সন্তান। তার পিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, পিতা নির্বিবাদী লোক। রাষ্ট্রীয় সম্মান বা দায়িত্বকে সে অবাঞ্ছিত বলে পরিহার করেছে।" পিতার এরূপ নির্বিবাদী চরিত্রে বিক্ষুব্ধ হয়ে পুত্র তার বিপরীত স্বভাব অর্থাৎ আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিক্রম এবং সম্মানলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে শুরু করে।

গ্লকন, তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে ঃ সর্বোত্তম রাষ্ট্রর স্ত্রী-পুত্র হবে যৌথ সম্পত্তি, শিক্ষা এবং যুদ্ধ এবং শান্তির সকল জীবিকা হবে রাষ্ট্র-পরিচালিত এবং সর্বোত্তম দার্শনিক এবং যোদ্ধা—এরা হবে রাষ্ট্রের শাসক?

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, এই সিদ্ধান্তই আমরা গ্রহণ করেছি।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। তা ছাড়া আমরা একথাও বলেছি যে, শাসকগণ নিজেরা নিযুক্ত হবার পরে তাদের সৈন্যদের নিযুক্ত করবে এবং তাদের যৌথ বাসগৃহের ব্যবস্থা করবে। এখানে সবকিছুই সকলের। বেসরকারি ব্যক্তিগত বলতে কারোর কিছু থাকবে না, এবং সম্পত্তির বিষয়ে আমরা যা বলেছিলাম, তাও নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে?

হ্যাঁ, সক্রেটিস। আমার মনে আছে, কারোর জাগতিক কোনো বিষয়সম্পত্তি থাকতে পারবে না। তারা হবে যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রের শাসক। বৎসরিক মাহিনার বদলে নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের জীবনধারণের দ্রব্যাদি তারা লাভ করবে। এমনিভাবে তারা নিজেদের এবং রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধন করবে।

তুমি যথার্থ বলেছ। আমাদের এদিকটা যখন শেষ হয়েছে তখন এসো আমরা আমাদের পুরনো প্রধান সড়কটিতে ফিরে আসার চেষ্টা করি।

যেখানটাতে আমরা ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম সেখান থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে।

গ্লকন বললেন ঃ আমাদের মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসা খুব কঠিন হবে না। তুমি তখনও বলেছিলে, রাষ্ট্রের বর্ণনা তুমি শেষ করেছ। তুমি বলেছিলে ঃ তোমার বর্ণিত রাষ্ট্রই হচ্ছে উত্তম রাষ্ট্র এবং যে-মানুষ এই রাষ্ট্রের উপযুক্ত সে-মানুষ উত্তম। অবশ্য তার পরেও তুমি রাষ্ট্র এবং মানুষ সম্পর্কে অনেক উত্তম কথা বলেছ। এ ছাড়া তুমি আরও বলেছ, আমাদের এই রাষ্ট্র যদি উত্তম হয় তা হলে অপর সব রাষ্ট্র অধম। এবং আমার যতদূর স্মরণ হয়, তুমি একথাও বলেছিলে, অধম রাষ্ট্র হচ্ছে প্রধানত চার প্রকারের এবং এই অধম রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রকারের চরিত্র রূপ গ্রহণ করে যে-ব্যক্তির মধ্যে তাদের ত্রুটি এবং অপূর্ণতার বিষয়েও আলোচনা আবশ্যক। আমাদের প্রশ্ন ছিল ঃ সকল মানুষকে যখন আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি এবং যখন আমরা স্থির করেছি, এদের মধ্যে কে সর্ব-উত্তম এবং কে সর্ব-অধম তখন আমাদের নির্ধারণ করতে হবে, এদের মধ্যে কে সুখী এবং কে অসুখী। যে সর্বোত্তম সে-ই কি সবচেয়ে সুখী এবং যে সর্ব-অধম সে কি সর্বাধিক অসুখী, সবচেয়ে হতভাগ্য? আমার মনে আছে, সক্রেটিস, আমি তোমাকে প্রশ্ন করেছিলাম ঃ তোমার উল্লিখিত চার রকম সরকার কী কী? কিন্তু এই সময়ে পলিমারকাস এবং এ্যাডিম্যান্টাস বাধা দিলেন। তখন তুমি আবার শুরু করলে। সেই আলোচনা ধরেই তুমি এই স্থানটিতে এসে উপস্থিত হয়েছ।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, স্মৃতি থেকে তোমার বর্ণনাটি খুবই ঠিক হয়েছে।

গ্লকন জবাব দিলেন ঃ তা হলে সক্রেটিস, মল্লযোদ্ধার মতো আবার তুমি উঠে দাঁড়াও এবং আমার প্রশ্নের আঘাত নিয়ে আমি শুরু করি। এবং যে-জবাব তুমি তখন আমাকে দিতে চেয়েছিলে সে-জবাব তুমি আমায় এবার দাও।

আমি বললাম ঃ আমার ক্ষমতায় কুলালে আমি তোমার জবাব নিশ্চয়ই দেব।

আমি বিশেষ করে জানতে চাই, চার রকম সংবিধান বলতে তুমি কী বোঝাতে চেয়েছিলে?

আমি বললাম ঃ এ-প্রশ্নের জবাব সহজেই দেওয়া যায়। যে-চাররকম সরকারের কথা আমি বলেছিলাম তাদের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে বলা যায় যে, এদের প্রথমটি হচ্ছে ক্রিট এবং স্পার্টার শাসন। এরূপ শাসনের বেশ প্রশংসা শোনা যায়। এর পরে আসে সেই ধরনের সরকার যাকে

'কতিপয়তন্ত্র' বলে অভিহিত করা হয়। এর নিন্দাবাদই আমরা অধিক শুনি। এর নানা ত্রুটিবিচ্যুতি। তৃতীয় হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র কতিপয়তন্ত্রের পরেই আসে। কিন্তু কতিপয়তন্ত্র থেকে এর চরিত্র খুবই ভিন্ন। সবার শেষে আসে স্বৈরতন্ত্র। স্বৈরতন্ত্র খ্যাত এবং সর্বজনবিদিত ঃ অপর সকল সংবিধান থেকেই এ অলাদা। স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে অধম রাষ্ট্রের মধ্যে চতুর্থ এবং রাষ্ট্রের বিকারের সবচেয়ে খারাপ দৃষ্টান্ত। এই চার প্রকারের বাইরে অপর কোনো রাষ্ট্রের কথা আমি জানিনে। গ্লকন, তোমার কি জানা আছে? এ ছাড়া রাজতন্ত্র যে না আছে তা নয়। আবার এমন রাষ্ট্রও আছে যার উচ্চতম পদসমূহ ক্রয়-বিক্রয় হয়। কিন্তু এগুলিকে আমাদের চার রকমের মিশ্রণ বা মধ্যবর্তী ধরনের রাষ্ট্র বলতে পারি। এদের দৃষ্টান্ত গ্রীক এবং বর্বর—সমস্ত জাতির মধ্যেই পাওয়া যায়।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, বর্বরদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অদ্ভুত ধরনের সরকারের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়।

কিন্তু একটা জিনিস কি তুমি খেয়াল করেছ? সরকারের চরিত্রের এই যে বিভিন্নতা, তা তার মানুষের চরিত্রের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। তুমি বলতে পার ঃ যত-প্রকারের মানুষ, তত প্রকারের সরকার। কারণ, আমরা এমন তো বলতে পারিনে যে, রাষ্ট্র কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি, মানুষ দিয়ে নয়। বস্তুত রাষ্ট্রের নিয়ামক মানুষ। পাল্লার ভারসাম্য সেইই ঘুরিয়ে দেয় এবং অপর সবকিছুকে সেইই নিয়ন্ত্রণ করে।

একথা সত্য। যেমন মানুষ, তেমন রাষ্ট্র। মানুষের চরিত্রের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের চরিত্র।

আর তাই তুমি যদি বল রাষ্ট্রের প্রকার পাঁচটি তা হলে মানুষের চরিত্রের প্রকারও হবে পাঁচটি।

অবশ্যই।

অভিজাততন্ত্র বা সর্বোত্তম শাসনের যারা বাহক এবং যাদের আমরা ন্যায়পরায়ণ এবং উত্তম বলে বিবেচনা করি সে-চরিত্রের বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি।[১]

হ্যাঁ, সে-চরিত্রের বিবরণ আমরা দিয়েছি।

এবার অধম চরিত্রের মানুষের বর্ণনা আমাদের দিতে হবে। অধম চরিত্রের মধ্যে কলহপরায়ণ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী চরিত্রের প্রকাশ পাই আমরা স্পার্টার

---

১. যে-আদর্শ রাষ্ট্রের বর্ণনা সক্রেটিস পূর্বে দিয়েছেন বর্তমানে অভিজাততন্ত্র বা সর্বোত্তমের শাসন বলতে সেই আদর্শ রাষ্ট্রকে বোঝান হচ্ছে।

শাসনব্যবস্থায়। এ ছাড়া কতিপয়তন্ত্রের বাহক যে চরিত্র এবং গণতন্ত্রের এবং স্বৈরতন্ত্রের যারা বাহক তাদের চরিত্রের বিবরণও আমাদের দিতে হবে। এসো, আমরা সর্বোত্তমকে সর্বাধমের পাশে স্থাপন করি। পাশাপাশি রেখে এই তুলনায় আমরা দেখতে পাব, পরিপূর্ণ ন্যায়ের ভিত্তিতে জীবন যে যাপন করছে এবং যে পরিপূর্ণ অন্যায়ের ভিত্তিতে জীবনযাপন করছে, তাদের কার সুখের পরিমাণ কত? কে যথার্থ সুখী? এই প্রশ্নের জবাব পেলে আমাদের অনুসন্ধানেরও শেষ হবে। তখন আমরা বুঝতে পারব, থ্রাসিমেকাস যেরূপ বলেছেন আমাদের কি সেইরূপ, অন্যায়কে অনুসরণ করাই সঙ্গত হবে, না যুক্তির ভিত্তিতে ন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করা আমাদের উচিত হবে?

তোমার প্রস্তাবমতোই আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত।

কিন্তু আমাদের অগ্রসর হওয়ার পদ্ধতিটি কী হবে? স্পষ্টতার কারণে আমরা আগে যেরূপ রাষ্ট্রকে প্রথম বিবেচনা করে পরে ব্যক্তির বিবেচনায় অগ্রসর হয়েছিলাম এবারও কি আমরা সেই পদ্ধতি অনুসরণ করব? এবং 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার'[১] সরকার নিয়ে যাত্রা শুরু করব? এর অপর কোনো উপযুক্ত নাম পাওয়া মুশকিল। এই সরকারের সঙ্গে আমরা এর বাহক ব্যক্তির চরিত্রের তুলনা করে দেখব। এর পরে আমরা কতিপয়তন্ত্র এবং তার প্রতিভূ চরিত্রের আলোচনা করব। গণতান্ত্রিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক ব্যক্তির চরিত্রের আলোচনা এর পরে আসবে। পরিশেষে আমরা স্বৈরতান্ত্রিক নগরীর চিত্র প্রত্যক্ষ করব এবং স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তির আত্মাকে বিশ্লেষণ করব এবং এই পদ্ধতিতে আমাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণে আমরা সাক্ষম হব। এ-বিষয়ে তোমার কী মনে হয় গ্লকন?

বিষয়টির বিবেচনা সম্পর্কে তুমি যেরূপ বলেছ তা-ই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে বলে আমি মনে করি।

তা হলে এসো, আমরা প্রথমে দেখি অভিজাততন্ত্র বা সর্বোত্তমের শাসন থেকে উচ্চাভিলাষতন্ত্রের উদ্ভব কেমন করে ঘটে। বস্তুত, সকল রাজনৈতিক পরিবর্তনেরই মূল হচ্ছে ক্ষমতাসীন শাসকশক্তির নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ, যে-সরকার ঐক্যবদ্ধ সে যতই ক্ষুদ্রাকার হোক তাকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

---

১. 'উচ্চাকাঙ্ক্ষার' সরকার ঃ ইংরেজি অনুবাদে 'টিমার্কি' বা টিমোক্রাসি' (timarchy. timocracy) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'অলিগার্কি', 'ডিমোক্রাসি' এবং 'টিরানী'র ন্যায় 'টিমোক্রাসি' কোনো পরিচিত শাসনব্যবস্থা নয়। প্লেটোর বর্ণনানুযায়ী এক শব্দে একে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, উচ্চাভিলাষ বা উচ্চ সম্মানলাভের সরকার বলে অভিহিত করা চলে।

গ্লকন বললেন, খুবই সত্য কথা।

তা হলে আমাদের রাষ্ট্রের পরিবর্তনের মূল কোথায় থাকতে পারে বলে আমরা মনে করি? আমাদের রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এবং শাসক—এই দুই শ্রেণী নিজেদের মধ্যে কিংবা একে অপরের সঙ্গে কি বিরোধ শুরু করবে? বিরোধের উদ্ভব কেমন করে ঘটে তা যদি আমরা না জানি তা হলে হোমারের মতো আমরাও কি কাব্য এবং সঙ্গীতের দেবীর নিকট 'বিরোধের আদি সূত্রপাতের' রহস্যটি খুলে বলার জন্য প্রার্থনা জানাব? আমাদের এ-প্রার্থনার জবাবে দেবতাদের প্রকাশ ভঙ্গিটিকে আমরা কল্পনা করতে পারি। তারা হয়তো আমাদের শিশুর মতো গণ্য করে একদিকে কৌতুকে ফেটে পড়বে, অপরদিকে গাম্ভীর্যের ভাব নিয়ে গুরুতর এবং বিষাদাত্মক সুরে আমাদের উদ্দেশ করে বলবে—।

আমাদের তারা কী বলবে?

তারা বলবে ঃ 'যে-নগরী তোমরা এমন করে রচনা করেছ তাকে নড়ায় এমন সাধ্য কার! তবে শুরু যার আছে, তার যখন একটা শেষও আছে, তখন তোমাদের আদর্শ ব্যবস্থাটিও চিরস্থায়ী হবে, এমন মনে করা তো সম্ভব হচ্ছে না। পরিশেষে এও লয়প্রাপ্ত হবে। আর সে-বিলয়ের বলয়টি এরূপই হবে ঃ মাটির উদ্ভিদ আর প্রাণী, তাদের দেহ নিজ জীবনবৃত্তের পরিধির সমাপ্তির সঙ্গে যুক্ত। যার বৃত্ত যখন সমাপ্ত হবে, তার জীবন তখন লয়প্রাপ্ত হবে। তাই যে-জীবনবৃত্তের পরিধি ক্ষুদ্র সে ক্ষুদ্র সময়েই শেষ হয়ে যায় এবং যার পরিধি বৃহত্তর তার জীবনকালও অধিকতর। কিন্তু তোমাদের নগরীর শাসকদের জন্ম-মৃত্যুর জ্ঞান যতই হোক-না কেন, ভ্রান্তির বিরুদ্ধে তাকে রক্ষা করতে তারা সক্ষম হবে না। এবং সেই অজ্ঞানতায় নগরীতে এমন সন্তানের জন্ম ঘটবে যে-সন্তান বাঞ্ছিত নয়। কারণ, তোমরা তো জান না, স্বর্গীয় সন্তান-উৎপাদনের নিয়ামক হচ্ছে একটি স্বর্গীয় সংখ্যা। আর মানুষের সন্তানের জন্মের নিয়ামক হচ্ছে এমন একটি সংখ্যা যে কয়েকটি মৌলিক সংখ্যার মূল এবং বর্গের গুণনে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সমানুপাতের মিশ্রণে অন্তিমে সাধারণ পরিমাপের একটি পরিফল সৃষ্টি করে। এই মৌলিক সংখ্যার মধ্যে ৪ এবং ৩, ৫-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে যখন চতুর্থ ঘাতে উন্নীত হয়, তখন এরা দুটি ঐক্যের সৃষ্টি করে। এর একটি হচ্ছে শতকের গুণিতকের বাহুসমন্বিত বর্গক্ষেত্র। অপরটি হচ্ছে এমন একটি আয়তক্ষেত্র যার একটি বাহু হচ্ছে একটি বর্গক্ষেত্রের পঞ্চম বাহুর বর্গক্ষেত্রের ব্যাসের এমন শতবর্গক্ষেত্র যার কোনো-একটির ব্যাসের মধ্যে অসঙ্গতি ঘটলে তার সংখ্যা একটি করে হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং সঙ্গতিপূর্ণ হলে তার

সংখ্যা দুটি করে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং যে-আয়তক্ষেত্রের আর-একটি বাহু হচ্ছে সখ্যা ৩-এর একশত ঘনক।[১]

'কাজেই মনুষ্যজাতি! তোমরা অনুধাবন করো : এই সংখ্যাই হচ্ছে তোমাদের জন্মের নিয়ামক। এই সংখ্যার ভিত্তিতে জন্মের উত্তম-অধম নির্দিষ্ট হয়। তোমাদের রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যখন এই সংখ্যার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হবে তখন তারা নারী এবং পুরুষের অবাঞ্ছিত মিলনের অনুমতি দান করবে এবং এই মিলনজাত সন্তানরা কোনো মহৎ গুণে গুণী হবে না। কালক্রমে যখন এদের মধ্য থেকেই 'সর্বোত্তমদের' বাছাই করে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিযুক্ত করা হবে, তখন তারা যথার্থভাবে এ-দায়িত্বে উপযুক্ততার কোনো পরিচয় দিতে সক্ষম হবে না। আর তাই তাদের পিতাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যখন তারা অধিষ্ঠিত হবে তখন শাসক হয়েও তারা কর্তব্যে অবহেলা করবে, মানসিক এবং দৈহিক শিক্ষার মর্যাদা দানে তারা ব্যর্থ হবে। ফলে রাষ্ট্রের তরুণসম্প্রদায় যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হবে না। আর এই অধম শিক্ষায় শিক্ষিত বংশধরদের মধ্য থেকে যখন শাসক নিযুক্ত হবে, তখন তারা আর যথার্থ অভিভাবকদের ন্যায় উত্তম এবং অধম ধাতুতে তৈরি বিভিন্ন শ্রেণীর নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে না। স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল এবং লৌহের ভেদাভেদ তারা বিস্মৃত হবে। হিসিয়ড যেমন বলেছেন, তেমনিভাবে তখন লৌহ এবং রৌপ্য কিংবা পিত্তল বা স্বর্ণের মিশ্রণে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অপূর্ণ বস্তুর সৃষ্টি হবে এবং তাদের অসঙ্গতি এবং অনিয়মের কারণে যুদ্ধ এবং ঘৃণা ও সংঘাতের বিস্ফোরণ অনিবার্য হয়ে উঠবে।' গ্লকন, বিরোধের উৎপত্তি সম্পর্কে দেবতাদের জবাব নিশ্চয়ই এরূপ হবে।

গ্লকন বললেন : আমরা তাদের এ-জবাবকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে পারি।

দেবতাদের মুখনিঃসৃত যখন, তখন এ অবশ্যই সত্য হবে।

কিন্তু দেবতাদের এর পরের বক্তব্য কী?

পরের বক্তব্য হবে : একবার যখন অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে তখন তার গতি বিরামহীন। এবার দুটি চরিত্র বিপরীত দিকে নাগরিকদের আকর্ষণ করতে

---

১. মানুষের উত্তম সন্তান উৎপাদনের এই সংখ্যার হিসাব দুর্বোধ্য। আদর্শ রাষ্ট্রে ভ্রান্তি কীভাবে সৃষ্টি হতে পারে তার ব্যাখ্যার সূচনাতে সক্রেটিস দেবতাদের বর্ণিত এই সংখ্যারহস্যের উল্লেখ করেছেন। একে সক্রেটিসের কথামতো দেবতাদের পরিহাস বলেও গণ্য করা যায়। তবে এর মধ্যে প্রাচীন গ্রীসে পাইথাগোরাসের সংখ্যার রহস্যময় দর্শনের প্রভাবের একটি আভাস পাওয়া যায়।

চাইবে। লৌহ এবং পিত্তল আকর্ষণ করবে ব্যক্তিগত মুনাফা এবং জমি এবং গৃহাদি এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের দিকে; অপরদিকে রৌপ্য এবং স্বর্ণ-চরিত্র তাদের আত্মার সম্পদের গুণে আকর্ষণ করবে ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার দিকে। উভয় চরিত্রের এই দ্বন্দ্বের একটা সমাধান ঘটবে আপোসের মধ্যে। আপোসের ভিত্তিতে যৌথ সম্পত্তির স্থানে এবার জমি এবং গৃহাদিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে আর শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক পূর্বে যেখানে ছিল স্বাধীন নাগরিক এবং সুহৃদের সম্পর্ক এবং যে-নাগরিকদের উপর শাসকগণ নির্ভর করত নিজেদের ভরণপোষণের জন্য, সেখানে শাসিত এবার শাসকের ভূমিদাস এবং গৃহভৃত্যে পর্যবসিত হবে। শাসকগণ এবার নিজেদের ব্যাপৃত রাখবে যুদ্ধে এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদের অবদমনে।

গ্লকন বললেন ঃ আমারও তা-ই মনে হয়। পরিবর্তন এভাবেই শুরু হয়। এর ফলে যে-সরকারের উদ্ভব ঘটবে তাকে আমরা কি আমাদের আদর্শ রাষ্ট্র অর্থাৎ অভিজাততন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র—এই দুই-এর মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করতে পারিনে?

হ্যাঁ, এরূপ সরকারের অবস্থান এখানেই স্বাভাবিক।

তা হলে এই পরিবর্তন সংঘটিত হবে। কিন্তু এই পরিবর্তনের পরের ঘটনা কীরূপ ঘটবে? এটা পরিষ্কার যে, পরিবর্তনের ফলে যে-রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে, যেহেতু সে-রাষ্ট্রের অবস্থান হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র এবং আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে, সে-কারণে তার চরিত্রে যেমন প্রকাশ পাবে কতিপয়তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, তেমনি থাকবে তাতে আদর্শ রাষ্ট্রেরও কিছু বৈশিষ্ট্য। আর এ ছাড়া কিছু বিশেষ চরিত্রের সাক্ষাৎও আমরা এ-ব্যবস্থায় লাভ করব।

তুমি ঠিকই বলেছ।

এই বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ পাব আমরা শাসকদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনে, যোদ্ধাশ্রেণীর কৃষি, হস্তশিল্প, এবং সাধারণভাবে ব্যবসায়বৃত্তি গ্রহণ থেকে বিরত থাকার মধ্যে এবং খাদ্যগ্রহণের যৌথ ব্যবস্থায় এবং শরীরচর্চা এবং সামরিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানে। এসব ক্ষেত্রে কতিপয়তন্ত্রের সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

হ্যাঁ। এসব ক্ষেত্রে কতিপয়তন্ত্রের সঙ্গে মিল আছে।

অপরদিকে আবার দার্শনিকদের হাতে শাসনের ক্ষমতাদানে এই ব্যবস্থার ভীতিতে এবং দার্শনিকদের স্থানে শান্তির বদলে যুদ্ধের প্রবণতা যাদের অধিক

তেমন আবেগপ্রবণ এবং অগভীর চরিত্রের লোকদের প্রতি এই ব্যবস্থার আকর্ষণে এবং সামরিক কলাকৌশল এবং বিরামহীন যুদ্ধপরিচালনার উপর অধিক মূল্য আরোপে এই রাষ্ট্রে কতকগুলি বিশেষ চরিত্রের উদ্ভব ঘটে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

আর এই চরিত্রের যে-মানুষ তারা অবশ্যই কতিপয়তন্ত্রের শাসকদের ন্যায় অর্থলোভী হয়ে দাঁড়াবে। বাহ্যত না হলেও এই রাষ্ট্রের শাসকগণের মনে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের জন্য একটা গোপন আকর্ষণ বিরাজ করবে। তাই তারা এই সমস্ত সম্পদ গোপনে গুপ্ত স্থানে সঞ্চয় করতে থাকবে। এবং শাসকরা নিজেদের সম্পদ জমা রাখার জন্য গোপন কোষাগার এবং অস্ত্রাগার তৈরি করবে। তারা দুর্গও তৈরি করবে এবং তাকে হারেমে পরিণত করে তাদের স্ত্রী এবং প্রিয়পাত্রীদের উপর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে থাকবে।

নিঃসন্দেহে এই রাষ্ট্রের শাসকগণ এরূপই করবে।

আর এদের চরিত্রে কার্পণ্যও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। কারণ, যে-অর্থে তাদের লালসা সে-অর্থ প্রকাশ্যে অর্জিত হতে পারে না। তা অর্জিত হবে গুপ্তভাবে। তারা অপরের অর্থ আত্মসাৎ করে নিজেদের বিলাস-উপভোগে ব্যয় করবে। বস্তুত তারা অপরের আনন্দ অপহরণ করে দুষ্ট বালকের ন্যায় তাদের পিতামাতা এবং আইনের দণ্ডকে উপেক্ষা করে। কারণ, এদের শিক্ষা সুকুমার চরিত্রের প্রভাবে হয়নি। মানুষের যথার্থ যে শিক্ষক—যুক্তি এবং দর্শন, তাকে এরা অবজ্ঞা করেছে। এরা শিক্ষিত হয়েছে শক্তির প্রভাবে এবং এরা অধিক মূল্যবান মনে করেছে সঙ্গীতকে নয়, শরীরচর্চাকে।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, তুমি যে-প্রকার সরকারের বিবরণ দিচ্ছ, নিঃসন্দেহে এ-শাসনে উত্তম এবং অধমের মিশ্রণ ঘটেছে।

হ্যাঁ গ্লকন, মিশ্রণ আছে ঠিকই। কিন্তু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এই শাসকদের চরিত্রের একটি দিক। অর্থাৎ তাদের অন্তর্বিরোধ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকটিই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এর কারণ হচ্ছে এদের চরিত্রে সাহস, অর্থাৎ তেজের উপাদানের আধিক্য।

অবশ্যই।

এরূপ রাষ্ট্রের উদ্ভব তা হলে এমনি করে ঘটে এবং তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও হচ্ছে এরূপ। আমি অবশ্য এর বহিঃরেখাটি মাত্র উপস্থিত করেছি। এর অধিক বিবরণের আবশ্যকতা নেই। কারণ, এই খসড়ার মধ্য দিয়েই সর্বোত্তম চরিত্রের

এবং সর্বাধম চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো রাষ্ট্রকে বাদ না দিয়ে সব রাষ্ট্রের বিবরণদান এবং সবরকম রাষ্ট্রের প্রতিভূ-চরিত্রের পরিচয়দানে আমাদের অশেষ পরিশ্রমই কেবল ব্যয়িত হবে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই ধরনের সরকারের প্রতিভূ যে-মানুষ তার চরিত্র কীরূপ। তার জন্ম এবং বৃদ্ধি কী করে ঘটে?

এ্যাডিম্যান্টাস বলে উঠলেন ঃ আমার তো মনে হয় তুমি তার চরিত্রে বিরোধের যে-উপদানের উল্লেখ করেছ, সক্রেটিস, তাতে এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রটি আমাদের বন্ধু গ্লকন থেকে তেমন পৃথক কিছু হবে না।

আমি বললাম ঃ সেই একটি বিষয়ে গ্লকনের সঙ্গে তার মিল থাকতে পারে, কিন্তু অপরদিকে তার চরিত্র অবশ্যই ভিন্ন।

কোনদিকে সে ভিন্ন?

এই রাষ্ট্রের বাহক-ব্যক্তির চরিত্রে অবশ্যই যেমন একদিকে অধিকতর আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব থাকবে, তেমনি তার পরিশীলনের মান অনেক কম হবে। তবু সে সংস্কৃতির একজন সুহৃদ হবে, এ কথা আমরা বলতে পারি। অপরের কথা শ্রবণ করার ক্ষমতাটি তার প্রশংসানীয় কিন্তু নিজে বক্তা হিসাবে তেমন কিছু নয়। এমন চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, অশিক্ষিতের মতো তার দাসের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারে সে বেশ দক্ষতা দেখায়। কোনো শিক্ষিত লোক এরূপ করবে না। কারণ এরূপ রূঢ় ব্যবহারকে সে তার শিক্ষার অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করে। কিন্তু সে স্বাধীন নাগরিকদের প্রতি বেশ সৌজন্যপরায়ণ এবং ক্ষমতাবানদের প্রতি বিশেষভাবে অনুগত; মোটকথা, শক্তির সে ভক্ত এবং সম্মানের সে যাচনাকারী। শাসক হওয়ার দাবি তার বাগ্মিতা কিংবা অন্য কোনো গুণের কারণে নয়। শাসক হওয়ার দাবি তার যোদ্ধা হিসাবে তার দক্ষতার জন্য। আর তাই সে শরীরচর্চা এবং পশ্চাদ্ধাবনের কৌশলকে বিশেষ পছন্দ করে।

গ্লকন বললেন ঃ উচ্চাভিলাষতন্ত্রের পরিপোষক চরিত্র এরূপই হবে।

এরূপ যে-চরিত্র, সে সম্পদকে অপছন্দ করে কেবল তখন, যখন সে বয়সে তরুণ থাকে। কিন্তু তার বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে তত সে অর্থ এবং সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ তার চরিত্রের মধ্যে লোভের উপাদান রয়েছে। ধর্ম বা মহৎ গুণের প্রতি সে একনিষ্ঠ থাকতে পারে না, কারণ তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী যে-অভিভাবক তাকে সে পরিত্যাগ করেছে।

এ্যাডিম্যান্টাস জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে তার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক ছিল?

সঙ্গীতমিশ্রিত দর্শন ছিল তার হিতকাঙ্ক্ষী অভিভাবক। যে-মানুষের মধ্যে এই হিতাকাঙ্ক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে তাকে সে জীবনব্যাপী রক্ষা করে। তার ধর্মের সেইই একমাত্র রক্ষক।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ উত্তম কথা।

আমি বললাম ঃ তা হলে এই চিত্রটিই হচ্ছে উচ্চাভিলাষী তরুণের চিত্র। যেমন রাষ্ট্র তেমন তার নাগরিক। উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রের অনুরূপ হচ্ছে উচ্চাভিলাষী তরুণের চরিত্র।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

এমন তরুণের উদ্ভবটি আমরা বর্ণনা করে বলতে পারি প্রায়শ একটি সুশাসিত নগরীর সাহসী পিতার সে সন্তান। তার পিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, পিতা নির্বিবাদী লোক। রাষ্ট্রীয় সম্মান বা দায়িত্বকে সে অবাঞ্ছিত বলে পরিহার করেছে। কোনো উপদ্রবের মধ্যে জড়িত হওয়াকে সে পছন্দ করে না। তাই কোনো বিষয়ে আইন-আদালতের সে শারণাপন্ন হয়নি। নিজের প্রাপ্য অধিকারকেও সে উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার আশায় পরিত্যাগ করেছে।

কিন্তু তার সন্তানের চরিত্র এরূপ হল কীভাবে?

পুত্রের চরিত্রে এর প্রভাব তখন থেকেই পড়তে শুরু করে যখন ছেলে দেখে, মা বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছে ঃ 'সরকারে তোমার কোনো জয়গা নেই, তাই তো মেয়েদের মহলেও আমার কোনো মান নেই।' তাছাড়া স্ত্রী যখন দেখে তার স্বামীর অর্থের প্রতি আগ্রহ নেই, আইন-আদালত কিংবা জনসভায় তর্ক-লড়াই-বাগ্মিতার কসরত না করে সামান্য যে-অর্থ পায় তা-ই সে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে, যখন সে দেখে তার স্বামীর চিন্তা তার নিজেতেই কেন্দ্রীভূত এবং সে তার কাছ থেকে নিস্পৃহতা বাদে কিছু লাভ করে না, তখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে তার পুত্রকে বলে ঃ ' তোমার বাপ পুরো মানুষই নয়। সে জীবনটাকে নিয়েছে অতি সহজ ভাবে।' এই বলে স্বামীর বিরুদ্ধে অপর সকল অভিযোগেরই সে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। কারণ, স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগের পুনরাবৃত্তি মেয়েদের বিশেষ প্রিয় বিষয়।

এ্যাডম্যিান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, আমাদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের অন্ত নেই। আর তাদের অভিযোগ তাদের চরিত্রেরই প্রতিফলন।

তা ছাড়া তুমি জান, পুরনো গৃহভৃত্য যাদের আমরা প্রভুর গৃহের প্রতি অনুরক্ত বলে মনে করি তারাও সময়ে সময়ে গোপনে পুত্রের কাছে একই সুরে প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রকাশ করে। এরূপ ভৃত্যরা যদি দেখে যে, তার প্রভুর কাছে অর্থের দায়ে যারা ঋণী তারা তাদের দেয় ঋণ পরিশোধ করছে না কিংবা অন্য উপায়েও তাকে প্রতারিত করছে তবু তার প্রভু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আদলতে নালিশ করে কোনো প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করছে না, তখন সে পুত্রকে বলে ঃ 'আপনি আপনার পিতার মতো না হয়ে শক্ত হবেন এবং এই ধরনের প্রতারকদের বিরুদ্ধে আপনি কঠিন প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' কেবল গৃহভৃত্যের নিকট নয়, পুত্র যেখানে যায় সেখানেই সে পিতার বিরুদ্ধে অনুরূপ কথাই শুনতে পায়। সে দেখে, নগরীতে যারা নিজের কর্তব্য পালন করে তারা সম্মানের পাত্র নয়। তাদের মনে করা হয় নির্বোধ। আর যারা ব্যস্তসমস্ত ফোপরদালাল তারাই সবার বাহবা লাভ করে। তারাই সম্মানিত হয়। তরুণ পুত্র একদিকে দেখে তার পিতার বিরুদ্ধে সাধারণের এমনি অভিযোগ; অপরদিকে পুত্র হিসাবে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সে তার পিতার অভিমতকে জানে। পুত্র এই উভয় অভিজ্ঞতাকে তুলনা করে এবং দেখতে পায়, তার পিতা যখন নিজের মনে যুক্তিকে প্রধান বলে গণ্য করছে এবং যুক্তির নীতিকে লালন করছে তখন অপর সকলের কাছে প্রধান হচ্ছে ব্যক্তিগত স্বার্থ। সেই ব্যক্তিগত স্বার্থসাধনেরই তারা চেষ্টা করছে। এমন অবস্থায় দুই বিপরীত আকর্ষণ সে বোধ করে। পুত্রের নিজের চরিত্র গোড়াতে খারাপ ছিল না। কিন্তু সকল অসৎসঙ্গের সম্মিলিত প্রভাব তাকে দূরে সরিয়ে এনে দুই বিপরীত আকর্ষণের মধ্যবিন্দুতে স্থাপিত করে। পুত্র এবার তার অন্তরের সৎ-এর রাজ্য পরিত্যাগ করে বিরোধ এবং লোভের কেন্দ্রবিন্দুকে বরণ করে এবং পরিণামে অহংকারী এবং উচ্চাভিলাষী এক চরিত্রে পরিণত হয়।

এ্যাডম্যান্টাস বললেন ঃ উচ্চাভিলাষী রাষ্ট্রের উচ্চভিলাষী তরুণের উদ্ভব এবং বিকাশকে তুমি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছ সক্রেটিস।

তা হলে আমরা দ্বিতীয় প্রকারের[১] সরকার এবং দ্বিতীয় প্রকার চরিত্রের পরিচয় পেলাম।

হ্যাঁ, আমরা এদের পরিচয় পেলাম।

---

১. প্রথম প্রকারের সরকার হচ্ছে প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্র। আদর্শ রাষ্ট্রকে অভিজাততন্ত্র বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম প্রকার চরিত্র হচ্ছে দার্শনিক শাসকের চরিত্র।

অধ্যায় ঃ ২১
[৫৫০—৫৫৫]

কতিপয়তন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রী চরিত্র

উচ্চাভিলাষতন্ত্র থেকে কতিপয়তন্ত্র। উচ্চাভিলাষতন্ত্র কালক্রমে সম্পদকে সম্মান ও শক্তির কেন্দ্র বলে মনে করে, জ্ঞানকে নয়। ফলে শাসকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি জড়ো করতে শুরু করে। আর এই সম্পদের লোভ যখন শাসককে পরিপূর্ণরূপে গ্রাস করে তখনই কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব হয়। সম্পদ যেখানে লক্ষ্য, সেখানে শাসন কতিপয়ের হাতে সীমাবদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। কারণ, সকলেই চাইবে সর্বাধিক পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করতে। এই প্রতিযোগিতায় দুর্বলরা ক্রমান্বয়ে নিঃস্ব হবে এবং সবলরা ধনবান হবে। দুর্বলের এবং দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং সবলের তথা সম্পদবানের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে কতিপয় হয়ে দাঁড়াবে। বিচ্যুতির যে-ক্রম, তাতে দেখা যায় প্রত্যেক পর্যায়ে রাষ্ট্রের ঐক্য ক্রমাধিক পরিমাণে বিনষ্ট হচ্ছে। আদর্শ রাষ্ট্রে ঐক্য ছিল। কারণ, সেখানে যার যা করণীয় সে তা-ই করত। উচ্চাভিলাষতন্ত্রে যার শাসন করা সঙ্গত নয় সেই 'বিক্রম' শাসন করতে শুরু করে। এই অসঙ্গতির মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা। কতিপয়তন্ত্রে রাষ্ট্রের ঐক্য অধিকতর বিনষ্ট হয়। কারণ, সম্মান বা শক্তির আকাঙ্ক্ষা অর্থের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে উৎকৃষ্ট। অর্থের ক্রমাধিক আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্রকে সম্পদবান এবং নিঃস্ব—এই দুই পরস্পরবিরোধী 'দ্বন্দ্বমান শ্রেণীতে' বিভক্ত করে ফেলে। প্লেটোর ভাষায় 'এমন রাষ্ট্রকে আমরা আর একটি রাষ্ট্র বলতে পারিনে। এ হচ্ছে দুটি রাষ্ট্র কিংবা এমন রাষ্ট্র যার একপ্রান্ত অপর প্রান্তকে অবিশ্বাস করে এবং অপর প্রান্তকে ধ্বংস করতে চায়।' কতিপয়তন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র হচ্ছে কতিপয়ী চরিত্র যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অর্থগৃধ্নুতা এবং আলস্য। "অর্থের লিপ্সা তার অন্তরে সম্রাট। যুক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা সেই সম্রাটের পদপ্রান্তে দাস। যুক্তির জন্য জিজ্ঞাসা কিংবা হিসাব বা অনুমান এখন নিষিদ্ধ। কেমন করে অধিকতর অর্থ অর্জন করা যায়, এই হচ্ছে এখন সম্রাটের আদেশে যুক্তির বিবেচ্য। উচাচাকাঙ্ক্ষাও এখন

সম্পদ এবং সম্পদবান ব্যতীত অপর কিছুর মূল্যদানে অক্ষম।" [৫৫৩]

এবার তা হলে আমরা এসকাইলাস[১] যেমন বলেছেন 'যেমন ব্যক্তি তেমন রাষ্ট্র' সেরূপ আর-একটি চরিত্রের পরিচয় নিই? অথবা যদি বল, তা হলে আমাদের পরিকল্পনা অনুসরণ করে রাষ্ট্রটি সম্পর্কে আগে আলাপ করে নিই?

হ্যাঁ, আমাদের এরূপ করাই উচিত।

সেই ধারায় আমার বিশ্বাস কতিপয়তন্ত্র নিয়েই এবার আমাদের আলাপ করতে হয়?

কিন্তু সক্রেটিস, কী ধরনের সরকারকে তুমি 'কতিপয়তন্ত্র' বলে অভিহিত করতে চাও?

কতিপয়তন্ত্র আমরা তাকেই বলব, যেখানে সরকারের ভিত্তি হচ্ছে সম্পত্তি এবং যেখানে অর্থবানরাই ক্ষমতাবান আর দরিদ্রগণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু আমাদের বোধহয় উচ্চাভিলাষতন্ত্র থেকে কতিপয়তন্ত্রের পরিবর্তনটা আগে ব্যাখ্যা করা আবশ্যক।

হ্যাঁ, এই পরিবর্তনটি আমাদের জানা আবশ্যক।

অবশ্য এর একটি অপরটিতে কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেটি দেখার জন্য খুব তীক্ষ্ণ চোখের নিশ্চয়ই আবশ্যকতা নেই?

কেন?

ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির অর্জন এবং ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে তা জমা করার মধ্যেই উচ্চাভিলাষতন্ত্রের ধ্বংস নিহিত। উচ্চাভিলাষতন্ত্রের শাসকগণ বেআইনি উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে অবৈধ ব্যয়েরও নানা উপায় আবিষ্কার করে। কারণ, তারা কিংবা তাদের স্ত্রীগণ আইনের কোনো পরোয়া করে না।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

---

১. এসকাইলাস (৫২৫–৪৫৬ খ্রিঃ পূঃ) গ্রীক বিষাদাত্মক নাট্যকলার স্রষ্টা।

ফলে একজন যখন অপরজনকে ধনী হতে দেখে তখন সে নিজে তার চেয়েও অধিক ধনী হতে চায়। ধন-উপার্জনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এমনিভাবে অধিকসংখ্যক নাগরিকই অর্থলিপ্সু হয়ে দাঁড়ায়।

এরূপ হওয়াই সম্ভব।

এমনিভাবে তারা অধিক থেকে অধিকতর ধনবান হতে আরম্ভ করে। আর যত অধিক তারা সম্পদের কথা চিন্তা করে, তত কম তারা ন্যায়ধর্মের বিষয়ে আগ্রহবোধ করে। কারণ, দাঁড়িপাল্লায় তুমি যখন ধনসম্পদ আর ন্যায়ধর্ম একসঙ্গে ওজন করতে চাইবে, তখন একদিকে যখন ধনসম্পদ ভারী হতে থাকবে তখন অপরদিকে ন্যায়ধর্ম হ্রাস পেতে থাকবে।

এ কথা যথার্থ।

এবং যে-অনুপাতে এরূপ রাষ্ট্রসম্পদ এবং সম্পদবানের সম্মান বৃদ্ধি পেতে থাকবে ঠিক সেই অনুপাতে অপরদিকে ন্যায়ধর্ম এবং ন্যায়বান অসম্মানিত হতে থাকবে।

নিঃসন্দেহে।

আর একথাও সত্য, যাকে তুমি সম্মান কর তারই চর্চা হয়, তারই বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু যে অসম্মানিত, সে অবজ্ঞাত হতে থাকে।

এ-সত্য স্পষ্ট।

পরিণামে এরূপ রাষ্ট্রে সম্মানের দ্বন্দ্ব সম্পদের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। সম্মানের জন্য দ্বন্দ্বের বদলে এবার সকলে অর্থ এবং ব্যবসায়কামী হয়ে ওঠে। এখন তারা সম্পদবানকেই সম্মানিত করে; তার প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং সম্পদবানকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করে এবং দরিদ্রকে তারা অসম্মান করে।

তারা এরূপই করে।

এর পরবর্তী ধাপে এরা এরূপ একটা আইন প্রণয়ন করে, যে-আইনের আদেশে বিশেষ বিশেষ পরিমাণ অর্থকে নাগরিকত্বের শর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়। এ-অর্থের পরিমাণ কোথাও কম, কোথাও বেশি হতে পারে। কারণ, কতিপয়তন্ত্রের শাসকের সংখ্যা কম কিংবা বেশি হতে পারে। নির্দিষ্ট অর্থের চেয়ে কম যাদের অর্থের পরিমাণ, সরকারের সকল ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত রাখা হয়। সন্ত্রাসের মাধ্যমে যদি তারা সংবিধানের মধ্যে এই সমস্ত পরিবর্তন

অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম না হয়, তা হলে অস্ত্রের জোরে শাসকগণ তাদের বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধন করে।

খুবই সত্য কথা।

মোটামুটি এভাবেই কতিপয়তন্ত্রের সরকার স্থাপিত হয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস। কিন্তু এরূপ সরকারের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য কী এবং এদের যে-ত্রুটির কথা তুমি একবার উল্লেখ করেছিলে, সেগুলিই-বা কি?[১]

আমি বললাম ঃ প্রথমত, শাসনের শর্তের কথা ধরো। জাহাজ কে চালাবে? মনে করো শর্ত করা হল, যার অর্থ আছে সে-ই জাহাজ চালাবে, সে নয় যে জাহাজ চালাতে জানে। একজন দরিদ্র যদি নৌচালনায় দক্ষ হয় তবুও সে নৌযানের নাবিক হতে পারবে না। কারণ নৌযানচালনার গুণ নির্দিষ্ট হয়েছে—অর্থ, নৌচালনার দক্ষতা নয়। এমন যদি হয়, তার পরিণাম কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর?

এর পরিণাম নির্ঘাত ধ্বংস। জাহাজ সমুদ্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হ্যাঁ। তাই হবে, আর এ কেবল জাহাজের ক্ষেত্রেই কি সত্য? যে-কোনো কিছুর চালনার ক্ষেত্রেই কি এ কথা সত্য নয়?

হ্যাঁ, সর্বত্রই এ কথা সত্য।

কিন্তু একটি রাষ্ট্র? সে কি এ-সত্য থেকে বাদ থাকবে? না, রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রেও এ-পরিণাম সত্য?

শুধু সত্য নয়, আমি বলব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ সবচেয়ে বেশি সত্য। কারণ, একটি রাষ্ট্রচালনা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন কাজ।

তা হলে কতিপয়তন্ত্রের এটাই হচ্ছে প্রথম ত্রুটি?

নিঃসন্দেহে এটা তার ত্রুটি।

কিন্তু এর আর-একটি ত্রুটির কথাও আমাদের বলতে হয়, যে-ত্রুটি প্রথমটির মতোই মারাত্মক।

কী সে ত্রুটি?

রাষ্ট্রের মধ্যকার অনিবার্য বিভেদ ও বিভাগ। এরূপ রাষ্ট্র আসলে একটা রাষ্ট্র নয়। এ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে দুটা রাষ্ট্র। এর একটি হচ্ছে দরিদ্রের রাষ্ট্র। অপরটি

---

১. ৫৪৪ দ্রষ্টব্য।

হচ্ছে ধনবানের রাষ্ট্র। একই স্থানে এই দুই রাষ্ট্রের অবস্থান এবং সর্বদা এরা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত। সর্বদাই এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে রত থাকে।

এমন হলে এ-ত্রুটি অবশ্যই প্রথমটির মতোই মারাত্মক।

এরূপ রাষ্ট্রের অপর অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এই কারণেই এরা যুদ্ধ-পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের সম্মুখে উভয়সংকট। হয় তাদের জনতাকে যুদ্ধের জন্য সশস্ত্র করতে হয়, নয়তো তাদের সামরিক বাহিনীর একেবারে বাইরে রাখতে হয়। জনতাকে সশস্ত্র করতে তাদের ভয়। সশস্ত্র জনতাকে তারা তাদের বৈদেশিক শত্রুর চেয়েও অধিক ভয় করে। অপরদিকে যুদ্ধের সময়ে জনতাকে যুদ্ধে না পাঠালে কে যুদ্ধ করবে? কারণ কতিপয়তন্ত্র যথার্থই কতিপয়ের তন্ত্র। তার শাসকও যেমন কতিপয়, তার যোদ্ধাও কতিপয়। তা ছাড়া তাদের অর্থগৃধ্নুতা রাষ্ট্রীয় কর এবং যুদ্ধের ব্যয়-পরিশোধেও তাদের অনাগ্রহী করে তোলে।

এও তো এক মারাত্মক ত্রুটি।

ফলে, আমরা পূর্বে যা বলেছিলাম সেই ব্যাপারই এখানে সংঘটিত হয়। এরূপ শাসনব্যবস্থায় এক ব্যক্তির উপর একাধিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। যে কৃষক, সে-ই বণিক এবং সে-ই আবার যোদ্ধা ঃ একসঙ্গে সে সবকিছু। এ-ব্যাপারটা কি তুমি উত্তম মনে কর?

না, এ কিছুতেই উত্তম হতে পারে না।

কিন্তু সবচেয়ে বড় যে, ত্রুটি, যার প্রবণতা এর মধ্যে প্রথমেই দেখা যায় তার কথা বলা এখনও বাকি আছে।

কী সে-ত্রুটি?

সে-ত্রুটি হচ্ছে এই যে, একজন নাগরিক ইচ্ছা করলে তার সকল বিষয়-আশয়ই বিক্রি করে দিতে পারে এবং অপর একজন তার সেসব সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে এবং এরূপ বিক্রয়ের পরে সে আর নগরীর নাগরিক না থাকা সত্ত্বেও নগরীতে বাস করতে পারে। অথচ সকল কিছু বিক্রয়ের পরে সে আর এই নগরীর না বণিক, না কারিগর, না সেই সৈনিক। সে তখন একেবার নিঃস্ব এক অধিবাসী। কতিপয়তন্ত্রে এর উপর কোনো নিষেধ নেই। এর ফলেই এই শাসনব্যবস্থায় চরম সম্পদ এবং চরম দারিদ্র্যের তীব্র বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

একথা সত্য।

এক্ষেত্রে আর একটা কথা আছে। এখন যে নিঃস্ব অধিবাসীতে পরিণত হয়েছে সে যখন ধনবান ছিল, তখন কি সে তার অর্থ কোনো প্রয়োজনীয়

সামাজিক দায়িত্বপালনে ব্যয় করেছে? না, তা সে করেনি। তাকে যদিও শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে বোধ হয়েছে তবু না সে শাসনের দায়িত্ব পালন করেছে, না সে সামাজিক অপর কোনো কর্তব্যসম্পাদন করেছে। সে কেবল ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করেছে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এ কথা যথার্থ। তাকে যেমনই বোধ হোক না কেন, সে কেবলমাত্র ভোগীই ছিল।

তা হলে আমরা তাকে কী বলতে পারি? সঙ্গতভাবেই আমরা বলতে পারি সে ছিল পুরুষ-মৌমাছির মতোই অলস। পুরুষ-মৌমাছি যেমন মৌচাকের জন্য ক্ষতিকর, এমন লোকও নগরীর জন্য ক্ষতিকর। ঠিক নয় কি?

ঠিক কথা সক্রেটিস।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, পার্থক্য এই যে, বিধাতা উড়ন্ত পুরুষ-মৌমাছিকে যেখানে একেবারে হুলবিহীন করে তৈরি করেছেন, সেখানে তিনি পায়ে-হাঁটা এই পুরুষ-মৌমাছির কাউকে হুলবিহীন করলেও অপরগুলোর মধ্যে মারাত্মক হুল জুড়ে দিয়েছেন। হুলবিহীন যেগুলি সেগুলি বৃদ্ধ বয়সে নিঃস্ব হয়ে জীবন শেষ করে। কিন্তু হুলযুক্তগুলি থেকেই রাষ্ট্রের যত অপরাধী, তাদের সৃষ্টি।

খুবই সত্য কথা।

আর তাই নগরীর যেখানে তুমি এই নিঃস্ব ভবঘুরেদের দেখতে পাবে, নিশ্চিত জেনো সেখানেই লুকিয়ে রয়েছে নগরীর যত চোর, বাটপাড়, মন্দির-লুণ্ঠনকারী ডাকাত এবং আরসব দুষ্কর্মকারীর দল।

নিঃসন্দেহে।

কতিপয়তন্ত্রে তুমি কি এরূপ নিঃস্ব লোকের সাক্ষাৎ পাও না?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি তো বলব এমন রাষ্ট্রে যে শাসক নয় সে-ই ভিক্ষুক, সে-ই নিঃস্ব।

তা হলে আমাদের একথাও বলতে হয় যে, এদের মধ্যে বহু অপরাধী রয়েছে—বহু দুষ্কর্মকারী রয়েছে যারা মারাত্মক রকমের হুলযুক্ত। এদের দমন রাখার জন্য শাসকদের বিশেষ বেগ পেতে হয়, সর্বদা তাদের সতর্ক থাকতে হয়?

হ্যাঁ, একথাও আমাদের বলতে হয়।

কিন্তু এরূপ লোকের অস্তিত্বের কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব, কুশিক্ষার আধিক্য এবং রাষ্ট্রের ত্রুটিপূর্ণ সংবিধান।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

এই হচ্ছে তা হলে কতিপয়তন্ত্রের গঠন এবং তার ত্রুটি। এর বাইরেও এমন শাসনব্যবস্থার আরও অনেক ত্রুটি থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আরও ত্রুটি থাকতে পারে।

তা হলে কতিপয়ের তন্ত্র বা যে-ধরনের শাসনব্যবস্থায় সম্পদের ভিত্তিতে শাসক নির্দিষ্ট হয় সে-সরকারের আলোচনা এবার আমরা শেষ করতে পারি। এবার এসো, আমরা এর প্রতিরূপ-ব্যক্তির চরিত্র অর্থাৎ যে-চরিত্র এইরূপ রাষ্ট্রের বাহক তার আলোচনা করি।

হ্যাঁ, সে-আলোচনা এবার আমরা করতে পারি।

যেভাবে অভিলাষতন্ত্র কতিপয়তন্ত্রে পরিণত হয়েছে, অনুরূপভাবেই উচ্চাভিলাষী কি কতিপয়তন্ত্রের বাহক-চরিত্রে পরিণত হয় না?

কেমন করে?

ধারাটি এইরূপ। উচ্চাভিলাষীর ছেলের কথা ধরো। প্রথমে সে পিতার পথ ধরেই চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন সে নিজেকে রাষ্ট্রের মুখোমুখি একটা নিমজ্জিত প্রবাল-প্রাচীরের উপর স্থাপিত বলে বোধ করে। তার নিজেকে হৃতসর্বস্ব মনে হয়। তার পিতা হয়তো কোনো সমরাধিনায়ক বা উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ছিল। কিন্তু গুপ্তচরের ষড়যন্ত্রে আজ তাকে বিচারে সোপর্দ হতে হয়েছে। এবং সে বিচারে হয় তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, নয়তো সে নির্বাসিত হয়েছে। কিংবা সকল নাগরিক-অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তার সকল সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব।

আমি বললাম ঃ পিতার এ-ভাগ্য পুত্রের চোখের সম্মুখেই ঘটেছে। পুত্র সবকিছুই দেখতে পেয়েছে। পিতার এই দুর্ভাগ্য, বিশেষ করে সম্পদের ক্ষেত্রে তার হৃতসর্বস্ব অবস্থা পুত্রের মনে সাহস এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার যে-ভাব ছিল তাকে বিনষ্ট করে ফেলে। সে তার সাহস হারিয়ে ফেলে। কিন্তু দারিদ্র্যে নিপতিত হয়ে এবং নিজের পরিশ্রমে জীবিকা-অর্জনে বাধ্য হয়ে পুত্র কষ্টকর মিতব্যয়ে এবং কঠিন কাজের মাধ্যমে পুনরায় যখন সম্পদ সঞ্চয়ে সক্ষম হয়, তখন সে কি তার অন্তরে সম্পদের কামনাকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবে না? অর্থের কামনাই কি এবার প্রাচ্যের একচ্ছত্র সম্রাটের মতো তাকে মুকুট, শৃঙ্খল এবং তরবারিতে সজ্জিত হয়ে শাসন করতে শুরু করবে না?

অবশ্যই।

অর্থের লিপ্সা তার অন্তরে সম্রাট। আর যুক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা সেই সম্রাটের পদপ্রান্তে দাস। যুক্তির জন্য জিজ্ঞাসা কিংবা হিসাব বা অনুমান এখন নিষিদ্ধ। কেমন করে অধিকতর অর্থ অর্জন করা যায়, এই হচ্ছে এখন সম্রাটের আদেশে যুক্তির বিবেচ্য। উচ্চাকঙ্ক্ষাও আর সম্পদ এবং সম্পদবান ব্যতীত অপরকিছুকে মূল্যদানে অক্ষম। তার জন্য তা নিষিদ্ধ। তার করণীয় এখন শুধুমাত্র অর্থ উপার্জন করা। অর্থ-উপার্জনের প্রতিযোগিতাতে যোগদান করা—অপরকিছুতে নয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ উচ্চাভিলাষ থেকে অর্থের লিপ্সায় এর চেয়ে দ্রুত পরিবর্তন আর কিছু হতে পারে না।

এবং যে-চরিত্রটি আমরা এখানে তুলে ধরলাম, সে কি কতিপয়তন্ত্রের বাহকেরই চরিত্র নয়?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ যে-সমাজব্যবস্থা কতিপয়তন্ত্রকে সৃষ্টি করে এ-চরিত্র অবশ্যই সে-অবস্থারই সৃষ্টি।

তা হলে দেখা যাক এই চরিত্রের বৈশিষ্টও একইরূপ কি না।

ঠিক আছে, দেখা যাক এর বৈশিষ্ট্য কী?

কতিপয়ের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এ-চরিত্রের প্রথম সাদৃশ্য অর্থের উপর এর সর্বাধিক গুরুত্বদানে নিহিত।

একথা সত্য।

আবার দ্যাখো, সে মিতব্যয়ী এবং কঠিন পরিশ্রমী। তার যা অপরিহার্য প্রয়োজন তাকেই সে পূরণ করে, যথেষ্ট ব্যয়ের অভ্যাস তার থাকে না। অপর সব কামনাকে সে অপ্রয়োজনীয় বলে দমন করে রাখে।

যথার্থ।

হ্যাঁ, আমরা তাকে একটি কৃপণ এবং অপরিচ্ছন্ন চরিত্র বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ, সে সবকিছুর মধ্যেই অর্থের অন্বেষণ করে এবং তার অর্থের থলিটি সে ক্রমান্বয়ে ভারী করে তুলতে চায়। এরূপ চরিত্র স্থূলমনাদের কাছ থেকেই প্রশংসালাভ করে। কাজেই যে-রাষ্ট্রের সে প্রতিনিধি তার সে সত্যকার প্রতিরূপই বটে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমার কাছেও তাকে সত্যকার প্রতিরূপ বলেই বোধ হয়।

মোটকথা, অর্থকে মূল্যবান বিবেচনার ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্র এবং এই চরিত্র—উভয়েরই সাদৃশ্য স্পষ্ট।

আর এরূপ চরিত্র যে খুব সংস্কৃত চরিত্র নয়, সেটিও পরিষ্কার?

হ্যাঁ,একথা ঠিক। না হলে এক অন্ধ চরিত্রকে[১] তার জীবননাট্যের নায়কে সে পরিণত করত না।

তুমি বেশ বলেছ এ্যাডিম্যান্টাস; কিন্তু দ্যাখো, এই সংস্কৃতির অভাবই তার চরিত্রে আবার নিঃস্ব এবং বর্বর সেই পুরুষ-মৌমাছির প্রবণতার বীজ বপন করতে থাকবে। তার সতর্ক দৃষ্টি এ-প্রবণতাকে প্রকট হতে না দিতে পারে, কিন্তু সে-বীজ অবশ্যই উপ্ত হবে।

হ্যাঁ, একথা মিথ্যা নয়।

আর এই মারাত্মক প্রবণতা কোথায় প্রকাশ পাবে, জান?

কোথায়?

প্রকাশ পাবে, অনাথদের ব্যবস্থাপনা কিংবা অনুরূপ সব ক্ষেত্রে যেখানে তার অসৎ হওয়ার সুযোগ মিলবে প্রচুর। এক্ষেত্রেই স্পষ্ট হয়ে যায়, জীবনের লেনদেনের অপরক্ষেত্রে এই চরিত্র যে-সম্মানজনক সততার পরিচয় এতদিন দিয়ে আসছিল, সে-সততার মূল হচ্ছে তার বৈষয়িক জীবনে অসততা থেকে লোকসানের ভয়। এই ভয়ই তার মারাত্মক প্রবণতাকে এতদিন একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখেছিল।

একথা খুবই সত্য।

তা ছাড়া আরও মারাত্মক যা তা হচ্ছে এই যে, এরূপ লোকের এই অধম প্রবৃত্তি সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দেয় তখন, যখন সে অপর লোকের অর্থব্যয়ের দায়িত্ব লাভ করে।

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

এরূপ লোকের কিন্তু অন্তরে শান্তি থাকে না। তার ব্যক্তিত্ব দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। অবশ্য সামগ্রিকভাবে এখনও তার উত্তম প্রবৃত্তি তার অধম প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম থাকছে।

তা ঠিক।

---

১. অর্থের দেবতা অন্ধ বৈ অপর কিছু নয়—গ্রীকদের এরূপ একটি ধারণা ছিল।

কাজেই এ-চরিত্রের একটা পরিমাণ সম্মান থাকে। কিন্তু তা হলেও, একটা সুসংহত ঐক্যসূত্রে গ্রথিত চরিত্রের যে যথার্থ উৎকৃষ্টতা, তাকে লাভ করা কিংবা তার নিকটবর্তী হওয়া এ-চরিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়।

তোমার অভিমতের সঙ্গে আমি একমত।

আসলে সে একটি দুর্বল লোক আর তাই সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো উচ্চ অভিলাষের ক্ষেত্রে কিংবা সাফল্যের প্রতিযোগিতার জন্য সে অনুপযুক্ত। সম্মান এবং বিশিষ্টতার সংগ্রামে অর্থব্যয়ে সে অনাগ্রহী এবং নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষে লড়াই-এর ব্যয়সাপেক্ষ প্রবৃত্তিসমূহকেও সে জাগরিত করার ব্যাপারে ভীত। আর তাই কতিপয়তন্ত্রের একজন যথার্থ প্রতিভূ হিসাবে সে নিজের সত্তারই একটি অংশের বিরুদ্ধে লড়াইতে ব্যস্ত থাকে। তার একটি অংশকে সে দমিত করে। এ-লড়াইতে সে তার অর্থকে বাঁচাতে পারে বটে, কিন্তু মূলত সে পরাজিত হয়।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে আমরা দ্বিধাহীনভাবেই কি বলতে পারিনে যে, এরূপ অর্থগৃধ্নু চরিত্রই হচ্ছে কতিপয়তন্ত্রের যথার্থ প্রতিভূ চরিত্র?

এ-সিদ্ধান্তে আমাদের দ্বিধার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

অধ্যায় ঃ ২২
[৫৫৫—৫৬২]

গণতন্ত্র এবং গণতন্ত্রী চরিত্র

কতিপয়তন্ত্রের অনিবার্য পরিণাম গণতন্ত্র। কারণ, কতিপয় শাসক সংখ্যায় অল্প। সমস্ত সম্পদ তারা নিজেরা পুঞ্জিভূত করেছে। ব্যক্তিগত ধনাগার তারা তৈরি করেছে। দরিদ্রকে তারা নিঃস্ব করেছে। তাদের তারা ভিক্ষুকে পরিণত করেছে। কিন্তু দরিদ্ররা ব্যক্তিগতভাবে অক্ষম হলেও তাদের সংখ্যাই শক্তি। শাসকশ্রেণী তাদের সংখ্যাকে ভয় করে। শাসকশ্রেণী তাদের সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত করতেও ভরসা পায় না। পাছে অস্ত্র পেয়ে সেই অস্ত্র সে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে লক্ষ্য করে। কিন্তু সংকটকালে দরিদ্রের উপর নির্ভর করা ব্যতীত শাসকের গত্যন্তর নেই। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ আছে। অপর সংকট আছে। তাই পরস্পরের সাক্ষাৎ এড়ানো সম্ভব নয়। "হয়তো তীর্থযাত্রায় কিংবা যুদ্ধাভিযানে সহ-সৈনিকের ভূমিকায় তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। একে অপরকে দেখে। ... এরূপ অবস্থাতে এমন হওয়া খুবই সম্ভব যে, যুদ্ধক্ষেত্রে রোদেপোড়া মানুষটির অবস্থান ঘটবে ধনবান মেদবহুল সেই লোকটির পাশে যার দেহের বর্ণটি সূর্যের তাপে বিবর্ণ হতে পারেনি। রোদেপোড়া দরিদ্র মানুষটি যখন এরূপ মেদবহুল ধনবানকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে হতশ্বাস এবং হতবুদ্ধি অবস্থায় দেখতে পায় তখন সে এই সিদ্ধান্ত না করে পারে না যে, এই অপদার্থগুলি অর্থবান হতে পেরেছে কেবলমাত্র শাসিতের সাহসের অভাবে। ... নিজেদের মধ্যে তারা একে অপরকে বলে ঃ দেখেছ, যোদ্ধা হিসাবে এরা কী অপদার্থ! এদের দিন শেষ হয়ে গেছে!" কতিপয়তন্ত্রের দুর্বলতা প্লেটো মুক্তচিত্তে প্রকাশ করেছেন। দরিদ্রের শক্তিকে তিনি উপলব্ধি করেছেন। এবং কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্র যে অনিবার্য তাও তাঁর উপস্থাপনায় স্বীকৃত। কিন্তু প্লেটোর নিকট গণতন্ত্র আদর্শ রাষ্ট্রের অধিকতর বিচ্যুতি। আদর্শ রাষ্ট্র থেকে এর অবস্থান অনেক দূরে। কারণ, প্লেটোর মতে সম্মানের আকাঙ্ক্ষা যেমন অর্থের আকাঙ্ক্ষার চেয়ে উত্তম, তেমনি অর্থের আকাঙ্ক্ষা সংখ্যার নীতিহীনতার চেয়ে উত্তম। কারণ, কতিপয়তন্ত্রের একটা আদর্শ

আছে। সে-আদর্শ হচ্ছে অর্থসংগ্রহ। সেদিক থেকে গণতন্ত্রের কোনো আদর্শ নেই। না জ্ঞান, না সম্মান, না অর্থ—কোনো আদর্শই গণতন্ত্রের আদর্শ নয়। তাই প্লেটোর কাছে গণতন্ত্র হচ্ছে নীতিহীন সংখ্যার শাসন। প্লেটো এথেন্সের প্রচলিত গণতন্ত্রের তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর পারিবারিক সম্পর্কেও প্লেটো যুক্ত ছিলেন অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে। তাঁর যুক্তিবাদী মন অবশ্য তাঁকে অভিজাততন্ত্র বা পিলোপনেশীয় যুদ্ধের শেষের দিকে স্বৈরাচারী ত্রিশের অভ্যুত্থানের পরিপূর্ণ সমর্থক হতে দেয়নি। গণতন্ত্রের নীতিহীনতা, ব্যক্তিচরিত্রের দায়িত্বহীনতা, বল্গাহীন বাগাড়ম্বর ইত্যাদি তাঁকে গণতন্ত্রের সমালোচকে পরিণত করেছিল, কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারও তাঁর যুক্তিবাদী মনকে স্বৈরতন্ত্রের পরিপোষক হতে দেয়নি। তাই প্লেটোর বর্ণনায় গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র, উভয় পদ্ধতির তুলনাহীন স্পষ্ট এবং বিদ্রূপাত্মক উপস্থাপনা এবং সমালোচনার আমরা সাক্ষাৎ পাই। প্লেটোর মতে "গণতন্ত্রে কারও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যার শাসন করার গুণ আছে, সে শাসন করতে বাধ্য নয়। যার আনুগত্য পোষণ করার আবশ্যকতা আছে সেও অনুগত হতে বাধ্য নয়। ... যে অপরাধী, সে দণ্ডিত নয়। যে দণ্ডিত, সে অপরাধী নয়। স্বচ্ছন্দে সে ঘুরে বেড়ায়। বলা চলে এ এক অবাধ 'স্বাধীনতার' রাজত্ব। এখানকার পশুরাও অপর কোনো রাজত্ব থেকে অধিক স্বাধীন। গণতন্ত্র তৈরি করে গণতন্ত্রী চরিত্র যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে মুহূর্তের দাস। ... এই মুহূর্তে হয়তো সে সুরা, নারী এবং সঙ্গীতে লিপ্ত। পরমুহূর্তে সে ভোজ্যদ্রব্যে ভুক্ত। এই মুহূর্তে সে কঠিন শরীরচর্চায় রত। পরমুহূর্তে সে অলস আয়েশি জীবনে তৃপ্ত; আবার পরমুহূর্তে দর্শনের চর্চায় সে উদ্‌ব্যস্ত। তার পরের মুহূর্তেই সে রাজনীতিক হল্লায় উচ্চকণ্ঠ।" মোটকথা "তুমি বলতে পার, এ হচ্ছে এক অদ্ভুত রকমের অরাজক ব্যবস্থা, যেখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই আর যেখানে সমান এবং অসমান—সকলেই সমান।"

এবার গণতন্ত্রের কথা আসে। গণতন্ত্রের উদ্ভব এবং প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক। এ-আলোচনা আমাদের বাকি রয়েছে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনার পরে গণতন্ত্রী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব। উভয়ের চরিত্রের পরিচয়ের পরে উভয়কে বিচার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে।

হ্যাঁ সক্রেটিস, এই ধারতেই আমাদের অগ্রসর হওয়া সঙ্গত।

কিন্তু কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে পরিবর্তনকে আমরা কীভাবে প্রকাশ করব? এই পরিবর্তনের ধারাটি কি এই নয় যে, কতিপয়তন্ত্র সম্পদ অর্জনের যে-লক্ষ্যের পেছনে ছুটে চলে, সে-লক্ষ্যের তৃষ্ণা অপূরণীয়?

ধনের তৃষ্ণা অবশ্যই অপূরণীয়। কিন্তু তার পরে কী ঘটে?

এ-রাষ্ট্রের শাসকরা যখন বুঝতে পারে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি হচ্ছে অর্থ, তখন তারা অমিতব্যয়ী তরুণের অপব্যয়ের অভ্যাসকে আইন দ্বারা হ্রাস করতে অস্বীকার করে। কারণ, তরুণের ধ্বংসকে তারা নিজেদের লাভ বলে গণ্য করে। অপব্যয়ী তরুণদের কাছ থেকে তারা সুদ গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরিশেষে তাদের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করে। এমনিভাবে তারা নিজেদের সম্পদ এবং শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

হ্যাঁ, এভাবেই তারা তাদের সম্পদ এবং শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

আর এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই যে, অর্থের লিপ্সা এবং সংযমের মনোভাব একই সঙ্গে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অধিক পরিমাণে থাকতে পারে না। এদের একটি অবশ্যই অবজ্ঞাত হবে।

হ্যাঁ, একথা বোধগম্য।

কতিপয়তন্ত্রের অমিতব্যয়ের এবং অপব্যয়ের কারণে উত্তম অনেক পরিবারই ভিক্ষাজীবীতে পরিণত হয়ে যায়।

হ্যাঁ, প্রায়ই এরূপ ঘটে।

কিন্তু তথাপি এরূপ লোক নগরীতে বাস করে। এরা হৃতসর্বস্ব হলেও এরা শক্তিহীন নয়। এরা আঘাত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। এদের মধ্যে এমন আছে যারা অর্থের ঋণে ঋণী। এমন থাকে যারা তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আবার এমনও থাকে যারা এই উভয়রকম বিপদেই বিপন্ন হয়েছে। এরা স্বভাবতই যারা তাদের সম্পদকে হস্তগত করেছে তাদের প্রতি এবং অপর সকলের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। তারা বিপ্লবের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

একথা সত্য।

আর ওদিকে অর্থগৃধ্নুর দল তাদের অর্থসংগ্রহ করার কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এক্ষেত্রে তারা ভ্রূক্ষেপহীন। দৃষ্টি তাদের ভূমির দিকে। যাদের সর্বনাশ ইতিমধ্যে তারা সাধন করেছে তাদের যেন এরা দেখতেই পায় না। তারা নতুন শিকার অন্বেষণ করে। অপর কোনো অসতর্ক শিকারের দেহে তাদের অর্থের হুল বিদ্ধ করে। যে-পুঁজি একদিন তারা ঋণ হিসাবে দিয়েছিল তার সুদের সন্তানসন্ততির মারফত সে-পুঁজির শতগুণ অধিক তারা আদায় করে। এমনিভাবে এরা রাষ্ট্রের মধ্যে কর্মহীন অলস এবং নিঃস্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলে।

হ্যাঁ, এরূপ নিঃস্বের সংখ্যা যে বহু তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার এই পাপে আগুন ধরে যায়। সে-আগুন দাউদাউ করে ওঠে। কিন্তু তবু এই অধম শাসকবর্গ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কিংবা অপর কোনো উপায়ে এ-আগুনকে নির্বাপিত করার চেষ্টা করে না।

সম্পত্তির বিধিনিষেধ ব্যতীত অপর কী উপায় আছে?

হ্যাঁ, আছে। তাকে আমরা দ্বিতীয় উৎকৃষ্ট উপায় বলতে পারি। এ-উপায়ের প্রধান গুণ হচ্ছে, এ নাগরিককে তার চরিত্র সংশোধন করতে বাধ্য করবে। আমি বলব, একটি সাধারণ আইন এক্ষেত্রে প্রণয়ন করা যায়, যে-আইন নাগরিকদের বলবে, ঋণের ক্ষেত্রে নাগরিকরা যে যার নিজের দায়িত্বে অপরের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবে। এতে রাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব থাকবে না। এরূপ বিধান প্রণীত হলে টাকা তৈরির এই পাপ-স্বভাব কিছুটা রুদ্ধ হবে এবং এ থেকে রাষ্ট্রের যে-অনিষ্ট সাধিত হয়, তাও বেশ পরিমাণ হ্রাস পাবে।

একথা ঠিক। তা হলে রাষ্ট্রের অনিষ্ট অনেকটা হ্রাস পাবে।

কতিপয়ের শাসনব্যবস্থায় কী ঘটে? যে-মনোভাবের আমরা উল্লেখ করেছি এর শাসকরা সেই মনোভাব থেকে শাসিতদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে। একদিকে তারা এবং তাদের অনুসারীগণ, বিশেষ করে শাসকশ্রেণীর তরুণরা, দেহ এবং মনের অলস এবং বিলাসপরায়ণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে; অপরদিকে তারা আনন্দ কিংবা কষ্ট কোনোকিছুকে প্রতিরোধের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

খুবই সত্য কথা।

এদের একমাত্র চিন্তা, কেমন করে টাকা বানানো যায় এবং নিঃস্ব ভিক্ষুকের মতো এরাও মহৎ গুণের চর্চায় সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

সক্রেটিস, একথা ঠিক। এ-ব্যাপারে এরা নিঃস্বের মতোই নির্বিকার।

কতিপয়তন্ত্রের শাসকদের এই হচ্ছে অবস্থা। কিন্তু আবার অনেক সময় এরূপ ঘটে যে, শাসক এবং শাসিত একই পথের পথিক হয়ে পড়ে—তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। হয়তো তীর্থযাত্রায় কিংবা যুদ্ধাভিযানে সহ-সৈনিকের ভূমিকায় অথবা সমুদ্রের বুকে জাহাজে সহ-নাবিক হিসাবে একের সঙ্গে অপরের সাক্ষাৎ ঘটে যায়। তখন ঘনিষ্ঠভাবে বিপদের মুহূর্তে একে অপরের আচরণ লক্ষ করতে সক্ষম হয়। কারণ, বিপদের মধ্যে অন্তত এই আশঙ্কা থাকে না যে, ধনবান দরিদ্রকে ঘৃণা করবে। এমন অবস্থাতে এরূপ হওয়া খুবই সম্ভব যে, যুদ্ধক্ষেত্রে রোদে-পোড়া মানুষটির অবস্থান ঘটবে ধনবান-মেদবহুল সেই লোকটির পাশে যার দেহের বর্ণটি সূর্যের তাপে বিবর্ণ হতে পারেনি। রোদে-পোড়া দরিদ্র মানুষটি যখন এরূপ মেদবহুল ধনবানকে যুদ্ধের ক্ষেত্রে হতশ্বাস এবং হতবুদ্ধি অবস্থায় দেখতে পায় তখন সে এই সিদ্ধান্ত না করে পারে না যে, এই অপদার্থগুলি অর্থবান হতে পেরেছে কেবলমাত্র শাসিতদের সাহসের অভাবে। এর পরে শাসিতগণ যখন নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়, তখন তারা একে অপরকে বলে ঃ 'দেখেছ যোদ্ধা হিসাবে এরা কী অপদার্থ! এদের দিন শেষ হয়ে গেছে।'

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ আমি নিশ্চিত, শাসিতরা তখন পরস্পরকে একথা বলবে।

এখানে একটা জিনিস আমরা স্মরণ করতে পারি ঃ একটা লোকের দেহ যখন দুর্বল, তখন তাকে অল্পতেই অসুস্থ করে তোলা যায়। তার অসুখ ভেতর থেকেও হতে পারে। দেহের ক্ষেত্রে যা সত্য, একটা দুর্বল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা সত্য। বাইরের সামান্য প্ররাচনায় সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। ভিতরের কোনো দল কিংবা উপদল প্রতিবেশী কতিপয়তন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রকে যদি হস্তক্ষেপের জন্য ডেকে আনে তা হলেই এরূপ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। কোনো সময়ে বহির্দেশীয় কোনো প্ররোচনা ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে উপদলীয় লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে।

খুবই সত্য কথা।

তা হলে আমরা বলতে পারি গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে তখন, যখন রাষ্ট্রের যারা নিঃস্ব তারা জয়লাভ করে, যখন তারা তাদের বিরোধীপক্ষীয়দের হত্যা করে কিংবা নির্বাসিত করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সকল অধিকার এবং সুযোগ দরিদ্রগণ সমানভাবে ভোগ করে। শাসনক্ষমতাকে তখন তারা লটারির মাধ্যমে বণ্টন করে।

এ্যাডিম্যান্টাস আমার কথাকে স্বীকার করে বললেন ঃ হ্যাঁ, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এভাবেই ঘটে। হয় তারা অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে কিংবা বিরোধীপক্ষকে আতঙ্কিত করে পলায়নে বাধ্য করে।

কিন্তু এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রটি কী? এর শাসনব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হয়? এই প্রশ্নের জবাবের মধ্য দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মানুষের চরিত্রেরও পরিচয় পাব। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

বেশ। কিন্তু এই রাষ্ট্রের মানুষকে কি তুমি স্বাধীন বলবে? একথা ঠিক যে বাক আর ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিমাণ এখানে প্রচুর। এখানে যার যেমন ইচ্ছা তেমন করার স্বাধীনতা আছে।

হ্যাঁ, গণতন্ত্রের সমর্থনকারীগণ তাই বলে।

তাই যদি হয় তা হলে একথাও সত্য যে, এমন রাষ্ট্রে প্রত্যেকেই নিজের পছন্দমতো জীবন যাপন করতে চাইবে?

অবশ্যই।

ফলে এমন রাষ্ট্রে চরিত্রের বৈচিত্র্যের কোনো অভাব ঘটবে না।

না, বৈচিত্র্যের অভাব ঘটবে না।

এ্যাডিম্যান্টাস, আমি বরঞ্চ বলব, সমস্ত শাসনব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র হচ্ছে সর্বাধিক আকর্ষণীয়। বিচিত্র বর্ণের পোশাকের ন্যায় এ-রাষ্ট্রের চরিত্রের বৈচিত্র্য একে খুবই মনোহর করে তোলে। আর এজন্যই, মেয়েরা এবং শিশুরা যেমন বর্ণ দেখেই বিচার করে, তেমনি বিচিত্র এই রাষ্ট্রকে অনেকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করে।

হ্যাঁ, অনেকের পক্ষে এরূপ মনে করা স্বাভাবিক।

সেদিক থেকে সংবিধান-শিকারের যদি কোনো ব্যাপার থাকে তা হলে গণতান্ত্রিক রাজ্যকে সংবিধান-শিকারের উত্তম রাজ্য বলে আমরা গণ্য করতে পারি।[১] সীমাহীন স্বাধীনতার জন্য এখানে সকল রকম সংবিধান-চরিত্রেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কাজেই আমাদের মতো, সংবিধান বছাই করে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছে তাদের অবশ্যই গণতন্ত্রের বাজার ভ্রমণ করা

১. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচয় দান এবং সমালোচনার মধ্যে প্লেটোর বিদ্রূপের সুরটি লক্ষণীয়।

উচিত। বিচিত্র সংবিধানের সমাবেশ থেকে তাদের পছন্দসই সংবিধান তারা এই বাজারেই সংগ্রহ করতে পারবে। আর তা-ই দিয়ে তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার কাজে অনয়াসে অগ্রসর হতে পারবে।

হ্যাঁ, একথা সত্য। এ-বিপনিতে সংবিধানের নমুনার কোনো অভাব হবে না।

আমি এবার বললাম ঃ তা হলে গণতন্ত্রে কারোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যার শাসন করার ক্ষমতা আছে, সে শাসন করতে বাধ্য নয়; যার আনুগত্য পোষণ করার আবশ্যকতা, সেও অনুগত হতে বাধ্য নয়। অনুগত হওয়া না-হওয়া তোমার ইচ্ছার ব্যাপার। যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তুমি যুদ্ধ নাও করতে পার। আর দেশ যদি শান্ত থাকে, তুমি শান্ত নাও থাকতে পার। তুমি নিজেই একটা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ শুরু করে দিতে পার। রাজনীতিক অথবা বিচারের কোনো দায়িত্বগ্রহণে তোমার উপর যদি কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়ে থাকে, তুমি তাকে অবজ্ঞা করে এরূপ দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পার। মুহূর্তের বিচারে এমন ব্যবস্থা অবশ্য মনোহর।

হ্যাঁ সক্রেটিস, মুহূর্তের জন্যই বটে। তার অধিক নয়।

আরও চমৎকার হচ্ছে তাদের বিষয়টি, বিচারালয় যাদের কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত করেছে। এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ, গণতন্ত্রে হয়তো কাউকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে কিংবা কাউকে নির্বাসিত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও সে নগরীর রাস্তায় নাগরিকদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এজন্য কেউ আঁতকে উঠছে না। অদৃশ্য ভূত বা প্রেতকে যেমন কেউ দেখে না, তেমনি এই দণ্ডিত অপরাধীদেরও তার সঙ্গীরা যেন দেখেও দেখে না।

হ্যাঁ, একথা সত্য। এরূপ আমি অনেক সময়েই দেখেছি।

তারপর, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে-সকল মূলনীতির আমরা উল্লেখ করেছি সে-সম্পর্কে গণতন্ত্রের শাসকদের বিবেচনা দ্যাখো। সে-মূলনীতি কঠিনভাবে পালন করার পরিবর্তে তার প্রতি তারা অবজ্ঞাই প্রদর্শন করে। আমরা বলেছিলাম ঃ অসাধারণ গুণ নিয়ে যে জন্মগ্রহণ করেনি, শৈশব থেকে উত্তম পরিবেশ এবং উত্তম শিক্ষা ব্যতীত তার পক্ষে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে বিকাশলাভ করা অসম্ভব। গণতন্ত্র এক নিশ্বাসে এই নীতিকে উড়িয়ে দিতে দ্বিধা করে না। রাজনীতিকদের অভ্যাস এবং ইতিহাস যা-ই হোক-না কেন, তাতে কোনোকিছু যায়-আসে না। তারা 'জনতার বন্ধু'—একথাটি উচ্চারণ করাই যথেষ্ট।

কী অদ্ভুত বিবেচনা!

এ্যাডিম্যান্টাস, তা হলে এই হচ্ছে গণতন্ত্রের চরিত্র। এই হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। তুমি বলতে পার এ হচ্ছে এক অদ্ভুত রকমের অরাজক ব্যবস্থা যেখানে বৈচিত্র্যের অভাব নেই আর যেখানে সমান এবং অসমান—সকলেই সমান।

সক্রেটিস, চরিত্রটি আমাদের অপরিচিত নয়। আমরা সহজেই একে চিনতে পারি।

এবার তা হলে এসো, আমরা গণতান্ত্রিক ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা করি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আলোচনায় যেরূপ, ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তার উদ্ভবটি আমাদের প্রথম দেখা আবশ্যক। এর উদ্ভবটি এরূপ। কতিপয়তন্ত্রের শাসকের কৃপণ এবং অধম চরিত্রকে আমরা দেখেছি। এই অধম চরিত্রের একটি পুত্র হল। পুত্রকে সে নিজের পথেই মানুষ করতে লাগল।

বেশ, তারপর?

পুত্রও পিতার মতো অর্থের ব্যয়ের দিকটি জোর করে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল—কিন্তু অর্থ-উপার্জনের দিকটি নয়। যে ব্যয় তার নিকট অপ্রয়োজনীয়, সে ব্যয়েতে সে পিতার মতোই কৃপণ।

খুবই স্বাভাবিক।

তার প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় আনন্দ কোন্‌গুলি এবং কিসের ভিত্তিতে সে এর মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করে, সে-বিষয়টি আমরা একটু দেখতে পারি। কী বল?

হ্যাঁ, আমাদের এ-বিষয়টি দেখা আবশ্যক।

আমরা নিজেরা কী করি? আমরা কি আমাদের সেই আনন্দকে প্রয়োজনীয় বলিনে যেগুলি আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং লাভজনক? এবং এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতিগতভাবেই আমরা তাকেই কামনা করি যা আমাদের প্রয়োজনীয় এবং যা আমাদের উপকারসাধন করে। এরূপ কামনা করতেই আমরা বাধ্য।

ঠিক কথা।

কাজেই যা আমাদের উপকারী তাকে প্রয়োজনীয় বলা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নয়।

না। এরূপ বলাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত।

আবার যে-ইচ্ছাকে মানুষ শৈশব থেকে চেষ্টা করলে নিজের চরিত্র থেকে বাদ দিতে পারে, যে-ইচ্ছা অপকার বই কোনো উপকারসাধন করে না, সে-ইচ্ছাকে সঙ্গতভাবেই আমরা অনাবশ্যক বলতে পারি?

অবশ্যই। আমরা তাকে অনাবশ্যক ইচ্ছা বলব।

আমাদের ধারণা স্পষ্ট করার জন্য দুরকম ইচ্ছারই আমরা দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

উত্তম কথা।

ধরো আহারের ইচ্ছা অর্থাৎ সাধারণ খাদ্য এবং মশলাদি গ্রহণের ইচ্ছার কথা। স্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য এদের যতখানি প্রয়োজন আমরা এদের ততখানি আবশ্যক বলে অভিহিত করতে পারি। নয় কি?

হ্যাঁ, এদের আমরা আবশ্যক ইচ্ছা বলতে পারি।

আহারের যে-আনন্দ তার প্রয়োজন দুধরনের : সে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী এবং সে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য।

একথা ঠিক।

কিন্তু মশলাদির প্রয়োজন কেবল স্বাস্থ্যের কারণে। এরা স্বাস্থ্যের যতটুকু উপকার করে ততটুকু এদের প্রয়োজন।

একথাও যথার্থ।

কিন্তু আহারের যে-ইচ্ছা একে অতিক্রম করে যায় অর্থাৎ সুস্বাদ, অন্য আহার কিংবা বিলাস-উপকরণ—যেগুলি দেহের জন্য ক্ষতিকর এবং আত্মার জ্ঞান এবং মহৎ গুণের চর্চায় যেগুলি প্রতিবন্ধক—সেগুলিকে আমরা সঠিকভাবেই অনাবশ্যক ইচ্ছা বলতে পারি এবং এগুলিকে শৈশব থেকে চেষ্টা করলে আমরা আমাদের চরিত্র থেকে বাদ দিতে পারি। ঠিক নয় কি?

নিঃসন্দেহে।

এই দুধরনের ইচ্ছার একটিকে বলা চলে উপকারী, অপরটিকে অপকারী : একটি মিতব্যয়ী, অপরটি অমিতব্যয়ী।

অবশ্যই।

এবং যৌন-আনন্দ বা ইচ্ছা এবং অন্যান্য ইচ্ছা সম্পর্কেও একথা সত্য।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

এবং যে-অলস মৌমাছির কথা আমরা বলেছি, সে-অলস মৌমাছি অনাবশ্যক আনন্দে নিমজ্জিত, অপ্রয়োজনীয় ইচ্ছার সে দাস এবং যে-চরিত্র ব্যয়ে কৃপণ এবং স্বভাবে অধম, অর্থাৎ অধম কতিপয়ী চরিত্র, সে অপরিহার্য ইচ্ছার অধীন। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

এবার দেখা যাক, এই কতিপয়ী চরিত্র থেকে গণতান্ত্রিক চরিত্রের উদ্ভব কেমন করে ঘটে। প্রক্রিয়াটিকে আমরা এভাবে দেখাতে পারি—

কী ভাবে?

কার্পণ্য এবং স্থূল প্রবৃত্তির মধ্যে যে-পুত্র লালিত হচ্ছিল, যার কথা আমরা কিছু পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে যখন অলস মৌমাছির মধুভক্ষণের স্বাদ পেয়ে যায়, যখন তার এমন সব সঙ্গীসাথি জুটে যায় যারা তাকে সকলরকম উদ্দাম আনন্দ এবং বিলাসের অনুসন্ধান দানে সক্ষম, তখনই তার মধ্যে কতিপয়ের নীতির ভাঙন এবং গণতান্ত্রিক চরিত্রের উদ্ভব শুরু হয় বলে তুমি বলতে পার।

হ্যাঁ এ-উদ্ভব তখন অনিবার্য।

কিন্তু এই তরুণের চরিত্রের মধ্যে কতিপয়ী নীতির সমর্থক উপাদান তার পিতা কিংবা স্বজনের প্রভাব যদি এখনও বিদ্যমান থাকে এবং তারা যদি তার এই বিচ্যুতিকে ভর্ৎসনা করতে থাকে এবং তাকে নিবৃত্ত করার জন্য উপদেশদান করে, তা হলে তার আত্মা পরস্পরবিরোধী উপসত্তায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এর এক ভাগ অপর ভাগের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে রত হবে। অর্থাৎ তার নিজের সঙ্গেই তার লড়াই বেধে যাবে।

হ্যাঁ, তার চরিত্রের অভ্যন্তরে লড়াই বেধে যাবে।

এ-লড়াইতে দুএক সময়ে এমন হয় যে, তার চরিত্রের কতিপয়ী নীতির কাছে গণতান্ত্রিক নীতিকে পরাজয় বরণ করতে হয় এবং তার কোনো কোনো ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে, কোনো ইচ্ছার নির্বাসন ঘটে। তরুণদের মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্ট হয় এবং তার চরিত্রে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, কোনো কোনো সময়ে এরূপ ঘটে।

কিন্তু এ-অবস্থা সাময়িক। পুরনো ইচ্ছার বহিষ্কারের পর আবার অনুরূপ নূতন ইচ্ছার আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই ইচ্ছার যে-জনক সেই চরিত্র এর নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষায় অক্ষম। ফলে এদের বিক্রম এবং সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

হ্যাঁ, এরূপ হওয়াই সম্ভব।

এই নূতন ইচ্ছা তাকে পুনরায় তার সঙ্গীদের কাছে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। নূতন আর পুরনো ইচ্ছার মধ্যে গোপন আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নূতনতর ইচ্ছার জন্ম ঘটে। ফলত এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলে।

খুবই যথার্থ বর্ণনা।

পরিণামে এই ইচ্ছার দল আত্মার দুর্গকে দখল করে ফেলে। কারণ, তারা দেখতে পেয়েছে তরুণের আত্মা জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে। তার নীতি এবং সত্য বিসর্জিত হয়েছে। আর জ্ঞান, নীতি এবং সত্য—এই হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম রক্ষক।

হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম রক্ষক।

আর এই শূন্যস্থানে এবার আসন গ্রহণ করে অহংকার এবং অসার বাক্য।

হ্যাঁ, এবার এদেরই বিক্রম।

এবার সেই তরুণ আবার তার পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে। সেখানেই সে তার স্থায়ী আবাসকে নির্দিষ্ট করে। এখনও তার চরিত্রে কতিপয়ী নীতির রেশ যদি কিছু থাকে এবং তারা যদি তাকে রসদাদি পাঠিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করে, তা হলে তার চরিত্রের অহংকার এবং দম্ভ সেই সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করে আত্মার দুর্গের দ্বারকে সকল নীতির মুখের উপর একেবারে রুদ্ধ করে দেয়। পুরনো এবং বিশ্বস্ত মহৎ বন্ধুর সদুপদেশকেও এরা দুর্গে প্রবেশ করতে দেয় না। এই সময়ে হয়তো কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং অধমরা জয়লাভ করে। এবার সৌজন্য এবং সংকোচকে বিজয়ীরা বিকার বলে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দেয়। তাদের তারা নির্বাসিত করে এবং সংযমকে কাপুরুষতা আখ্যা দিয়ে তাকে পঙ্কে পদদলিত করে বিসর্জন দেয়। জনসাধারণকে তারা বোঝাতে থাকে, সংযম এবং মিতব্যয় হচ্ছে স্থূলতা এবং দীনতা। এমনিভাবে অধম প্রবৃত্তিরা কোলাহল তুলে সংযম এবং মিতাচারকে আত্মার সীমানার বাইরে দূর করে দেয়।

এ-বর্ণনাও যথার্থ।

অধম প্রবৃত্তির দল এবার তাদের হাতে বন্দি আত্মাকে তার সকল মহৎ গুণ থেকে শোধন করতে শুরু করে। এবার তারা দম্ভ, অনাচার, অমিতব্যয় এবং নির্লজ্জতাকে মশাল-শোভাযাত্রাসহকারে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে এবং প্রশংসার মধুর বাণী উচ্চারণ করে বরণ করে এনে আত্মাশূন্য ঘরে তাদের প্রতিষ্ঠিত করে। এবার তারা ঔদ্ধত্যকে অভিহিত করে আভিজাত্য বলে, অরাজকতাকে বলে স্বাধীনতা এবং অপব্যয়কে মহানুভবতা আর মূর্খতাকে বলে বিক্রম। যে-তরুণের কথা আমরা বলতে শুরু করেছিলাম তার মূল চরিত্র এবার পরিপূর্ণরূপেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে এক দিন লালিত হয়েছিল অপরিহার্য প্রয়োজনের

বোধে, সে এবার অধম এবং অনাবশ্যক ভোগ এবং সুখের অবাধ স্বাধীনতা এবং সেচ্ছাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, পরিবর্তনের এ-বিপুলতা কার দৃষ্টি এড়াতে পারে?

এবার আমাদের এই গণতান্ত্রিক তরুণ বাকি জীবন প্রয়োজনীয় ইচ্ছার পেছনে যে-পরিমাণ অর্থ, সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় করে, ঠিক সে-পরিমাণ অর্থ, সময় এবং পরিশ্রম তার ব্যয়িত হয় অনাবশ্যক ইচ্ছার পেছনে। তবে তার ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয় এবং ধ্বংসের চরমে যদি সে না পৌঁছে থাকে তা হলে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার এই উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতা হয়তো হ্রাস পেতে থাকে এবং নির্বাসিত মহৎ গুণের কিছু হয়তো আবার আত্মার দুর্গে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে পরিপক্ক বয়সে হয়তো আক্রমণকারীর প্রথম প্রবৃত্তির একাধিকপত্য আর তত বজায় থাকে না। এবার তার চরিত্রে কিছুটা ভারসাম্য সৃষ্ট হয়। আবশ্যক এবং অনাবশ্যক আনন্দ এবং ভোগের মধ্যে একটা সমতা স্থাপিত হয়। পূর্ণরূপে তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মুহূর্তের উল্লাসকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতাই সে অর্পণ করে। কিন্তু পরিতৃপ্তির পরে অনুরূপ স্বাধীনতা অপর ইচ্ছাকেও সে প্রদান করে। কাজেই আবশ্যক এবং অনাবশ্যক কোনো ইচ্ছাই আর অতৃপ্ত থাকার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে তুলতে পারে না।

হ্যাঁ, একে একটা সমতা বলা যায় বটে।

এবার যদি কেউ তাকে বলে, যে আনন্দের উৎস উত্তম ইচ্ছা, তাকেই তার উৎসাহিত করা উচিত এবং যে-আনন্দের উৎস হচ্ছে অধম প্রবৃত্তি, তার বল্গা টেনে ধরা উচিত, তা হলে এরূপ পরামর্শের প্রতি সে কর্ণপাত করবে না। সত্যের জন্য অন্তরের দ্বার সে উন্মুক্ত করবে না। তার মাথা নেড়ে সে বলবে ঃ সকল আনন্দই আমার চোখে সমান এবং সকলেরই সমান অধিকার থাকা সঙ্গত।

হ্যাঁ, এরূপ সঙ্গতির কথাই সে বলে।

আমি বললাম ঃ আসলে সে মুহূর্তের ভোগের মধ্যেই বাস করে। এই মুহূর্তে হয়তো সে সুরা, নারী এবং সঙ্গীতে লিপ্ত, পরিমুহূর্তে সে ভোজ্যদ্রব্যে ভুক্ত। এই মুহূর্তে সে কঠিন শরীরচর্চায় রত, পরমুহূর্তে সে অলস-আয়েশি জীবনে তৃপ্ত, আবার পরমুহূর্তে দর্শনের চর্চায় সে উদ্ব্যস্ত! এবং পরক্ষণেই সে রাজনীতিক হল্লায় উচ্চকণ্ঠ। বলা চলে সে সর্বদাই ব্যস্ত। ব্যস্তবাগীশের মতো দুপায়ে খাড়া অবস্থাতে সে যখন যা মাথায় আসছে তা-ই ভাবছে, যখন যা মুখে আসছে তা-ই বলছে। কোনো সময় মনে হবে, তার সকল কামনা সমরবিদ হওয়ার জন্য,

কখনো মনে হবে, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য ব্যবসায় অর্থাৎ অর্থোপার্জনে সাফল্য। তার জীবনে সংযম বা শৃঙ্খলা বলে কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। এমন মানুষ তার জীবনকে আনন্দময়, স্বাধীন এবং সুখী বলে বিবেচনা করে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ স্বাধীনতা এবং সাম্যে বিশ্বাসীর একটি যথার্থ বর্ণনাই বটে।

হ্যাঁ, আর তার চরিত্রের এইসব বিদ্যায় পারদর্শিতার ভাব এবং বহু বৈশিষ্ট্যের বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যে-বৈচিত্র্য, তার সাদৃশ্য তো স্পষ্ট। এমন জীবন অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় বলে বোধ হতে পারে। কারণ, এর সম্ভাবনা বিচিত্র।

হ্যাঁ, এর সম্ভাবনা বিচিত্র, একথা বলা যায়।

তা হলে এই ব্যক্তিই হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিভূ। আমরা একে বলতে পারি ঃ গণতান্ত্রিক চরিত্র।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ব্যক্তির চরিত্র।

অধ্যায় ২৩
[৫৬২—৫৬৯]

স্বৈরতন্ত্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র

গণতন্ত্রই আবার স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি লক্ষ্য থাকে। কিন্তু প্লেটোর মতে সে-লক্ষ্যের উপর জোরের আধিক্য সেই ব্যবস্থা ধ্বংসেরও কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এক্ষেত্রে কতিপয়তন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সাদৃশ্য আছে। কতিপয়তন্ত্রের লক্ষ্য সম্পদের সংগ্রহ, অর্থের উপার্জন। কিন্তু এই লক্ষ্যের উপর অত্যধিক জোর দানের জন্যই কতিপয়তন্ত্রের রাষ্ট্র ধনিক ও দরিদ্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। "ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা। ... যারা গণতন্ত্রের সমর্থনকারী তারা বলে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। ... কিন্তু অপর সকল প্রয়োজনের বিনিময়ে স্বাধীনতার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে এবং পরিণামে এই স্বাধীনতার আধিক্য থেকেই স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়।"

প্লেটোর বর্ণনায়, গণতান্ত্রিক অরাজকতা চরম আকার গ্রহণ করে রাষ্ট্রকে দরিদ্র–ভবঘুরে-অমিতব্যয়ী এবং ধনিক ও কৃষক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলে। একসময়ে রাষ্ট্রে সংকটের সৃষ্টি হয়। অলস পরজীবীর দল হয়তো আক্রমণ করে ধনবানদের উপর। ধনবানরা নিজেদের রক্ষার্থে দল তৈরি করে। তখন রাষ্ট্রে আবার ধনিকে এবং দরিদ্রে গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে ওঠে। এবার প্রয়োজন হয় নেতৃত্বের। এই সংকটে কোনো নেতা জনতার সামনে জনতার রক্ষক হিসাবে হাজির হয়। সে জনতাকে বলে ঃ আমার দেহরক্ষী তৈরি করে দাও, আমি তোমাদের রক্ষা করব। জনতা তার দাবিকে পূরণ করে। তার দেহরক্ষী তৈরি হয়। "কিন্তু একবার যখন জনতাকে নিজের প্রভাবে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়, তখন কোনো স্বজনের রক্তপাতেই 'রক্ষকের' আর দ্বিধার কোনো কারণ থাকে না। ... যাকে তার হত্যা করা প্রয়োজন তার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয় এবং পরবর্তীকালে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। এই রক্তের স্বাদ নিয়ে তার অপবিত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠ তার সহ-নাগরিকদের

রক্তপানের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে।" গণতন্ত্রের বিবরণে প্লেটো যেরূপ আপোসহীনভাবে সামলোচক ছিলেন, স্বৈরতন্ত্রের ক্ষেত্রে প্লেটো সমপরিমাণেই আপোসহীন। গ্রীসের ইতিহাসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের যেমন বিকাশ ঘটেছিল, তেমনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকেরও অভাব ছিল না। বস্তুত, অনেক ক্ষেত্রে স্বৈরতান্ত্রিক একচ্ছত্র শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই জনতা গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্লেটোর এই বিবরণে তাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মনোভাবের স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্লেটো গণতন্ত্রের সমালোচক হলেও স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন না।

স্বৈরতন্ত্র তার বাহক স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র সৃষ্টি করে। আসলে স্বৈরতন্ত্রী শাসন এবং স্বৈরতন্ত্রী চরিত্র একই। কারণ এ হচ্ছে একটিমাত্র ব্যক্তির একচ্ছত্র শাসন। তার শাসন এবং চরিত্র—উভয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অপরের প্রতি ভয় এবং বিরামহীনভাবে সকল গুণী এবং শক্তিমানের নিধন। গোড়ার দিকে অবশ্য তার মুখে মৃদু হাসির রেখা থাকে। সকলকেই সে নানা মধুর প্রতিশ্রুতিতে মুগ্ধ করতে চয়। কিন্তু সে-ভাব বেশিদিন স্থায়ী হয় না। যতক্ষণ সে নিজেকে সংকটাপন্ন বোধ করে, ততক্ষণ জনতার উপর নির্ভর করে। "কিন্তু যে-মুহূর্তে সে সংকটমুক্ত হয়, সেই মুহূর্তে সে স্বাধীনচেতা নাগরিক যদি কেউ অবশিষ্ট থাকে ... তাহলে কোনো-না-কোনো অজুহাতে সে তাকে শক্রর হাতে তুলে দেয়।" নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার জন্য এবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসক প্ররোচনা দিয়ে অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে। তার উদ্দেশ্য, করের চাপে জনতা নিজেদের জীবিকা অর্জনেই ব্যস্ত থাকবে,—তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অবসর পাবে না। কালক্রমে এই স্বৈরশাসক যে-জনতা তাকে সৃষ্টি করেছে সেই জনতাকে হত্যা করতে শুরু করে। স্বৈরতন্ত্রী তাই পিতৃহন্তায় পরিণত হয়। সে রাষ্ট্রকে সকল উত্তম থেকে শোধন করে সমগ্র রাষ্ট্রকে নিজের বশংবদ অনুগতের রাজ্যে পরিণত করে। কিন্তু এমন অবস্থও কি স্থায়ী? কিংবা অপ্রতিহত অন্যায়রূপ যে স্বৈরতন্ত্রী চরিত্র, সে কি সুখী? স্বৈরতন্ত্রী শাসক—তথা অন্যায়ের এই প্রতিমূর্তি সুখী কি না তার আলোচনা সক্রেটিস পরবর্তী পুস্তকে করবেন। কিন্তু এই অন্যায় শাসনের মুখে জনতা কি একেবারেই অসহায়? জনতা কি চিরদিনই স্বৈরতন্ত্রকে সহ্য করবে? খুব দৃঢ়ভাবে জবাব না দিলেও প্লেটো এরূপ

আভাস দিয়েছেন যে, জনতা একদিন উত্তেজনায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ফেটে পড়তে পারে। "কিন্তু ধরো জনতা একদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। তার পুত্রকে (স্বৈরতন্ত্রকে) ডেকে সে একদিন বলল ঃ বয়স্ক পুত্রকে পিতা পোষণ করে না। পুত্রেরই দায়িত্ব হচ্ছে পিতাকে রক্ষা করা। ... পিতাকে তার নিজের এবং ভৃত্যদের দাসে পরিণত করা নয়।" এমন যদি জনতা করে তা হলে তো ভয়ানক ব্যাপারই ঘটবে। অবশ্য বৃদ্ধ পিতা হয়তো তখন দেখবে তারই জাত বর্বর পুত্র তার চেয়ে দেহে অধিক শক্তিশালী। সে-বর্বর পুত্র প্রয়োজনবোধে পিতাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না। জনতা স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে কি না সে-সম্পর্কে প্লেটো নিশ্চিত না হলেও স্বৈরতন্ত্র যে বর্বর, সে যে ঘৃণ্য—এ-মনোভাব প্রকাশে প্লেটো দ্বিধাহীন। জনতার বিরুদ্ধে প্লেটোর অভিযোগ, আবেগ-উচ্ছ্বাসে আপ্লুত জনতাই একদিন স্বৈরতন্ত্রকে সৃষ্টি করেছিল ঃ জনতাই স্বেচ্ছাচারীর জনক। তাই প্লেটোর মনোভাব যেন এরূপ ঃ স্বৈরতন্ত্রের হাতে জনতার এই দুর্দশার মূলে তো জনতা নিজেই। তাই পুত্রের হাতে জনকের বর্তমান দুর্দশায় প্লেটোর যত না সহানুভূতি, তার অধিক তাঁর ক্ষোভ।

কিন্তু এর চেয়েও বিস্ময়কর রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং তার প্রতিভূ-চরিত্রের বর্ণনা বাকি আছে। সে-ব্যবস্থা হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র এবং তার প্রতিভূ-চরিত্র হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের চরিত্র।

হ্যাঁ, তার পরিচয়গ্রহণ আমাদের বাকি আছে।

আমি বললাম ঃ কিন্তু গ্লকন, স্বৈরতন্ত্রের স্বভাব কী? একথা তো স্পষ্ট যে স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রেরই সন্তান; গণতন্ত্র থেকেই তার উদ্ভব। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা তোমার ঠিক।

এবং আমরা এও বলতে পারি যে, গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব, কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভবেরই অনুরূপ।

কেমন করে অনুরূপ বলছ, সক্রেটিস?

অনুরূপ বলছি, কারণ কতিপয়তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ছিল সম্পদ। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, ঠিক।

এবং কতিপয়তন্ত্রের পতনের কারণও হচ্ছে সম্পদ বা অর্থের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা। অর্থের আকাঙ্ক্ষার ফলে অপর সকল ইচ্ছাই কতিপয়তন্ত্রে অবজ্ঞাত হয়।

যথার্থ।

ঠিক তেমনি গণতন্ত্রেরও কি একটা লক্ষ্য থাকে না? এবং সেই লক্ষ্যের জন্য অত্যধিক আকাঙ্ক্ষাই কি গণতন্ত্রের পতনের কারণ নয়?

কিন্তু সক্রেটিস, গণতন্ত্রের লক্ষ্য বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও?

কেন, স্বাধীনতা! গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, যারা গণতন্ত্রের সমর্থনকারী তারা দাবি করে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে তার স্বাধীনতা। তাদের দাবি হচ্ছে, এ-কারণেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে স্বাধীন মানুষ বাস করতে পারে, যে-রাষ্ট্র স্বাধীন মানুষের বাসের উপযুক্ত।

হ্যাঁ, গণতন্ত্রের সমর্থকগণ সাধারণত এ-দাবিই করে থাকে।

আর এজন্যই আমি বলেছিলাম ঃ অপর সকল প্রয়োজনের বিনিময়ে স্বাধীনতার অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে এবং পরিণামে এই স্বাধীনতার আধিক্য থেকেই স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার হয়।

একটু ব্যাখ্যা করে বলো সক্রেটিস।

বলছি ঃ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তার অত্যধিক স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্রতার কারণে অধম নেতৃত্বের কবলে পতিত হতে পারে। নীতিহীন অধম এই শাসকগণ স্বাধীনতার উত্তেজক সুরার আকর্ষণ সকলের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু পরিণামে তারা যখন সেই প্রতিশ্রুত চরম স্বাধীনতার সুরাপাত্র জনতার মুখে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়, তখন জনতাই তাদের অভিশপ্ত শাসক বলে অভিযুক্ত করে তাদের দণ্ডদানের দাবি তোলে। ফলে স্বাধীনতার আধিক্য এমন রূপ গ্রহণ করে যে, আইনের অনুগত নাগরিকগণ শৃঙ্খলের দাস বলে অপমানিত হতে থাকে। অপরদিকে যে-শাসক শাসিতের মতো এবং যে-শাসিত শাসকের ন্যায় আচরণ করে তাদের প্রশংসাধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। তারাই হয় সম্মানিত। কাজেই এরূপ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা যে সীমাহীন হয়ে উঠবে তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে?

না, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ক্রমে এই অরাজকতা প্রত্যেক নাগরিকের গৃহে বিস্তার লাভ করে এবং পরিশেষে জীবজন্তুর দেহেও তা সংক্রমিত হয়।

কীরূপে?

অর্থাৎ, ক্রমে পিতাও তার অরাজক পুত্রের স্তরে নেমে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। পিতা তার পুত্রকে ভয় পেতে শুরু করে। পুত্রও নিজেকে পিতামাতার সমান স্তরের বলে মনে করে। পিতা কিংবা মাতা—কারোর প্রতি তার কোনো সম্মানবোধ থাকে না। এটাকেই সে তার স্বাধীনতা মনে করে। নগরীর মধ্যে বিদেশী, অপিরিচিত বা নাগরিকের মধ্যে আর কোনো পার্থক্য থাকে না। বিদেশীও নিজেকে নাগরিকের সমান বলে গণ্য করে।

হ্যাঁ, ব্যাপারটি এরূপই দাঁড়ায়।

এ ছাড়া কম মারাত্মক হলেও, এর আরও খারাপ দিক আছে। এরূপ পরিবেশ এবং সমাজব্যবস্থায় শিক্ষক তার ছাত্রকে ভয় করতে শুরু করে। শিক্ষক ছাত্রের মরজিকে তুষ্ট করে চলে। ছাত্র শিক্ষককে অবজ্ঞার চোখে দেখে। বয়সেরও আর কোনো পার্থক্য থাকে না। তরুণ এবং বৃদ্ধ সকলেই সমান হয়ে যায়। যে-অল্পবয়স্ক সেও নিজেকে বয়োবৃদ্ধের সমান বলে গণ্য করে এবং কথায় ও কাজে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে। বয়স্ক যারা তারাও তরুণদের স্তরে নেমে যায় এবং তরুণদের আনন্দ এবং উল্লাসে উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারা গম্ভীর এবং বয়স্ক বলে বিবেচিত হওয়াকে আর পছন্দ করে না। তাই তারা তরুণদের আচরণ নিজেদের চরিত্রে গ্রহণ করতে শুরু করে।

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

এই গণস্বাধীনতা চরমে পৌছে, যখন অর্থের বিনিময়ে ক্রীতদাস বা দাসী তার প্রভু বা প্রভুপত্নীর ন্যায়ই স্বাধীন এবং সমান হয়ে ওঠে। নারী ও পুরুষ তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে-অবাধ স্বাধীনতা এবং সাম্য বোধ করে তার কথাটিও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন, এসকাইলাসের মতো আমাদেরও বলা উচিত ঃ ওষ্ঠাধরে যে শব্দ এসে উপস্থিত হয়েছে, তার উচ্চারণে আর সঙ্কোচ কেন?

আমি বললাম ঃ আমি তা-ই করছি, এ্যাডিম্যান্টাস। আমি বরঞ্চ আরও বলব, যারা জানে না তারা বিশ্বাস করবে না, অপর যে-কোনো রাষ্ট্রের চেয়ে গণতন্ত্রে বাসকারী পশুদের স্বাধীনতা কত বেশি। বস্তুত প্রবাদে যেমন বলে মাদি কুকুর আর প্রভুপত্নীতে পার্থক্য কোথায়, তেমনি গণতন্ত্রে ঘোড়া এবং গাধা স্বাধীন নাগরিকের সকল অধিকার এবং মর্যাদাসহকারে স্বাধীনভাবেই ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্য রাস্তা পরিষ্কার রাখতে হবে। না হলে, যে তাদের পথে পড়বে তার

ওপরই তারা চড়াও হবে। মোটকথা, সবকিছুই স্বাধীনতার আধিক্যের চাপে ফেটে পড়ার উপক্রম করে।

এ্যাডিম্যান্টাস আমাকে সমর্থন করে বললেন, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি, সক্রেটিস। গ্রামের রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে এরূপ অভিজ্ঞতা আমার প্রায়শই ঘটে।

আমি বললাম ঃ এসবের ফল কী দাঁড়ায়? এর ফলে নাগরিকদের মন এত স্পর্শকাতর হয়ে পড়ে যে, সংযমের বিন্দুমাত্র রেশ আর অবশিষ্ট থাকে না। বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণই তাদের কাছে অসহ্য বলে বোধ হয়। নিয়ন্ত্রণমাত্রেই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এবং 'কোনো শাসককেই মানব না'—এই নীতির পরিণামে তারা লিখিত কিংবা অলিখিত সকল আইনকানুন বিধিবিধানকে উপেক্ষা করতে থাকে।

একথা আমার নিজেরও অজানা নয়।

আমি বললাম ঃ আর এই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের উৎস। এখান থেকেই স্বৈরতন্ত্রের জন্ম ঘটে। আর এর সূচনাটি যে বিশেষ প্রতিশ্রুতিময় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, তা বটে। কিন্তু এর পরে কী ঘটে?

আমরা তো বলেছি, যে-রোগ কতিপয়ী শাসনকে আক্রমণ করে এবং পরিণামে তার ধ্বংস সাধন করে, সেই একই রোগ তীব্রতরভাবে গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে এবং গণতন্ত্রের স্বাধীনতার সুযোগে অধিকতর ব্যাপকতা লাভ করে তাকে দাসে পরিণত করে। আসল কথা হচ্ছে ঃ যা-কিছু চরম আকার ধারণ করে, তা প্রবল প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করে। একথা আবহওয়া, উদ্ভিদ এবং পশুর ক্ষেত্রে যেমন সত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য।

হ্যাঁ, চরম থেকে চরম প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি হয়।

কাজেই ব্যক্তির চরিত্রে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় চরম স্বাধীনতা, চরম দাসত্বের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তা-ই যদি হয়, তা হলে গণতন্ত্র থেকেই যে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হবে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। এই পরিণতিই আমাদের পক্ষে আশা করা সঙ্গত। স্বাধীনতার আধিক্য থেকে সবচেয়ে বর্বর এক দাসত্ব জন্মলাভ করে।

যুক্তির সঙ্গতিতে এ অনিবার্য।

কিন্তু এ্যাডিম্যান্টাস, তোমার প্রশ্নের জবাব আমি এখনও দিইনি। কতিপয়ী শাসন এবং গণতন্ত্রকে সমানভাবে আক্রমণ করে যে রোগ, সেটি কী? তোমার

নিশ্চয় স্মরণ আছে, আমরা অমিতব্যয়ী একশ্রেণীর অলসের কথা বলেছিলাম। এদের আমি অলস পুরুষ মৌমাছির সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। এদের মধ্যে যারা অনিষ্টপটু নেতা তাদের হুল আছে। আর তাদের জড়বৎ অনুসারীর দল হচ্ছে হুলশূন্য অলস মৌমাছি।

খুবই উপযুক্ত উপমা।

যখনই রাষ্ট্রে এই দুই দলের আবির্ভাব ঘটে, তখনই এর দেহে পিত্তরস এবং শ্লেষ্মার আধিক্যের ন্যায় সমাজে নানা উপদ্রব সৃষ্টি করে। কাজেই উত্তম চিকিৎসক এবং উত্তম বিধায়কের কর্তব্য হচ্ছে, পূর্ব থেকেই এই অবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় বিধানের ব্যবস্থা রাখা। মৌচাকের রক্ষাকারী তা-ই করে। মৌচাকের যে রক্ষাকারী তার নিজের কাজ সে জানে। সে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাতে অকর্মণ্য মৌমাছির দল আদৌ জন্মলাভ করতে না পারে। এবং যদি তারা জন্মগ্রহণ করে, তা হলে কোষসুদ্ধ তাদের সে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দেয়।

তার এ-ব্যবস্থাটি খুবই প্রয়োজনীয়।

তা হলে এ্যাডিমেন্টাস, এসো বিষয়টির সুবিবেচনার জন্য আমরাও নিম্ন পদ্ধতিটি অনুসরণ করি ঃ মনে করি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিবাসী তিন দলে বিভক্ত। প্রকৃতপক্ষে তারা তিন দলেই বিভক্ত। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এদের প্রথম দল গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার কারণে কতিপয়ী শাসকদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক এবং তাদের চেয়ে এরা অধিকতর উদ্যোগী।

কী প্রকারে?

কতিপয়ী শাসনে এরা ছিল ক্ষমতার বাইরে। এরা ছিল তখন ঘৃণিত। এ-কারণে এরা ছিল কতিপয়ী শাসনে শক্তিহীন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অংশ থেকেই নেতৃত্ব তৈরি হয়। এদের মধ্যে যারা অধিকতর চতুর তারাই সকল কথা এবং কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বাকি যারা তারা অলসভাবে বসে থাকলেও অপর কাউকে কথা বলতে দেয় না। ফলে, গুরুত্বহীন ব্যতিক্রম বাদে, রাষ্ট্রীয় সকল কাজের চাবিকাঠি এদের হাতেই থাকে আবদ্ধ।

এ কথা সত্য।

এর পরে আসে দ্বিতীয় দলের কথা। জনতার মধ্য থেকেই এই দলের উদ্ভব ঘটে। এ-দলের সকলেরই অকাঙ্ক্ষা অর্থ উপার্জনের। কিন্তু যারা স্বভাবে দৃঢ় তারা এক্ষেত্রে সবচেয়ে দক্ষ।

এরূপ হওয়াই সম্ভব।

এরা হচ্ছে এ-ব্যবস্থার মধুর উৎস। শাসকদল এদের শোষণ করেই অর্থসংগ্রহ করে।

বটেই। দরিদ্রকে শোষণ করায় তেমন লাভ নেই।

কাজেই এই দল হচ্ছে গণতন্ত্রের অর্থবান। কারণ,এদের শোষণেই অলসের মেদ বৃদ্ধি। তৃতীয় দল হচ্ছে জনতা। এরা নিজেদের জীবকা নিজেরা উপার্জন করে। রাজনীতিতে এদের আগ্রহ কম। রাজনীতিতে এরা তেমন দক্ষও নয়। গণতন্ত্রে এরাই হচ্ছে সংখ্যায় সবচেয়ে অধিক। ফলে এদের কোনো সমাবেশ ঘটলে এরা সবচেয়ে শক্তিমান হয়ে দাঁড়ায়।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, কিন্তু মধুর ভাগ না পেলে তারা সমবেত হওয়ারও তেমন আগ্রহ বোধ করে না।

আমি বললাম ঃ মধুর ভাগ তারা ঠিকই পায়। এদেরও পাণ্ডারা ধনীদের সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং সে-লুণ্ঠিত সম্পদের বেশির ভাগ নিজেরা ভোগ করে। অবশিষ্টাংশ জনতার মধ্য বণ্টন করে দেওয়া হয়।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ। এভাবে তারাও বিধানসভা কিংবা অন্যত্র নিজেদের স্বার্থ যথাসাধ্য রক্ষা করার চেষ্টা করে। তখন অভিযোগ আসে, তারা জনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল, তারা কতিপয়ীর মনোভাব পোষণ করে। এ সব অভিযোগই ভিত্তিহীন। কারণ, এদের হয়তো কোনো বিপ্লবাত্মক উদ্দেশ্য থাকে না।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন ধনবানরা দেখতে পায়, জনতা তাদের নেতাদের পরিচালনায়, হিংসার কারণে না হলেও, অজ্ঞানতার কারণে তাদের আঘাত করার চেষ্টা করছে, তখন ধনবানরা যথার্থই প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়। এ তাদের স্বেচ্ছাকৃত ব্যাপার নয়। গণতন্ত্রের অলস মৌমাছির দল তাদের হুল দ্বারা দংশন করতে শুরু করেছে। কাজেই তারা প্রতিক্রিয়াশীলে পরিণত হয়েছে।

তুমি যথার্থ বলেছ।

তখন বিচারের পালা শুরু হয়। একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বিচারালয়ে অভিযোগ উত্থাপন করে। উভয়পক্ষ বিচারালয়ে হাজির হয়।

হ্যাঁ, তারা বিচারালয়ে উপস্থিত হয়।

এই সংগ্রামে জনতা কি সাধারণত একজন নেতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে না? এরূপ নেতাকে তারা নিজেরাই লালন করে বড় করে তুলেছে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, সাধারণত তা-ই তারা করে।

তা হলে এবার এটা স্পষ্ট যে, এই হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের উৎস। এখান থেকেই স্বৈরতন্ত্রের অনিবার্য উদ্ভব। প্রথমে সে জনতার রক্ষক হিসাবেই দেখা দেয়।

হ্যাঁ, এটা খুবই স্পষ্ট।

কিন্তু যে রক্ষক ছিল সে কীভাবে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকে পরিণত হয়, এটি আমাদের বোঝা আবশ্যক। এক্ষত্রে আর্কেডিয়ার জিউস লাইক্যুস দেবের মন্দিরের যে-গল্প আমরা শুনে থাকি স্বৈরতান্ত্রিক নেতার শুরুও কি সেভাবে?

কিন্তু গল্পটি কী?

কেন, তুমি কোনোদিন শোননি, যে-লোক আর-একটি লোকের অন্ত্রকে তৃতীয় কোনো লোকের অন্ত্রের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করে সে নেকড়েতে পরিণত হয়? আর্কেডিয়ার মন্দিরের লোকটি নাকি এমন করেই নেকড়েতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

হ্যাঁ, এ-গল্প আমরা শুনেছি বটে।

জনতার রক্ষককেও আমরা সেই লোকের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। একবার যখন জনতাকে সে নিজের প্রভাবে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় তখন কোনো স্বজনের রক্তপাতেই তার আর দ্বিধার কোনো কারণ থাকে না। তখন পরিচিত প্রিয় সেই পুরনো পদ্ধতিটি সে প্রয়োগ করতে শুরু করে। যাকে তার হত্যা করা প্রয়োজন, তার বিরুদ্ধে বিচারালয়ে মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, এবং পরবর্তীকালে তাকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। এ-রক্তের স্বাদ নিয়ে তার অপবিত্র জিহ্বা এবং ওষ্ঠ তার সহ-নাগরিকদের রক্তপানের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এখন কাউকে সে হত্যা করে, কাউকে নির্বাসনের দণ্ডে দণ্ডিত করে। একই সঙ্গে সে আবার জনতার সম্মুখে সকল ঋণ মকুব করে দেবার এবং জমি ভাগ করে সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিতে থাকে। এর পরে তার পরিণাম কী হতে পারে? হয় সে নিজের শত্রুর হাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, নয়তো সে নরখাদক নেকড়েতে পরিণত হবে ঃ স্বৈরতন্ত্রিক শাসক হয়ে নিজের জনতাকে সে ধ্বংস করবে। এই তার অনিবার্য পরিণাম। নয় কি?

অবশ্যই এই তার অনিবার্য পরিণাম।

এই নেতাই একদিন সম্পাদবানের বিরুদ্ধে দরিদ্রের লড়াই-এর নেতৃত্ব করেছিল। লড়াইতে যদি সেদিন সে পরাজিত হয়ে নির্বাসিত হয়ে থাকে তা হলেও আজ সে পুরাদস্তুর স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হয়ে ফিরে এসেছে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

যদি তার প্রতিপক্ষ তার বহিষ্কারে বিফল হয় কিংবা প্রকাশ্য বিচারে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে ব্যর্থ হয় তা হলে তার গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র করে।

হ্যাঁ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের জীবনে এটাই স্বাভাবিক।

এবার স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের পক্ষ থেকে সেই পরিচিত পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হয়। সে তার ব্যক্তিগত রক্ষিবাহিনী তৈরির প্রস্তাব উত্থাপন করে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের শক্তির ক্রমবিস্তারেও এ একটি অনিবার্য স্তর। 'জনতার রক্ষককে আগে রক্ষা করতে হবে ঃ জনতার বন্ধুর জীবন তো বিপন্ন হতে পারে না।'—শক্তিবিস্তারের এই হচ্ছে কৈফিয়ত।

তুমি যথার্থ বলেছ।

জনতা সহজেই প্রস্তাবটি মেনে নেয়। কারণ তাদের সকল ভয়ের কেন্দ্র এই শাসক। নিজেদের জন্য আকাঙ্ক্ষার অপর কোনো উৎস আর তাদের অবশিষ্ট নেই।

খুবই সত্য কথা।

কারণ কোনো নাগরিক যদি ধনবান হয় এবং জনতার শত্রু বলে যদি তার বিরুদ্ধে এই স্বৈরশাসক অভিযোগ এনে থাকে, তা হলে ক্রিসারের কাছে উচ্চারিত দৈবজ্ঞের বাণী অনুসরণ করে ঃ

কঙ্কর আকীর্ণ সমুদ্রতীর ধরে তাকে ছুটতে হয়

কাপুরুষ হওয়ার লজ্জা তাকে আর নিবৃত্ত করতে পারে না'[১]

কারণ এ-রাজ্যে কাপুরুষ হওয়ার দ্বিতীয় সুযোগ সে আর লাভ করবে না।

হ্যাঁ, একথা ঠিক। কারণ ধরা পড়ে গেলে মৃত্যু তার অনিবার্য।

হ্যাঁ, ধরা পড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য।

১. হেরোডোটাস থেকে। হেরোডোটাস (৪৮৪–৪২৪ খ্রিঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইতিহাসশাস্ত্রের জনক বলে আখ্যাত।

ইতিমধ্যে 'জনতার রক্ষক' 'ধুলার বুকে নিজের দৈর্ঘ্য পরিমাপের' জন্য সময়ক্ষেপণ না করে তার সকল প্রতিপক্ষকে উচ্ছেদ করে শক্ত হাতে রাষ্ট্রের শাসন ধারণ করে। এখন আর রক্ষকের কোনো ভূমিকা তার অবশিষ্ট নেই। এখন সে পরিপূর্ণরূপে একজন স্বেচ্ছাচারী শাসক।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, এটাই হচ্ছে অনিবার্য সিদ্ধান্ত।

এবার কি আমরা এই স্বৈরশাসকের সুখের বিষয়টি আলোচনা করব? যে-রাষ্ট্রে এমন জীবের জন্ম ঘটে, সে-রাষ্ট্রের অবস্থাও কি আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক নয়?

হ্যাঁ সক্রেটিস, এরূপ শাসক এবং রাষ্ট্র উভয়ের 'সুখের' বিষয়টি আলোচনা করা আবশ্যক। আমাদের অনুরোধ তুমি এবার সেদিকটির কথা বলো।

গোড়ার দিকে কিন্তু এই স্বৈরশাসকের মুখে একটি হাসির প্রলেপ লেগে থাকে। সকলের জন্য তখন সে মিষ্টবাক্য উচ্চারণ করে। তার বক্তব্য ঃ সে তো স্বেচ্ছাচারী নয়। এরই প্রমাণ হিসাবে সে উদারভাবে প্রকাশ্যে এবং গোপনে বৃহৎ সব প্রতিশ্রুতির কথা ঘোষণা করতে থাকে। ঋণগ্রস্তদের ঋণ থেকে মুক্তিদানের এবং জনতার মধ্যে এবং স্বজনের মধ্যে জমিবণ্টনেরও সে প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে। মোটকথা, সে একটি নমনীয় এবং উদার ভাব দেখাতে থাকে।

হ্যাঁ, তখন তার এরূপ ভাব দেখানো আবশ্যক।

কিন্তু একবার যখন সে তার বৈদেশিক শত্রুকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত কিংবা চুক্তির মাধ্যমে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছে এবং যখন বৈদেশিক কোনো শত্রু থেকে ভয়ের কোনো কারণ আর নেই, তখন সে নিজ রাষ্ট্রের জনতার কাছে তার নিজের নেতৃত্বের অপরিহার্যতা প্রমাণের জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করতে থাকে। তার উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রের মানুষ যেন তার প্রয়োজনীয়তাকে বোধ করতে পারে, যেন তারা করের চাপে দারিদ্র্যে নিপতিত হয় এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে নিজেদের জীবিকা অর্জনের চেষ্টাতে সর্বদা নিযুক্ত থাকতে বাধ্য হয়।

হ্যাঁ, তার এ-কার্যক্রম বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

এবার যদি সে সন্দেহ করে, তার রাজ্যে এখনও স্বাধীনচেতা নাগরিক কেউ অবশিষ্ট আছে যে নাগরিক তার বশ্যতা-স্বীকারে এখনও রাজি হয়নি, তা হলে স্বৈরশাসক কোনো-না-কোনো অজুহাত সৃষ্টি করে নির্ঘাত তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে। এই সকল কারণে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সব সময়ে যুদ্ধের অজুহাত অন্বেষণ করে। সর্বদাই তাকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিতে হয়।

হ্যাঁ, যুদ্ধের অজুহাত তাকে অবশ্যই খুঁজতে হবে।

এবং এবার সে নিজের জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে।

এও তার কার্যক্রমের অনিবার্য ফল।

একদিন যারা তাকে শাসকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মিলিত হয়েছিল, যারা এখনও নিজেদের শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত মনে করে, এবার তারা তাদের শাসক সম্পর্কে পরস্পরের নিকট কথা বলতে শুরু করে এবং যাদের সাহস একটু অধিক, তারা শাসকের সামনে তার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে নিজের মনের প্রতিবাদ ব্যক্ত করে ফেলে।

হ্যাঁ, এটাই প্রত্যাশিত।

স্বৈরশাসক এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাকে যদি শাসন করতে হয় তা হলে এদের অবশ্যই শেষ করতে হবে ঃ বস্তুত শক্তিমান কোনো শত্রু কিংবা মিত্র অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এই নিধনযজ্ঞ থেকে স্বৈরশাসকের নিবৃত্ত হওয়ার উপায় নেই।

না, তার থামার আর উপায় নেই।

আর তাই, এবার সে শিকারির চোখ নিয়ে তাকাতে থাকে, রাজ্যের মধ্যে কে রয়েছে এখনও সাহসী, কে এখনও উচ্চমনা, কে জ্ঞানী, কে অর্থবান। কারণ সে চাক কিংবা না চা'ক তার 'সুখী' ভাগ্যের অনিবার্য বিধানে সে এখন সাহসী, জ্ঞানী, অর্থবান—সকলের শত্রু। এদের সকলকে ধ্বংস করে রাষ্ট্রকে 'শোধন' না করা পর্যন্ত স্বৈরশাসকের আর বিরাম নেই।

অদ্ভুত এক শোধন বটে!

হ্যাঁ, এ এক অসাধারণ শোধন। চিকিৎসকগণ দেহকে দোষমুক্ত করার জন্য শোধনকে প্রয়োগ করে। কিন্তু এরূপ শাসকের শোধন চিকিৎসকের সে-শোধন নয়। চিকিৎসক দেহের দোষকে নিষ্কাশন করে এবং স্বাস্থ্যকর উপাদানকে দেহের মধ্যে রক্ষা করে। কিন্তু এই শাসক এর বিপরীত কাজটি সাধন করে। উত্তমকে নিষ্কাশন করে সে অধমকে ধারণ করে।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ তাকে শাসন করতে হলে, এর উপায়ান্তর নেই বলেই আমার মনে হয়।

কিন্তু তার এমন উপায়টিকেও তুমি খুব আনন্দজনক বলতে পার না। ভেবে দ্যাখো, কী অদ্ভুত জীবনযাপনে সে বাধ্য হচ্ছে ঃ হয় তাকে অধমের মধ্যে বাস

করতে হবে, তাদের দ্বারা সে ঘৃণিত হবে, নয় সে আদৌ বেঁচে থাকতে পারবে না।

হ্যাঁ, এই তার একমাত্র বিকল্প।

এবং তার কার্যক্রম যত অধিক পরিমাণে ঘৃণ্য হতে থাকবে, তত অধিক পরিমাণেই তার আবশ্যক হবে বশংবদের এবং অধিকতর পরিমাণে তাদের আনুগত্যের।

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু এই বশংবদদের সাক্ষাৎ সে কোথায় পাবে? কোত্থেকে সে এদের সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ কেন? অর্থ ছুড়লেই সে তাদের পেয়ে যাবে। বশংবদরা এসে তার পাশে ভিড় জমাবে।

তার মানে, বিদেশ থেকে আর একদল অলস মৌমাছি এসে ভিড় জমাবে।

হ্যাঁ, তা-ই ঘটবে।

কিন্তু বিদেশ থেকে সংগ্রহ ব্যতীত দেশের ভিতরেও কি সে এরূপ লোক সংগ্রহের চেষ্টা করবে না?

দেশের ভেতরে সে কোথায় পাবে?

কেন, সে নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের দাসদের ছিনিয়ে নিতে পারে। তাদের মুক্তি দিয়ে নিজের দেহরক্ষী বাহিনীতে তাদের সে নিযুক্ত করতে পারে।

হ্যাঁ, তা এই স্বৈরশাসক পারে বটে। এবং তা হলে বিশ্বস্ত লোকের তার অভাব হবে না।

কিন্তু কী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এই স্বেচ্ছাচারী শাসক! বিশোধনের পরে তার নির্ভরের লোক যদি কেবল এরাই হয়, তা হলে তার ভাগ্যকে অদ্ভুতই বলতে হবে। নিজের বিশ্বস্ত বন্ধুদের সে হত্যা করেছে এবং দাসদের সে বিশ্বস্ত বন্ধুর আসনে স্থাপিত করেছে।

হ্যাঁ, তার বিশ্বস্ত বন্ধু এবার এরাই।

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এই নূতন নাগরিকদের সে সৃষ্টি করেছে। এরাই তার সঙ্গী। এরাই তাকে প্রশংসা করে। উত্তমরা তাকে ঘৃণা করে। উত্তমরা তাকে পরিহার করে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে আমি বলব ঃ বিষাদাত্মক নাটক একটি জ্ঞানের ব্যাপার এবং ইউরিপাইডিস[১] একজন বড় বিষাদাত্মক নাট্যকার।

কেন?

কারণ, তিনি তাৎপর্যপূর্ণ এই বাক্যটি সৃষ্টি করে বলেছেন ঃ

'স্বেচ্ছাচারী শাসক জ্ঞানীর সঙ্গে জ্ঞানীর জীবনযাপন করে।' ইউরিপাইডিস বলতে চেয়েছেন ঃ স্বেচ্ছাচারী যাদের তার সঙ্গীতে পরিণত করে, তারা আবশ্যই জ্ঞানী।

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ হ্যাঁ, তা ছাড়া ইউরিপাইডিস স্বেচ্চাচারীকে দেবতা বলে প্রশংসা করেছেন। তিনি এবং অন্যান্য অনেক কবিই এরূপ কথা বলেছেন।

আর আমরাও তা-ই বলব, কিন্তু বিষাদাত্মক কবিগণ অবশ্যই আমাদের ক্ষমা করবেন যদি আমরা স্বেচ্ছাচারের প্রশংসাকারী এই কবিকুলকে আমাদের রাষ্ট্রে প্রবেশ-অধিকারদানে অক্ষম হই।

হ্যাঁ, এই 'বিজ্ঞজনের' মধ্যে যাঁদের বুদ্ধি আছে তাঁরা অবশ্যই আমাদের ক্ষমার চোখে দেখবেন।

কিন্তু আমাদের রাজ্যে প্রবেশ-অনুমতি না পেলেও তাঁরা অপর সব নগরীতে গিয়ে ভিড় জমাতে পারেন। সেখানে তাঁরা জনতাকে তাঁদের মধুর এবং উচ্চকণ্ঠ দিয়ে আকর্ষণ করবেন, তাঁরা তাঁদের কাব্যের প্রভাবে জনতাকে প্রভাবিত করবেন এবং সে সকল নগরীকে স্বৈরতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যাবেন।

হ্যাঁ, একথা খুবই সত্য।

এই কবিদের আমরা বলতে পারি ভাড়াটে। রাষ্ট্র এঁদের অর্থ প্রদান করে। এঁদের নানা সম্মানে ভূষিত করে। এঁদের সর্বাধিক সম্মানদান করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকই। তার পরবর্তী স্তরের সম্মান আসে গণতন্ত্রের কাছ থেকে। কিন্তু এই সংবিধানের পর্বত যত তাঁরা আরোহণ করতে থাকেন, তত তাঁদের সুনামে ঘাটতি পড়তে শুরু করে। তাঁরা হতশ্বাস হয়ে পড়েন এবং পর্বতের চূড়ায় আরোহণ আর তাঁদের ভাগ্যে ঘটে না।

যথার্থ।

কিন্তু একথা থাক। আমরা বিষয়ান্তরে চলে গেছি। এসো আমরা আমাদের বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করি এবং দেখি আমাদের স্বৈরাতান্ত্রিক শাসক যে-বিপুল,

---

১. ইউরিপাইডিস (৪৮০–৪০৭ খ্রিঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীক নাট্যকারদের অন্যতম। এসকাইলাস (৫২৫–৪৫৬ খ্রি ঃ পূঃ), সফোক্লিস (৪৯৬–৪০৬ খ্রিঃ পূঃ) এবং ইউরিপাইডিস প্রাচীন গ্রীক নাট্যসাহিত্যের স্রষ্টা বলে পরিচিত।

বিচিত্র এবং সদাপরিবর্তমান সঙ্গীদল সংগ্রহ করেছে তাদের পালনের ব্যবস্থাটি তার কীরূপ?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ মন্দিরে যদি পবিত্র সম্পদ সঞ্চিত থেকে থাকে তা হলে সে-সম্পদকে বাজেয়াপ্ত করে নিশ্চয়ই সে ব্যয় করবে। তার কোপগ্রস্তদের সম্পদ সে সংগ্রহ করবে। এবং এই কারণে জনতার উপর ধার্য করের পরিমাণ হয়তো কিছুটা কম হবে।

কিন্তু এ-উপায় যখন ব্যর্থ হবে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ কেন, তখন তার পিতার সম্পদের ওপর নির্ভর করে সে এবং তার বালক-বন্ধু এবং বালিকা-বান্ধবীগণ জীবন ভোগ করতে থাকবে।

তার পিতা বলতে তুমি নিশ্চয়ই জনতার কথা বলছ—যে-জনতা তার জনক? সেই জনকই পোষণ করবে তাকে এবং তার এরূপ সঙ্গীদলকে?

হ্যাঁ, জনতার কোনো উপায়ান্তর নেই।

কিন্তু ধরো, জনতা একদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়ল। তার পুত্রকে ডেকে সে একদিন বলল, 'বয়স্ক পুত্রকে পিতা পোষণ করে না। পুত্রেরই দায়িত্ব হচ্ছে পিতাকে পালন করা, তাকে রক্ষা করা। এ না হলে পুত্র-জন্মদানের সার্থকতা কোথায়? পুত্রকে পিতা জন্ম দিয়েছে, সে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এইজন্য নয় যে, পুত্র বড় হলে পিতা তার নিজের গৃহভৃত্যেরও ভৃত্যের দাসে পরিণত হবে এবং পুত্রকে এবং তার উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীর দলকে তার পোষণ করতে হবে। পিতা পুত্রকে মানুষ করেছে এই আশা নিয়ে যে, পুত্র তাকে রক্ষা করবে, পুত্রের সাহায্যে সে ধনিক এবং অভিজাতদের শাসন থেকে মুক্তিলাভ করবে।' কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটছে। তাই পিতা অবশ্যই ক্রোধান্বিত হয়ে, অপর সকল পিতা যা করে তা-ই করবে। সে তার অধম পুত্র এবং তার অধম অবাঞ্ছিত সঙ্গীদের অবিলম্বে তার গৃহপরিত্যাগের আদেশ দেবে। কাজেই এ্যাডিম্যান্টাস, স্বেচ্ছাচারী শাককের পিতা যে-জনতা, সে ক্ষিপ্ত হতে পারে এবং যদি সে এরূপে ক্ষিপ্ত হয়, তখন কী হবে?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন ঃ এমন হলে তো ভয়ানক ব্যাপারই ঘটবে, সক্রেটিস। পিতা তা হলে উপলব্ধি করতে পারবে দুধ-কলা দিয়ে নিজের বুকে সে কী কালসাপ পুষেছে, কোন্ দানবকে সে এতদিন পালন করেছে। কিন্তু যদি সে এই সত্য উপলব্ধি করে, উত্তেজিত হয় এবং তাকে তার গৃহত্যাগের নির্দেশ

দেয় তা হলে সে এটাও দেখবে, সে দুর্বল হয়ে পড়েছে, পুত্র তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালী।

তার মানে এ্যাডিম্যান্টাস, তুমি বলতে চাও স্বেচ্ছাচারী পুত্র বৃদ্ধ পিতার গায়ে হাত তুলবে? পিতা যদি তার বিরোধিতা করে তবে পুত্র তাকে প্রহার করবে?

হ্যাঁ,সক্রেটিস, পুত্র তা-ই করবে। পুত্র পিতাকে প্রথমে নিয়ন্ত্রণ করবে, তার পরে প্রহার করবে।

তা হলে তো সে হবে পিতৃহন্তা, বৃদ্ধ পিতামাতার নিষ্ঠুর অভিবাবক, নিষ্ঠুর শাসক। জনতার হত্যাকারী। এবং যথার্থ স্বৈরতন্ত্রের এই হচ্ছে চরিত্র। স্বেচ্ছাচারী শাসকের এই চরিত্র সম্পর্কে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এবার সেই প্রবাদের বাক্যই সত্য হয়েছে ঃ 'কইমাছ তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনানে ঝাঁপ দিয়েছে।' যা ছিল ধোঁয়া, স্বাধীন নাগরিকের দাসত্ব, তা থেকে সে দাসের স্বেচ্ছাচারের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এমনিভাবে সীমাহীন স্বাধীনতা, সমস্ত শৃঙ্খলা এবং যুক্তিকে লংঘন করে যে-স্বাধীনতা, সে পরিণামে নিষ্ঠুরতম এবং তিক্ততম দাসত্বেই পর্যবসিত হয়।

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

তা হলে এ্যাডিম্যান্টাস, একথা কি আমরা বলতে পারি স্বৈরতন্ত্রের চরিত্র এবং গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব কেমন করে ঘটে, সে-বিষয়টির আলোচনা বিস্তারিতভাবেই আমরা সম্পন্ন করেছি?

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি।

নবম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ২৪
[৫৭১—৫৯১]

কে সুখী? ন্যায়বান, না অন্যায়কারী?

'রিপাবলিক'-এর আলোচনা বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এই অগ্রগতির ধারাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করে আমরা বলতে পারি, সক্রেটিসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ঃ ন্যায় কী? এর জবাবের জন্য ন্যায়কে বৃহৎ আকারে পাওয়ার উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্র রচনা করা হয়েছে। এবং সেই ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রে শাসনের যে-নীতি তা-ই হচ্ছে ন্যায়। সে হচ্ছে সঙ্গতির নীতি। সঙ্গতিসম্পন্ন সেই রাষ্ট্র হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র। দার্শনিক বা জ্ঞানীর শাসনে শাসিত রাষ্ট্র। এই সঙ্গতির নীতির লংঘনে সকল ব্যত্যয় বা বিচ্যুতির সৃষ্টি। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আদর্শ রাষ্ট্র থেকে এই বিচ্যুতিরও বর্ণনা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই বিচ্যুতির প্রকাশ ঘটে উচ্চাভিলাষতন্ত্রে, কতিপয়তন্ত্রে, গণতন্ত্রে এবং স্বৈরতন্ত্রে। এদের প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্যের ধারক-চরিত্রও সক্রেটিস বর্ণনা করেছেন।

সক্রেটিস মনে করছেন তাঁর কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। একমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে থ্র্যাসিমেকাসের সেই দাবির একটি জবাব, যে-দাবিতে থ্র্যাসিমেকাস বলেছিলেন ঃ 'অন্যায়কারী হচ্ছে সুখী।' সক্রেটিস এ-অভিমত অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কেবল অস্বীকার করা যথেষ্ট নয়। তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, অন্যায়কারী যত শক্তিমান কিংবা যথেচ্ছাচারী এবং স্বাধীন হোক-না কেন, অন্যায়কারী সুখী নয়। সুখী হচ্ছে ন্যায়বান।

রাষ্ট্র-অনুরূপ চরিত্রচিত্রণের উদ্দেশ্যও ছিল সক্রেটিসের এটি। অর্থাৎ জ্ঞান, বিক্রম এবং প্রবৃত্তি—এদের প্রাধান্যের ভিত্তিতে এক-একটি চরিত্র কী হতে পারে, তা সক্রেটিস বর্ণনা করেছেন। যে-ধারাক্রমে প্লেটো অসম্পূর্ণ রাষ্ট্রগুলিকে বর্ননা করেছেন সে-ধারাক্রম কোনো ঐতিহাসিক ক্রম নয়। এটি প্লেটোর কাছে একটি যুক্তিগত এবং নিকৃষ্টতার দিক থেকে বলা চলে, পরিমাণগত ক্রম। প্লেটোর মতে উচ্চাভিলাষতন্ত্র (ইংরেজি অনুবাদে 'টিমোক্রাসি' শব্দ ব্যবহার করা হয়) হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী। কাজেই নিকৃষ্টতার

দিক থেকে এই ধরনের রাষ্ট্র সবচেয়ে কম নিকৃষ্ট। তার পরে আসে কতিপয়তন্ত্র। তার চেয়েও নিকৃষ্ট গণতন্ত্র। এবং নিকৃষ্টতম হচ্ছে স্বৈরতন্ত্র। সুখের ক্ষেত্রেও এই ক্রমটি অনুসরণ করেই সক্রেটিস প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের প্রতিভূ-চরিত্রকেও সৃষ্টি করেছেন। সক্রেটিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রত্যেকটি চরিত্রকে তার পূর্ণ বিকাশের ভিত্তিতে রূপায়িত করা। তা হলেই মাত্রা কে কী পরিমাণ সুখী কিংবা অসুখী তা স্থির করা সহজ হবে।

সুখ-অসুখের দুই প্রান্তে দুটি চরিত্র। এক প্রান্তে রয়েছে দার্শনিক-শাসকের চরিত্র। অপর প্রান্তে রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিকের চরিত্র। একটির বিপরীত অপরটি। একজন সুখী, অপরজন অসুখী। একথা প্রমাণের জন্য প্লেটো তিনটি যুক্তির অবতারণা করেছেন।

১. স্বাধীনতার সম্পদ এবং সাহস—যেদিক থেকেই দেখা যাক, যে-চরিত্র প্রবৃত্তির দাস সে-চরিত্রই সর্বাধিক অসুখী। তার যথেচ্ছাচারকে অপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা বলে বোধ হলেও স্বেচ্ছাচারী যথার্থভাবে স্বাধীন নয়। কারণ, যথার্থ স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের জন্য আত্মা যা করা সঙ্গত বোধ করবে তা করার স্বাধীনতা। কিন্তু স্বৈরাচারীর এই স্বাধীনতা নেই। সে যা করে, তা সে করতে বাধ্য। তা না করার তার স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্রের সকল জ্ঞানীগুণীকে সে হত্যা করে। হত্যা করতে সে বাধ্য। কারণ, নিষ্পেষিত দাস-পরিবেষ্টিত প্রভুর ন্যায় সর্বদা শাসিতের বিদ্রোহের আশঙ্কায় সে ভীত। সে তার জনক, অর্থাৎ জনতাকে হত্যা করে। তাকে হত্যা করতে সে বাধ্য। কারণ, জনক পুত্রের বর্বরতার প্রতিরোধ করে বলতে পারে ঃ 'তুমি আমার কুপুত্র।' তা-ই জনকের ভয়ে সে ভীত। আপাতদৃষ্টিতে স্বৈরশাসক যেমন ইচ্ছা তেমন করতে পারে। তার অবাধ স্বাধীনতা। আসলে সে যা করে, গত্যন্তরহীন বলেই সে তা করে। "যে-আত্মা স্বৈরাচারের দাস সে তা-ই উন্মত্ততা, বিভ্রান্তি এবং অনুতাপের হাতে অসহায়।" এবং যার আকাঙ্ক্ষার কোনো শেষ নেই, তার পক্ষে কোনো সম্পদই যথেষ্ট নয়। কাজেই স্বৈরাচারীকে সম্পদেও সম্পদবান বলা চলে না।

২. অভিজ্ঞতার সুখের পরিমাণের ক্ষেত্রে দার্শনিক এবং স্বৈরাচারী অর্থাৎ ন্যায় এবং অন্যায়কে তুলনা করলে আমাদের বলতে হয়, দার্শনিকই অধিক সুখী। কারণ, আত্মার যে-তিনটি উপাদানের উল্লেখ

করা হয়েছে—অর্থাৎ সম্পদ, সম্মান এবং জ্ঞান তার সবটারই অভিজ্ঞতা দার্শনিকের আছে। দার্শনিকের স্বাভাবিক সম্পদের অভিজ্ঞতা আছে—যেমন অপর দশজনার থাকে। দার্শনিকের সম্মানের অভিজ্ঞতা আছে—যেমন কৃতী ব্যক্তিমাত্রেরই থাকে। এবং তার জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু আত্মার সকল উপাদানের অভিজ্ঞতা অপর কারও থাকা সম্ভব নয়।

৩. দার্শনিকমাত্রই জানে, সত্যকার সুখ এবং অসুখের মধ্যে পার্থক্য কী। অপরদিকে, দার্শনিক ব্যতীত অপর সকলে সুখকে মনে করে অসুখের অভাব এবং অসুখ হচ্ছে সুখের অভাব। আমরা আহার গ্রহণ করে তীব্র সুখ বোধ করি, কারণ ক্ষুধাজনিত যন্ত্রণার তখন আর অস্তিত্ব নেই। কাজেই বলা চলে ক্ষুধার অভাবেই ভুক্তের সুখ। কিন্তু এ হচ্ছে সুখের আপেক্ষিক বোধ। একের ভিত্তিতে অপরের অস্তিত্ব। এ অবশ্যই অলীক। কারণ, যথার্থ সুখ হবে অনন্যনির্ভর এবং দার্শনিকের আত্মার সুখই হচ্ছে অনন্যনির্ভর। স্বৈরাচারীর অনন্যনির্ভর বলে কিছু নেই। স্বৈরাচারী নিজেই নিজের প্রভু নয়। প্রবৃত্তিই হচ্ছে তার প্রভু। প্রবৃত্তিনির্ভর তার অস্তিত্ব। এ-কারণে যথার্থ সুখ থেকে স্বৈরাচারীর দূরত্ব সর্বাধিক। প্লেটোর ভাষায় ঃ "যথার্থ সুখ থেকে স্বৈরতন্ত্রীর সুখের দূরত্ব অঙ্কের হিসাবে দাঁড়াচ্ছে তিনের তিন বা ৩ × ৩।" অথবা বলা চলে "দার্শনিক-শাসক স্বৈরতন্ত্রীর চেয়ে সাত শত উনত্রিশ গুণ অধিক সুখী এবং স্বৈরতন্ত্রী দার্শনিক-শাসকের চেয়ে সাত শত উনত্রিশ গুণ অধিক অসুখী।" [৫৮৭]

কিন্তু স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের বর্ণনা আমাদের এখনও অবশিষ্ট আছে। গণতান্ত্রিক ব্যক্তি থেকে তার বিকাশ কেমন করে ঘটল এবং তার রূপটি কী এবং এমন ব্যক্তি সুখী না অসুখী তাও আমাদের জানা আবশ্যক।

হ্যাঁ, এ-বিষয়টি এখনও বাকি আছে।

এ ছাড়া অপর একটি বিষয়ও আমার করণীয় আছে।

কী সে বিষয়?

আমার মনে হয় না, প্রবৃত্তির শ্রেণীবিভাগটি আমরা সম্পূর্ণ করেছি। কিন্তু এ-কাজটি অসম্পূর্ণ রাখলে আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্যটি অস্পষ্ট রয়ে যাবে।

কিন্তু এখন তুমি সে-কাজটি সমাধা করতে পার।

হ্যাঁ, সে-কাজটি সমাধা করার কথাই আমি ভাবছি। আমার মনে হয় আমাদের এমন কতগুলি কামনা-বাসনা আছে যেগুলি অবৈধ। হয়ত এগুলি আমাদের সহজাত। এগুলি নিয়েই আমরা জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু সামাজিক আইনকানুন, যুক্তি এবং উত্তম ইচ্ছা এগুলিকে ক্রমান্বয় এরূপ বাধ্য করে তোলে যে অনেকের চরিত্র থেকে এরা পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায় কিংবা থাকলেও বেশ দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু অনেকের চরিত্রে এগুলির সংখ্যা এবং শক্তি অব্যাহতই থাকে।

কিন্তু সক্রেটিস, কোন্ ইচ্ছার কথা বোঝাতে চাইছ?

আমি সেই ইচ্ছাগুলির কথা বলছি, যেগুলি আমাদের স্বপ্নে দেখা দেয়। নিদ্রামগ্ন অবস্থায় আমাদের যুক্তি যখন সুপ্ত এবং মনুষ্যোচিত শক্তির নিয়ন্ত্রণ যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন আমাদের ভিতরের পশুশক্তি খাদ্য এবং পানীয়ে পূর্ণ হয়ে আমাদের দেহের মধ্যে জেগে ওঠে এবং ইচ্ছামত নিজেদের কামনাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। আমরা জানি, আমাদের এমন কামনার পক্ষে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়। এদের মধ্যে সঙ্কোচ কিংবা লজ্জার কোনো অস্তিত্ব নেই। আর তা-ই এমন অবস্থায় এই কামনা জননী কিংবা অনুরূপ কারোর সঙ্গে, পুরুষ কিংবা পশু কিংবা দেবতা কারোর সঙ্গে দৈহিক মিলনে সঙ্কোচ বোধ করে না কিংবা নরহত্যা বা অপবিত্র কোনো কর্ম থেকে বিরত থাকার আবশ্যকতা বোধ করে না।

এ-সম্পর্কে তোমার কথা খুবই সত্য, সক্রেটিস।

কিন্তু যে-লোক চরিত্রবান, যার বিবেচনা সুস্থ এবং সুনিয়ন্ত্রিত, সে নিদ্রাগমনের পূর্বে তার যুক্তিকে জাগরিত করে। যুক্তিকে সে বুদ্ধি এবং সংলাপের অস্ত্রে সজ্জিত করে। তার কামনাকে সে যেমন প্রশ্রয় দেয়নি, তেমনি সে তাকে বুভুক্ষুও রাখেনি। কাজেই তার কামনা তার আত্মাকে অতৃপ্তি কিংবা ভোগ—কোনোকিছু দিয়েই আর উদ্ব্যস্ত করে তোলে না। তার কামনাও নিদ্রার সঙ্গে শান্ত এবং নিদ্রিত হয়ে পড়ে। আত্মা তখন নিরুদ্বেগে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের জ্ঞানের অন্বেষণে বহির্গত হতে পারে। তার চরিত্রের তৃতীয় শক্তিকেও সে শান্ত করতে সক্ষম হয়। আর তা-ই সে চরিত্রবান। সে যখন তার ক্ষুধা এবং প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নিদ্রায় গমন করে তখন তার অন্তর-বোধ কোনো দুষ্কর্মের দুঃস্বপ্নে বিব্রত না হয়ে সত্য-অনুধাবনে ব্যাপৃত থাকতে সক্ষম হয়।

হ্যাঁ, চরিত্রবানের ক্ষেত্রে এরূপই ঘটে।

আমি জানি, আমরা প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি। তবু যে-কথাটি আমি বলতে চাচ্ছি সে হচ্ছে এই, আমরা যে যতই সম্মানীয় বলে বোধ হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভয়ংকর পাশব এবং অর্থনৈতিক ইচ্ছার অস্তিত্ব রয়েছে। এগুলির প্রকাশ ঘটে প্রধানত স্বপ্নে। তোমার কী মনে হয় এ্যাডিম্যান্টাস? তুমি কি আমার সঙ্গে একমত?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, আমি তোমার সঙ্গে একমত।

ঠিক আছে, তা হলে চলো আমরা আবার আমাদের গণতান্ত্রিক চরিত্রটির কাছে প্রত্যাবর্তন করি। তোমার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, আমরা বলেছিলাম, গণতান্ত্রিক তরুণের জনক হচ্ছে সেই কতিপয়ী শাসক যার সমগ্র দৃষ্টি অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ, যে হচ্ছে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃপণ এবং উপভোগ কিংবা বাহারের জন্য অপ্রয়োজনীয় ব্যায়ের ইচ্ছাকে যে প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক।

হ্যাঁ, একথা আমার মনে আছে।

কিন্তু পুত্র কালক্রমে যে-সঙ্গী জোটাল তাদের রুচি এবং ইচ্ছায় কোনো কার্পণ্য ছিল না। তারা যথেচ্ছাচারী। পিতার কার্পণ্য এবং নীচতা তাকে যথেচ্ছাচারের জগতে ঠেলে দেয়। কিন্তু একথা স্বীকার্য যে, গণতান্ত্রিক পুত্র তার সঙ্গীদের চেয়ে উত্তম চরিত্রের। আর এজন্যই সে উভয় দিককে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কার্পণ্য কিংবা অমিতব্যয়—উভয়কে পরিহার করে সে উভয়ের মধ্যে একটা আপোস-স্থাপনের চেষ্টা করে। মোটকথা, কতিপয়ী থেকে গণতান্ত্রিক চরিত্রে তার রূপান্তর ঘটে।

হ্যাঁ, একথাও যথার্থ।

আমি বললাম ঃ বেশ, এবার মনে করো এ-পুত্রেরও কালক্রমে একটি পুত্র হল এবং তার পুত্রকে সে নিজের স্বভাবে পালন করে তুলল। মনে করো এই পুত্রের ক্ষেত্রেও তেমন ব্যাপারটি ঘটল যা তার পিতার ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তার সঙ্গীদল পুরো স্বাধীনতার নামে তাকে পুরো যথেচ্ছাচারের পথে নিয়ে গেল। তার পিতা এবং পরিবার যেখানে ছিল সংযম এবং মিতাচারের পক্ষে, তার সঙ্গীরা সেখানে তাকে নিয়ে গেল এর বিপরীত ক্ষেত্রে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত যখন তার সঙ্গী কুমন্ত্রকের দল তাকে বশে রাখা অসম্ভব বলে আশঙ্কিত হয়ে ওঠে, তখন তারা তার অলস ইচ্ছার বশকারী এক প্রভুকে তার উপর স্থাপিত করে। এই প্রভু তাকে তার অলস ইচ্ছার জগতে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে।

তোমার এ-বর্ণনাটি এ-চরিত্রের সঠিক বর্ণনাই বটে।

অলস ইচ্ছার দল মৌমাছির ন্যায় পালাক্রমে অষ্টপ্রহর পুত্রের কানের কাছে গুঞ্জন তুলতে থাকে। ইচ্ছার সুবাস, পুষ্প এবং সুরার উপঢৌকনে তাকে পূর্ণ এবং মোহিত করে তোলে এবং পরিশেষে তার অন্তরে এই ইচ্ছার হুল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এবার তার প্রবৃত্তির প্রভু আর কোনো রাস মানে না। সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। তরুণের মনে এখনও যদি কোনো মহৎ ইচ্ছা, সঙ্কোচ বা উৎকৃষ্ট ধারণার অস্তিত্ব থেকে থাকে তবে তার সবকিছুকে এবার হত্যা করা হয় এবং তাদের স্থানে উন্মত্ততা অনধিকারীর আসন দখল করে নেয়।

স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের উদ্ভবের একটি পরিপূর্ণ বর্ণনাই তুমি উপস্থিত করেছ, সক্রেটিস।

আর এ-কারণেই কামের প্রবৃত্তিকে কি আমরা এ-যাবৎ স্বৈরাচারী বলে আখ্যায়িত করিনি?

হ্যাঁ, আমরা তা-ই করেছি।

আর যে-মানুষ সুরাপানে মত্ত, তার চরিত্রেও কি আমরা স্বৈরাচারের লক্ষণ দেখিনে?

হ্যাঁ।

আর যে-উন্মাদের মন বল্গাহীন সে কল্পনা করে দেবতা এবং মানুষ সকলেরই সে সম্রাট। সকলকেই শাসনের জন্য সে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

একথা যথার্থ।

তা হলে সংক্ষেপে স্বৈরাচারীর সংজ্ঞা দিয়ে আমরা বলতে পারি, স্বৈরাচারী হচ্ছে সে যার চরিত্রে জন্মগত কিংবা অভ্যাসগতভাবে কিংবা উভয়ভাবে সুরার উন্মাদনা, লালসা এবং মত্ততার সংযোগ ঘটেছে।

অবশ্যই।

তার জন্মের কথা বলতে গেলে এ-পর্যন্তই যথেষ্ট। এবার তার জীবনযাত্রার দিকটিতে যাওয়া যাক। এ্যাডিম্যান্টাস তুমি এবার বলো, এমন চরিত্র কেমন করে জীবন ধারণ করে?

বলার ভূমিকা তোমার,সক্রেটিস। তুমি বলো।

বেশ। বস্তুত কোনো প্রবল প্রবৃত্তি যখন মানুষের মনকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে তখন তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে অবসর বিনোদনে, ভোজনউৎসবে, বন্ধু এবং বান্ধবী-মিলন—প্রভৃতি অনুষ্ঠানে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, তার জীবনে এসব অনিবার্য।

শুধু তা-ই নয়, এ ছাড়াও নূতনতর প্রবল ইচ্ছার দল তার চরিত্রে জন্মলাভ করতে থাকে এবং তাদের তৃপ্তির দাবীকে অদমনীয় করে তোলে।

হ্যাঁ, তারা তৃপ্তির দাবি তুলবে।

ফলে তার যা-কিছু উপার্জন সবটাই ইচ্ছার তৃপ্তিতে ব্যায়িত হয়ে যাবে এবং তাকে ঋণগ্রহণ এবং মূলধন ব্যয়ের পথ অবলম্বন করতে হবে।

হ্যাঁ, তাকে এই পথ অবলম্বন করতে হবে।

কিন্তু ঋণ আর মূলধনেরও শেষ আছে। অর্থের সব উৎস যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তার ইচ্ছার দল অতৃপ্তির কোলাহলে ফেটে পড়বে। তাদের কোলাহল তাকে উন্মাদ করে তুলবে। কিন্তু এই ইচ্ছার যে-উৎস, যে প্রভু, সে তাদের চেয়েও তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলবে লুণ্ঠন কিংবা প্রতারণা, যে-কোনো উপায়ে হোক অর্থ সংগ্রহের জন্য তাকে যত্রতত্র তাড়িত করতে থাকবে। তার ইচ্ছার প্রভুর হুকুম ঃ যে-কোনো প্রকারে হোক, যেখান থেকে হোক তাকে অবশ্যই অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় তার জীবন—যন্ত্রণা এবং বেদনায় বিদ্ধ হতে থাকবে।

হ্যাঁ, তাকে অর্থ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে।

তার জীবনের ধারাটিই এরূপ। প্রত্যেক পরবর্তী ইচ্ছা তার পূর্ববর্তী ইচ্ছাকে অতিক্রম করে গেছে। পূর্ববর্তীর বিনিময়ে সে পরবর্তীকে গ্রহণ করেছে। আর তা-ই পিতামাতাকে এখন সে পূর্ববর্তী বলে পরিত্যাগ করেছে। পারিবারিক সম্পদে তার যে অংশ ছিল সে-অংশ সে নিঃশেষ করেছে এবং তাকে নিঃশেষ করে বাকি অংশকে ব্যয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু পরিবারের অন্যরা যদি তাতে বাধা দান করে তবে সে তা দখলের জন্য নিশ্চয়ই প্রবঞ্চনা এবং প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করবে। ঠিক নয় কি?

আমারও তা-ই মনে হয়।

কিন্তু তাতেও যদি সে ব্যর্থ হয় তা হলে সে কি লুণ্ঠন এবং জোর প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে?

না, আমার তা মনে হয় না।

কিন্তু ধরো বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রের আক্রমণকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। তারা তাকে বাধা দিল। তখন এই পুত্র কী করবে? তখন সে কি পিতামাতার সঙ্গেও স্বৈরাচারী ব্যবহার করবে না?

এ্যাডিম্যান্টাস বললেন : আমি তো পুত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ পিতামাতার এই প্রতিরোধের সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা দেখিনে।

তার মানে তুমি বলতে চাও, এই বর্বর পুত্র তার অসহায় মাতা এবং বৃদ্ধ পিতাকে, অর্থাৎ তার নিকটতম এবং প্রিয়তম জনকে আঘাত করতে দ্বিধা করবে না? এবং যদি সে পিতামাতার সঙ্গে একই গৃহে বাস করতে থাকে, তা হলে তার পিতামাতাকে তার সর্বশেষ উপপত্নী কিংবা তার বয়স্য প্রণয়ীর দাসদাসীতে পরিণত করবে? অথচ তার পিতামাতার উপর এসব লোকের কোনো অধিকার থাকতে পারে না।

এ-পুত্র এরূপ ব্যবহার করবে। আমি যথার্থই তা-ই মনে করি।

আহা, পিতার কী ভাগ্য। স্বেচ্ছাচারীকে সন্তান হিসেবে পাওয়া একটা ভাগ্যের কথা বটে!

বলো, ভাগ্যের পরিহাস।

কিন্তু পিতামাতার সম্পদেরও শেষ আছে। পুত্র তাকেও শেষ করেছে। অপরদিকে তার ইচ্ছার সংখ্যার বৃদ্ধি বই কমতি ঘটেনি। আর তা-ই এবার সে হয় অপরের ঘরে সিঁধ কাটতে শুরু করবে, নয়তো রাত্রে কোনো পথচারীর উপর হামলা করবে এবং মন্দিরের সম্পদ অপহরণ করবে। অপরদিকে এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত ন্যায়-অন্যায়ের বিশ্বাস, যার ভিত্তিতে সে নিজে বর্ধিত হয়েছিল, সেসব বিশ্বাস শৃঙ্খলমুক্ত প্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে পড়বে। কারণ, যে-প্রবৃত্তি এতদিন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে ছিল তা এখন তার প্রবল প্রভুর আদেশে মুক্তি পেয়ে তার দেহরক্ষীতে পরিণত হয়েছে। যখন সে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন এবং আইনের অনুগত এবং তার পিতার প্রভাবে ছিল, তখন এইসব কামনার পক্ষে কেবল স্বপ্নের মধ্যে জেগে ওঠাই সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রভুত্বে তার স্বপ্নের সত্তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এবার আর তার জীবনে কোনো নিয়ম-নিষেধের বালাই নেই। হত্যা, তা যতই ভয়ংকর হোক-না কেন—তা থেকেও আর সে নিবৃত্ত হবে না। তার প্রবৃত্তিই সকলরকম বিধিনিষেধহীন স্বৈরতান্ত্রিক প্রভু হয়ে তাকে শাসন করছে, যেমন করে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক একটা রাষ্ট্রকে শাসন করে। নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, কিংবা নিষিদ্ধ ভয়ংকর কোনো কর্ম—কোনোকিছুতেই তার আর কোনো দ্বিধা নেই। দুষ্প্রবৃত্তির স্বার্থে যে-কোনো দুষ্কর্মে সে এবার প্রবৃত্ত হয়। এই দুষ্প্রবৃত্তির কতকগুলিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে বাইরে থেকে। অপর যারা তার ভিতরে এতদিন বন্দি ছিল তারা এবার মুক্ত হয়েছে। এমন চরিত্রের জীবনধারণের এই বিবরণটি কি সঠিক নয়?

হ্যাঁ, আমি তা-ই মনে করি।

অবশ্য এমন চরিত্রের সংখ্যা যদি রাষ্ট্রে কম হয় এবং রাষ্ট্রের অধিকসংখ্যক লোক যদি আইনের অনুগত হয়, তা হলে এই দুষ্প্রবৃত্তির দলগুলিকে দেশত্যাগ করে অপর কোনো স্বৈরশাসকের কাঁধে ভর করতে হবে কিংবা যুদ্ধে ভাড়াটে সৈন্যের ভূমিকা পালন করতে হবে। আর রাষ্ট্রে যখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করে তখন এরা কতকগুলি ছোটখাটো দুষ্কর্মের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়।

কীরকম দুষ্কর্মের কথা বলছ?

এরা তখন চোর, পকেটমার, অপহরক, মন্দির-লুণ্ঠক ইত্যাদিতে পরিণত হয়। আবার মিথ্যাভাষণে পটু হলে এরা গুপ্তচর, মিথ্যাসাক্ষী এবং উৎকোচ গ্রহণকারীর বৃত্তি গ্রহণ করে।

সক্রেটিস, তুমি এই দুষ্কর্মকে নগণ্য বলছ কি এই কারণে যে, এই দুষ্কৃতিকারীর সংখ্যা নগণ্য?

আমি বললাম ঃ এ্যাডিম্যান্টাস, 'নগণ্য' কথাটি অবশ্যই আপেক্ষিক। তবে রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ কিংবা অকল্যাণের দিক থেকে এই অপরাধকে স্বৈরাচারের সীমানাভুক্ত বলতে পারিনে। বস্তুত এগুলি স্বৈরাচারীর দুষ্কর্ম থেকে বিরাটভাবে পৃথক। কিন্তু এই দুষ্কর্মকারী এবং তাদের অনুসারীদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং যখন তারা নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন জনতার অজ্ঞতাই স্বৈরাচারীকে সৃষ্টি করে। জনতা তাদের অজ্ঞতার মাধ্যমে এমন নেতাকে গ্রহণ করে, যার অন্তরে প্রবৃত্তির শাসন স্বৈরাচারী রূপ ধারণ করেছে।

হ্যাঁ, এরূপ লোকই স্বৈরতান্ত্রিক শাসক হওয়ার উপযুক্ত লোক।

এবং জনতার প্রতি এর দৃষ্টিভঙ্গি কীরূপ হয়? জনতা যদি তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তা হলে তো ভালো কথা। কিন্তু যদি জনতা আত্মসমর্পণ না করে, তা হলে তার সাধ্য হলে সে সমগ্র রাষ্ট্রকে দণ্ডিত করবে—যেমন সে দণ্ডিত করেছিল তার পিতা এবং মাতাকে; এবং ক্রীটবাসীদের ভাষায়, তার যে, জন্মভূমি তাকে লালনপালন করেছে তাকেই এবার তার ভুঁইফোঁড় অনুসারীর দলের দাসত্ব করে তাদের পোষণ করতে হবে। এভাবেই এই স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রের সকল কামনা, বাসনা, ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

এরূপ চরিত্র শাসনক্ষমতা লাভ করার পূর্বে ব্যক্তিগত জীবনে একইরূপ আচরণ করে থাকে। তার সঙ্গী হচ্ছে অন্ধ স্তাবকের দল যারা তার নিকট

আত্মসমর্পণে সদাব্যগ্র। এদের স্বার্থসাধন হলে, স্বৈরাচারীর প্রতি বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে তারা দ্বিধা করে না। কিন্তু নিজেদের স্বার্থ সাধিত হওয়ার পরে তাদের পরিবর্তন ঘটে যায়।

হ্যাঁ, তখন তাদের সুরের পরিবর্তন ঘটে।

ফলে স্বৈরাচারীর জীবন অতিবাহিত হয় যথার্থ সুহৃদ ব্যতীত। কারণ যে স্বৈরাচারী সে হয় প্রভু হবে, নয় সে দাস হবে। সত্যিকার সৌহৃদ্য কিংবা স্বাধীনতা কাকে বলে তা সে জানে না।

তোমার একথা যথার্থ।

তা হলে এমন চরিত্রকে আমরা সঠিকভাবেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলে অভিহিত করতে পারি। এবং আমাদের ন্যায়ের সংজ্ঞা যদি যথার্থ হয়ে থাকে তবে বলব, এই চরিত্রই হচ্ছে অন্যায়ের যথার্থ প্রতিমূর্তি।

হ্যাঁ, এ অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিমূর্তি।

আমাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসাবে বলতে পারি ঃ নিকৃষ্টতম যে-চরিত্র সে বাস্তব জীবনেও সেরূপ আচরণই করে যেরূপ আচরণ কোনো কোনো মানুষ তাদের স্বপ্নের মধ্যে করে থাকে। স্বভাবগতভাবে যে স্বৈরতান্ত্রিক সে যখন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাদখলে সক্ষম হয় তখন এই ব্যাপারটিই ঘটে। এবং যত দীর্ঘদিন সে ক্ষমতায় আসীন থাকে, তার চরিত্র তত বেশি স্বৈরতান্ত্রিক হতে থাকে।

এবার গ্লকন জবাব দিলেন ঃ নিঃসন্দেহে একথা সত্য।

তা হলে একথাও কি আমরা বলতে পারিনে যে, সর্ব-অধম যারা তারাই সবচেয়ে অসুখী? তা যদি হয়, তা হলে স্বৈরাচারীর ক্ষমতা যত অধিক দীর্ঘ এবং ব্যাপক হবে স্বৈরাচারী তত অধিক অসুখী হবে? লোকে যা-ই বলুক, আমরা তো একথাই বলব। ঠিক নয় কি?

আমরা তা-ই বলব। স্বৈরাচারী তত অসুখী হবে।

আর একথাও সত্য, স্বৈরাচারী-চরিত্র হচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের প্রতিভূ, গণতান্ত্রিক-চরিত্র গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিভূ। শাসন এবং শাসনের অনুরূপ চরিত্র সম্পর্কে আমরা একথাই বলেছি।

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছি।

কাজেই উত্তমতা এবং সুখের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের সম্পর্ক বিভিন্নপ্রকার রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের অনুরূপই হবে?

হ্যাঁ, তা-ই হবে।

তা হলে এসো, আমরা দেখি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের রাষ্ট্র এবং দার্শনিক-শাসকের রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কটি কী!

গ্লকন বললেন ঃ এদের সম্পর্ক তো পরস্পরবিরোধী। একটি যেখানে সর্বোত্তম, অপরটি সেখানে সবচেয়ে অধম।

হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই নয় যে, এদের কোন্‌টি কী! তাদের এ চরিত্র পরিষ্কার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সুখ এবং অসুখের ক্ষেত্রে আমাদের সিদ্ধান্ত কী হবে? তুমি যে-কথা বলেছ, সে কথা কি এদের সুখ এবং অসুখ সম্পর্কেও সত্য? এ-প্রশ্নের জবাব স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের বর্তমান শক্তি এবং তার অনুসারীদের সংখ্যার প্রাবল্যে আতঙ্কিত হয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। এ-প্রশ্নের জবাবে বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিচার করে প্রশ্নটির জবাব দিতে হবে।

তোমার এ কথা যথার্থ। আর এটা তো পরিষ্কার যে, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের রাষ্ট্রের চেয়ে অসুখী রাষ্ট্র আর হতে পারে না এবং দার্শনিক-শাসকের রাষ্ট্রের চেয়ে সুখী রাষ্ট্রও আর হতে পারে না।

রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যেমন আমরা একথা বলেছি, রাষ্ট্রানুরূপ চরিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা সেকথা বলব। যে সঠিক বিচারক, তাকে আপাতদৃশ্যকে অতিক্রম করে ব্যক্তির চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে হবে। আর এ-কর্তব্যে স্বৈরতান্ত্রিকের জীবনের জাঁকজমক এবং তার পরিবেশের ঠাট দেখে ছোট শিশুর ন্যায় অভিভূত হলে তার চলবে না। এই পরিবেশকে বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে তাকে ভেদ করতে হবে। তা হলেই মাত্র সে প্রশ্নটির সম্যক বিচারে সক্ষম হবে এবং তখন তার মতামতকে আমরা অবশ্যই শ্রবণ করব। বিশেষ করে, সে যদি স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের সঙ্গে বাস করে থাকে, যদি সে স্বৈরতান্ত্রিকের নিজের গৃহে এবং পরিবারের মধ্যে তার আচরণকে প্রত্যক্ষভাবে দেখে থাকে, তবে তার অভিমতকে মূল্যবান বিবেচনা করব। কারণ, গৃহের মধ্যেই আমরা একটি চরিত্রকে তার সকল নাটকীয়তাশূন্য অবস্থায়, বলা চলে একেবারে নিঃবস্ত্র অবস্থায় অবলোকন করতে পারি। রাষ্ট্রীয় জীবনের সংকটের মোকাবেলাতেও এই চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যটি প্রকট হয়ে আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তা হলে আমরা কি আমাদের সন্ধানীকে অনুরোধ করব, যেন সে এই বিচারের ভিত্তিতে অপর সকলের সঙ্গে তুলনা করে স্বৈরতান্ত্রিকের জীবনের সুখ এবং অসুখের বিষয়টি স্থির করে?

হ্যাঁ, এটি তার কাছে আমাদের সঙ্গত অনুরোধ।

তা হলে এখন আমরা কী করব? আমরা কি ধরে নেব আমাদের মধ্যেই এমন লোক আছেন স্বৈরতান্ত্রিকের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁর আছে?[১] তেমন হলে তাঁর কাছ থেকেই আমরা আমাদের প্রশ্নের জবাব পেতে পারব।

হ্যাঁ, আমরা সেরূপ ধরতে পারি।

তা হলে রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির চরিত্রের যে-সাদৃশ্যের উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি, সেই সাদৃশ্যের আলোকে ব্যক্তির চরিত্রের সুখ-অসুখের প্রশ্নটি কি আমরা আলোচনা করতে পারি?

কিন্তু সক্রেটিস, কোন চরিত্রের সাদৃশ্যের কথা তুমি বলছ?

রাষ্ট্রের কথাই প্রথম ধরো। স্বৈরতান্ত্রিক শাসিত যে-রাষ্ট্র সে-রাষ্ট্রকে কি আমরা যথার্থভাবে স্বাধীন বলব, না তাকে একটি দাসরাষ্ট্র বলে অভিহিত করব?

সে পরিপূর্ণভাবে একটি দাসরাষ্ট্র।

হ্যাঁ, কিন্তু এ-রাষ্ট্রে স্বাধীন নাগরিকও তো আছে?

হ্যাঁ, তারাও আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। এ-রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ, এমনকি যারা উত্তম ছিল তারাও সকল অধিকার হারিয়ে এখন হতভাগ্য দাসে পরিণত হয়েছে।

বেশ। এবং ব্যক্তি যদি রাষ্ট্রের অনুরূপ হয়, তা হলে ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য হবে। সেও আর তার আত্মার প্রভু নয়। কারণ, তার চরিত্রে যা-কিছু মহৎ উপাদান ছিল, সে উপাদান নিকৃষ্টতর প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়েছে।

হ্যাঁ, ব্যক্তির চরিত্রের ক্ষেত্রে একথা সত্য।

তা হলে এমন ব্যক্তির অবস্থা কি স্বাধীনতার অবস্থা, না দাসত্বের অবস্থা?

তার অবস্থাও দাসত্বের অবস্থা।

এবং যে-রাষ্ট্র স্বৈরাচারী শাসকের দাসে পরিণত হয়েছে তার পক্ষে স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে কোনো কার্যসম্পাদন করার ক্ষমতাও কি খুব সামান্য নয়?

---

১. স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্লেটোর নিজেরই ছিল। সাইরাক্যুজ দ্বীপের স্বৈরশাসক ডায়োনিসিয়াস-প্রথম-এর দরবারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্লেটো তাঁর প্রথম পর্যটনকালে (৩৮৮–৩৮৭ খ্রিঃ পূঃ) অর্জন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ডায়োনিসিয়াস-এর তরুণ পুত্রকে দার্শনিক-শাসকে পরিনত করারও তিনি চেষ্টা করেছিলেন।—কর্নফোর্ড : রিপাবলিক, পৃঃ ২৯৬।

হ্যাঁ, তার সে-ক্ষমতা খুব সামান্যই।

ঠিক তেমনি, যে-আত্মা স্বৈরাচারের দাস, তার পক্ষেও নিজের ইচ্ছামতো কোনোকিছু সম্পাদন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে উন্মত্ততা, বিভ্রান্তি এবং অনুতাপের হাতে অসহায়।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

এবার বলো, স্বৈরতন্ত্রের কবলিত যে-রাষ্ট্র, সে কি সম্পদময়, না দরিদ্র?

সে অবশ্যই দরিদ্র।

তা হলে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিভূ যে-চরিত্র, সেও দরিদ্র এবং অতৃপ্ত?

হ্যাঁ, সে-চরিত্র দরিদ্র এবং অতৃপ্ত।

আর এমন রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি উভয়ই ভীতি দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত। এই রাষ্ট্র যেমন অভিযোগ, দুঃখ, শোক এবং বেদনায় পূর্ণ থাকে, তেমনি এ-রাষ্ট্রের ব্যক্তিও তার ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির উন্মত্ত স্বৈরাচারী শাসনে সর্বদাই একইরূপ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হতে থাকবে।

খুবই সত্য কথা।

অপর সকল কারণ ছাড়াও , এই সকল কারণের জন্য তুমি বলেছিলে, স্বেচ্ছাচারী-শাসিত রাষ্ট্রই হচ্ছে সবচেয়ে অসুখী রাষ্ট্র।

গ্লকন বলেছেন ঃ এবং আমি কি ঠিক বলিনি?

আমি বললাম ঃ খুবই ঠিক বলেছ। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এইসব কারণের ভিত্তিতে স্বৈরতান্ত্রিক মানুষ সম্পর্কে তুমি কী বলবে?

স্বৈরতান্ত্রিক মানুষও সবচেয়ে অসুখী মানুষ।

আমি বললাম ঃ না গ্লকন, এখানে তুমি ঠিক বলনি।

কেন?

কারণ, তার চেয়েও অসুখী একজন আছে।

কে সে?

আমি বললাম ঃ তুমি হয়তো স্বীকার করবে, স্বৈরতান্ত্রিক ব্যক্তি একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনযাপন করার পরিবর্তে যদি সে ঘটনার স্রোতে শাসকের চরম ক্ষমতায় আরোহণ করতে বাধা হয়, তবে তার ন্যায় হতভাগ্য এবং অসুখী আর কেউ হতে পারে না।

হ্যাঁ, আমরা যে-আলোচনা করেছি, তার ভিত্তিতে এ কথাই সত্য বলে বোধ হয়।

কিন্তু শুধু 'বোধ হওয়া' আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ আমরা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। উত্তম এবং অধমের কোন্‌টি আমাদের কাম্য, তা এবার স্থির করতে হবে। কাজেই কার পক্ষে যুক্তি কী, তা আমাদের পুরোপুরি দেখতে হবে।

তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তের বিবেচনা থেকে আমরা শুরু করতে পারি।

কোন্ দৃষ্টান্তের কথা বলছ?

একজন ধনবান দাসপ্রভুর কথা চিন্তা করো যার দাসের সংখ্যা বেশ বৃহৎ। এরূপ লোকের অবস্থা থেকে আমরা স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের অবস্থাটি অনুমান করতে পারব। কারণ, এদের উভয়েরই দাস দাছে। দু'এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের দাসের সংখ্যা ধনবান নাগরিকের চেয়েও অধিক।

হ্যাঁ, এদের মধ্যে এটাই মাত্র পার্থক্য।

আমরা জানি, এমন ধনবান নাগরিক বেশ নিশ্চিত জীবনযাপন করে। কারণ, তার ভৃত্যদের তরফ থেকে তার কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।

না, তার বিপদের আশঙ্কা কেন থাকবে?

ঠিক কথা, তার বিপদের কোনো ভয় নেই। কিন্তু কেন নেই?

কারণ, তার জীবনযাত্রার পেছনে সমগ্র রাষ্ট্রেরই সমর্থন রয়েছে। তার বিপদে অপর সকলে তাকে রক্ষা করবে। একের বিপদে অপর সকলে ছুটে আসে।

খুবই সত্য কথা। কিন্তু গ্লকন, তুমি কল্পনা করো, এরূপ একজন দাসপ্রভু যার পঞ্চাশজন দাস আছে। তাকে এক দেবতা তার সংসার, সম্পত্তি এবং দাসদেরসহ একেবারে তুলে নিয়ে গেল এক বিজন ভূমিতে। বিজন ভূমিতে তাকে সাহায্য করার জন্য কোনো স্বাধীন নাগরিকের অস্তিত্ব নেই। এমন যদি হয়, তা হলে এই দাসপ্রভুর মনে কি বিপদের আশঙ্কা জাগবে না যে, দাসরা দলবদ্ধ হয়ে তাকে, তার স্ত্রী এবং সন্তানদের যে-কোনো সময়ে হত্যা করতে পারে?

হ্যাঁ, তা তো বটেই। তার মনে মারাত্মক ভয়ের সৃষ্টি হবে।

এবার সে নিজের প্রাণের ভয়ে তার দাসদের তোষামোদ করতে বাধ্য হবে। সে তাদের নানাভাবে তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে তাদের মুক্তিদানসহ নানারকম প্রতিশ্রুতি দেবে। মোটকথা, তাকে নিজের দাসদের এবার খোসামোদ করতে হবে।

হ্যাঁ, এটাই হবে তার বাঁচার একমাত্র উপায়।

এবার মনে করো, যে-দেবতা তাকে তার সমাজ থেকে তুলে এনেছে সে-দেবতা তার চার পাশে এমন প্রতিবেশী এনে দিল যারা কেউ কাউকে দাস করে না এবং কেউ এমন অপরাধের চেষ্টা করলে, তারা অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হলে, জীবননাশেও কুণ্ঠিত হয় না।

এমন হলে তার অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হবে। কারণ, এবার সে নিজেকে চতুর্দিক থেকেই শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখতে পাবে।

স্বেচ্ছাচারী-শাসকও কি এমন বন্দিশালায় নিজেকে আবদ্ধ দেখবে না? আমরা তার যে-চরিত্র বর্ণনা করেছি তাতে সকল রকম ভয় এবং লালসা দিয়ে সে পূর্ণ। তার আত্মা লোভাতুর এবং বিলাসী। নগরীর মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সঙ্গীহীন। তবু সে একাকী ভ্রমণে বের হতে পারে না। অপর স্বাধীন নাগরিক যা দেখতে ইচ্ছা করে এবং দেখে, তা সে দেখতে পারে না। অন্তঃপুরে আবদ্ধ নারীর মতো সেও এক বিবরের মধ্যে আবদ্ধ এবং অপরে যখন স্বাধীনভাবে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে এবং তাদের যা আগ্রহ তা-ই দর্শন করে, তখন সে তাদের ভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করে।

তোমার বর্ণনা খুবই যথার্থ, সক্রেটিস।

এমন অবস্থায় যে নিজের মধ্যে সুশাসিত নয়, অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্রী যে-চরিত্র, যাকে তুমি অসুখী এবং হতভাগ্য বলেছ তেমন ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত জীবনযাপন করতে না পারে, যদি তাকে স্বৈরতন্ত্রী-শাসকও হতে হয়, তা হলে তার জীবন কি ঢের বেশি অসুখী এবং হতভাগ্য জীবন হবে না? সে নিজেরই প্রভু নয়, কিন্তু তাকে প্রভু হতে হচ্ছে অপর সকলের। একে তুমি তুলনা করতে পার সেই অসুস্থ এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকের সঙ্গে যার অবসরযাপনের ভাগ্য জুটল না, যাকে জীবনপাত করতে হল পঙ্গু অবস্থায় এবং অপরের সঙ্গে লড়াই করে, অপরকে প্রতিরোধ করে।

সক্রেটিস, তোমার তুলনাটি খুবই ঠিক।

কাজেই, গ্লকন তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যার জীবনকে তুমি সবচেয়ে অসুখী বলেছ, তার চেয়েও অসুখী হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রী-শাসকের জীবন। যে-জীবনকে তুমি কঠিন বলেছ তার চেয়েও কঠিন হচ্ছে এই শাসকের জীবন।

সক্রেটিস, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

কাজেই লোকে যা-ই বলুক, যে যথার্থ স্বৈরতন্ত্রী সে আসলে নিজে প্রভু নয়। সে দাস, পরাশ্রয়ী এবং দুর্বৃত্তদলের উপর নির্ভরশীল। নিজের কোনো ইচ্ছার পূরণ সে স্বাধীনভাবে করতে পারে না। তার অসংখ্য চাহিদাকে ভেদ করে তুমি যদি তার আসল রূপের দিকে চাইতে পার তা হলে দেখতে পাবে, সে একটি হৃতসর্বস্ব চরিত্র। তার জীবনে ভীতির উপচ্ছায়া সর্বক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে-রাষ্ট্রকে সে শাসন করে তাকে যদি আমরা নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করি তা হলে বলতে পরি, তার রাষ্ট্রের ন্যায় তার চরিত্র সর্বদাই যন্ত্রণা এবং দুর্দশার অন্তর্ঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। আমরা পূর্বে যা বলেছি তার সঙ্গে এও আমাদের বলতে হবে যে, তার ক্ষমতাই তাকে অধিকতর ঈর্ষাপরায়ণ, অবিশ্বাসী, অন্যায়ী, বন্ধুহীন, এবং ধর্মহীন করে তাকে সকল অন্যায়ের উৎসস্থলে পরিণত করো। এমন চরিত্র যেমন তার প্রতিবেশী ও পরিজনদের কাছে, তেমনি তার নিজের কাছে সীমাহীন দুর্দশার কারণস্বরূপ।

এ কথাকে বোধসম্পন্ন কারো পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

বেশ, তা হলে এবার তুমি শেষ বিচারকের দায়িত্বটি পালন করো। তোমার সিদ্ধান্তটি প্রকাশ করে বল, সুখের মাপকাঠিতে দার্শনিক-শাসক, উচ্চাভিলাষী, কতিপয়ী, গণতন্ত্রী এবং স্বৈরতন্ত্রী—এই পাঁচ প্রকার চরিত্রের কার অবস্থান কোথায়?

গ্লকন বললেন ঃ এ-রায়দান সোজা। আমি বলব, উদ্ভবের ক্ষেত্রে এদের যে-পর্যায়ক্রম, সুখের ক্ষেত্রেও তাদের সেই একই পর্যায়ক্রম। এবং কেবল সুখের ক্ষেত্রে নয়, নৈতিক মূল্যের ক্ষেত্রেও এরা সেই ধারাক্রমই বহন করে।

তা হলে এবার আমাদের একজন ঘোষকের আবশ্যক। কিংবা আরিস্টনের পুত্র বিচারক গ্লকনের রায়টি আমি নিজেও ঘোষণা করে বলতে পারি ঃ যে পরম ন্যায়বান, যে সবার চেয়ে উত্তম সে-ই সবচেয়ে সুখী। অন্য কথায়, যে-দার্শনিক-রাজা নিজেকে শাসন করতে সক্ষম, সে-ই সবচেয়ে সুখী। এবং যে সবচেয়ে অন্যায়ী, যে সবার চেয়ে অধম, সে-ই সবার চেয়ে অসুখী, সে-ই সবার চেয়ে হতভাগ্য। অন্য কথায়, যে-মানুষ নিজের আত্মার ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রী এবং যে নিজের রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বৈরতন্ত্রী-শাসক, সে-ই সবচেয়ে অসুখী।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, তুমি এ-ঘোষণাটি করতে পার সক্রেটিস।

এবং এর সঙ্গে আর-একটি কথা যোগ করে বলব ঃ এ-রায় শাশ্বত সত্য। মানুষ কিংবা দেবতাদের জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত যা-ই হোক-না কেন তাতে আমাদের রায়ের সত্যতার কোনো ক্ষতি কিংবা বৃদ্ধি ঘটবে না। একথাও কি আমি বলতে পারিনে?

হ্যাঁ সক্রেটিস, একথাও তুমি বলতে পার।

তা হলে, এটা আমাদের প্রথম প্রমাণ। আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণও কিছু গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় প্রমাণ কী?

আত্মার স্বভাবের উপর আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত। কারণ, রাষ্ট্রের ন্যায় ব্যক্তির আত্মাকেও আমরা তিনটি উপাদানে বিভক্ত করেছিলাম। আমাদের দ্বিতীয় প্রমাণের শুরু এখান থেকেই।

কেমন করে?

বলছি ঃ আত্মার প্রত্যেকটি উপাদানেরই নিজ নিজ আনন্দ, ইচ্ছা এবং নিয়ামক নীতি রয়েছে।

তোমার এ কথার কী অর্থ, সক্রেটিস?

কেন গ্লকন, আমরা তো দেখেছি মানুষের চরিত্রের এই উপাদানগুলির একটি মানুষকে জ্ঞানদান করে, আর একটি তাকে বিক্রমে এবং উদ্যোগে সমৃদ্ধ করে। এবং তৃতীয়টির দান এরূপ বিচিত্র যে, তাকে এক শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তৃতীয়টিকে আমরা এ-কারণে ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বলে অভিহিত করেছি। আমাদের খাদ্য এবং পানীয়ের ক্ষুধা, জৈবিক তাড়না এবং অনুরূপ চাহিদার প্রাবল্যের উৎস হচ্ছে এই তৃতীয় উপাদান। একে আমরা 'অর্থ-কামনা' বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ অর্থ দ্বারাই মাত্র এসব প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করা চলে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কাজেই এই তৃতীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করে আমরা বলতে পারি, এর আনন্দ এবং ইচ্ছার লক্ষ্য হচ্ছে সংগ্রহ। অথবা বলতে পারি আত্মার এই উপাদানের লক্ষ্য হচ্ছে লাভ করা বা অর্থ উপার্জন করা।

আমি তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

তেমনি আত্মার যে-উপাদানকে আমরা বিক্রম বলেছি, তার লক্ষ্য হচ্ছে সম্মান এবং সাফল্যলাভ। কাজেই আমরা যথার্থই বলতে পারি, বিক্রম সম্মান বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অন্বেষণ করে।

হ্যাঁ, আমরা তা বলতে পারি।

আর এ কথাও স্পষ্ট যে, জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে সত্যের আবিষ্কার। অর্থ বা সম্মানের প্রতি জ্ঞানের কোনো আগ্রহ নেই।

এ কথা সত্য।

কাজেই আত্মার এ-ভাগকে আমরা জ্ঞানের প্রেমিক বলে অভিহিত করতে পারি। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই।

এর ভিত্তিতে আমরা কি বলতে পারিনে যে, একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে আত্মার এক-একটি উপাদান প্রবল হয়ে দেখা দেয়?

আমরা অবশ্যই তা-ই বলব।

এ-কারণেই আমরা মানুষকে মূলত তাদের চরিত্রের নিয়ামক শক্তি : জ্ঞান, বিক্রম এবং প্রবৃত্তির ভিত্তিতে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছি। প্রত্যেক শ্রেণীর অবশ্য উপযুক্ত ইচ্ছার দিকও আছে।

খুবই সত্য কথা।

এবার তুমি তিন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেক শ্রেণীকে প্রশ্ন করো, কোন্ শ্রেণীর জীবন সবচেয়ে সুখী, তা হলে দেখবে প্রত্যেক শ্রেণীই নিজেদের জীবনকে সবচেয়ে সুখী বলে প্রশংসা করছে এবং অপর শ্রেণীর জীবন অসুখী বলে তার নিন্দা করছে। দেখবে, যার জীবনের লক্ষ্য অর্থ, নগদ মূল্যের বাহক না হলে জ্ঞান বা সাফল্য তার কাছে একেবারেই মূল্যহীন।

হ্যাঁ, জ্ঞান বা সাফল্য এদের কাছে মূল্যহীন।

এবং যে উচ্চাভিলাষী, সে কি মনে করে? সেও কি অর্থোপার্জন কিংবা জ্ঞান যদি সম্মানের বাহক না হয় তা হলে তাকে স্থূল এবং মূল্যহীন বলে গণ্য করে না?

হ্যাঁ, সেও অর্থোপার্জন এবং জ্ঞানকে মূল্যহীন বিবেচনা করে।

এবং দার্শনিক, যে সর্বদা জ্ঞান এবং সত্যের অন্বেষণে রত, সে জ্ঞান এবং সত্যের তুলনায় আত্মার অপর উপাদানকে কী চোখে দেখে? সে কি মূল্যের ক্ষেত্রে এদের স্থান অনেক নিচে বলেই গণ্য করবে না? আত্মার অপর উপাদানকে 'প্রয়োজনীয়' বলে সে স্বীকার করবে বটে, কিন্তু অনিবার্য না হলে সে এদের বর্জন করতেও দ্বিধা করবে না। দার্শনিকের বিবেচনা কি এরূপই হবে না?

নিঃসন্দেহে।

তা হলে আমরা নীতির প্রশ্ন না তুলে এই তিনপ্রকার সুখকে (অর্থ, বিক্রম এবং জ্ঞান) যদি তিনপ্রকার জীবনের সঙ্গে তুলনা করি তা হলে সত্যের রূপটি কী হবে বলে তুমি মনে কর, গ্লকন?

গ্লকন বললেন : আমি ঠিক জানিনে, সক্রেটিস।

বিষয়টি অন্যভাবে দেখা যাক। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য এক্ষেত্রে আমাদের কী আবশ্যক? সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং যুক্তির অধিক উত্তম কোনো উপায় আছে বলে কি তুমি মনে কর?

অবশ্যই না।

বেশ, তা হলে চিন্তা করে দ্যাখো, যে তিনপ্রকার মানুষের কথা আমরা বলেছি তাদের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর উল্লিখিত তিনপ্রকার সুখের সর্বাধিক অভিজ্ঞতা আছে? জ্ঞানের সুখের ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনকারীর অভিজ্ঞতাকে কি তুমি দার্শনিকের অর্থ উপার্জনের সুখের অভিজ্ঞতার চেয়ে অধিক বলবে?

গ্লকন বললেন, না, তা তো নয়ই। দার্শনিক তার জীবনের শুরু থেকে অর্থ লাভের সুখের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই লাভ করবে। এ-অভিজ্ঞতা লাভ না করার কোনো উপায় তার নেই। কিন্তু তা-ই বলে অর্থ উপার্জনকারী চরিত্রের এমন কোনো অনিবার্যতা নেই যাতে তাকে সত্য উপলব্ধির সুখের অভিজ্ঞতালাভ কিংবা ভোগ করতেই হবে। বস্তুত, এমন লোকের যদি সত্যোপলব্ধিগত সুখের অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছাও জন্মে তবু তা লাভ করা তার পক্ষে কঠিন হবে।

তা হলে আমরা বলব, জ্ঞানের সুখ এবং অর্থের সুখ—এই উভয় সুখের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দার্শনিকের অবস্থা অর্থ উপার্জনকারীর চেয়ে উত্তম? দার্শনিকের সুবিধা অর্থোপার্জনকারীর চেয়ে অধিকতর?

হ্যাঁ, তার সুবিধা অধিকতর।

বেশ, কিন্তু সম্মানের প্রেমিক বা উচ্চাভিলাষীর সঙ্গে তুলনায় দার্শনিকের অবস্থাটি কী? উচ্চাভিলাষীর জ্ঞানের সুখের যে-অভিজ্ঞতা তার চেয়ে সম্মানের সুখের অভিজ্ঞতা কি দার্শনিকের কম?

না। তা হতে পারে না। কারণ, সম্মান সকলেই লাভ করে। দার্শনিক কিংবা উচ্চাভিলাষী কিংবা অর্থ উপার্জনকারী—যার যে-লক্ষ্য সে যদি তা অর্জন করে তা হলে তাদের আপন-আপন প্রশংসাকারীদের নিকট থেকে তারা সম্মান লাভ করে। কাজেই সকলেই জানে সম্মানের সুখ কী। কিন্তু সত্যকে জানার যে-সুখ তা কেবল দার্শনিকই লাভ করতে পারে।

আমি বললাম ঃ তা হলে অভিজ্ঞতার দিক থেকে দার্শনিকের বিচার করার অধিকার সবার চেয়ে অধিক?

হ্যাঁ, তার ক্ষমতা সবার চেয়ে বেশি।

এবং দার্শনিকই হচ্ছে একমাত্র লোক যার মধ্যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ সাধিত হয়।

এ কথাও সত্য।

আর এ-কার্য সাধনের জন্য দার্শনিকেরই মাত্র প্রয়োজনীয় উপায়ও রয়েছে—যে-উপায় অর্থাকাঙ্ক্ষী বা সম্মানাকাঙ্ক্ষী, কারোর নেই।

সক্রেটিস, তোমার এ কথার অর্থ কী?

গ্লকন, আমরা কি বলিনি, কোনো সমস্যার বিচার বা সিদ্ধান্ত করতে হবে যুক্তির মাধ্যমে? আর এই যুক্তির মাধ্যম বা হাতিয়ার তো কেবলমাত্র দার্শনিকেরই বিশেষ হাতিয়ার।

হ্যাঁ, এ কথা সত্য।

কিন্তু সম্পদ এবং লাভ—এটাই যদি আমাদের বিচারের মাপকাঠি বা মাধ্যম হত তা হলে আমরা বলতাম যে অর্থ উপার্জনকারীর বিচারের মধ্যেই সর্বাধিক পরিমাণ সত্য নিহিত আছে।

হ্যাঁ, তা হলে অনিবার্যভাবে তা-ই হত।

আবার আমাদের মাপকাঠি যদি সম্মান, সাফল্য এবং সাহস হত তা হলে উচ্চাভিলাষীর ক্ষেত্রেও একথা সত্য হত।

নিশ্চিতই।

কিন্তু আমরা যখন বিচারের মাপকাঠি বা মাধ্যম গ্রহণ করেছি অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি এবং যুক্তিকে—?

তখন এটা তার অনুসিদ্ধান্ত যে, সত্যকে আমরা লাভ করতে পারব কেবল মাত্র দার্শনিকের বিচার এবং যুক্তির মাধ্যমে, অপর কোনো উপায়ে নয়।

তা হলে যে-তিনপ্রকার সুখের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে পরম সুখ হবে সেই সুখ যা আমাদের জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। এবং যে মানুষের নিয়ন্ত্রণশক্তি রয়েছে সুখের এই উপাদানের উপর, সে অবশ্যই পরম সুখের জীবনযাপন করবে।

গ্লকন বললেন ঃ নিঃসন্দেহে একথা সত্য। জ্ঞানী যখন নিজের জীবন সম্পর্কে কথা বলে, তখন সে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই বলে।

কিন্তু দার্শনিক তা হলে কোন্ জীবন এবং কোন্ সুখকে দ্বিতীয় স্তরের জীবন এবং সুখ বলে চিহ্নিত করবে বলে তুম মনে কর?

কেন, সে নিশ্চয়ই উচ্চাভিলাষীর জীবন অর্থাৎ সামরিক ধরনের জীবনকে পরবর্তী স্তরে স্থাপন করবে। কারণ অর্থাকাঙ্ক্ষীর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে সে নিজের জীবনের নিকটতর বলে গণ্য করে।

তা হলে, অর্থলাভের যে-সুখ সে আসে সকলের শেষে।

হ্যাঁ, অর্থলাভের সুখের স্থান সবার নিচে।

বেশ, তা হলে দেখা যাচ্ছে ন্যায়বান অন্যায়ীকে প্রথম দু'কিস্তিতে ধরাশায়ী করেছে। এবার তৃতীয় কিস্তির শুরু। তৃতীয় কিস্তির পূর্বে মল্লযোদ্ধাদের অলিম্পীয় ক্রীড়ার ন্যায় অলিম্পাসের ত্রাণকর্তা জিউসকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে হবে। গ্লকন, আমার মনে হয় আমি জ্ঞানীদের এরূপ বলতে শুনেছি যে জ্ঞানের সুখই হচ্ছে একমাত্র বিশুদ্ধ সুখ। অপর সকল সুখই হচ্ছে ভ্রম বা মায়া। এ-প্রশ্নের সমাধান এই তৃতীয় কিস্তিতে হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, এ-সমাধান এবার হয়ে যাওয়া সঙ্গত। কিন্তু সক্রেটিস, তুমি একটু ব্যাখ্যা করে বলো, তুমি কী বলতে চাচ্ছ।

অবশ্যই আমি বলব। কিন্তু তোমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

অবশ্যই আমি তা করব। তুমি প্রশ্ন করলেই আমি তাতে সাড়া দিব।

তা হলে গ্লকন, তুমি আমাকে বলো, সুখ কি দুঃখের বিপরীত নয়?

হ্যাঁ, সে খুবই বিপরীত।

কিন্তু এমন অবস্থা কি আমাদের হয় না, যেখানে আমরা সুখ কিংবা দুঃখ কোনোটাই বোধ করিনে?

হ্যাঁ, এরূপ অবস্থা আমাদের হতে পারে।

আমার মনে হয়, এ-অবস্থাটি সুখ এবং দুঃখের মধ্যবর্তী হবে। তাতে আমাদের মন উভয় অবস্থার উত্তেজনা থেকে বিরাম পাবে। তুমি কী বল?

হ্যাঁ, তোমার কথা আমি স্বীকার করি।

আমি বললাম ঃ আচ্ছা গ্লকন, তুমি কি জান অসুস্থ অবস্থায় রোগী কী বলতে থাকে?

না। কী সে বলতে থাকে?

রোগী তখন কেবল বলতে থাকে ঃ আহা! স্বাস্থ্যের চেয়ে সুখ নেই। কিন্তু অসুস্থ্ না হওয়া পর্যন্ত এই উপলব্ধিটি তার জন্মেনি।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

আবার এ কথাও কি তুমি শোননি, যে বেদনা বা যন্ত্রণায় বিদ্ধ হচ্ছে, সে বলছে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তির চেয়ে কোনো সুখ নেই?

হ্যাঁ, যন্ত্রণাকাতরের এরূপ উক্তি আমি শুনেছি।

এরকম আরও উদাহরণের উল্লেখ করা চলে, যেখানে আমরা দেখি, কোনো যন্ত্রণা যখন আমরা ভোগ করি তখন তা থেকে মুক্তিকেই আমরা পরম সুখ বলে গণ্য করি—অপর কোনো বস্তু বা বিষয়ের সুখভোগকে নয়।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, একথা ঠিক। এবং এর কারণ বোধহয় এই যে, এমন অবস্থায় যন্ত্রণা থেকে আরামই বড় সুখ বলে বোধ হয়।

তা হলে সুখভোগের যেখানে বিরাম বা শেষ, সেখানেই দুঃখ বা বেদনার শুরু?

তাও হতে পারে।

তা-ই যদি হয় তা হলে 'বিরাম'—যাকে আমরা সুখ এবং দুঃখের মধ্যবর্তী বলেছি, সে-সুখও যেমন, দুঃখও তেমন?

সাধারণভাবে তা-ই মনে হয়।

কিন্তু যে-বস্তু এটাও নয়, ওটাও নয়, সে দুটোই হতে পারে?

না, তেমন হতে পারে বলে আমি মনে করিনে।

তা ছাড়াও যেটা সত্য সে হচ্ছে সুখ এবং দুঃখ—এ দুটোই হচ্ছে মনের ব্যাপার। আত্মার ব্যাপার। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু আমরা কি এইমাত্র বলিনি, সুখ কিংবা দুঃখ কোনোটা বোধ না করা হচ্ছে মনের একটা বিরামের অবস্থা?

হ্যাঁ, আমরা তা বলেছি।

তা হলে একথা বলা কি আমাদের ঠিক হবে যে, দুঃখের অভাব হচ্ছে সুখ কিংবা সুখের অভাব দুঃখ?

না। এরূপ মনে করা আমাদের ঠিক হবে না।

তা হলে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এরূপ হতে পারে না। বিরামের অবস্থাকে আমরা সুখ বলি, ইতিপূর্বে যে-দুঃখ আমরা ভোগ করেছি তার সঙ্গে তুলনাক্রমেই। কিংবা বিরামকে আবার দুঃখ বলি, আমাদের যে-সুখ গত হয়েছে তার সঙ্গে তুলনাক্রমে। কিন্তু যথার্থ সুখের পরিমাপে এর কোনো অভিজ্ঞতা অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ থেকে বিরামের অভিজ্ঞতা, যথার্থ সুখ বা দুঃখের অভিজ্ঞতা বলে গণ্য হতে পারে না। এমন অবস্থা অভিজ্ঞতার একপ্রকার ভ্রম।

আমাদের যুক্তির তাৎপর্য এইরূপ বলেই বোধ হয়।

কিন্তু দুঃখের অভাবই সুখ এবং সুখের অভাব দুঃখ—এ-ধারণা যদি তোমার মনে এখনও থেকে থাকে তা হলে এসো, আমরা এমন কিছু সুখের বিচার করি যে-সুখের পূর্বে দুঃখ সংঘটিত হয়নি।

এমন সুখের দৃষ্টান্ত তুমি কোথায় পাবে? কী সে-সুখ?

এমন সুখ আছে। কিন্তু এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঘ্রাণের সুখ। এমন সুখ তীব্রভাবে আমরা বোধ করি। এ-সুখ হঠাৎ আসে কোনো দুঃখের পূর্বঅভিজ্ঞতা ছাড়াই। কিংবা এ-সুখ যখন চলে যায় তখনও পেছনে কোনো দুঃখ রেখে যায় না।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কাজেই একথা আমাদের বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, দুঃখের অভাবই হচ্ছে বিশুদ্ধ সুখ কিংবা বিশুদ্ধ দুঃখ হচ্ছে সুখের অভাব।

হ্যাঁ, একথা স্বীকার্য।

তা হলেও, যে-তীব্র সুখ আমরা দেহের মাধ্যমে বোধ করি তার বেশির ভাগই এই-ধরনের সুখ। দুঃখের অভাব থেকেই আমরা এদের অনুভব করি। যেমন, আহারের যে সুখ তা আমরা ক্ষুধার পরেই বোধ করি। ক্ষুধার অভাবেই আহারের সুখের অনুভব।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তেমনি যে-সমস্ত সুখ এবং দুঃখ আমরা কল্পনার ভিত্তিতে অনুভব করি তাদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য।

হ্যাঁ, তা বটে।

এদের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত সম্পর্কে আমি কী ভাবছি বলতে পার?

না। তুমি বলো।

আচ্ছা বেশ! কিন্তু তুমি কি একথা স্বীকার কর, যে-জগতের মধ্যে আমরা বাস করি তার একটা ঊর্ধ্বদেশ, অধঃদেশ এবং মধ্যদেশ আছে?

হ্যাঁ, একথা আমি স্বীকার করি।

তা-ই যদি হয় তা হলে, যে অধঃদেশ থেকে মধ্যদেশে উঠে আসে সে কি মনে করে না, সে উর্ধ্বদেশে আরোহণ করছে? আর এখান থেকে তার অধঃদেশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে কি মনে করবে না, সে যথার্থই উর্ধ্বদেশে অবস্থান করছে? কারণ যথার্থ উর্ধ্বদেশকে সে তো দেখেনি।

এ ছাড়া তার পক্ষে অপর কিছু মনে করা সম্ভব নয়।

এবার মনে করো, সে আবার অধঃদেশে গমন করল। এবার সে মনে করবে, সে অধঃদেশে গমন করছে। এবং এ-সিদ্ধান্ত তার যথার্থ।

হ্যাঁ, সে যথার্থই অধঃদেশে গমন করছে।

কিন্তু তার এই উর্ধ্ব, অধঃ এবং মধ্য সম্পর্কে সকল সিদ্ধান্তের ভিত্তি হচ্ছে অজ্ঞানতা। কারণ সে জানে না যথার্থ উর্ধ্ব, অধঃ কিংবা মধ্যদেশ কী।

হ্যাঁ, তার সিদ্ধান্তের ভিত্তি অবশ্যই অজ্ঞানতা।

তা-ই যদি হয়, তা হলে এতে কি বিস্ময়ের কিছু আছে যে, যারা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ তারা সুখ এবং দুঃখ এবং সুখ ও দুঃখের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ অবস্থা সম্পর্কে ভিত্তিহীন অভিমত পোষণ করবে? অনুরূপ অনেক বিষয় সম্পর্কেই তাদের ধারণা ভিত্তিহীন। তা-ই যখন তাদের উপর দুঃখ আসে, তখন তারা দুঃখভোগ করে। এবং এ-দুঃখ তাদের যথার্থ দুঃখ। কিন্তু আবার দুঃখ শেষ হয়ে যখন একটা দুঃখহীন অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন সেই দুঃখের অভাবটাকে সুখ বলে তারা বিশ্বাস করে। আসলে যথার্থ সুখের অজ্ঞতাই তাদের দুঃখ এবং দুঃখের অভাবের মধ্যে তুলনার মনোভাব সৃষ্টি করে। দুঃখকে তারা দুঃখের অভাবের সঙ্গে তুলনা করে, যেমনভাবে সাদাকে যে কখনো দেখেনি সে ধূসরকে সাদা বলে কালোর সঙ্গে তুলনা করে।

গ্লকন বললেন ঃ এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

বেশ, তা হলে একটা বিষয় বিচার করো। ক্ষুধা, তৃষ্ণা—এগুলি কি দেহের কোনো ক্ষয় বা অভাবসূচক নয়?

অবশ্যই।

তেমনি অজ্ঞতা এবং অন্তঃসারশূন্যতাও কি আত্মার অভাব বা ক্ষয়ের সূচক নয়?

নিশ্চয়ই।

এবং এ-ক্ষয়ের পূরণ দেহের ক্ষেত্রে ঘটে খাদ্য দ্বারা এবং আত্মার ক্ষেত্রে ঘটে জ্ঞান দ্বারা। ঠিক নয় কি?

অবশ্যই ঠিক।

তা হলে, যে অধিকতর সত্য তার ক্ষয়ের পূরণে কি আমরা, যে কম সত্য তার ক্ষয়ের পূরণের চেয়ে অধিকতর সুখ লাভ করিনে?

অবশ্যই।

তা হলে অধিকতর সত্য কী? রুটি, মাংস, পানীয়—অর্থাৎ খাদ্যসামগ্রী? কিংবা বিচার, বিবেচনা, বুদ্ধি এবং জ্ঞান এবং মনের অনুরূপ গুণাবলী? প্রশ্নটি তুমি এভাবেও করতে পার ঃ কে বেশি সত্য? যে অবিনশ্বরতার জগতে বাস করে এবং তার স্বভাব নিজের মধ্যে ধারণ করে সে, কিংবা মৃত্যু এবং পরিবর্তনের জগতে যে বাস করে এবং তার স্বভাব নিজের মধ্যে যে ধারণ করে সে?

যে অবিনশ্বরতার জগতে বাস করে সে অবশ্যই অধিক সত্য।

এবং সত্য এবং অবিনশ্বর সত্তা—উভয়েরই অনিবার্য স্বভাব কি জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে গঠিত নয়?

অবশ্যই।

কাজেই সত্যের পরিমাণ যেখানে কম, সত্তার পরিমাণও সেখানে কম নয় কি?

নিশ্চয়ই।

তা হলে যা দিয়ে আমরা দেহের প্রয়োজনকে পূরণ করি তার সত্যতা এবং যথার্থতা যা দিয়ে আমরা আত্মার অভাব পূরণ করি তার সত্যতা এবং যথার্থতার চেয়ে কম। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আত্মার সত্যতার চেয়ে অবশ্যই অনেক কম।

আত্মার তুলনায় দেহের ক্ষেত্রে একথা কি সমভাবেই সত্য নয়?

হ্যাঁ, সমভাবেই সত্য।

আবার অভাবপূরণের উপায়গুলি যত অধিক সত্য হবে এবং যত অধিক সত্য হবে সেই অভাবপূরণের লক্ষ্য, তত অধিক যথার্থ হবে সেই অভাবের তৃপ্তি।

একথা আমি স্বীকার করি, সক্রেটিস।

এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই একথাটি আসে, উপযুক্তভাবে অভাবের পূরণের ভিত্তিতে যদি আমরা আনন্দ বোধ করি তা হলে যত অধিক যথার্থ হবে আমাদের

অভাবের পূরণ এবং তার উৎস, তত অধিক যথার্থ হবে আমাদের তৃপ্তি এবং সুখ। আবার আমাদের অভাব এবং তার পুরণ যত কম যথার্থ হবে, তত কম হবে তার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সুখ।

হ্যাঁ, এ তো অনিবার্য।

তা হলে যাদের জ্ঞানের এবং উত্তমের অভিজ্ঞতা নেই, যারা কোনো কর্তব্যসাধন না করে মিথ্যা সময় ক্ষেপণ করে, তারা আমাদের এ-দৃষ্টান্তের অধঃদেশ এবং মধ্যদেশের মধ্যেই কেবল বিচরণ করতে পারে। যথার্থ উর্ধ্বদেশে আরোহণ করা এবং যথার্থ তৃপ্তি বা বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাদের আমরা তুলনা করতে পারি চারণক্ষেত্রে মেষশাবকের সঙ্গে। তাদের মুখ খাদ্যের মধ্যে। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ চারণভূমির দিকে। খাদ্য দ্বারা তাদের উদরকে তারা পূর্ণ করে এবং জৈবিক আবেগে প্রজননকার্য সাধন করে। তবু তারা অতৃপ্ত। অধিকতর খাদ্যের লোভে তারা পরস্পর পরস্পরকে তাদের লৌহআবৃত খুর এবং শৃঙ্গ দ্বারা আঘাত করে এবং তারা পরস্পরকে হত্যা করে। তারা অতৃপ্ত। তারা অসুখী। তাদের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তাদের সত্তার যেটা অলীক অংশ, এবং সে-কারণেই যার তৃপ্তির কোনো শেষ নেই, তাকেই তারা তৃপ্ত করতে চাচ্ছে।

প্রিয় সক্রেটিস, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি জনতার জীবনের উপর উপদেশবাণী বর্ষণ করছ।

তা হোক, গ্লকন। কিন্তু এদের এই যে সুখ, এ কি অসুখের সঙ্গে মিশ্রিত নয়? এ কি যথার্থ সুখের ছায়ামাত্র নয়? এগুলির তীব্রতার সৃষ্টি হয় তুলনা থেকে এবং এরা মূর্খের মনে উন্মত্ত কামনার সঞ্চার করে। এদের সম্পর্কে স্টেসিকোরাসের বর্ণনা সত্য। স্টেসিকোরাস বর্ণনা করেছেন, ট্রয়ের প্রান্তরে কেমন করে 'বীর' যোদ্ধাগণ হেলেনের একটি প্রতিকৃতির উপর মূর্খের মতো পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল।[১]

---

১. নাট্যকার ইউরিপাইডিস (৪৮০—৪০৭ খ্রিঃ পূঃ) রচিত 'হেলেন'-এর কাহিনীতে এরূপ বর্ণনা আছে যে, হেলেন আসলে অপহৃত হয়নি, দেবী হেরা ট্রয়ের রাজপুত্র প্যারিসকে হেলেনের একটি প্রতিকৃতি দিয়েছিল—যথার্থ হেলেনকে নয়। এই প্রতিকৃতি বা উপচ্ছায়াকে প্যারিস যথার্থ হেলেন ভেবেছে এবং গ্রীকবাসীগণ তাকে অপহৃত মনে করেছে এবং এ-ভ্রমের ভিত্তিতে পরস্পর যুদ্ধ করেছে। কিন্তু হেলেন তখন মিশরে তার স্বামী মেলেনাসের প্রতীক্ষায় দিনযাপন করছিল।

এইচ. ডি.পি লী'র অনুবাদ পৃঃ ৩৬২।

হ্যাঁ, এদের ক্ষেত্রেও এটি অনিবার্য।

তা হলে মানুষের চরিত্রের তেজ বা বিক্রম বা সাহস সম্পর্কে আমরা কী বলব? এখানেও সেই একই কথা কি অনিবার্যভাবে সত্য নয়? কারণ, কেউ যখন যুক্তিহীনভাবে সম্মান, সাফল্য বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে ছুটে চলে এবং এদের অতৃপ্তির কারণে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা, ক্রোধ এবং জিঘাংসায় পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তার ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, এখানেও অনিবার্যভাবে সেই কথা সত্য হয়ে দাঁড়ায়।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, আমরা তা হলে এবার সিদ্ধান্ত করতে পারি, আমাদের লাভের কামনা এবং উচ্চাভিলাষ যদি জ্ঞান এবং যুক্তির নির্দেশ পালন করে এবং যদি তারা এমন আনন্দ ভোগ করতে চায়, যে-আনন্দে জ্ঞানের অনুমোদন রয়েছে, তা হলে যে-আনন্দ তারা লাভে সক্ষম হবে সে-আনন্দ যথার্থ আনন্দ হবে। তাদের উপযুক্ত আনন্দ হবে। কারণ, সত্য তাদের সহায় এবং যার যা উপযুক্ত তা-ই হচ্ছে তার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট।

হ্যাঁ, একথা অবশ্য সত্য।

তা হলে, আত্মার মধ্যে যদি কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে এবং যদি সে দর্শনকে অনুসরণ করে তা হলে আত্মার যে-উপাদানের যা করণীয় সে তা-ই করতে থাকবে এবং যার উপযুক্ত যে-সুখ, সে-সুখ সে লাভ করতে সক্ষম হবে। এবং তখন এ-সুখই তার জন্য উপযুক্ত এবং সর্বোত্তম বলে গণ্য হবে।

নিঃসন্দেহে এ কথা সত্য।

কিন্তু দর্শন বা জ্ঞান না হয়ে অপর দুটি উপাদানের কেউ যদি আত্মার শাসক হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে এই শাসক যেমন নিজের উপযুক্ত সুখকে লাভ করতে সক্ষম হবে না, তেমনি সে অপর দুটি উপাদানকে সেই সুখের অন্বেষণে ছুটতে বাধ্য করবে, যে-সুখ তাদের কারোর জন্য উপযুক্ত এবং উত্তম নয়।

যথার্থ।

এবং এমন অবস্থার উদ্ভব তো সেই উপাদানের কারণেই ঘটবে, যে-উপাদানের অবস্থান হচ্ছে জ্ঞান থেকে সর্বাধিক দূরত্বে?

অবশ্যই।

এবং যার অবস্থান জ্ঞান থেকে সর্বাধিক দূরত্বে, সে কি নিয়ম এবং শৃঙ্খলা থেকেও সর্বাধিক দূরত্বেই অবস্থিত নয়?

নিঃসন্দেহে।

এবং আমরা তো পূর্বেই বলেছি, উন্মত্ত এবং স্বৈরাচারী ইচ্ছার অবস্থান হচ্ছে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা থেকে সর্বাধিক দূরত্বে এবং যুক্তিগত এবং নিয়মগত ইচ্ছার অবস্থান হচ্ছে সর্বাধিক নৈকট্যে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা তা বলেছি।

তা হলে আমরা বলব, যে স্বৈরাচারী তার অবস্থান মানুষের যথার্থ এবং উপযুক্ত সুখ থেকে সর্বাধিক দূরত্বে এবং যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক, সে সবচেয়ে অসুখী জীবনযাপন করে। দার্শনিক-শাসক সবচেয়ে সুখী জীবন যাপন করে।

অনিবার্যভাবেই এ-সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করতে হয়।

কিন্তু গ্লকন, তুমি কি জান, দার্শনিক-শাসকের চেয়ে স্বৈরতান্ত্রিক শাসক কত অধিক পরিমাণে অসুখী।

না। পরিমাণের কথাটি তুমি বলো।

আমি বললাম : আমরা তো দেখেছি, সুখের প্রকার হচ্ছে তিনটি : এক প্রকার সুখ হচ্ছে যথার্থ সুখ। অপর দুই প্রকার হচ্ছে অলীক সুখ। যে স্বৈরাচারী, সে বিধান এবং যুক্তিকে বর্জন করে এই অলীক সুখকেও অতিক্রম করে যায়। একদল দাসবৎ প্রবৃত্তির দ্বারা সে নিজেকে সর্বদা পরিবেষ্টিত রাখে। তার এই অধঃপতন বর্ণনার অতীত। তার অবস্থানটি দেখতে চেষ্টা করলে তুমি বলতে পার, কতিপয়ী থেকে শুরু করে ধারাক্রমে স্বৈরতন্ত্রীর অবস্থান হচ্ছে তৃতীয়। গণতন্ত্রীর অবস্থান হচ্ছে এদের উভয়ের মধ্যস্থলে।

হ্যাঁ, তোমার একথা সত্য।

এবং আমাদের যুক্তি যথার্থ হলে, স্বৈরতন্ত্রীর সুখ কতিপয়ীর সুখের চেয়ে তিনগুণ অলীক।

ঠিক কথা।

আবার কতিপয়ীর অবস্থান হচ্ছে দার্শনিক-শাসক থেকে শুরু করে ধারাক্রমে তৃতীয়।

হ্যাঁ, তার অবস্থান দার্শনিক শাসক থেকে তৃতীয়।

তা হলে যথার্থ সুখ থেকে স্বৈরতন্ত্রীর সুখের দূরত্ব অঙ্কের হিসাবে দাঁড়াচ্ছে তিনের তিন বা ৩ × ৩?

হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

তা যদি হয় তা হলে, স্বৈরতন্ত্রীর অলীক সুখের দূরত্ব সাধারণ সংখ্যার হিসাবেও একটি অখণ্ড সংখ্যা?

অবশ্যই।

এবার তুমি সংখ্যাটির বর্গ করো এবং তার ফলকে ঘনফলে পরিণত করো। তা হলেই তুমি বুঝতে পারবে যথার্থ সুখ থেকে স্বৈরতন্ত্রীর সুখের দূরত্বের দৈর্ঘ্য কত।

সক্রেটিস, অঙ্কবিদের পক্ষে তোমার এ-দূরত্বের পরিমাণ বুঝতে অসুবিধে হবে না।

আবার বিপরীত ক্রমেও তুমি যদি ঘনফলটি তৈরি কর, তা হলেও তুমি দেখবে, এই দু-এর দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে এরূপ যে, দার্শনিক-শাসক স্বৈরতন্ত্রীর চেয়ে সাতশত ঊনত্রিশ গুণ অধিক সুখী এবং স্বৈরতন্ত্রী দার্শনিক-শাসকের চেয়ে সাতশত ঊনত্রিশ গুণ অধিক অসুখী।

গ্লকন বিস্ময়ের আর্তরব তুলে বললেন, ন্যায়বান আর অন্যায়ী—এদের উভয়ের জীবন এবং এদের সুখ এবং অসুখের ব্যবধান দেখাতে কী ভয়ংকর অঙ্কের হিসাবের কসরত, সক্রেটিস!

আমি বললাম ঃ তা বটে। কিন্তু হিসাবটি নির্ভুল। মানুষের জীবনে এটি ঠিক ঠিক মিলে যায়। কারণ মানুষের জীবনও আমরা দিন, রাত্রি, মাস এবং বর্ষের হিসাবে পরিমাপ করি।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে নির্ভুল।

এবং সুখের ক্ষেত্রে উত্তম এবং ন্যায়বান যদি অধম এবং অন্যায়ীর চেয়ে এত অধিক পরিমাণে শ্রেয়, তা হলে নীতির সৌন্দর্য এবং মূল্যের ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব যে সীমাহীন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গ্লকন বললেন ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই সে সীমাহীনভাবে শ্রেষ্ঠ।

আমি বললাম ঃ এতক্ষণ তো মঙ্গলমতোই কেটেছে। এ-পর্যন্ত যখন আমরা এসেছি তখন সেই গোড়ার কথাটি, যা থেকে আমাদের শুরু—তাকে আবার স্মরণ করা যাক। আমার মনে হয় কথাটা ছিল এই ঃ অন্যায় যদি ন্যায় বলে প্রতিভাত হতে পারে, তা হলে অন্যায়ীর সব অন্যায় হচ্ছে লাভজনক। অন্যায় কার্যেই লাভ অধিক।

হ্যাঁ, কথাটা এরূপই ছিল।

বেশ, এবার যখন আমরা ন্যায় এবং অন্যায়ের ফলাফল সম্পর্কে একমত হতে পেরেছি, তখন অভিমতটির প্রবক্তার সঙ্গে এখন কিছু আলাপ করা যাক। কী বল?

তাকে আমরা কী বলব?

আমরা মানুষের চরিত্রকে পুরনো উপাখ্যানের জন্তু যেমন, কিমেরা, সিলা, সারবিরাসের[১] সঙ্গে তুলনা করে তার কথার তাৎপর্যটি দেখিয়ে দেব।

হ্যাঁ, আমি এই কাহিনীগুলি জানি।

গ্লকন, বেশ জটিল বহুমাথাবিশিষ্ট একটা জন্তুর তুমি কল্পনা করো। এ-জন্তুর যেমন বুনো মাথা আছে, তেমনি পোষা মাথা আছে। জন্তুটার মস্তকদেশ এইগুলি দিয়ে গঠিত। আর তার কী অদ্ভুত ক্ষমতা যে, সে ইচ্ছামতো এগুলোকে হিংস্র কিংবা বাধ্য স্বভাবে পরিণত করে ফেলতে পারে।

গ্লকন বললেন : এমন জন্তু তৈরিতে কারিগরি আছে; যাহোক আমাদের পক্ষে কল্পনা করা, একে তৈরি করার চেয়ে সহজতর।

এবার তুমি একটি সিংহের কল্পনা করো। সিংহের পরে একজন মানুষকে কল্পনা করো। বহুমাথা জন্তুর আকৃতি অবশ্যই প্রকাণ্ড। কিন্তু তার পরেই সিংহের আকার।

সক্রেটিস তুমি বলে যাও, আমি কল্পনা করছি। কল্পনা করা সহজ।

এবার এই তিন জন্তুকে মিলিয়ে তুমি একটা জন্তুতে পরিণত করো।

করে ফেলেছি, সক্রেটিস।

এবার গোটা জন্তুর উপর তিন জন্তুর এক জন্তুর, ধরো মানুষের বহিরাকার বসিয়ে দাও—যেন যে-দর্শকের পক্ষে বহিরাকার ভেদ করা সম্ভব হবে না সে যেন একে মানুষ বলেই গণ্য করে।

যো হুকুম সক্রেটিস। এটিও করা হয়েছে।

এবার তা হলে আমরা বলব, অন্যায়সাধনে লাভ এবং ন্যায়সাধনে লোকসান—এমন অভিমতের অর্থ দাঁড়ায়, এই বহুমাথা জন্তুকে যেমন ইচ্ছা

১. কিমেরা (Chimaera) : ছাগ, সিংহ এবং সর্প—তিন জন্তুর দেহবিশিষ্ট বিকটাকার দানব। গ্রীক উপাখ্যানে আছে কোরিন্থের রাজপুত্র বেলারোফন এই দানবকে তার পক্ষযুক্ত অশ্ব দ্বারা হত্যা করে।
সিলা (Scylla) : সামুদ্রিক দানব। ইংরেজিতে Scylla and Charybdis বলে একটি কথা আছে। 'চেরিবডিস' ছিল মেসিনা প্রণালীর একটি বিপজ্জনক আবর্ত। কথাটিতে উভয়সংকটের ভাব বিদ্যমান।
সারবিরাস (Cerberus) : তিনটি কিংবা পঞ্চাশটি মুণ্ডুবিশিষ্ট পাতালপুরীর দেবতা হেডিস-এর প্রহরী কুকুর।

তেমন করার স্বাধীনতা দেওয়া এবং এই জন্তুর এবং সিংহের চরিত্রকে শক্তিশালী করা, আর এর ভিতরের মানুষটিকে বুভুক্ষু ও অসহায় করে রাখা, যাতে পরিণামে এই জন্তুর দল দুর্বল মানুষটাকে নিয়ে যেমন খুশি তেমন করতে পারে। এ কথার অর্থ দাঁড়াবে, এই তিন শক্তির মধ্যে কোনো আপোস বা মিত্রতা স্থাপন না করা; বরঞ্চ তাদের পরস্পরকে দ্বন্দ্বমান, গর্জনকারী এবং পরস্পরকে ভক্ষণকারী অবস্থায় রেখে দেওয়া। ঠিক নয় কি?

অন্যায়কারী এবং অন্যায় কর্মকে সমর্থন করার অর্থ তা-ই দাঁড়ায়।

অপরদিকে ন্যায় সাধনেই লাভ—একথা বলার অর্থ হচ্ছে আমাদের সকল কথা এবং কাজ এমন হওয়া উচিত যাতে আমাদের অন্তরের মানুষটি শক্তিশালী হতে পারে, যেন সে বহুমাথা জন্তুটার দিকে কৃষকের ন্যায় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে পারে। কৃষক দেখবে, যেন আমাদের অন্তরের পোষা স্বভাবগুলি উৎসাহিত হতে পারে, যেন বন্য স্বভাবের বৃদ্ধি না ঘটে। সিংহকে বশ করে তার শক্তিকে সে সহায় করবে এবং সকলের স্বার্থরক্ষার্থে তার নিজের সঙ্গে অপর দুই বন্য শক্তির এবং দুই বন্য শক্তির পরস্পরের মধ্যে আপোস স্থাপন করবে।

একথাও সত্য। ন্যায়কে সমর্থন করার অর্থ তা-ই।

তা হলে অন্যায়ের প্রশংসা সর্বপ্রকারেই অন্যায় এবং ন্যায়ের প্রশংসা ন্যায়। কারণ তুমি তৃপ্তি, সুখ, সম্মান—যার কথাই ধর-না কেন, ন্যায়ের প্রশংসার অর্থ হচ্ছে সত্যকে প্রকাশ করা। অপরদিকে ন্যায়ের নিন্দা করার অর্থ হচ্ছে অজ্ঞতার প্রকাশ করা। তার অর্থ হচ্ছে, তুমি জান না তুমি কিসের সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত করছ।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

কিন্তু আমাদের প্রতিবাদীর প্রতি আমাদের সদয় আচরণ করা উচিত। কারণ, তার যে-ভ্রম সে তার ইচ্ছাকৃত ভ্রম নয়। আমরা তাকে উদ্দেশ করে বলব ঃ "প্রিয়বর, সাধারণ নীতির লক্ষ্যটি কী? যেটাকে আমরা সঙ্গত আচরণ বলে আখ্যায়িত করি তার উদ্দেশ্য তো আমাদের অন্তরের জন্তুকে আমাদের অন্তরের মানুষের বশ করা। কিংবা বলতে পারি, ঐশ্বরিক স্বভাবের অধীনে বন্যকে বশ করা। অপরদিকে অন্যায় কর্ম করার অর্থ আমাদের অন্তরের মানুষকে বন্যের দাসে পরিণত করা।" আমাদের একথার সঙ্গে তাকে অবশ্যই একমত হতে হবে। নয় কি?

হ্যাঁ, সক্রেটিস, সে আমার বাধ্য হলে কথাটি স্বীকার করবে।

তা হলে এই হিসাবে আমরা কি বলতে পারি, কেউ যদি অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জন করে এবং সে-উপার্জন যদি তার আত্মার উত্তমকে অধমে পরিণত করে তা হলেও সে-কর্ম তার জন্য লাভজনক? নিশ্চয়ই কেউ বলবে না যে, উচ্চ মূল্য পেলেই পুত্র কিংবা কন্যাকে দাস হিসাবে নিষ্ঠুর প্রভুর কাছে বিক্রি করে দেওয়া তার পক্ষে লাভজনক কর্ম। মূল্য যতই উচ্চ হোক, এমন কথা সে বলতে পারে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি আপন চরিত্রের যেটি দেবোপম অংশ তাকে নিষ্ঠুর দানবের দাসে পরিণত করে, তা হলে তাকে আমরা কোনো লাভজনক কর্ম বলতে পারিনে। এ হচ্ছে এক মর্মান্তিক লেনদেন। এ ফল এরিফাইল-এর সেই কাহিনীর চেয়েও কি মারাত্মক নয়, যেখানে এরিফাইল তার একটি কণ্ঠহারের জন্য নিজের স্বামীর জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছিল?

আমাদের প্রতিবাদীর পক্ষ হয়ে আমি বলব, অবশ্যই এ-কাজ তার চেয়েও মারাত্মক।

আত্ম-অসংযমকে সর্বদা নিন্দা করা হয় কেন? সে কি এই কারণে নয় যে, অসংযম আমাদের ভিতরের সেই বহুআকৃতির দানবকে বল্গাহীন করে দেয়?

অবশ্যই।

এবং গোঁড়ামি এবং রূঢ় মেজাজকেও নিন্দা করা হয়, কারণ, আমাদের চরিত্রের এই উপাদান আমাদের অন্তরের সিংহ এবং ড্রাগনকে অমিততেজি করে তোলে। আবার চরিত্রের বিলাসিতা এবং নারীসুলভ নমনীয়তার আধিক্য আমাদের তেজকে নির্বাপিত করে আমাদেরকে কাপুরুষে পরিণত করে। একথাও কি ঠিক নয়?

হ্যাঁ, একথাও ঠিক।

তেমনি, আমরা তোষামোদ এবং হীনমন্যতার নিন্দা করি, কারণ এরা আমাদের চরিত্রের সাহসকে জন্তুর হিংস্রতার অধীন করে ফেলে। পরিণামে এই হিংস্র জন্তু তার লোভ এবং অর্থগৃধ্নু প্রবৃত্তির তৃপ্তির জন্য আমাদের অন্তরের সিংহকে সকল অমর্যাদাকে সহ্য করার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাকে অনুকারী বানরে পরিণত করে।

যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

এবং দৈহিক শ্রমের আমরা নিন্দা করি কেন? এর কারণ কি এই নয় যে, এরূপ শ্রম আমাদের চরিত্রের উত্তমাংশের একটা দুর্বলতাকে প্রকাশ করে? আমাদের চরিত্র যখন তার পাশব অংশকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সে দৈহিক শ্রমের মাধ্যমে তাকে সেবা করে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে।

হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।

এবং যাতে এই স্বভাবের মানুষও উত্তম চরিত্রের মানুষের ন্যায় একই নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকে সেজন্য আমরা বলেছিলাম, মানুষের পাশব দিককে উত্তম দিকের অধীন হতে হবে। এ-নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য থ্র্যাসিমেকাস যেমন মনে করেছেন তেমন নয়। কারণ, জ্ঞানের অধীন থাকা সকল মানুষের জন্যই মঙ্গলকর। কিন্তু জ্ঞান এবং নিয়ন্ত্রণ যদি ব্যক্তির আপন অন্তর থেকে আসে তবে অধিকতর মঙ্গল। কিন্তু অন্তর থেকে যদি এ-নিয়ন্ত্রণ না আসে, তবে বাইরে থেকেই ব্যক্তির উপর তাকে আরোপ করতে হবে, যেন সকল মানুষ একই নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহোদর এবং সমান জনের আচরণ করতে পারে।

এ তো অত্যন্ত সঙ্গত কথা।

আমাদের রাষ্ট্রে আইনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই। সকল নাগরিকেরই সে মঙ্গল কামনা করে। এই কারণেই আমরা শিশুদের নিয়ন্ত্রণ করি। তাদের অন্তরে স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত আমরা শিশুদের অবাধ স্বাধীনতা দান অমঙ্গলকর বিবেচনা করি। তাদের মধ্যে যা উত্তম তাকে আমরা শিক্ষিত করে তুলব, যেন আমাদের মধ্যে যা উত্তম তাকে তারা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

একথা অবশ্যই যথার্থ।

প্রিয় গ্লকন, তা হলে আমরা কেমন করে বলতে পারি, অন্যায়, অসংযম বা কোনো অধম আচরণ বা অধম কার্যসাধন হচ্ছে লাভজনক? এমন কার্য আমাদের সম্পদ দিতে পারে, শক্তি দিতে পারে, কিন্তু সে একই সঙ্গে আমাদের অধম মানুষে পর্যবসিত করে।

না, এমন কার্যকে আমরা লাভজনক বলতে পারিনে।

তা ছাড়া, যে অন্যায় কার্য সাধন করেছে, সে আইনের হাতে ধৃত না হয়ে যদি দণ্ডকে ফাঁকি দিতে পারে, তা হলে তাতে তার কি লাভ অর্জিত হতে পারে? দণ্ডকে ফাঁকি দিয়ে সে কি অধিকতর অধমে পর্যবসিত হয় না? অপরদিকে, সে যদি আইনের হাতে ধৃত হয় এবং দণ্ডিত হয়, তা হলে কি তার অন্তরের পশুই ধৃত এবং বাধ্য হয়ে ওঠে না? আর তার অন্তরের পশু যত বাধ্য হয়ে ওঠে, তার চরিত্রের উত্তম অংশ ঠিক তত মুক্তিলাভ করে না? এবং এর অর্থ কি এই নয় যে, এর মাধ্যমে তার চরিত্রের যে-স্বাভাবিক গুণ তা বিকাশলাভের সুযোগ পায়? ফলে তার এমন চরিত্র গঠিত হয়, যে-চরিত্রে ন্যায়পরায়ণতা এবং আত্মসংযমের সম্মিলন সংঘটিত হয়েছে। এটাই হচ্ছে তার যথার্থ লাভ। আত্মা যেমন দেহের

চেয়ে মূল্যবান, তেমনি এই লাভ দেহের শক্তি, স্বাস্থ্য এবং মনোহর শোভার চেয়ে অধিক মূল্যবান।

তোমার কথা নিশ্চিতই সত্য।

বুদ্ধিমান ব্যক্তির এই হবে জীবনের লক্ষ্য। সেই অধ্যয়ন এবং শিক্ষাকেই সে মূল্যবান বিবেচনা করবে যে-অধ্যয়ন এবং শিক্ষা তার আত্মা এবং চরিত্রকে উপযুক্তরূপে গঠিত করবে। স্বাস্থ্য এবং শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও তার চিন্তা কেবল পাশব এবং যুক্তিহীন আনন্দকে ভোগ করা হবে না। বস্তুত, স্বাস্থ্যই তার প্রধান লক্ষ্য নয়। আত্মসংযম যদি সঙ্গী না হয় তাহলে শক্তি, স্বাস্থ্য এবং মনোহারিতার কোনো মূল্য নেই। তা-ই আদর্শ চরিত্রকে সর্বদা দৈহিক সুখকে নীতি এবং যুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় রক্ষা করতে হবে।

হ্যাঁ, সত্যের সঙ্গে যদি তার সঙ্গতি রক্ষা করতে হয়, তা হলে তাকে বুদ্ধির সঙ্গে অবশ্যই দৈহিক সুখের সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে।

সম্পদের ক্ষেত্রেও কি তাকে এই একই সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে না? তা-ই সুখের সাধারণ প্রচলিত ধারণা দ্বারা তার বিভ্রান্ত হলে চলবে না। জনমতে বিভ্রান্ত হয়ে সম্পদের পাহাড় তৈরি করে নিজের জন্য সীমাহীন সংকট সৃষ্টি করা তার জন্য মঙ্গলকর হবে না।

আমিও তা-ই মনে করি, সক্রেটিস।

কারণ, তার ব্যয় কিংবা সঞ্চয়—সবই পরিচালিত হবে তার অন্তরের স্বশাসনের নীতির ভিত্তিতে। তার একমাত্র লক্ষ্য হবে, যেন তার এই নীতি সম্পদ কিংবা দারিদ্র্যের আধিক্যে বিপর্যস্ত হয়ে না যায়।

খুবই সত্য কথা।

সম্মান—সে ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয়—যা-ই হোক, উভয় ক্ষেত্রে উত্তমকে এই নীতিই অনুসরণ করতে হবে। যদি এরূপ সম্মান তাকে অধিকতর উত্তম করে, তবে সে তাকে গ্রহণ করবে এবং তাকে ভোগ করবে। যদি সে মনে করে এ-সম্মান তার অন্তরের শাসনকে বিনষ্ট করবে, তা হলে তাকে সে পরিহার করবে।

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, এই যদি তার লক্ষ্য হয় তা হলে সে অবশ্যই রাজনীতিতে প্রবেশ করবে না।

আমি বললাম ঃ কেন গ্লকন? অবশ্যই যে-রাষ্ট্র তার উপযুক্ত রাষ্ট্র তার রাজনীতিতে সে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু কেবল জন্মের কারণে যে-রাষ্ট্র তার,

সে-রাষ্ট্রের রাজনীতিতে সে অংশগ্রহণ করবে না। কেবল অভাবিত কোনো ঘটনাই তার এ-নীতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

তোমার কথাটি আমি বুঝতে পারছি, সক্রেটিস। তুমি বলতে চাচ্ছ, যে-রাষ্ট্রের আমরা বর্ণনা করছি এবং তত্ত্বগতভাবে যাকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করছি তার পরিচালনায় সে অংশগ্রহণ করবে। কিন্তু এমন আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তব জগতে কখনো অস্তিত্বময় হবে কি না তা-ই আমার সন্দেহ।

আমি বললাম ঃ তা হলেও আমাদের এই রাষ্ট্র আদর্শ হিসাবে স্বর্গে দীপ্যমান থাকবে। যারা তাকে প্রত্যক্ষ করার বাসনা পোষণ করবে, তারা তাকে অবশ্যই দেখতে পাবে এবং নিজেদের অন্তরে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু গ্লকন, সেটি বড় কথা নয়। আমাদের এই রাষ্ট্র কোথাও অস্তিত্বময় থাকুক, কোনোদিন সে অস্তিত্বময় হোক, কিংবা না হোক—এই হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র যার রাজনীতিতে যে উত্তম সে অংশগ্রহণ করতে পারে।

আমিও তা-ই মনে করি, সক্রেটিস।

দশম পুস্তক

অধ্যায় ঃ ২৫

[৫৯৫–৬২১]

দর্শন এবং কাব্যের বিরোধ

দশম অর্থাৎ শেষ পুস্তকের বক্তব্যের সঙ্গে নবম পুস্তকের বক্তব্যের কোনো যোগ দেখা যায় না। বস্তুত 'রিপাবলিক'-এর প্রতিপাদ্য বক্তব্য নবম পুস্তকেই সমাপ্ত হয়েছে, বলা চলে। দশম পুস্তক সে হিসাবে একটি সংযোজন বা পরিশিষ্ট। এর মূল বিষয় হচ্ছে জীবনের ক্ষেত্রে কাব্যের সর্বময় প্রভাবের দাবিকে অস্বীকার করা এবং তাকে হ্রাস করা। পরিশেষে সক্রেটিস এরের কাহিনী দ্বারা আত্মার অমরতা এবং আত্মার পুনর্জন্মের তত্ত্বটি উপস্থিত করেছেন। কাব্যের বিরুদ্ধে প্লেটোর যুক্তি অবশ্য দশম পুস্তকে আকস্মিক নয়। আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি কাব্যের এবং বিশেষ করে নাটক এবং নাট্যকারের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন (৩৯২-৩৯৮)। সেখানে সক্রেটিস বলেছেন, কাব্যকে আদর্শ রাষ্ট্রে অবাধ হতে দেওয়া চলবে না। কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কাব্যের বিরুদ্ধে প্লেটোর এই নিয়ন্ত্রণমূলক মনোভাবের কারণ বোধহয় এই যে, কাব্যকে তিনি দর্শনের প্রতিশক্তি হিসাবে দেখেছেন। এ-মনোভাবের একটি কারণ এই যে, দর্শন যেখানে যুক্তিনির্ভর, কাব্য সেখানে আবেগ এবং কল্পনানির্ভর। কাজেই যিনি তাত্ত্বিক নির্ভেজাল যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্র তৈরিতে সংকল্পবদ্ধ, তিনি আবেগের প্রভাবকে তাঁর রাজ্যে স্বাগত জানাবেন না। কিন্তু কাব্যকলার উপর প্লেটোর এরূপ তীব্র আক্রমণের কারণ কী? শুধু যে তিনি যুক্তির ভিত্তিতে আবেগকে অস্বীকার করছেন তা-ই নয়, কাব্যের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তির তীব্রতা অপর এক আবেগের রূপ ধারণ করেছে, বলা চলে। এর কারণ হিসাবে প্রাচীন গ্রীসে কাব্যের সর্বময় প্রভাবের উল্লেখ করা চলে। আধুনিক জীবনে, আমরা মনে করি, কাব্যের প্রভাব বিলীয়মান। কবির কথা গুরুত্বহীন। এমনকি বিদ্যালয়েও কবিদের হাজার হাজার ছত্র মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক নয়। গবেষকরা বলেন,

প্লেটোর কাল পর্যন্ত গ্রীসে কোনো ধর্মগ্রন্থের উদ্ভব হয়নি। কিন্তু তবু ধর্মগ্রন্থের মতো যদি কিছু সর্বদা আবৃত্ত হত, যদি কোনো গ্রন্থের শ্লোককে জীবনের যে-কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্ধৃত করা হত এবং শিক্ষাজীবনে যদি বাধ্যতামূলকভাবে কোনো পাঠ্য বিষয়কে মুখস্থ করতে হত, তা হোমারের কাব্য শ্লোক। জীবনের সর্বত্র কাব্যের এই 'ধর্মীয়' প্রভাবকে প্লেটো যুক্তির প্রতিশক্তি হিসাবে মনে করেছেন। দশম পুস্তকে কাব্যের ক্ষতিকর প্রভাবের পুনর্বার অধিকতর বিস্তারিত আলোচনার কারণ হয়তো এই যে, সংলাপের গোড়ার দিকে তাঁর কাব্যের সমালোচনা এথেন্সের বিদ্বজ্জন মহলে প্রতি-সমালোচনার সৃষ্টি করেছিল। তাই সংলাপের শেষে অধিকতর জোর এবং যুক্তির সঙ্গে প্লেটো তাঁর পূর্ব অভিমতকে যথার্থ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।[১] এবং এই প্রসঙ্গে তিনি মূল সত্তা এবং তার প্রকাশের পার্থক্যটি উপস্থিত করেছেন। জগতের যা-কিছু সৃষ্টি সব হচ্ছে মূলের প্রকাশ, মূল নয়। শয্যা আছে তিন রকম। ঈশ্বরের রচিত শয্যা। সূত্রধরের তৈরি শয্যা। এবং শিল্পীর অঙ্কিত শয্যা। বিধাতার তৈরি শয্যাই হচ্ছে মূল শয্যা। অপর সব শয্যা হচ্ছে এই শয্যারই কমবেশি প্রকাশ। তাই তারা অ-সত্য। অবশ্য তাদের অ-সত্যতার পরিমাণ নির্ভর করে মূল সত্তা থেকে তার কোন্ প্রকাশ কত দূরে অবস্থিত, তার ওপর। সূত্রধর, চিত্রশিল্পী, কবি বা নাট্যকার ঃ অর্থাৎ যেরূপ শিল্পীই হোক-না কেন—এরা সকলেই সত্তার প্রতিরূপ মাত্র সৃষ্টি করতে পারে, মূল সত্তাকে নয়। "তা হলে আমাদের এই কথাই মনে করতে হয় যে, হোমার থেকে শুরু করে কবিকুলের কারোরই সত্যের যথার্থ কোনো জ্ঞান নেই। যে-বিষয়ের তারা আলোচনা করে, তার অগভীর প্রতিরূপই মাত্র তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম" [৬০০]। তাই "বিষাদাত্মক কবি, যার শিল্পকৌশল হচ্ছে সত্যের প্রতিরূপ সৃষ্টি, তার অবস্থানও সত্য তেকে তিন প্রস্ত দূরত্বে। অপর সকল শিল্পী সম্পর্কেও একথা সত্য" [৫৯৭] দশম পুস্তকে উপস্থাপিত কাব্যকলা সম্পর্কে আলোচনাটিকে কোনো বিশেষ শিল্পতত্ত্ব হিসাবে বিবেচনা করা সঙ্গত হবে না। শিল্পের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা নয়, দর্শনের আসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্লেটোর মূলতত্ত্ব, ভাববাদকে সুদৃঢ় করার জন্যই কাব্য এবং শিল্পের এই নাকচমূলক আলোচনা।

---

১. কর্নফোর্ডকৃত রিপাবলিকের ইংরেজি অনুবাদ, পৃঃ ৩১৪।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই জান আমাদের আদর্শ রাষ্ট্রের উত্তম গুণের মধ্যে যাকে আমি সর্বোত্তম বলে গণ্য করি, সে হচ্ছে তার কাব্যের নীতি।

কিন্তু কেন সক্রেটিস?

কারণ, আমাদের রাষ্ট্রের বিধান এখানে সুস্পষ্ট। সকল নাটকীয় সৃষ্টিকে আমাদের রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আত্মার বিভিন্ন ভাগকে আমরা চিহ্নিত করেছি। এবার আমরা পূর্বের চেয়েও স্পষ্টরূপে এই বিধানের উপযোগিতাটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

তুমি কী বলতে চাচ্ছ, সক্রেটিস।

তোমাকে একান্তে একটি কথা বলছি। তুমি বিষাদাত্মক এবং অন্য প্রকৃতির নাট্যকারদেরকে কথাটি বোলো না। আসলে আমরা যদি শ্রোতাদের মনে এই নাট্যকারদের সৃষ্টির যথার্থ প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি তৈরি না করি তা হলে এদের সৃষ্টি শ্রোতাদের মনকে নিশ্চিতই বিভ্রান্ত করবে।

কিন্তু তুমি সঠিকভাবে কী বলতে চাচ্ছ?

অবশ্য তোমাকে আমার আর-একটি কথা বলতে হয়। কিন্তু আমার শৈশবকাল হতে হোমারের প্রতি যে-ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা আমি পোষণ করে এসেছি তাতে কথাটি প্রকাশ করতে আমি দ্বিধা বোধ করছি। কারণ, আমার মতে সকল বিষাদাত্মক কবির গুরু হচ্ছেন হোমার। তিনি হচ্ছেন অপর সকলের শিক্ষাদাতা পথপ্রদর্শক। কিন্তু সত্যের চেয়ে কি ব্যক্তি বড়? সত্যের চেয়ে ব্যক্তিকে আমরা অধিক সম্মান দেখাতে পারিনে। কাজেই তোমার কাছে কথাটি আমার বলতেই হবে।

কথাটি তুমি বলো, সক্রেটিস।

বেশ, তা হলে তুমি শ্রবণ করো। না, বরঞ্চ তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

জিজ্ঞেস করতে শুরু করো।

আচ্ছা গ্লকন, প্রতি-সৃষ্টির কোনো সংজ্ঞা দিতে পার? আমি নিজে জানিনে প্রতিসৃষ্টি যথার্থই কী।

তুমি না জানলে আমারও জানার আশা কম।

না, যথার্থই আমি জানিনে। বস্তুত, নিকটদৃষ্টি অনেক সময়ে দূরদৃষ্টির চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়। ঠিক নয় কি?

গ্লকন বললেন : তা হয় বইকী। কিন্তু তুমি উপস্থিত থাকতে আমার কিছু বলা সঙ্গত নয়। সক্রেটিস, তোমার নিজের দৃষ্টির উপরই তোমার নির্ভর করতে হবে।

তা হলে, এসো আমরা শুরু করি। কিন্তু অন্য বিষয়ে যেখান থেকে আমরা সর্বদা শুরু করি এ-বিষয়েও কি আমরা সেখান থেকে শুরু করব? তুমি তো জান, আমরা সর্বদা একটি সত্যকে ধরে নিয়েছি যে, প্রত্যেক প্রকার বস্তুর পেছনে তার অনুরূপ একটি মূল সত্তার অস্তিত্ব আছে। এই বস্তুর যা নাম সেই একই নামে আমরা তার সত্তাকেও অভিহিত করি। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা আমি জানি।

বেশ, একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। যেমন শয্যা এবং টেবিল; জগতে বিশেষ শয্যা এবং বিশেষ টেবিলের সংখ্যা অনেক আছে।

তা আছে।

কিন্তু এদের মূল সত্তা দুটি। একটি হচ্ছে 'শয্যা', অপরটি হচ্ছে 'টেবিল'।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তা ছাড়া একথাও আমরা সাধারণত বলি যে, কোনো সূত্রধর অর্থাৎ এই সকল গৃহসামগ্রীর যে তৈরিকারক, তৈরির ক্ষেত্রে তার দৃষ্টি থাকে, যে-দ্রব্যটি সে তৈরি করবে তার মূল সত্তার দিকে। সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কারণ, কোনো দ্রব্যের মূল সত্তাকে কেউ তৈরি করতে পারে না। তুমি কী বল? কেউ কি তা পারে?

না, তা পারে না।

বেশ ধরো, এমন একজন মানুষ আছে, সে সকলরকম কারিগরের তৈরি দ্রব্যই তৈরি করতে পারে। একে তুমি কী বলবে?

তাকে আমরা বিস্ময়কররূপে দক্ষ লোক বলব।

বেশ, এবার একটু থামো। তোমার জন্য অধিকতর বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। কারণ, যে-কারিগরের কথা বললাম, তার দক্ষতা কেবল কৃত্রিম দ্রব্যসামগ্রী সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়। সে উদ্ভিদজগতের সকল উদ্ভিদ, পশু এবং নিজেকেও যে সৃষ্টি করতে পারে তা-ই নয়, অধিকন্তু এই পৃথিবী, আকাশ, দেবতাকুল, ঊর্ধ্ব এবং অধঃলোকের বস্তুপুঞ্জ—সব সৃষ্টিরই সে কারিগর।

এ-দক্ষতা অবশ্যই বিস্ময়ের বিস্ময়!

আমি জানি তুমি আমায় বিশ্বাস করছ না গ্লকন। কিন্তু তুমি বলো, তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর না, এরূপ শিল্পী একজন থাকতে পারে? এবং সে উল্লিখিতভাবে কিংবা অন্যভাবে এই সবকিছুর সৃষ্টি করতে সক্ষম? এক অর্থে কিন্তু তুমি নিজেও এই সবকিছুকে সৃষ্টি করতে পারে।

কী অর্থে?

খুব যে কঠিন, এমন নয়। বস্তুত বিভিন্ন উপায়ে দ্রুতই করা যায়। এবং দ্রুততম উপায়টি হচ্ছে একটি আরশি নিয়ে তোমার চারদিকে একবার ঘুরিয়ে আনা। মুহূর্তমধ্যে তুমি দেখতে পাবে সূর্য, তারকারাজি, পৃথিবী, তোমার নিজেকে, সকল পশু, উদ্ভিদাদি— এবং আর যা-কিছুর আমরা উল্লেখ করেছি তার সবকিছু তুমি সষ্টি করে ফেলেছ।

হ্যাঁ, তা আমি পারব বটে। কিন্তু সেগুলি তো প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেগুলি তো যথার্থ বস্তু নয়।

আমি বললাম ঃ খুবই ঠিক কথা। তুমি ধরেছ ঠিকই। আমি বলব, একজন চিত্রশিল্পী ঠিক এই ধরনেরই একজন কারিগর। তুমি কি একথা স্বীকার কর?

হ্যাঁ, আমি একথা স্বীকার করি।

তোমার আপত্তি হবে, শিল্পী যে-বস্তু তৈরি করবে তা সত্যকার বস্তু নয়। তবু একটা অর্থে শিল্পী একটি শয্যা অবশ্যই তৈরি করে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, সে তৈরি করে—কিন্তু তার সে-শয্যা তো যথার্থ শয্যার একটি দৃশ্য বা প্রকাশমাত্র।

হ্যাঁ, কিন্তু সূত্রধর সম্পর্কেও কি তুমি বলনি যে সূত্রধর যা তৈরি করে তা শয্যার মূল সত্তা নয়, তার অন্তরসত্তা নয়, একটি বিশেষ শয্যাকেই সে তৈরি করে?

হ্যাঁ, একথা আমি বলেছিলাম।

তা হলে যা সে তৈরি করে তা মূল সত্তা নয়। সে সৃষ্টি করে এমন কিছু, মূল সত্তার সঙ্গে যার সাদৃশ্য আছে। কাজেই কেউ যদি বলে, সূত্রধর কিংবা অপর কোনো কারিগর যা তৈরি করে তা হচ্ছে মূল সত্তা বা চরম সত্তা, তা হলে সে নিশ্চয়ই সত্য কথা বলবে না। তুমি কী বল?

যে আমাদের যুক্তির সঙ্গে পরিচিত সে নিশ্চয়ই এরূপ কথা বলতে পারবে না।

কাজেই সূত্রধরের শয্যায় মূল সত্তার যদি কিছু ঘাটতি পড়ে, তাতে আমাদের বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

তা হলে এই দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে আমরা কি এবার প্রতিসৃষ্টির সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করব?

হ্যাঁ, এবার তুমি সংজ্ঞাটি দাও।

আমরা দেখেছি, শয্যা তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম হচ্ছে মূল শয্যা। এ হচ্ছে সকল শয্যার মূল সত্তা। একে কেউ যদি তৈরি করে থাকে সে একমাত্র বিধাতা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূত্রধরের তৈরি শয্যা। এবং তৃতীয়টি হচ্ছে চিত্রশিল্পীর 'শয্যা'।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তা হলে আমরা বলতে পারি একই শয্যার পেছনে তিনজন স্রষ্টা রয়েছে ঃ সূত্রধর, বিধাতা এবং শিল্পী।

হ্যাঁ, তা-ই তো রয়েছে দেখছি।

এর মধ্যে বিধাতা শয্যার কেবল মূল সত্ত তৈরি করে দিয়েছেন। এর কারণ হয়তো এই যে, তিনি শয্যার এই সত্যটিই তৈরি করতে চেয়েছেন কিংবা কর্মব্যস্ততার জন্য তিনি শয্যার অপর কোনো সত্তা তৈরির সময় পাননি। মোট কথা বিধাতা শয্যার একটি সত্তাই তৈরি করেছেন, এর একাধিক রূপ তিনি তৈরি করতে পারেননি।

কিন্তু কেন তিনি পারলেন না?

কারণ, তিনি যদি দুটি সত্তাও তৈরি করতেন, তা হলেও সে-দুটির মধ্যে চারিত্রিক মিল থাকত এবং এই দুটি সদৃশ সত্তাই মূল হিসাবে পরিগণিত হত।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

আমার মনে হয় বিধাতা এ কথাটি জানতেন। এবং তিনি সূত্রধরের ন্যায় একটি বিশেষ শয্যা তৈরি না করে সত্যকার মূল শয্যা তৈরি করতে চেয়েছিলেন বলেই তাকে তিনি দ্বিতীয় কোনো মূল শয্যার সদৃশ না করে একটিমাত্র অনন্য মূল শয্যা তৈরি করেছেন।

তা-ই হবে, সক্রেটিস।

তা হলে আমরা কি তাকে বস্তুর সত্তার স্রষ্টা কিংবা অনুরূপ অপর কোনো নামে অভিহিত করতে পারিনে?

আমরা সঙ্গতভাবেই তাঁকে এই বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ তাঁর সকল সৃষ্টিই হচ্ছে সকল মূল সত্তার সৃষ্টি।

বেশ। তা হলে সূত্রধরের বিষয়ে আমরা কী বলব? সূত্রধরও তো শয্যা তৈরি করে?

হ্যাঁ, সেও শয্যা তৈরি করে।

এবং শিল্পী সম্পর্কে আমরা কী বলব? সেও কি শয্যা তৈরি করে?

না, সে তৈরি করে না।

তা হলে সে কী করে?

আমরা বলতে পারি অপর দুজন যে-শয্যা তৈরি করে শিল্পী তাকে প্রকাশ করে।

উত্তম কথা। তা হলে শিল্পীর প্রকাশ, সত্য থেকে তিন প্রস্ত তফাতে অবস্থিত?

হ্যাঁ, তিন প্রস্ত তফাতে তার অবস্থান।

তা হলে বিষাদাত্মক কবি, যার কৌশল হচ্ছে সত্যের প্রতিসৃষ্টি রচনা করা, তার অবস্থানও সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরত্বে। অপর সকল শিল্পী সম্পর্কেও একথা সত্য। ঠিক নয় কি?

তা-ই তো মনে হচ্ছে, সক্রেটিস।

তা হলে প্রতিসৃষ্টি সম্পর্কে আমরা একমত। কিন্তু গ্লকন তুমি বলো, শিল্পী কোন্ সৃষ্টিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে? সে কি বস্তুর মূল সত্তাকে প্রকাশ করে কিংবা কারিগর যা সৃষ্টি করে তারই প্রতিরূপ সে তৈরি করে?

কারিগর যা তৈরি করে তারই প্রতিরূপ সে সৃষ্টি করে।

কিন্তু শিল্পী কারিগরের সৃষ্টি যেমন আছে তেমন তৈরি করে কিংবা সে সৃষ্টির বহিঃরূপটিকে প্রকাশ করে? এ-পার্থক্যটি স্থির করা আমাদের এখনও বাকি রয়েছে।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছিনে, সক্রেটিস।

আমি বলতে চাচ্ছি ঃ তুমি যদি একটি শয্যা কিংবা অপর কোনো বস্তুকে তার পার্শ্বদেশ, প্রান্তদেশ কিংবা কোনো কৌণিক অবস্থান থেকে দেখ তাতে কি শয্যাটির চরিত্রের কোনো পরিবর্তন ঘটবে? না, বিভিন্ন অবস্থান থেকে বস্তুটি কেবল বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হবে?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস। একই শয্যা কিন্তু সে বিভিন্ন রূপে দৃষ্ট হবে।

তা হলে শিল্পীর সম্পর্কে কী বলবে? শিল্পী কি শয্যাটি কিংবা অপর কোনো বস্তু যেমন আছে তেমন তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে? না, এ-সকল বস্তু যেমন দৃষ্ট হয় তেমন তাকে সে প্রকাশ করে? না যেমন সে দেখায় তেমন তাকে প্রকাশ করে?

বস্তুটি যেমন দেখায়, তেমন প্রকাশ করে।

তা হলে শিল্পীর প্রকাশ সত্য থেকে বহুদূরে অবস্থিত। এবং শিল্পী যে যে-কোনো বস্তুরই প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারে, তার কারণ তার দৃষ্টি বস্তুর বাহ্যরূপকে ভেদ করে কখনো তার অন্তসত্তায় পৌঁছে না। যেমন ধরো, একজন শিল্পী, একজন পাদুকা প্রস্তুতকারক,একজন সূত্রধর কিংবা অপর যে-কোনো কারিগরেরই প্রতিকৃতি এদের শিল্প-নৈপুণ্যের কোনো জ্ঞান ব্যতিরেকেই অঙ্কন করতে পারে। কিন্তু তবু এই চিত্রশিল্পী যদি দক্ষ হয় তা হলে কিছুটা দূরত্ব থেকে শিশুদের নিকট কিংবা সকল মানুষের কাছে তার অঙ্কিত প্রতিকৃতি যথার্থ সূত্রধর বলেই বোধ হবে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, প্রতিকৃতিটি যথার্থ সূত্রধর বলে বোধ হতে পারে।

তা হলে এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক হওয়া সঙ্গত। তাই, যদি কেউ আমাদের বলে যে, সর্বক্ষেত্রে নিপুণ কারিগরের সে সাক্ষাৎ পেয়েছে, সকল জ্ঞানীর চেয়েই এর জ্ঞান অধিক, তা হলে আমরা তাকে বলব মূর্খের মত আচরণ করা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। হাতুড়ের হাতে প্রতারিত হওয়া তার উচিত নয়। হাতুড়ে তার কাছে সর্বজ্ঞ বলে বোধহচ্ছে, কারণ সে নিজে জ্ঞান এবং অজ্ঞতা, এবং প্রতিরূপের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবনে অক্ষম।

খুবই যথার্থ।

এবার তা হলে আমাদের বিষাদাত্মক কবি এবং তাদের গুরু হোমারের দাবি পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক। তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়, তাঁরা নাকি সকল নৈপুণ্যে দক্ষ। তাঁরা ধর্ম এবং নীতির ক্ষেত্রেও সর্বজ্ঞ। কারণ কবিদের সমর্থকরা বলেন, একজন উৎকৃষ্ট কবিকে কোনো বিষয়ে উত্তম রচনার জন্য তাকে সে-বিষয়ের সবকিছুই জানতে হয়। যাঁরা এই কবিদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যাঁরা এঁদের রচনা পাঠ করেছেন আমরা তাঁদের জিজ্ঞেস করব তাঁরা কি একটি বিষয় লক্ষ করেননি যে, কবিদের এই সৃষ্টি সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরে অবস্থিত ঃ এরা

সত্যের ছায়ামাত্র, সত্য নয় এবং এ-কারণে সত্যের জ্ঞান ব্যতীত এদের সৃষ্টি করা কবিদের পক্ষে সহজ হয়েছে? অথবা আমরা বলব যে, তাদের কথাই সত্য এবং জনসাধারণ যেমন তাদের উত্তম কথক মনে করে তেমনি উত্তম কবিগণ তাদের রচনার বিষয় সম্পর্কে যথার্থই জ্ঞানী?

সক্রেটিস, বিষয়টি আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

আচ্ছা বেশ, ধরো কেউ কোনো সৃষ্টির মূল এবং তার প্রতিরূপ—উভয়কে জানে। তা হলেও কি সে প্রতিরূপ সৃষ্টিতেই নিজেকে নিয়োজিত করবে এবং জীবনের চরম লক্ষ্যে পরিণত করবে?

না, আমি তা মনে করিনে।

ঠিক, তা সে অবশ্যই করবে না। যে-বস্তুর প্রতিরূপ সে সৃষ্টি করছে, তাকে যদি সে যথার্থই জানে তা হলে মূল বস্তুর প্রতিই সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে, তার প্রতিরূপের উপর নয়। তার উত্তম রচনার প্রশংসার স্মৃতির বদলে সে কাজের জন্য প্রশংসিত হওয়ারই অধিক কামনা করবে। অপরের বৃহৎ কর্মের প্রশংসায় কাব্যকলা রচনার পরিবর্তে নিজেই সে বৃহৎ কর্মের নায়ক হওয়ার কামনা করবে।

গ্লকন বললেন, হ্যাঁ, একথা ঠিক। অপরের প্রশংসায় রচিত কাব্যের চেয়ে নিজের কর্মের প্রশংসা এবং পুরস্কার—উভয়ই অধিক হবে।

তা হলে আমরা এরূপ আশা করব না যে, হোমার কিংবা অপর কোনো কবি আমাদের নিকট নিরাময়বিদ্যা কিংবা অপর কোনো দক্ষতার ব্যাখ্যা পেশ করবেন। যেমন ধরো, কবিদের কেউ যদি যথার্থই চিকিৎসাবিদ বলে নিজেকে দাবি করেন এবং যদি তিনি চিকিৎসকের আলাপের কেবল অনুকারী না হন তা হলে চিকিৎসাবিদ এসক্যুলাপিয়াসের ন্যায় কোন্ প্রাচীন কিংবা আধুনিক কবি চিকিৎসায় পারদর্শী হয়েছেন কিংবা তাঁর কোন্ কবি চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন তাঁর নাম তাঁকে বলতে হবে—এমন দাবি নিশ্চয়ই তাঁর কাছে আমরা করব না। কিন্তু হোমার যখন রণনীতি, রাষ্ট্রীয় শাসন এবং শিক্ষার ন্যায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন তখন তাঁকে পালটা প্রশ্ন করার আমাদের অবশ্যই অধিকার আছে। আমরা বলব ঃ "কবিবর হোমার, আমরা যদি আমাদের সংজ্ঞায় ভ্রান্ত হয়ে থাকি এবং আপনি যদি সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূর থেকে সত্যের ছায়া সৃষ্টি করে না থাকেন, যদি আপনি মানুষের উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে সত্যের এক প্রস্ত নিকটবর্তী হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি যথার্থই বলতে পারেন কোন্ আচরণ ব্যক্তি কিংবা রাষ্ট্রকে উত্তম কিংবা অধম করে,

তা হলে আপনি দয়া করে বলুন লাইকারগাস[১] যেমন স্পার্টার কিংবা অপরে যেমন অন্যত্র রাষ্ট্রীয় সংবিধানের সংস্কার কম কিংবা অধিক পরিমাণে সাধন করেছেন, তেমনি আপনি কোন্ রাষ্ট্রের সংবিধানের সংস্কারসাধন করেছেন। কোন্ নগরীর বিধানাবলী আপনার জ্ঞানের নিকট ঋণী? ইতালী এবং সিসিলি তাদের সংবিধানের জন্য চারোন্দাজের নিকট ঋণী, আমরা ঋণী সলোনের[২] নিকট। আপনি বলুন কোন্ রাষ্ট্রের মানুষ অনুরূপভাবে আপনার নিকট ঋণী?"

গ্লকন বললেন ঃ সক্রেটিস, আমার তো মনে হয় না, হোমারের যে সর্বাধিক অনুরক্ত সেও তাঁর জন্য এমন কোনো কৃতিত্ব দাবি করতে পারবে।

বেশ। কিন্তু হোমারের কালের এমন কোনো যুদ্ধের কথা কি আমরা জানি যে-যুদ্ধের সাফল্য তাঁর অধিনায়কত্বে কিংবা তাঁর উপদেশে অর্জিত হয়েছে?

না, তা আমরা জানিনে।

তা হলে মাইলেটাসের থেলিস[৩] কিংবা সিদের আনাকারসিসের ন্যায় কোনো বাস্তব কৌশলকে কি তিনি আবিষ্কার করেছেন? এরূপ বাস্তব কোনো দক্ষতা কি তাঁর ছিল?

না, এরূপ কোনো দক্ষতাও হোমার প্রদর্শন করেননি।

বেশ, তিনি যদি জনসেবামূলক কিছু নাও করে থাকেন, তবু নিজের শিক্ষাকেন্দ্র কি তিনি স্থাপিত করেছিলেন, এমন শিক্ষালয় যেখানে তাঁর জীবনকালে সাগ্রহী শিক্ষার্থীগণ তাঁর উপদেশ শ্রবণের জন্য সমাগত হত এবং তিনি তাঁর উত্তরপুরুষদের জন্য একটা বিশিষ্ট হোমারীয় জীবনপদ্ধতি দান করে গেছেন? পাইথাগোরাসের[৪] খ্যাতি তো এ-কারণেই। তাঁর অনুসারীগণ আজও পাইথাগোরীয় জীবনধারার কথা বলেন এবং এই জীবনধারা তাঁদের অপর সকল থেকে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করে।

না সক্রেটিস, হোমার সম্পর্কে আমরা এরূপ কোনো খ্যাতির কথা শুনিনে। বস্তুতঃ হোমার সম্পর্কে প্রচলিত সব কাহিনী যদি সত্য হয় তা হলে তাঁর সুহৃদ

---

১. লাইকারগাস (খ্রিঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী) প্রাচীন স্পার্টার সংবিধানের প্রতিষ্ঠাতা।

২. সলোন ঃ প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনীতিবিদ। পৃঃ ৩৭০ দ্রষ্টব্য।

৩. থেলিস (৬২৪–৫৪৭ খ্রিঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। থেলিস মনে করতেন বস্তুজগতের মূল উপাদান হচ্ছে পানি।

৪. পাইথাগোরাস বা পিথাগোরাস প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক। তাঁর অনুসারীগণ পাইথাগোরীয় নামে পরিচিত। সংখ্যাকে পাইথাগোরাস সব সৃষ্টি এবং শক্তির মূল বলে মনে করতেন। পৃঃ ৩৬১ দ্রষ্টব্য।

ক্রিওফাইলাস অধম শিক্ষার একটি অধমতর দৃষ্টান্ত। কারণ হোমার যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁর সুহৃদ তাঁর প্রতি অতি সামান্য সম্মানই প্রদর্শন করেছেন।

গ্লকনের কথায় আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, এরূপ কাহিনীই প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু গ্লকন, হোমারের যদি যথার্থই মানুষকে শিক্ষার উপকারে উপকৃত করার ন্যায় জ্ঞান থাকত, কোনো বস্তুর অলীক প্রতিরূপ তৈরি করার ক্ষমতা ব্যতীত তাঁর যদি সত্যিকার জ্ঞান থাকত, তা হলে তাঁর কি বহুসংখ্যক অনুসারী এবং অনুরাগী না থেকে পারত? আবডেরার প্রোটাগোরাস[১] এবং সিওস-এর প্রডিকাস[২] এবং তাঁদের অনুরূপ বহু শিক্ষক তাঁদের সমকালীনদের বুঝিয়েছেন যে, তাঁদের অধীনে শিক্ষা গ্রহণ না করে তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্বপালনই সম্ভব হবে না। এবং এঁদের অনুসারীগণ এই শিক্ষকদের জ্ঞানের দক্ষতার প্রশংসায় এরূপ উচ্ছ্বসিত হত যে, তারা তাদের শিক্ষকদের নিজেদের স্কন্ধে তুলে সম্মান জানাতেও দ্বিধা করত না। হোমার এবং হিসিয়ডের যদি যথার্থই মানুষকে উত্তম করার ক্ষমতা থাকত, তা হলে তাঁদের সমকালীন লোক কি তাদের চারণ কবি হিসাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে দিত? তারা কি সকলে খাঁটি স্বর্ণের ন্যায় তাঁদের দেহে সংলগ্ন হয়ে গৃহের মধ্যে অবস্থানে তাঁদের সম্মত করতে সচেষ্ট হত না? তথাপি তাঁরা যদি গৃহে অবস্থান না করতেন, তা হলে অনুরাগীগণ কি তাদের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য তাঁদের অনুগমন করে, তাঁরা যেখানে যেতেন সেখানেই যেত না?

সক্রেটিস, তোমার একথা যথার্থ বলেই আমার মনে হয়।

তা হলে আমাদের এ কথাই মনে করতে হয় যে, হোমার থেকে শুরু করে কবিকুলের কারোরই সত্যের যথার্থ কোনো জ্ঞান নেই। যে-বিষয়ে তারা আলোচনা করে তার অগভীর প্রতিরূপই মাত্র তারা সৃষ্টি করতে সক্ষম। মানুষের কিসে মঙ্গল সে-সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। যেমন আমরা খানিক পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অঙ্কনশিল্পী পাদুকা প্রস্তুতকারক বলে যা মনে হয় তার চিত্রই সে অঙ্কন করে। অথচ সে কিংবা তার চিত্রের দর্শকবৃন্দ কেউই পাদুকা প্রস্তুতের বিষয়ে কোনো জ্ঞান রাখে না। তারা বস্তুর বর্ণ এবং আকার দ্বারাই তাকে বিচার করে।

---

১. প্রোটাগোরাস (৪৮৬–৪১৫ খ্রিঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীসের বিশিষ্ট শিক্ষকসম্প্রদায় সফিস্টদের অন্যতম। সফিস্ট শিক্ষকগণ প্রচলিত নীতি, বিশ্বাস, ধারণা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করতে শুরু করেন। প্রাচীনপন্থী প্লেটো এ-কারণে তাঁদের বিরুদ্ধতা করেন। 'মানুষই সত্যের নিয়ামক'—এ-উক্তি প্রোটাগোরাসের।

২. প্রডিকাস (৪৮০–৪০০ খ্রিঃ পূঃ) একজন সফিস্ট।

এ কথা সত্য।

অনুরূপভাবেই একজন কবি শব্দের মাধ্যমে যে-কোনো কারিগরের একটি চিত্র তৈরি করতে পারে। অথচ সে তার ছবি তৈরি করা ব্যতীত তার সম্পর্কে কিছুই জানে না। কিন্তু তার শব্দের মাত্রা এবং ছন্দ এবং তার সঙ্গীত মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। সাধারণ মানুষ যারা নিজেরা কবির মতোই অজ্ঞ, যারা কেবল শব্দের ভিত্তিতেই কোনো বিষয়কে বিচার করে তারা মনে করবে, এ-কবির পাদুকা প্রস্তুতকারক কিংবা যুদ্ধ পরিচালনা কিংবা ইত্যাকার সব বিষয় সম্পর্কেই গুরুতর বক্তব্য একটা-কিছু রয়েছে। এরূপ প্রবল হচ্ছে কাব্যের স্বভাবগত জাদুর ক্ষমতা। কবির এই বক্তব্যকে তুমি তার কাব্যিক বর্ণলেপ থেকে মুক্ত করে ফ্যালো, সাধারণ গদ্যে তাকে পরিণত করো, তা হলেই তুমি দেখবে সে বক্তব্য কত মূল্যহীন।

হ্যাঁ, এটি আমি লক্ষ করেছি। তখন এরূপই হয়।

এ হচ্ছে সেই মূর্খের মতো যার যথার্থ কোনো সৌন্দর্য নেই; যৌবনের ফুটন্ত কুসুমই যার সৌন্দর্যের একমাত্র নির্ভর।

হ্যাঁ, এ কথাও সত্য।

আর-একটি বিষয় লক্ষ করা। যে-শিল্পী কোনো বস্তুর প্রতিরূপ তৈরি করে সে বস্তুর সত্তাকে জানে না, তার প্রকাশকেই মাত্র জানে। আমরা এই কথাটি বলেছিলাম, ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা এ কথা বলেছি।

কিন্তু তার মারফত আমরা অর্ধপথই অগ্রসর হতে পারি, অধিক নয়।

বেশ, তা হলে আরও অগ্রসর হও।

শিল্পী অশ্বের লাগাম এবং বল্গার ছবিও তৈরি করতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে।

কিন্তু আসলে এ-বস্তুগুলি তৈরি করে কর্মকার এবং অশ্বের সাজ প্রস্তুতকারক। ঠিক নয় কি?

ঠিক কথা।

কিন্তু শিল্পী কি জানে বল্গা এবং লাগাম কীরূপ হওয়া আবশ্যক? বস্তুতঃ কর্মকার কিংবা প্রস্তুতকারকও এ-বিষয়টি জানে না। বল্গা এবং লাগাম কীরূপ হওয়া আবশ্যক, সেকথা জানে কেবলমাত্র অশ্বচালক, যে এদের ব্যবহারের জ্ঞান রাখে। তুমি কী বল?

অবশ্যই। অশ্বচালকই মাত্র জানে।

একথা কি সব সময়ের জন্য সত্য নয়? যে-কোনো বস্তুর ক্ষেত্রেই তিনটি প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব রয়েছে; তার ব্যবহার, তার সৃষ্টি এবং তার প্রতিসৃষ্টি।

ঠিক কথা।

এবং কোনো হাতিয়ার কিংবা কোনো প্রাণী বা কোনো কার্য—তার গুণ, সৌন্দর্য এবং উপযোগিতা কী তাকে মানুষ কিংবা প্রকৃতি যে-ব্যবহারের জন্য তৈরি করেছে তার ভিত্তিতেই বিচার করা হয় না?

হ্যাঁ, তা-ই করা হয়।

তা হলে এ থেকে বোঝা যায় যে, বস্তুর ব্যবহারকারীকে বস্তুটিকে জানতে হবে; তার প্রস্তুতকারীকে সে বলে দেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুটি তার উপযোগিতার পরিচয় কতখানি দিতে সক্ষম হয়েছে। যেমন ধরো, বাঁশি যে বাজায়, সে বাঁশি যে বানায় তাকে বলে দেয়, তার বানানো বাঁশিটি কেমন করে বেজেছে। এবং তার কী ধরনের বাঁশি আবশ্যক সে কথাও বাঁশি প্রস্তুতকারককে সে বলে দেবে।

হ্যাঁ, তা-ই তাকে বলতে হবে।

তা হলে বস্তুর ব্যবহারকারীই বস্তুর জ্ঞান রাখে। বস্তুর যে তৈরিকারক তাকে ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ করতে হয়। তার জ্ঞানের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। ব্যবহারকারীর মাধ্যমেই মাত্র প্রস্তুতকারক বস্তু সম্পর্কে, তার গুণ এবং দোষ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা তৈরি করতে সক্ষম হয়।

এ কথা সত্য।

তা হলে শিল্পী এবং তার সৃষ্ট প্রতিরূপ সম্পর্কে আমরা কী বলব? যে-বস্তুর সে ছবি অঙ্কন করে, তার যথার্থতা কিংবা অযথার্থতা সম্পর্কে তার কি প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা আছে? অথবা এমন কি আমরা বলতে পারি যে, যারা জানে তার কী অঙ্কন করা উচিত তাদের নির্দেশের উপর নির্ভরজনিত সঠিক ধারণা অন্তত তার রয়েছে?

না, এর কোনোটিই শিল্পীর নেই।

তা হলে, শিল্পী যে-বস্তুর ছবি আঁকে তার 'উত্তমতা' কিংবা 'অধমতা' সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান কিংবা ধারণা থাকে না।

না, তার এরূপ জ্ঞান কিংবা ধারণা থাকে না।

ঠিক শিল্পীর মতো, কবিও তার কাব্যের বিষয় সম্পর্কে সমভাবেই অজ্ঞ?

হ্যাঁ, সে সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞ।

তথাপি, যে-বিষয়ে সে কাব্য রচনা করছে সে-সম্পর্কে তার অজ্ঞতা সত্ত্বেও সে কাব্যসৃষ্টি করতে থাকবে। এবং অজ্ঞ জনতার যাতে মনস্তুষ্টি ঘটে তারই প্রতিরূপ সে সৃষ্টি করে চলবে।

এছাড়া সে আর কী করতে পারে?

তা হলে আমরা বেশ পরিমাণেই একমত যে, শিল্পী তার সৃষ্টির বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ কিংবা সে-সম্পর্কে তার জ্ঞান অতি নগণ্য এবং তার এরূপ শিল্পের যথার্থ কোনো মূল্য নেই। একথা শুধু শিল্পীর ক্ষেত্রে নেয়, বিষাদাত্মক কবি, মহাকাব্য বা নাট্যকাব্য ঃ কাব্যের সকল ক্ষেত্রেই একথা সত্য?

হা, আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, সক্রেটিস।

একটা বিষয়ে আবার একটু স্মরণ করা আবশ্যক, গ্লকন। আমরা বলেছি প্রতি-রূপের এই সৃষ্টি সত্য থেকে তিন প্রস্ত দূরত্বে অবস্থিত। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, আমরা একথা বলেছি।

তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের কোন্ অংশকে এই প্রতিরূপ প্রভাবান্বিত করে?

সক্রেটিস, মানুষের অংশ বলতে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ?

বলছি। তুমি তো জান, কোনো বস্তুর দৃশ্য, আকার তোমার চোখ থেকে তার দূরত্বের উপর নির্ভরশীল?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তেমনি একটি কাঠি যদি তুমি পানিতে নিমজ্জিত কর, তা হলে সেটি তোমার চোখে বাঁকা ঠেকবে। এবং তুমি যখন তাকে পানির বাইরে নিয়ে আস তখন সেটি সোজা বোধ হয়। আবার আবরণের ব্যতিক্রমে একই তল তোমার চোখে অবতল কিংবা উত্তল বলে বোধ হতে পারে। এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের আত্মার বিভ্রান্তি। আমাদের এই স্বাভাবিক দুর্বলতার উপরই দৃশ্যশিল্পী, জাদুকর এবং তাদের অনুরূপ লোকেরা নির্ভর করে এবং তাদের কৌশল দ্বারা আমাদের বিভ্রান্ত করে।

একথা যথার্থ।

পরিমাপ, হিসাব এবং ওজনের উপায় মানুষ আবিষ্কার করেছে এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তির জন্য, এই নিশ্চয়তার জন্য যে, কোনোকিছুর বাহ্য আকার, কিংবা

পরিমাণ দ্বারা যেন আমরা পরিচালিত না হই, যেন আমরা নির্ভর করতে পারি সংখ্যা, পরিমাপ এবং ওজনের সঠিক হিসাবের ওপর। এবং আমরা জানি এরূপ সঠিক হিসাবের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আত্মার বুদ্ধি এবং যুক্তির।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

অথচ দ্যাখো, বারংবার হিসাবের ভিত্তিতে যুক্তি যদি আমাদের বলে যে, একটা বিশেষ বস্তু অপর একটা বিশেষ বস্তু থেকে বৃহত্তর কিংবা ক্ষুদ্রতর কিংবা পরস্পর সমান, তবু তাদের বাহ্যদৃর্শ এ-সিদ্ধান্তের বিরোধী বলে বোধ হতে পারে।

হ্যাঁ, এরূপ হতে পারে।

কিন্তু আমরা বলেছি যে আমাদের একই অংশ একই বস্তু সম্পর্কে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী ধারণা পোষণ করতে পারে না?

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছি এবং একথা যথার্থ।

তা হলে আত্মার যে-অংশ যুক্তির হিসাবকে অস্বীকার করছে, সেই একই অংশ যুক্তির হিসাবকে স্বীকার করতে পারে না?

না, তা পারে না।

কিন্তু আত্মার যে-অংশ অঙ্কের পরিমাপ এবং হিসাবের উপর নির্ভর করে সে-অংশই উত্তম এবং যে-হিসাবকে অস্বীকার করে সে-অংশ অধম?

অবশ্যই।

গ্লকন, আমি যখন বলেছিলাম, চিত্রশিল্পী কিংবা অপর শিল্পীদের সৃষ্টির অবস্থান সত্য থেকে বহু দূরে এবং এ-সৃষ্টির আবেদন আমাদের সত্তার এমন উপাদানের নিকট যে যুক্তি থেকে ভ্রষ্ট এবং আমাদের সত্তার সঙ্গে যার যোগটি অসুস্থ—তখন এই সিদ্ধান্তের কথাই আমি ভাবছিলাম।

হ্যাঁ, আমাদের সত্তার সঙ্গে তার যোগটি সম্পূর্ণ অসুস্থ।

তা হলে আমরা বলতে পারি, প্রতিরূপ শিল্প হচ্ছে এমন একটি অধম চরিত্র যে আর একটি অধম চরিত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি অধম সন্তানের জন্ম দিয়েছে।[১]

আমারও তা-ই বোধ হয়।

---

১. বি. জোয়েট দ্রষ্টব্য।

এবং একথা কি কেবল দৃশ্যশিল্পের ক্ষেত্রেই সত্য? একথা কি যে-শিল্পের লক্ষ্য আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়—অর্থাৎ কাব্য তার ক্ষেত্রেও সত্য নয়?

হ্যাঁ, আমার তো মনে হয় কাব্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

কিন্তু চিত্রশিল্প থেকে সম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করে তার ওপর নির্ভর করা আমাদের উচিত হবে না। আমাদের দেখতে হবে আমাদের আত্মার কোন্ অংশের উপর নাট্যকারের আবেদন সর্বাধিক এবং তার প্রভাব আত্মার জন্য মঙ্গলকর কিংবা অমঙ্গলকর?

হ্যাঁ, আমাদের সেটি দেখা আবশ্যক।

তা হলে গ্লকন, এসো বিষয়টিকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি ঃ নাটক মানুষের ইচ্ছুক কিংবা অনিচ্ছুক, কর্মরত জীবনকে রূপায়িত করে। সেই কর্মে মানুষ যেরূপ মনে করে সেরূপ উত্তম কিংবা অধম বলে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সে তার আনন্দ বা দুঃখকে ভোগ করে। কথাটি কি ঠিক বলা হল?

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস।

কিন্তু যে-ব্যক্তিসত্তার মধ্যে অভিজ্ঞতার এত বৈচিত্র্য সে-সত্তাকে কি আমরা সংঘাতহীন বলে গণ্য করতে পারি? আমরা দেখেছি, দৃশ্যজগতে পরস্পরবিরোধিতার উদ্ভব ঘটতে পারে। তা হলে কর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ দ্বন্দ্ব এবং বিরোধিতার অস্তিত্ব কি অসম্ভব? বস্তুত, প্রশ্নটি জিজ্ঞাসার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কারণ, আমরা একথা স্বীকার করেছি যে, আত্মার মধ্যে এরূপ দ্বন্দ্বের অবকাশ আছে এবং একই সময়ে আত্মার মধ্যে দশ সহস্র পরস্পরবিরোধী উপাদানের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হ্যাঁ, আমরা সঠিকভাবেই একথা বলেছিলাম।

হ্যাঁ, আমরা ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু একটি বিষয়ের তখন উল্লেখ করা হয়নি। সেটি এবার উল্লেখ করা আবশ্যক।

সেটি কী?

আমরা কি একথা বলিনি যে, একজন উত্তম মানুষ যখন তার পুত্রসন্তান কিংবা অপর কোনো প্রিয়জনকে হারায়, তখন সে অপর সকলের চেয়ে অধিক অবিচলভাবে তার এই দুর্ভাগ্যকে বহন করতে সক্ষম?

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছিলাম।

কিন্তু এবার বিবেচনা করে বলো ঃ তার কারণ কী? এ কি এই কারণে যে, সে কোনো দুঃখ বোধ করে না? তা যদি অসম্ভব হয়, তা হলে কারণ কি এই যে, সে তার দুঃখকে সহনীয় করে তোলে?

দ্বিতীয় কারণই সত্যের নিকটতর বলে বোধ হয়।

তা হলে বল, শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় তাকে অপর সকলে যখন দেখবে তখন কি সে তার শোকের প্রকাশকে অধিকতরভাবে বাধাদানের চেষ্টা করবে, কিংবা সে যখন একাকী থাকবে তখন নিজের শোককে অধিকতরভাবে প্রতিরোধ করবে?

সকলের মধ্যেই তার প্রতিরোধ-ইচ্ছা অধিকতর হবে।

অর্থাৎ অপরের সম্মুখে যে-আচরণে সে লজ্জিত হত, একাকী সে-আচরণে বা সে-বাক্য উচ্চারণে তার দ্বিধা হবে না?

হ্যাঁ, একথা সত্য।

কারণ দুঃখবোধ তাকে শোকের দিকে নিয়ে গেলেও তার নীতি এবং যুক্তি তার চরিত্রের নিকট সংযম দাবি করবে।

যথার্থ।

তা হলে একই সময়ে পরস্পরবিরোধী ইচ্ছার অস্তিত্বের অর্থ তার চরিত্রে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির উপাদানের অস্তিত্ব রয়েছে?

অবশ্যই।

এ-দুটি উপাদানের একটি হচ্ছে আইনের অনুগত এবং আচরণের সঙ্গত নীতিকে স্বীকারে আগ্রহী। এই উপাদান বলে—শোকে এবং দুর্ভাগ্যকে যতদূর সম্ভব আমাদের ধৈর্যের সঙ্গে এবং তিক্ততা ব্যতিরেকে বহন করা উচিত। কারণ, এ-দুর্ভাগ্য ছদ্ম আবরণে আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপও হতে পারে। তা ছাড়া, ধৈর্যহীনতা আমাদের কোনো মঙ্গল সাধন করে না এবং মানুষের জীবনে মহামূল্যবান বলেও কিছু নেই এবং শোকাচ্ছন্নতা, যে-সাহায্য আমাদের প্রয়োজন, সে-সাহায্যলাভকেও অসম্ভব করে তোলে।

কী সাহায্য আমাদের প্রয়োজন?

আমাদের বুদ্ধি বা যুক্তির সাহায্য। যে-বুদ্ধি দ্বারা আমরা ঘটনাকে বিচার করি এবং অনিবার্যতার মধ্যেও যে-উদ্যোগ নেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব, সেই উদ্যোগ গ্রহণে আমরা অক্ষম হয়ে পড়ি। অথচ, শিশুদের ন্যায়, যে-আঘাত আমরা পেয়েছি তাকে চেপে ধরে ক্রন্দন করে সময়ক্ষেপণ করা আমাদের উচিত নয়। আঘাতকে নিরাময় করে শোককে দূর করা এবং যথাশীঘ্র ভ্রান্তি

সংশোধনের শিক্ষায় আত্মাকে শিক্ষিত করে তোলা আমাদের কর্তব্য।

হ্যাঁ, দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে এরূপ আচরণই আমাদের পক্ষে সঙ্গত আচরণ। এবং আমাদের সত্তার যে-উত্তম অংশ সে এরূপ আচরণেই আগ্রহী?

অবশ্যই।

কিন্তু আমাদের সত্তার অপর যে-অংশ আমাদের কোনো দুর্ভাগ্যকে বিস্মৃত হয় না এবং তা নিয়ে বিলাপেরও তার বিরাম নেই, তাকে আমরা অযৌক্তিক, অলস এবং কাপুরুষ বলে অভিহিত করতে পারি?

হ্যাঁ, তাকে আমরা এরূপই অভিহিত করব।

এবং আমাদের আত্মার এই অবাধ্য উপাদানই নাটকীয় প্রতিসৃষ্টির কাঁচামালের যোগান দেয়। কিন্তু যে-কারোর পক্ষে আমাদের আত্মার যৌক্তিক এবং অবিচল প্রশান্ত অংশকে প্রতিসৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু কেউ যদি এভাবে প্রকাশ করেও তবুও তাকে অনুধাবন করা, বিশেষ করে রঙ্গালয়ের সেই বিচিত্র দর্শকদের পক্ষে অনুধাবন করা বিশেষভাবে কঠিন। কারণ আত্মার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

খুবই সত্য কথা।

নাট্যকাব্যের স্রষ্টা অর্থাৎ নাটকীয় কবি তাই স্বাভাবিকভাবে আত্মার এই উপাদানের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে না। তার কৌশল দ্বারা আত্মার এই অংশকে সন্তুষ্ট করারও সে প্রয়াস পাবে না। কারণ, এমন প্রয়াস তার জন্য কোনো জনপ্রিয়তা বহন করে আনবে না। কাজেই সে তার নাটকের বিষয়কে অন্বেষণ করবে আত্মার অস্থির এবং আঘাতপ্রবণ অংশের মধ্যে।

এ কথা স্পষ্ট।

তা হলে কবিকে আমরা সঙ্গতভাবেই চিত্রশিল্পীর পার্শ্বেই স্থাপন করতে পারি। কবিও চিত্রশিল্পীর সদৃশ। কারণ, তার সৃষ্টিরও সত্য মূল্য নগণ্য। তার আবেদনও আমাদের আত্মার অধম অংশেরই নিকট। এবং এ-কারণে আমাদের সুশাসিত রাষ্ট্রে কবির প্রবেশ নিষিদ্ধ করলে আমরা সঠিক কাজই করব। কারণ, যুক্তির বিনিময়ে কবি আমাদের আত্মার অধম উপাদানগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। এগুলিকে সে উৎসাহিত এবং শক্তিশালী করে তোলে। আত্মার অধম অংশকে প্রবল করার অর্থ, রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং পরিচালনার ভার নিকৃষ্টতম চরিত্রের হাতে তুলে দেওয়া এবং রাষ্ট্রের উত্তম চরিত্রের ধ্বংস সাধন করা। নাট্যকাব্যের কবিও অযৌক্তিক অংশকে উৎসাহিত করে ব্যক্তির চরিত্রে অনুরূপ

অবস্থা সৃষ্টি করে। কারণ, আত্মার অযৌক্তিক অংশ আকারের পার্থক্য-অনুধাবনে অক্ষম। ক্ষুদ্র এবং বৃহতের পার্থক্য স্থির করতে সে বিভ্রান্ত হয়। কবি আত্মার এই অযৌক্তিক অংশকে উৎসাহিত করে এবং সত্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত এর প্রতিরূপের সৃষ্টি করে।

আমি এক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে একমত, সক্রেটিস।

কিন্তু কাব্যের বিরুদ্ধে এর চেয়েও গুরুতর অভিযোগ আছে। খুব উত্তম যে-চরিত্র, তাকে কলুষিত করতেও এ-কৌশলের ক্ষমতা মারাত্মক। এই মারাত্মক প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে খুব কম চরিত্রই।

এরূপ হলে, এর ক্ষমতা মারাত্মকই বটে।

তাই আমরা যখন হোমার কিংবা অপর কোনো বিষাদাত্মক কবির কাব্যে দেখি, কবি কোনো মহৎ নায়কের দুঃখকে বর্ণনা করতে যেয়ে সেই চরিত্রের মুখে শোকের বিলাপধ্বনি দুঃখের সকল ব্যঞ্জনাসহকারে স্থাপন করছেন, তখন তাঁর সে দক্ষ-কৌশলে আমাদের মধ্যে যারা মহৎ তারা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে আবেগের বন্যায় ভেসে যাই। এবং আমাদের ওপর কবির এরূপ প্রভাবের দক্ষতায় কবির প্রশংসায় আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি।

হ্যাঁ, এ আমাদের পরিচিত অভিজ্ঞতা।

অথচ আমাদের ব্যক্তিগত শোকে আমরা বিপরীত আচরণ করি। শোককে নীরবে বহন করার ক্ষমতায় আমরা গর্ব বোধ করি এবং নাট্যমঞ্চে যে-আচরণকে আমরা প্রশংসা করেছি, ব্যক্তিগত জীবনে সেরূপ আচরণকে আমরা স্ত্রীজনোচিত বলে আখ্যায়িত করি।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে, যার সদৃশ হতে আমি নিজে লজ্জা বোধ করি, মঞ্চে তার আচরণকে প্রশংসা করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত? এরূপ আচরণে ঘৃণার বদলে আনন্দ এবং বিমুগ্ধতা বোধ করা কি অযৌক্তিক নয়?

হ্যাঁ, এরূপ মনোভাব নিতান্তই অযৌক্তিক।

বিশেষ করে বিষয়টিকে যদি আমরা এভাবে দেখি।

কীভাবে?

যেমন ধরো, তুমি যদি মনে কর ব্যক্তিগত জীবনে শোকের যে-প্রকাশ আমরা দমন করি, কবি মঞ্চে তাকে রূপায়িত করে আমাদের অশ্রুপাত এবং শোক প্রকাশের স্বভাবগত প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করছে। কারণ, আমাদের চরিত্রের যেটি

উত্তম অংশ সে-অংশ নৈতিক এবং যৌক্তিক শিক্ষার অভাবে মঞ্চে রূপায়িত শোকের দৃশ্যে তার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণকে এই অজুহাতে শিথিল করে দেয় যে, আমরা অপরের শোকের দৃশ্য দেখছি, নিজে শোকাহত হচ্ছিনে এবং এর শোকের প্রকাশটির মধ্যে যদিও আতিশয্য রয়েছে তবু তার প্রশংসায় কোনো ক্ষতি নেই। তা ছাড়া শোক দেখে আমাদের চরিত্রের এই অংশ একটা আনন্দও বোধ করে। এ-আনন্দকে সে লাভজনক বলে গণ্য করে এবং এর বিনিময়ে কবির সমগ্র সৃষ্টিটিকে নাকচ করে দিতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কারণ, এ সত্য খুব কম লোকই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, অপরের প্রতি আমাদের মনোভাব আমাদের নিজেদেরও অনিবার্যরূপে প্রভাবিত করে। এবং অপরের শোকের প্রকাশে আবেগে আপ্লুত হলে আমাদের নিজেদের শোকের আবেগকে দমন করাও আমাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।

একথা খুবই যথার্থ।

হাস্যধ্বনির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, যে-পরিহাস প্রকাশে তুমি নিজে লজ্জা বোধ কর, অপরের ক্ষেত্রে মঞ্চে কিংবা ব্যক্তিগত জীবনে সেই পরিহাসের স্থূলতাকে ঘৃণা না করে তাতে আনন্দবোধ করার প্রভাব তোমার চরিত্রের ক্ষেত্রে একই। কারণ, তোমার যে-পরিহাস-প্রবৃত্তি নিজে নির্বোধ বলে প্রতিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায় দমিত ছিল, সেই পরিহাস-প্রবৃত্তিকে তুমি বল্গাহীন করে দিচ্ছ। ফলে মঞ্চের কুরুচি অচেতনভাবে তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে তোমাকে হাস্যাস্পদ জীবে পর্যবসিত করে দেবে।

হ্যাঁ, এ-আশঙ্কা অমূলক নয়।

কাব্য যখন দেহের লালসায় এবং ক্রোধের আবেগে এবং আমাদের কর্মের সঙ্গে জড়িত সুখ এবং দুঃখের কামনা ও বোধে পূর্ণ থাকে তখন আমাদের চরিত্রের উপর কাব্যের প্রভাবও একই। এই সকল প্রবৃত্তিকে যখন অভুক্ত রাখা আবশ্যক, তখন কাব্য এগুলিকে উৎসাহিত করে তোলে এবং যখন আমাদের মঙ্গল এবং সুখের স্বার্থে এগুলির নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক, তখন এই প্রবৃত্তিই আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে।

হ্যাঁ, তোমার একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

তা হলে গ্লকন, তুমি যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ পাও যারা গ্রীসের শিক্ষাদাতা হিসাবে হোমারের প্রশংসা করে এবং বলে যে, আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং শিক্ষার বিষয়ে হোমারকে আমাদের অধ্যয়ন করা আবশ্যক এবং তাঁর নির্দেশের ভিত্তিতে আমাদের জীবনকে গঠিত করা উচিত, তা হলে তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের

মধ্যে তুমি তাদের সৎ মানুষ বলে বিবেচনা করতে পার এবং তাদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করে বলতে পার, হোমার কবিদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বিষাদাত্মক নাট্যকারের পথিকৃৎ। কিন্তু এ-বিষয়েও তোমার খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, রাষ্ট্রে যদি তুমি কোনো কাব্যকলাকে অনুমোদিত কর, তবে তা অবশ্যই দেবতা এবং উত্তম মানুষের প্রশংসায় রচিত স্তোত্র ব্যতীত অপর কিছু হতে পারবে না। করণ, একবার যদি তুমি এই সীমানাকে অতিক্রম কর এবং সুমিষ্ট গীতিকবিতা বা মহাকাব্যকে অর্গলমুক্ত করে দাও তা হলে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত নীতি এবং বিধানের বদলে আনন্দ এবং বেদনাই তোমার আত্মার শাসক হয়ে দাঁড়াবে।

তুমি যথার্থ বলেছ, সক্রেটিস।

তাই আমাদের রাষ্ট্র থেকে কাব্যকে নির্বাসিত করার অভিযোগের যদি জবাব দিতে হয় তা হলে আমরা বলব ঃ এ-নির্বাসনের দাবি যুক্তির দাবি। কিন্তু যদি বলা হয় যে,কাব্য বাদে আমরা অচেতন এবং বর্বরে পরিণত হয়ে যাব, তবে আমাদের জবাব হবে ঃ দর্শনের সঙ্গে কাব্যের বিরোধ একটি পুরাতন বিরোধ। এই প্রাচীন বিরোধের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'জন্তুটি প্রভুর দিকে মুখব্যাদান করল' 'শূন্যমস্তিষ্ক নির্বোধের মধ্যে সে সম্মানের পাত্র' অথবা 'বুদ্ধিতে অতিশয় স্ফীত মস্তিষ্কওয়ালাদের দল' এবং' বুদ্ধিতে ভারী বটে কিন্তু সম্পদে সর্বহারা ভিক্ষুক ইত্যাকার উক্তি আমাদের অপরিচিত নয়[১]। কিন্তু তবু কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, একটি সুশাসিত রাষ্ট্রে তৃপ্তির জন্য রচিত নাটক এবং কবিতা মঙ্গলকর, তা হলে আমরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রে তাদের সংবর্ধনা জানাব। কারণ এদের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে আমরা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু তাই বলে যাকে আমরা সত্য বলে জানি তাকে কোনো কারণে পরিত্যাগ করা আমাদের চরিত্রের সততার সাক্ষ্য বহন করবে না। আমি জানি, গ্লকন, তোমার মধ্যেও কাব্যের আকর্ষণ, বিশেষ করে হোমারের কাব্যের আকর্ষণ কম নয়। ঠিক নয় কি?

তুমি ঠিকই বলেছ, কাব্যের প্রতি আমার মধ্যেও আকর্ষণ রয়ে গেছে।

তা হলে সঙ্গতভাবে আমরা বলতে পারি, কাব্য যদি গীতিকাব্য কিংবা ভিন্নতর ছন্দের যথার্থতা প্রমাণ করতে সক্ষম হয় তবে তার প্রত্যাবর্তনের অনুমতিদানেও আমাদের আপত্তি হবে না।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

---

১. এ-সমস্ত উক্তির উৎস কী, তা জানা যায় না।—লীর অনুবাদ, পৃঃ ৩৮৫।

কাব্যের পক্ষে কৌশলী নিয়োগের যদি আবশ্যক হয় তা হলে আমরা এমন কাউকে নিযুক্ত করব, যে নিজে কবি নয় কিন্তু কাব্যকে যে ভালোবাসে। কাব্যের পক্ষে সে গদ্যে যুক্তি প্রদর্শন করবে এবং তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কাব্যদেবী কেবল আমাদের মধ্যে উপভোগের প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে না, সে মানুষের জীবন এবং রাষ্ট্রের জন্য স্থায়ী মঙ্গলও বহন করে নিয়ে আসে। এমন যুক্তিকে আমরা স্বাগতঃ জানাব। কারণ, কাব্য যদি আমাদের আনন্দ এবং উপকার—উভয়েরই উৎস হয় তা হলে তার কাছ থেকে আমাদের লাভ ব্যতীত লোকসানের কোনো আশঙ্কা থাকবে না।

হ্যাঁ, তেমন হলে কাব্য থেকে আমরা অবশ্যই লাভবান হব।

কিন্তু কৌশলী যদি তার দাবিকে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে প্রেমিক যেমন যতই কষ্ট হোক-না কেন তার অপদার্থ প্রেমাস্পদ বা প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, তেমনি আমরাও প্রেমিককে অনুসরণ করে কাব্যকে পরিত্যাগ করব। যেভাবে অমরা বর্ধিত হয়েছি তাতে কাব্যকে ভালোবাসতে আমরা বাধ্য। এবং কাব্য যদি আমাদের মঙ্গলের উৎস বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে আমরা যথার্থই আনন্দিত হব। কিন্তু এই চরিত্রের প্রমাণ যদি আমরা না পাই, তা হলে সাধারণ মানুষের উপর তার যে দুরারোধ্য প্রভাব, তার মোহে আমরাও যেন আবদ্ধ না হই—তার জন্য মন্ত্রপাঠের ন্যায় এই যুক্তিকে কাব্যের প্রভাবের বিরুদ্ধে নিজেদের কাছেই আমরা আবৃত্তি করতে থাকব। আমাদের মূল কথাটি হবে ঃ এরূপ কাব্যের কোনো যাথার্থ্য কিংবা সত্য-মূল্য নেই। অপর মানুষকেও আমরা তাদের চরিত্রের উপর এর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে সতর্ক করে দেব এবং তাদের বলব তারা যেন কাব্য সম্পর্কে আমাদের এই নীতিকেই গ্রহণ করে।

আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, সক্রেটিস।

হ্যাঁ প্রিয় গ্লকন, এই নীতিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ, প্রশ্নটি গুরুতর। উত্তম এবং অধমের মধ্যে কোন্‌টি আমাদের জন্য মঙ্গলকর, তাকে স্থির করতে হবে। এ-প্রশ্নের গুরুত্ব আপাতভাবে যেরূপ বোধ হয় তার চেয়েও গুরুতর। এবং সম্মান বল, সম্পদ বল, শক্তি কিংবা কাব্য বল—কোনোকিছুর আকর্ষণেই আমরা ন্যায় এবং উত্তমের দাবিকে অবজ্ঞা করতে পারিনে।

গ্লকন বললেন ঃ তুমি ঠিকই বলেছ, সক্রেটিস। আমি মনে করি কেবল আমি নই, তোমার যুক্তির যথার্থতা অপর যে-কেউ স্বীকার করতে বাধ্য হবে।

কিন্তু আমরা এখনও ন্যায়ের সম্মান এবং পুরস্কারের কথা উল্লেখ করিনি।

যা আমরা উল্লেখ করেছি সে-পুরস্কার এবং সম্মান যদি তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তার শ্রেষ্ঠত্বকে তো অকল্পনীয় বলতে হয়।

হ্যাঁ, তা বটে। কারণ, মাত্র ক্ষণকালের মধ্যে কার্ পক্ষে বৃহৎ কিংবা শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব? এবং তিন কুড়ি এবং দশ বৎসরের যে-পরিধি মহাকালের তুলনায় তুমি নিশ্চয়ই তাকে ক্ষণকালের অধিক বলবে না?

হ্যাঁ, তাকে তো কোনো কালের হিসাবে আনা যায় না। ক্ষণকালের চেয়েও অল্প।

যে অমর তার পক্ষে সমগ্র কালকে উপেক্ষা করে এই ক্ষণকালের উপর গুরুত্ব আরোপ করা কি সম্ভব?

না, সে অবশ্যই সমগ্র কালকে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু তোমার এমন প্রশ্নের কী তাৎপর্য?

গ্লকন, তুমি নিশ্চয়ই জান, মানুষের আত্মা হচ্ছে অমর, সে হচ্ছে অক্ষয়।

আমার এমন উক্তিতে গ্লকনের দৃষ্টিতে বিস্ময় সৃষ্টি হল। গ্লকন আমার পানে তাকিয়ে বললেন ঃ একথা কি যথার্থ? এবং তুমি এখনও কি এই অভিমত পোষণ করতে চাও?

আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, আমার এবং তোমারও এই অভিমতই পোষণ করা উচিত। আর একথা প্রমাণ করা খুব কঠিন ব্যাপার কিছু নয়।

আমার যেন কঠিন বলেই বোধ হচ্ছে। তুমি যদি তাকে এত সহজ মনে কর, তা হলে একটু ব্যাখ্যা করে বলো, প্রমাণটি কীরূপে সহজ।

তা হলে শ্রবণ করো, গ্লকন।

আমি প্রস্তুত, সক্রেটিস।

তুমি নিশ্চয়ই উত্তম এবং অধমের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার কর। কোনো জিনিসকে তুমি উত্তম বল, এবং কোনোকিছুকে তুমি অধম বল?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে, যা-কিছু অপরকিছুকে দূষিত করে কিংবা ধ্বংস করে তা-ই হচ্ছে অধম এবং যা-কিছু অপরকিছুকে রক্ষা করে এবং তাকে উন্নত করে, তাই হচ্ছে উত্তম?

হ্যাঁ, এ-ব্যাপারে আমি একমত।

আর একথাও নিশ্চয়ই তুমি স্বীকার করবে, প্রত্যেক সত্তার মধ্যে উত্তম এবং অধমের অস্তিত্ব আছে। চোখের কথা যদি ধর তা হলে চক্ষুর প্রদাহ হচ্ছে তার অধম অবস্থা। সমগ্র দেহের কথা ধরলে, রোগ হচ্ছে দেহের অধম অবস্থা। তেমনি শস্যের অধম অবস্থা হচ্ছে উদ্ভিদ-রোগ,কাষ্ঠের হচ্ছে তার পচন, তাম্র এবং লৌহের হচ্ছে তার মরচে পড়া। মোটকথা, প্রায় প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই তার ক্ষয় কিংবা অধমের একটা দিক আছে।

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

এবং কোনোকিছু যদি এই ক্ষয় দ্বারা আক্রান্ত বা সংক্রমিত হয়, তা হলে পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্য। পরিণামে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সে সম্পূর্ণরূপে অস্তিত্বহীন হয়ে যায়।

যথার্থ।

তা হলে, যে-বস্তুকে কোনো ক্ষয় আক্রমণ করে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও যাকে ধ্বংস করতে পারে না, তাকে আমরা অক্ষয় বলতে পারি?

হ্যাঁ, তাকে আমরা অক্ষয় বলতে পারি।

বেশ। কিন্তু আত্মার ক্ষেত্রে কোন্‌টি সত্য? এমন কোন ক্ষয় কি আছে, যে আত্মার ক্ষতিসাধন করতে পারে?

হ্যাঁ, তার ক্ষতিসাধন করার মতো ক্ষয় অবশ্যই আছে। অন্যায়, অরাজকতা, কাপুরুষতা এবং অজ্ঞতা—অর্থাৎ যে-সমস্ত দুষ্টশক্তির আমরা উল্লেখ করেছি, আত্মাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিশ্চয়ই তাদের ক্ষমতা আছে।

কিন্তু এদের কেউ কি আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে পারে? একটা বিষয়ে আমাদের ভুল করা উচিত নয়, গ্লকন। আত্মা দুষ্ট হয়ে যেতে পারে। দুষ্ট আত্মা অন্যায় কর্মসাধনকালে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু এই দুষ্টশক্তির কারণে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়, এরূপ চিন্তা করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। আমাদের বরঞ্চ বিষয়টি অন্যদিক থেকে দেখা আবশ্যক। আমরা বলব ঃ দেহের দুষ্টশক্তি হচ্ছে তার রোগ। রোগ তাকে ক্ষয়গ্রস্ত করে। তার ধ্বংস সাধন করে। পরিণামে দেহের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহ হিসাবে তার কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অন্য যে-সমস্ত দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি, তাদের সব ক্ষেত্রেই এরূপ দুষ্টশক্তি তাদের ধ্বংসসাধন করে। ঠিক নয় কি?

হ্যাঁ, একথা ঠিক।

এসো, আমরা আত্মাকেও সেভাবে বিচার করে দেখি। আত্মার মধ্যে অন্যায় এবং অপর দুষ্টশক্তির অস্তিত্ব কি আত্মাকে এরূপভাবে দুর্বল এবং বিনষ্ট করতে পারে, যাতে আত্মা আর আত্মা হিসাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে না, আত্মার মৃত্যু ঘটে যায় এবং সে দেহ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়?

না, তার এরূপ ধ্বংসসাধন সম্ভব নয়।

কিন্তু আবার এমন কথা ভাবাও অযৌক্তিক যে, নিজের ক্ষয়তে কেউ বিনষ্ট হয় না, বিনষ্ট হয় সে অপরের ক্ষয়তে।

হ্যাঁ, এরূপ ভাবা খুবই অযৌক্তিক।

আমি বললাম ঃ তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে গ্লকন, দেহের মৃত্যু ঘটে পুরনো এবং দূষিত খাদ্যের কারণে কিংবা খাদ্যের অপর কোনো ত্রুটির কারণে—এমন অভিমত পোষণ করাও আমাদের উচিত নয়। খাদ্যের এমন কোনো ত্রুটির কারণে দেহের মধ্যে যদি ক্ষয়ের ধারা শুরু হয়, তা হলে বরঞ্চ আমাদের বলা উচিত যে, দেহের মৃত্যু ঘটেছে তার নিজের স্বভাবের কারণে। নিকৃষ্ট খাদ্য তার একটি উপলক্ষ মাত্র। কারণ দেহ এবং নিকৃষ্ট খাদ্য স্বভাবগতভাবে পৃথক। এদের যোগ এখানে মাত্র যে, নিকৃষ্ট খাদ্য দেহের নিকৃষ্ট স্বভাবকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। ঠিক নয় কি?

একথা অবশ্যই ঠিক, সক্রেটিস।

এই একই যুক্তিতে আমরা বলব, দেহের রোগ যদি আত্মার স্বভাবের নিজস্ব রোগকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে না পারে তা হলে আমরা বলতে পারিনে যে, দেহের রোগে আত্মার মৃত্যু ঘটতে পারে। সেরূপ বলার অর্থ হবে, স্বভাবগতভাবে যারা একেবারে পৃথক তাদের একের রোগ অপরকে ধ্বংস করতে সক্ষম।

হ্যাঁ, এরূপ বলার অর্থ তা-ই দাঁড়ায়।

এই যুক্তি না খণ্ডানো পর্যন্ত আমাদের এই অভিমতই পোষণ করতে হবে যে, দেহের জরা কিংবা তার অপর কোনো রোগ কিংবা কোনো আঘাত—এমনকি দেহ যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়, তবু দেহের এরূপ কোনো অবস্থা আত্মাকে প্রভাবিত বা ধ্বংস করতে পারে না। আত্মা আপন স্বভাবে যা ছিল, দেহের এরূপ কোনো বিকার বা অবস্থা তাকে অধিকতর অন্যায়ে বা অধমে পর্যবসিত করতে পারে—একথা কেউ প্রমাণ না করা পর্যন্ত আমাদের অভিমতের কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে না। আমরা বলতে পারিনে, আত্মা কি

অপর কোনোকিছুই নিজস্ব স্বভাবের কোনো বিকার ব্যতীত, ভিন্নতর অস্তিত্বের স্বভাবগত বিকারে ধ্বংস হতে পারে।

গ্লকন বললেন ঃ মোটকথা কারোর পক্ষেই এরূপ প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে, মৃত্যু আত্মাকে নৈতিকভাবে কোনো অধম সত্তায় পর্যবসিত করে।

কিন্তু সাহসী কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী যদি আমাদের যুক্তির মোকাবেলায় অগ্রসর হয়ে আত্মার অমরতাকে অস্বীকার করার জন্য বলে, মানুষ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অধমতর অস্তিত্বে পর্যবসিত হয়, তবু আমরা বলব, তার অভিমত সত্য হলেও মানুষের নিজের স্বভাবের দুষ্টশক্তির কারণেই মানুষ অধমতর অস্তিত্বে পরিণত হয়। আইনের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের জন্য তার মৃত্যু নয়; তার মৃত্যু ঘটে তার স্বভাবের মধ্যকার মারাত্মক রোগের কারণে।

এবার গ্লকন কিন্তু জোরের সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ ভিতর থেকে তার নিজের দুষ্টশক্তি যদি তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষয়গ্রস্ত করে থাকে, তা হলে সেটা ভয়ানক কিছু নয়। এবার যে-কোনো আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটতে পারে।

এবার তার যন্ত্রণার শেষ হবে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে একেবারে বিপরীত। দুষ্টশক্তি নিজের মৃত্যু ঘটায় না। দুস্টশক্তি অপরের মৃত্যু ঘটায়। অপরদিকে, যার স্বভাবের মধ্যে এই দুষ্টশক্তির অবস্থান সে মৃত্যুর বদলে অধিকতর উদ্দীপনার সঙ্গে জীবনকে ভোগ করতে থাকে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত গ্লকন। আত্মার নিজের স্বভাবের বিকার যদি আত্মাকে ধ্বংস করতে না পারে তা হলে সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না। তা হলে সাধারণভাবেই আমরা বলব, কোনোকিছুই এমন কোনো শক্তির দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে না, যে-শক্তির ধ্বংসের লক্ষ্য ভিন্নতর কোনো অস্তিত্ব, তার নিজের অস্তিত্ব নয়। বস্তুত নিজের ধ্বংস কেবল নিজেই সাধন করতে পারে, অপরে নয়।

একথা অবশ্য স্বীকার্য।

তা হলে আত্মার ক্ষেত্রে সত্যটি যদি এই হয় যে, নিজের স্বভাব কিংবা অপরের বিকার, কোনোকিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না, তা হলে আত্মা অবিনশ্বর, আত্মার অস্তিত্ব চিরন্তন। অন্য কথায় বলতে পারি ঃ আত্মা হচ্ছে অমর।

হ্যাঁ, আত্মা অবশ্যই অমর।

তা হলে 'আত্মা অমর'—এ প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হল বলেই আমরা সিদ্ধান্ত করব। আর একথা যদি সত্য হয়, তা হলে একথাও সত্য যে, একই আত্মা

চিরকাল অস্তিত্বশীল। কারণ, আত্মার সংখ্যার কোনো হ্রাস ঘটতে পারে না। কোনো আত্মারই মৃত্যু ঘটে না। আত্মার সংখ্যার বৃদ্ধিও ঘটতে পারে না। কারণ অমরতার বৃদ্ধি মরণশীলের বিনিময়েই মাত্র ঘটতে পারে। তা যদি ঘটতে পারত, তা হলে সবকিছুই পরিণামে অমর হয়ে যেত।

তুমি যথার্থ বলেছ সক্রেটিস।

কিন্তু আমাদের যুক্তির ভিত্তিতে তেমন কথা আমরা বলতে পারিনে। এবং একথাও আমরা বলতে পারিনে, আত্মা তার স্বভাবের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় কিংবা অস্থির কিংবা অন্তর্দ্বন্দ্বপূর্ণ হতে পারে।

গ্লকন বললেন ঃ একথা তুমি কেন বলছ, সক্রেটিস?

কারণ, পরস্পরবিরোধী বহু উপাদানে যে গঠিত, তার পক্ষে অবিনশ্বর হওয়া কঠিন। কিন্তু আমরা বলেছি, আত্মা অবিনশ্বর।

হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।

তা হলে, যে-যুক্তি আমরা এইমাত্র দিয়েছি এবং অপর যেসব যুক্তি পূর্বে দেওয়া হয়েছে সবকিছুই প্রমাণ করে, আত্মা হচ্ছে অমর। কিন্তু আত্মার বিশুদ্ধ স্বভাবে আমরা যদি তাকে দেখতে চাই তা হলে আমরা বর্তমানে যেমন দেহের বিকার এবং অন্য দুষ্টশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে তাকে বিকৃতভাবে দেখি, সেরূপ না দেখে যুক্তির মাধ্যমে উদ্ভাসিত তার মূল বিশুদ্ধ সত্তায় তাকে আমাদের দেখতে হবে। তা হলে আমরা তখন দেখব, আত্মা কত অধিক সুন্দর। এবং তখনই মাত্র আমাদের পক্ষে ন্যায় এবং অন্যায়, এবং এরূপ অন্য যে-গুণের আলাপ আমরা করেছি, তাদের মধ্যে স্পষ্টতর পার্থক্য স্থির করা সম্ভব হবে। আমরা এতকাল আত্মাকে এখন যেরূপ দেখি সেরূপেই তার বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু আত্মার এ-অবস্থা পুরানের সমুদ্রে নিমজ্জিত সমুদ্র-দেবতা গ্লকাসেরই অনুরূপ। দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থেকে ভগ্ন এবং ক্ষতবিক্ষত এবং বিকৃত হওয়ার কারণে দেবতা গ্লকাসের মূল আকারটি যেমন পরিচয়ের অতীত হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমন দশাই হয়েছে আত্মার। দেবতা গ্লকাসকে সমুদ্রতলের শঙ্খ এবং সমুদ্রজ উদ্ভিদ এবং সমুদ্র-দেশের পাথর এমনভাবে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল যে, আকারে সে দেবতার বদলে একটি দানবে পরিণত হয়েছিল। বিচিত্র বিরূপ শক্তির আচ্ছাদনে সেই অবস্থা। কাজেই সত্যকে আমাদের অপর কোথাও অন্বেষণ করতে হবে।

গ্লকন জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোথায় আমরা তাকে অন্বেষণ করব?

আমি বললাম ঃ আমাদের অন্বেষণের স্থান হবে আত্মার সত্য-প্রেম। গ্লকন, তুমি চিন্তা করে দ্যাখো ঐশ্বরিক, অমর এবং অবিনশ্বর সত্যের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা এদের জন্য আত্মাকে কীরূপ আকাঙ্ক্ষী করে তোলে এবং আত্মা এদের উপলব্ধির জন্য কীরূপ সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ভেবে দ্যাখো, সে যদি তার এই আবেগকে পরিপূর্ণরূপে অনুসরণ করত এবং সত্যের কামনা দ্বারা সে যদি তার নিমজ্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার পেয়ে উপরে উঠে আসতে পারত এবং তার গাত্রের শ্যাওলা এবং পাথর—যাকে মানুষ সুখের আকর মনে করে—অথচ যা তাকে ক্ষয়গ্রস্ত করে, তাকে যদি সে ঝেড়ে ফেলতে পারত, তা হলে আত্মার কী বিস্ময়কর পরিবর্তন-না ঘটে যেতে পারত। তেমন অবস্থাতেই মাত্র তুমি আত্মাকে তার যথার্থ সত্তায় অবলোকন করতে পার। তখন তার সত্তা হবে সুসংগঠিত এবং অবিভাজ্য। সে যাহোক, এই মরজগতেও তার কী বৈশিষ্ট্য এবং অভিজ্ঞতা হতে পারে তার বর্ণনা যথেষ্টরূপে নিশ্চয়ই আমরা করেছি।

হ্যাঁ, সে-বর্ণনা আমরা যথেষ্টরূপেই করেছি।

এরপর আমি বললাম ঃ গ্লকন, তা হলে আমরা বলতে পারি, তুমি যে-শর্ত আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিলে সে-শর্ত আমাদের যুক্তি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে তুমি হোমার এবং হিসিয়ড সম্পর্কে যেরূপ বলেছ আমরা সেরূপ করিনি। আমরা কোনো সম্মান বা পারিতোষিকের কথা উল্লেখ করিনি। আমরা প্রমাণ করেছি, উত্তমতাই উত্তমের পুরস্কার এবং মেষপালক গাইজেস-এর[১] অঙ্গুরি এবং অদৃশ্য হওয়ার ঐন্দ্রজালিক টুপি আমাদের থাকুক কিংবা না-থাকুক, ন্যায়কর্ম আমাদের অবশ্যই উপকার সাধন করে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

আমি বললাম ঃ গ্লকন, তা-ই যদি হয় তা হলে এবার আমরা ন্যায় এবং উত্তমতা মানুষ এবং দেবতার জন্য এই লোকে এবং পরলোকে যে আশীর্বাদ বা পুরস্কার বহন করে আনে, তাকে যদি বর্ণনা করি তবে তাতে কি আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে?

না, এবার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

তা হলে তোমার সঙ্গে যে-আপোসটি আমি করেছিলাম, সেটি তোমাকে এবার পরিত্যাগ করতে হবে।

কী আপোস করেছিলে?

---

১. গাইজেস-এর উপাখ্যান। ৩৬০ দ্রষ্টব্য।

আমি তখন যুক্তির খাতিরে তোমার নিকট স্বীকার করেছিলাম, উত্তমের অসৎ বলে পরিচিত হওয়া আবশ্যক এবং যে অসৎ তার উত্তম বলে পরিচিত হওয়া আবশ্যক। মানুষ কিংবা দেবতার পক্ষে যদিও এরূপ বিপরীতভাবে পরিচিত হওয়া অসম্ভব, তবু ন্যায় এবং অন্যায়কে তাদের পরিফল ব্যতিরেকে আপন সত্তায় বিচার করার জন্য তুমি আমার নিকট এই স্বীকৃতিরই দাবি করেছিলে। তুমি নিশ্চয়ই একথা বিস্মৃত হওনি।

না সক্রেটিস, একথা অস্বীকার করা আমার পক্ষে কঠিন।

তা হলে সে-বিচার যখন আমাদের সম্পন্ন হয়েছে, এবার আমাদের মানুষ এবং দেবতার কাছে ন্যায়কে তার স্বনামে প্রতিষ্ঠিত করা কর্তব্য। কারণ ন্যায় কাউকে প্রতারিত করেনি। ন্যায়কে যারা বরণ করেছে, ন্যায় তাদের মঙ্গলসাধন করেছে। প্রতিদানে আমাদেরও কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়ের নিকট থেকে আমরা যা নিয়েছিলাম তাকে তা প্রত্যর্পণ করা। তা হলেই তার নিজস্বরূপে সে আবার দৃশ্যমান হতে সক্ষম হবে।

হ্যাঁ, ন্যায়ের এ দাবি অবশ্য ন্যায়সঙ্গত।

প্রথমতঃ এবার তোমাকে স্বীকার করতে হবে, আর এই স্বীকৃতিটিই হচ্ছে তোমার প্রত্যর্পণ যে, দেবতার নিকট ন্যায় এবং অন্যায়ের যথার্থ চরিত্র অপরিজ্ঞাত নয়। দেবতা ন্যায় এবং অন্যায়ের যথার্থ চরিত্রকে জানে।

হ্যাঁ, একথা আমি এবার স্বীকার করি।

এবং এরা উভয় যদি দেবতার পরিচিত হয় তবে এদের একজন দেবতাদের মিত্র এবং অপরজন দেবতাদের শত্রু বলে বিবেচিত হবে। একথা আমরা গোড়া থেকেই বলে এসেছি।

হ্যাঁ, একথা আমরা বলেছি।

এবং দেবতাদের নিকট থেকে তাদের মিত্র যা-কিছু উত্তম তা-ই লাভ করবে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে অতীতে কৃত কোনো অপরাধের দণ্ডের ক্ষেত্রে।

হ্যাঁ, একথা সত্য।

তা হলে আমরা এরূপই মনে করব যে, ন্যায়বান যদি দরিদ্র হয়, যদি সে অসুস্থ হয় কিংবা অনুরূপ অপর কোনো দুর্ভাগ্য দ্বারা যদি সে আক্রান্ত হয়, তা হলে এরূপ দুর্ভাগ্য তার এই জীবন কিংবা পরজীবনের মঙ্গলের উৎস। কারণ, যে-মানুষ ন্যায়কে বরণ করেছে এবং ন্যায়ের অনুসরণে যে মানুষ মানুষের সাধ্যমতো

দেবতায় পরিণত হওয়ার চেষ্টা করেছে, সে-মানুষকে দেবতা কোনোক্রমেই অবজ্ঞা করতে পারে না।

না, এমন লোক যদি দেবতার মতো হয়, তবে দেবতা তাকে অবজ্ঞা করতে পারে না।

অপরদিকে আমরা মনে করব, যে অন্যায়ী তার ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই সত্য।

হ্যাঁ, যে অন্যায়কারী তার ক্ষেত্রে অবশ্যই এর বিপরীতটা সত্য।

তা হলে ন্যায়বান দেবতার কাছ থেকে এই পুরস্কারই লাভ করে?

হ্যাঁ, সে এই পুরস্কারই লাভ করে।

এবং মানুষের ক্ষেত্রে কী ঘটে? ব্যাপারটি কি তখন এরূপ দাঁড়ায় না যে, সত্য যদি প্রকাশিত হয় তা হলে কূটকৌশলে দক্ষ অসৎ, দৌড়ের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে কিছুটা অগ্রগামী থাকলেও পরিণামকে সে ঠেকাতে পারে না? দৌড়ের দ্বিতীয় ধাপে তাকে অবশ্যই পিছিয়ে পড়তে হয়। প্রতিযোগিতার সারি থেকে শীঘ্রই তার পতন ঘটে এবং পরিণামে তার অসম্মান ঘটে। ধিকৃত পশুর ন্যায় তাকে পুরস্কারহীনভাবে লেজ গুটিয়ে সরে পড়তে হয়। আর যে সত্যকারের ধাবমান প্রতিযোগী সে তার দৌড় সম্পন্ন করে এবং বিজয়ীর পুরস্কার নিয়েই সে প্রত্যাবর্তন করে। ন্যায়বানের ক্ষেত্রেও কি একথা সত্য নয়? কোনো কর্ম সম্পাদনে, কিংবা অপরের সঙ্গে আচরণে কিংবা জীবনের ক্ষেত্রে ন্যায়বান কি পরিণামে তার সহযাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার এবং সুনাম উভয়েরই অধিকারী হয় না?

অবশ্যই।

তা হলে তুমি একসময়ে অন্যায়কারীর প্রশংসায় যা বলেছিলে এবার আমি ন্যায়বানের প্রশংসায় তোমার সে কথাই কি উচ্চারণ করতে পারিনে? অর্থাৎ যে ন্যায়পরায়ণ সে যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখন সে ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আরোহণ করতে পারবে; তেমনি নিজে ইচ্ছামতো অপর কোনো রমণীকে যেমন সে বিবাহ করতে পারবে, তেমনি নিজের ইচ্ছামতো সন্তানদের বিবাহকার্য সম্পন্ন করতেও সে সক্ষম হবে। তুমি একথা যেমন অন্যায়কারী সম্পর্কে বলেছিলে, আমি তেমনি তা ন্যায়বান সম্পর্কে বললাম। অপরদিকে, যে অন্যায়কারী, সে যদিবা তার যুবাবয়সে পরিত্রাণ পেয়ে থাকে, পরিণামে সে অবশ্যই ধৃত হবে এবং অসম্মানিত হবে। অন্যায়কারীর বার্ধক্য হবে দুর্দশাগ্রস্ত।

নগরের নাগরিক কিংবা বৈদেশিক সকলেই তাকে করুণার চোখে দেখবে। এবং তুমি যে-সমস্ত বর্বর নিগ্রহের উল্লেখ করেছ, বেত্রাঘাত, নির্যাতন এবং শলাকাদষ্ট হওয়া—সকল দণ্ডেই সে দণ্ডিত হবে। আমার পক্ষে এ গুলির পুনরাবৃত্তির কোনো আবশ্যকতা আছে বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু যা আমি বলেছি, এ-সবই তো আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে বলতে পারি। কী বল গ্লকন?

হ্যাঁ সক্রেটিস, এসব তুমি যথার্থই বলতে পার।

তা হলে, যে ন্যায়বান সে নিজের ন্যায়পরায়ণতার উপকার ব্যতীত তার জীবনকালে দেবতা এবং মানুষের নিকট থেকে এই সকল পুরস্কার লাভ করে।

গ্লকন বললেন ঃ এবং এরূপ পুরস্কার অবশ্যই অতি উত্তম পুরস্কার।

তবু মৃত্যুর পরে ন্যায়বান এবং অন্যায়কারীর জন্য যে-প্রাপ্য অপেক্ষা করে আছে, তার তুলনায় তাদের ইহজগতের এই প্রাপ্য সংখ্যা এবং গুণের ক্ষেত্রে আদৌ তুলনীয় নয়। সেই প্রাপ্যের কথাও তোমার শোনা আবশ্যক। তা হলেই মাত্র ন্যায় এবং অন্যায়ের প্রাপ্যের বর্ণনা পূর্ণ হবে।

তুমি বলো সক্রেটিস। একথা শোনার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে?

আমি বললাম ঃ গ্লকন, আমি তোমাকে একটি গল্প বলব। এ-গল্প এলসিনাসের কাছে অডিসিউসের বলা কাহিনী নয়। তবু আমার এ-কাহিনীও এক বীরের কাহিনী। এ-কাহিনী হচ্ছে প্যামফিলিয়তে জাত আর্মেনিয়াসের পুত্র এরের কাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রে এরের মৃত্যু ঘটল। বীরের মৃত্যু। দশদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহতদের মৃতদেহগুলিকে সংগ্রহ করে তাদের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা হল। সব দেহই তখন পচনক্রিয়া থেকে বিকৃত। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এরের দেহ অবিকৃত ছিল। তার দেহকে তার গৃহে এনে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে লাগল। কিন্তু দ্বাদশ দিবসে এর যখন শবশয্যায় শায়িত, তখন তার দেহে জীবন ফিরে এল। জীবন ফিরে পেয়ে তার চারদিকে সমবেত সকলকে তার পরলোকের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। এর বলল, তার আত্মা যখন দেহ থেকে মুক্ত হল, তখন সে আরও বহু বীরের সঙ্গে পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করল। সে-যাত্রায় অগ্রসর হতে হতে তারা একটি রহস্যময় স্থানে এসে উপনীত হল। পরলোকের যাত্রীগণ দেখতে পেল, পৃথিবীর এই স্থানটিতে দুটি প্রস্থানপথ রয়েছে। এ-দুটি প্রস্থানপথ পরস্পরসংলগ্নই ছিল। কিন্তু নিচের এ-দুটি পথের উপরে আকাশের দিকে আরও দুটি নিষ্ক্রমণপথকে দেখা গেল। উপরের এবং নিচের এই

নিষ্ক্রমণপথের মধ্যবর্তী স্থানে দেখা গেল একদল বিচারক উপবিষ্ট রয়েছেন। বিচারকগণ ন্যায়বানদের বিচার করলেন। ন্যায়বান সম্পর্কে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন এবং তাঁদের সেই সিদ্ধান্তকে গ্রন্থিবদ্ধ করে ন্যায়বানদের সম্মুখে রেখে তাদের আদেশ দিলেন : ন্যায়বানরা আকাশের নিষ্ক্রমণপথের ডানদিকের পথ ধরে স্বর্গে আরোহণ করুক। অনুরূপভাবে বিচারকগণ অন্যায়কারীদের বিচার করলেন। এবং তাদের আদেশ করলেন অধঃদেশের নিষ্ক্রমণপথ ধরে পাতাললোকে নেমে যেতে। অন্যায়কারীগণও তাদের দণ্ড বহন করে চলছিল। কিন্তু তাদের দণ্ড তাদের পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। এরের বিচার যখন সন্নিকট হল, তখন সে বিচারকদের সম্মুখে উপস্থিত হল। কিন্তু বিচারকগণ তার প্রতি আদেশ দিলেন যে, এর পরলোকের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করে পৃথিবীর মানুষের কাছে পরলোকের কথা বর্ণনা করবে। এবং এ-কারণে এরের উপর আদেশ হল, পরলোকের সবকিছু সে দেখবে এবং শুনবে। এই আদেশ নিয়ে এর পরলোকের সবকিছু দেখতে লাগল। সে দেখল, যার যেমন বিচার তা হবার পর কেউ উর্ধ্বদেশের নিষ্ক্রমণপথে, কেউ নিম্নদেশের প্রস্থানপথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এর আরও দেখতে পেল, পরলোকে গমনাগমনের অপর যে-দুটি পথ রয়েছে তার একটির মধ্য থেকে কেউ হয়তো পৃথিবীর ধুলাবালিসমাচ্ছন্ন হয়ে যাত্রার ক্লান্তি নিয়ে পৃথিবীর গহ্বর থেকে উপরে উঠে আসছে। আবার কেউ হয়তো স্বর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন এবং উজ্জ্বল বেশে নেমে আসছে। স্বর্গ থেকে যারা আসছে তাদের দেখে মনে হচ্ছে তারা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু তাদের অবয়বে কোনো ক্লান্তির চিহ্ন নেই। তাদের দেখা গেল, সানন্দ মনে তারা একটি প্রান্তরে পৌঁছে যেন কোনো উৎসবের আয়োজন করছে। এদের মধ্যে যারা পরস্পর পরিচিত তারা একে অপরকে আনন্দে আলিঙ্গন করছে। এবং বাক্যালাপে মশগুল হচ্ছে। পৃথিবী থেকে সদ্য আগত আত্মার দল এদের কাছে স্বর্গের বিষয়াদি সম্পর্কে আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করছে। স্বর্গ হতে আগত আত্মার দলও পৃথিবীর আত্মার কাছে পৃথিবীর খবর জিজ্ঞেস করছে। এমনিভাবে তারা পরস্পরকে আপন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছে। যারা পাতাললোক থেকে এসেছে, হাজার বছর ধরে যারা পথ চলতে চলতে এসেছে, তারা তাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার অভিজ্ঞতার করুণ বর্ণনা দিতে লাগল। তাদের চোখ দিয়ে দুঃখের অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। অপরদিকে যারা স্বর্গলোক থেকে এসেছে তারা সুখে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে স্বর্গের অবর্ণনীয় সুখ এবং সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে লাগল। গ্লকন, এ-গল্প অবশ্যই দীর্ঘ। এ কাহিনী শেষ করতে আমাদের দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে। সংক্ষেপে এরের কাহিনী

হচ্ছে এরূপ ঃ এর বলল, সে দেখতে পেল, বিচারকগণ যার যেমন অন্যায় তার তেমন বিচার করে প্রতি অন্যায়ের জন্য দশগুণ দণ্ডের ব্যবস্থা করছেন এবং একটি জীবনকে শত বছরের পরিধিতে পরিমাপ করে তার দণ্ডভোগকে একশত বছরে একবার কিংবা সহস্র বছরে দশবারের ভিত্তিতে বিভক্ত করে দিচ্ছেন। যেমন ধরো, কেউ যদি বহু হত্যার কারণ হয়ে থাকে কিংবা যদি সে বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে কিংবা কোনো নগরীকে এবং তার সেনাবাহিনীকে দাসে পরিণত করে থাকে কিংবা অনুরূপ কোনো দুষ্কর্মের যদি সে নায়ক হয়ে থাকে, তা হলে তার প্রতিটি অন্যায়ের জন্য সে দশগুণ দণ্ড ভোগ করবে। এবং যারা ন্যায়বান তারাও তাদের প্রতিটি ন্যায়কর্ম, তাদের মহানুভবতা এবং পবিত্রতার জন্য অনুরূপ হারে পুরস্কৃত হবে। যে-শিশু জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে তাদের বিচারের ব্যাপারে এরের বিবরণী উল্লেখ না করলেও চলবে। কিন্তু দেবতাদের প্রতি এবং পিতামাতার প্রতি অসম্মানকারীর এবং মানুষের হত্যাকারীর দণ্ড উল্লিখিত দণ্ডের চেয়েও বহুগুণ অধিক এবং ভয়ানক। এর একটি ঘটনার কথা বলেছিল। এর বলেছিল, সে শুনতে পেল একটি আত্মা অপর একটি আত্মাকে প্রশ্ন করছে ঃ ভাই, মহান আরডিউস কোথায়? গ্লকন, এই আরডিউস কিন্তু এরের হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে জীবনধারণ করেছিল। সে প্যামফিলিয়ার কোনো নগরীর স্বৈরশাসক ছিল। সে তার বৃদ্ধ পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করেছিল। এ ছাড়াও তার ঘৃণ্য দুষ্কর্মের সীমা ছিল না। সে যাহোক, এর শুনতে পেল, অপর আত্মাটি বলছে ঃ "আরডিউসের আত্মা কখনো এখানে আসেনি এবং কখনোই সে এখানে আসতে সক্ষম হবে না। কারণ, আমরা নিজেদের চোখেই এক ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি। আমরা তখন গুহার মুখে। সমস্ত অভিজ্ঞতা শেষ করে আমরা পুনরায় আরোহণের উদ্যোগ করছি। এমন সময়ে আমরা দেখলাম, আকস্মিকভাবে আরডিউস এবং তার সঙ্গে আরও একদল আত্মা এসে হাজির হল। এরা সকলেই ছিল স্বৈরশাসক। তা ছাড়া তাদের সঙ্গে এমন আত্মার দলও ছিল, যারা ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ দুষ্কর্মের নায়ক ছিল। তারাও গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও ভেবেছিল তারা স্বর্গে আরোহণ করবে। কিন্তু আমরা দেখলাম, গহ্বরের মুখ তাদের গ্রহণ না করে আচম্বিতে গর্জন করে উঠল। বস্তুত, এই দুরারোগ্য পাপীর দল কিংবা তাদের সঙ্গীদের মধ্যে যাদের দণ্ডভোগ সমাপ্ত হয়নি তাদের কেউ যখন গুহার মুখ দিয়ে উপরে আরোহণের চেষ্টা করছিল তখনি গুহা গর্জন করে উঠছিল। এবং যে সব ভীমাকার প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল তারা সেই গর্জন ধ্বনি শ্রবণ করে অগ্রসর হয়ে তাদের ধরে বেঁধে নিয়ে

যাচ্ছিল। আরডিউস এবং তার সঙ্গীদের প্রহরীর দল হাত-পা বেঁধে নিচে ফেলে দিচ্ছিল, তাদের চাবুক মারছিল এবং রাস্তার উপর দিয়ে তাদের টেনে নিতে নিতে পথিকদের নিকট তাদের অপরাধের বর্ণনা দিচ্ছিল এবং বলছিল, এদের তারা নরকে নিক্ষেপ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। এবং অপরাধী ছাড়া অপর যারা সেই গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মনের সবচেয়ে বড় আতঙ্ক ছিল, পাছে তারাও গুহার সেই গর্জনধ্বনি শুনতে পায়। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে গুহা যখন নীরব হয়ে রইল, তখন তারা একে একে অসীম আনন্দে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।" আরডিউসের দর্শনকারীর এই ছিল বর্ণনা। এর পৃথিবীর সমবেত মানুষকে বলল ঃ এই হচ্ছে অন্যায়কারীর দণ্ড। আবার যারা ন্যায়বান তাদের পুরস্কারের পরিমাণও এর চেয়ে কম নয়।

এরের বর্ণনাতে আরও ছিল। আত্মারা সাতদিন প্রান্তরে কাটাল। সাতদিনের অবশেষে তারা আবার যাত্রা শুরু করল। চতুর্থ দিনে তারা এমন একটি স্থানে এসে উপস্থিত হল যেখান থেকে স্বর্গ এবং মর্ত্য ভেদকারী একটি আলোর দণ্ডকে তারা দেখতে পেল। স্তম্ভের মতো আলোর এই দণ্ডটি বর্ণসমারোহে রামধনুপ্রায়। বরঞ্চ বলা চলে, রামধনুর চেয়েও সে উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট। আরও একদিন অতিবাহিত হল। অভিযাত্রী আত্মার দল এবার সেই আলোকস্তম্ভে প্রবেশ করল। তাদের এই অবস্থান থেকে আলোকস্তম্ভের মেরুদণ্ডের উপর দৃষ্টিপাত করে এবার তারা স্বর্গ থেকে প্রলম্বিত দণ্ডের উভয় প্রান্তকে দেখতে পেল। কারণ, আলোর এই স্তম্ভটি হচ্ছে স্বর্গ বা জ্যোতির্মণ্ডলের বন্ধনদণ্ড। এই দণ্ডই জাহাজের দাঁড়ের সারির বন্ধনসূত্রের ন্যায় জ্যোতির্মণ্ডলের সমগ্র পরিধিকে ধারণ করে রাখে। এই দণ্ডের প্রান্তদেশদ্বয়ে আবদ্ধ হচ্ছে অনিবার্যতার চক্রটি। অনিবার্যতার এই চক্রের কারণেই সকল নক্ষত্রপুঞ্জের আবর্তন। অনিবার্যতার চক্রের দণ্ড এবং বক্রপ্রান্ত কঠিন প্রস্তর এবং অন্য বস্তুর মিশ্রণে গঠিত। এবং এর গতির নিয়ামক অংশটির প্রস্তুতপ্রণালীর যে-বর্ণনা এর দিয়েছে তাতে মনে হয় চক্রের একটি অংশকে খোদাই করে তাকে তৈরি করা হয়েছে। এই খোদিত অংশটিতে আবার একটি দ্বিতীয় নিয়ামক স্থাপিত হয়েছে। আবার দ্বিতীয়টি খোদাই করে বসানো হয়েছে একটি তৃতীয় নিয়ামক। এবং তৃতীয় নিয়ামককে খোদাই করে স্থাপিত হয়েছে চতুর্থ নিয়ামক। এমনি করে তৈরি হতে হতে অষ্টম নিয়ামকে যেয়ে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এ যেন কতকগুলি কুম্ভের স্তরস্তূপ। কারণ সেখানে সর্বমোট আটটি নিয়ামক খোদিত ছিল। একটির মধ্যে ঘটেছিল অপরটির স্থাপন। উর্ধ্বদেশ থেকে দেখলে এ নিয়ামকের বাহুকে একটি বৃত্তের মতোই তোমার কাছে মনে হবে। দণ্ডকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল এই নিয়ামকের তল। অষ্টম নিয়ামকের কেন্দ্রবিন্দু

দিয়ে প্রবিষ্ট হয়েছিল এই দণ্ড। সবচেয়ে বাইরের দিকের নিয়ামকটির বাহু ছিল প্রশস্ততম। পরিধিতে হ্রস্বতর ছিল ষষ্ঠ। এবং তার চেয়ে চতুর্থ, চতুর্থের পরে অষ্টম। অষ্টমের পরে সপ্তম। সপ্তমের পরে পঞ্চম। তার পরে তৃতীয়। এবং সর্বশেষে দ্বিতীয়। বহির্দিগস্থ বৃহত্তম বাহুটি বর্ণে ছিল বিচিত্র। কিন্তু সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল সপ্তমটি। অষ্টমটির আলো আসছিল সপ্তম থেকে। কারণ, সপ্তমের বর্ণেই অষ্টমের বর্ণ। দ্বিতীয় এবং পঞ্চম নিয়ামকের বৃত্তকে বলা চলে পরস্পর সদৃশ। এদের বর্ণ ছিল অপর বৃত্তের চেয়ে অধিকতর পীত। কিন্তু তৃতীয়টি ছিল শুভ্রতম। চতুর্থটির বর্ণ লোহিত এবং ষষ্ঠটি শুভ্রতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়। সমগ্র চক্র একটি বেগেই আবর্তিত হত। কিন্তু সমগ্রের গতির অন্তরে অন্তর্ভুক্ত অপর সাতটি নিয়ামকের গতি ছিল ধীরতর এবং সমগ্রের বিপরীতমুখী। কিন্তু এদের মধ্যেও অষ্টমটির গতি ছিল সর্বাধিক। গতিতে অষ্টমের নিকটবর্তী ছিল যথাক্রমে সপ্তম, ষষ্ঠ এবং পঞ্চম। এদের সকলের গতি ছিল সমাহারের। গতির ক্রমে তৃতীয় স্থান ছিল চতুর্থের। এর গতি ছিল বিপরীত আবর্তের গতি। চতুর্থ অবস্থান ছিল তৃতীয়ের এবং পঞ্চম ছিল দ্বিতীয়ের। আবার সমগ্র চক্রের আবর্তই সংঘটিত হচ্ছে অনিবার্যতার ক্রোড়দেশে। এবং প্রত্যেক বৃত্তের উপরিভাগে একটি করে সংকেত-সিঙা স্থাপিত রয়েছে। আবর্তের সঙ্গে সঙ্গে এই সিঙাটি যেমন আবর্তিত হতে থাকে, তেমনি এ-সিঙা থেকে একটি নির্দিষ্ট খাতের শব্দ সর্বদা ধ্বনিত হতে থাকে। প্রত্যেক বৃত্তের সিঙা একই খাতের ধ্বনি সৃষ্টি করে। ফলে আটটি বৃত্তের ধ্বনিতে একটি শব্দরাগের সৃষ্টি হয়। বৃত্তের পরিক্রমপথে প্রায় সম-দূরত্বে আসীন রয়েছে তিনটি মূর্তি। প্রত্যেকেই তারা একটি করে সিংহাসনে উপবিষ্ট। এরা তিনজন হচ্ছেন তিন ভাগ্যদেবী। অনিবার্যতার তিন কন্যা ঃ ল্যাচেসিস, ক্লথো এবং এ্যাট্রোপস। শুভ্র বসনে তাঁরা ভূষিত। শিরে তাঁদের পুষ্পমাল্য। সিঙার ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তাঁরা সঙ্গীত সৃষ্টি করে চলেছেন। ল্যাচেসিসের সঙ্গীতের ধুয়া হচ্ছে অতীত, ক্লথোর বর্তমান, এ্যাট্রোপসের ভবিষ্যৎ। অভিযাত্রী আত্মার দল দেখতে পেল, মাঝে মাঝে ক্লথো চক্রের সবচেয়ে বাইরের বাহুটি আকর্ষণ করে তাতে গতির সঞ্চার করে দিচ্ছেন। এ্যাট্রোপস্‌ও তাঁর বাম হাত দিয়ে অন্তর্বাহুটি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন এবং ল্যাচেসিস পর্যায়ক্রমে তাঁর বাম এবং ডান হাত দ্বারা অন্তঃ এবং বহির্বাহুগুলিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন।

এই স্থানটিতে পৌঁছে আত্মার দল সোজা ল্যাচেসিসের সম্মুখে হাজির হল। এবার একজন দোভাষী তাদের সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিল এবং ল্যাচেসিসের ক্রোড় থেকে কতগুলি ভাগ্যের সংখ্যা এবং জীবনের প্রকার তুলে নিয়ে একটি উচ্চ মঞ্চে আরোহণ করে ঘোষণা করতে শুরু করল ঃ "হে আত্মার

দল! তোমরা অনিবার্যতার কন্যা ল্যাচেসিসের আদেশ শ্রবণ করো। মর্ত্যের মরণশীল জীবনের দ্বিতীয় পরিক্রম তোমাদের এবার শুরু করতে হবে। তোমাদের জন্য পথপ্রদর্শক কোনো ভাগ্যদূতকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে না। তোমাদের ভাগ্য তোমাদেরই নির্ধারণ করতে হবে। জীবনের সংখ্যা ছুড়ে দেওয়া হবে। যে-আত্মা ভাগ্যের যে-সংখ্যা তুলে নেবে, সেই সংখ্যার জীবনই তার গ্রহণ করতে হবে। উত্তম বা ধর্মের জন্য খবরদারির আবশ্যকতা নেই। তোমরা তাকে যে যেমনভাবে গণ্য করবে, সে তাকে তেমনভাবে লাভ করবে। এজন্য বিধাতাকে দায়ী করার কোনো অধিকার তোমাদের থাকবে না। আপন ভাগ্যনির্ধারণের দায়িত্ব আত্মার নিজের।" এই ঘোষণা পাঠ করে অনিবার্যতার কন্যা ল্যাচেসিসের ভাষ্যকার জীবনের সংখ্যার কড়ি ছুড়ে দিল এবং আত্মার দলের যার নিকটে যে-সংখ্যা এসে পড়ল সে তাকে তুলে নিল। এদের একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে রইল এর। এর কোনো জীবনের সংখ্যা কুড়িয়ে নিল না। কারণ, তার জন্য সংখ্যাগ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। জীবনের সংখ্যা কুড়ানো হলে আত্মারা বুঝতে পারল, কার ভাগ্যে কোন্ জীবন নির্দিষ্ট হয়েছে। এবার ভাষ্যকার সমবেত আত্মাদের যা সংখ্যা তার চেয়ে অধিক জীবনের প্রকার তাদের সম্মুখে রেখে দিল। কল্পনীয় সমস্ত প্রকার জীবনই এদের মধ্যে ছিল। পশুর জীবন এবং মানুষের জীবন—কোনো জীবনই এই জীবন-সম্মেলনের বাইরে ছিল না। সমস্ত আয়ুষ্কালব্যাপী যে-জীবন স্বৈরতান্ত্রিক, তাও যেমন এখানে ছিল, তেমনি ছিল স্বৈরতান্ত্রিক সে-জীবনও যার মধ্যপথে পতন ঘটে এবং যার সমাপ্তি ঘটে দারিদ্র্যে, নির্বাসনে কিংবা ভিক্ষাবৃত্তিতে। দেহের শোভায় মনোহর কিংবা শারীরক্রীড়ায় পারদর্শী কিংবা সুজাত বা অভিজাত পরিবারের সম্পর্কে সম্পর্কিত জীবনের নমুনারও অভাব ছিল না। এবং এরূপ কোনো সুনামের অধিকারী নয়, তেমন জীবনও ছিল। বাজির সংখ্যায় কোন্ আত্মার কী জীবন তা চিহ্নিত ছিল। তাই জীবনের এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ থেকে নির্বাচন করার কোনো স্বাধীনতা কোনো আত্মারই ছিল না। বাজির সংখ্যাতে চিহ্নিত জীবনই প্রত্যেককে স্বীকার করে নিতে হবে। জীবনের সমাবেশ থেকে যার যে-জীবন, সেই জীবনই তাকে বরণ করে নিতে হবে। কিন্তু দারিদ্র্য এবং সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রত্যেক জীবনেই মিশ্রিত ছিল।

প্রিয় গ্লকন, এবার তা হলে সেই সংকটমুহূর্তটি সমাগত। কারণ, এখানে আমাদের সবকিছুই বিপন্ন। এ-কারণেই আমাদের প্রথম চিন্তা জ্ঞানের নয়। জ্ঞানের প্রকারের প্রশ্ন পরিত্যাগ করে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে এমন জ্ঞানের সন্ধান করা, যে-জ্ঞান আমাদের উত্তম এবং অধমের পার্থক্য-নির্ধারণে সাহায্য

করবে এবং আমাদের সাধ্যমতো উত্তমের নির্বাচনে আমাদের সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে আমরা যা বলেছি সবকিছুই আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক। আমাদের যুক্তিকে সামগ্রিকভাবে যেমন দেখতে হবে, তেমনি তাকে বিশ্লেষণ করেও দেখতে হবে। সেই বিবেচনায় আমরা দেখতে পাব, উত্তম জীবনের উপর এর কি প্রভাব; দেখতে পাব, দেহের মনোহর দৃশ্য যখন দারিদ্র্য কিংবা সম্পদ কিংবা অন্যপ্রকার চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে উত্তমের উপর বাঞ্ছিত কিংবা অবাঞ্ছিত কোন্ প্রভাবের সৃষ্টি করে কিংবা জন্মের ভেদ, আভিজাত্য, শক্তি, দুর্বলতা, চাতুর্য বা মূর্খতা—এবং অপর সকল সহজাত কিংবা অর্জিত গুণের কোন্‌টির প্রভাব উত্তমের জীবনে কী? এইসব বিষয়ে যদি আমরা বিবেচনা করি এবং আমরা যদি স্মরণ রাখি আত্মার গঠনটি কী, তা হলেই মাত্র আমাদের পক্ষে অধম থেকে উত্তমকে পৃথক করা সম্ভব হবে এবং তখনই আমরা যে-জীবন আমাদের অধিকতর অধম করে তোলে, যে আমাদের অধিকতর অন্যায়ী করে তোলে, তাকে অধিকতর অধম এবং যে আমাদের অধিকতর ন্যায়বান করে তোলে, তাকে অধিকতর উত্তম বলে অভিহিত করতে পারব। এর বাইরে কোনো বস্তু আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। আর সবকিছুকেই আমরা ছেড়ে দিতে পারি। কারণ, এই জ্ঞানে আমরা এবার সমৃদ্ধ যে, জীবিত কিংবা মৃত—উভয়ের জন্য সর্বোত্তম জীবন হচ্ছে এই জীবন। পরলোকে যখন আমরা প্রবশ করতে উদ্যত হব, এই বিশ্বাসে তখন আমাদের অবিচল থাকতে হবে। অবিচল থাকতে হবে, যেননা সম্পদ কিংবা অপর কোনো দুষ্টশক্তির আকর্ষণ আমাদের বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়; যেন স্বৈরতান্ত্রিক কিংবা অপর দুষ্কর্মের নায়কের জীবনে পতিত হয়ে আমরাও সেই দুষ্কর্মের কারক হয়ে না দাঁড়াই এবং অধিকতর দুর্ভোগের ভোগী না হই। উত্তমের বিশ্বাসে আমাদের অবিচল থাকতে হবে, যেন আমরা চরমের বদলে মধ্যমকে জীবনের সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করতে পারি এবং ইহলোকে কিংবা পরলোকে সাধ্যমতো যেন উভয় দিকের চরমকে আমরা পরিহার করতে পারি। কারণ এই পথই মানুষের সুখের একমাত্র নিশ্চিত পথ।

সে যাহোক, এসো আমরা এরের কাহিনীতে ফিরে যাই! এর বলতে লাগল ঃ "ভাষ্যকার এবার আত্মাদের উদ্দেশ করে বলল ঃ যে-আত্মা সকলের শেষে এসে উপস্থিত হয়েছে তারও চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে যদি তার বিচারে এবং জীবন নির্বাচনে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে তা হলে সেও এমন জীবনলাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, যে-জীবনে সে সুখী হতে পারবে। কাজেই সবার প্রথমে যে নির্বাচন করেছে তার অধৈর্য হওয়ার কারণ নেই;

সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করুক সে তার জীবনকে এবং যে নির্বাচন করছে সবার শেষে তারও হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।"[১] ভাষ্যকারের এ-বাণী সমাপ্ত হলে যে-আত্মা বাজির সংখ্যা সবার প্রথমে গ্রহণ করেছিল, সে এবার তার জীবনকে বাছাই করে নিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, ত্বরিত সে বাছাই করে নিল সর্বাধিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের এক জীবনকে। নিজের মূর্খতা, লোভ এবং ব্যগ্রতায় সে পরিপূর্ণরূপে বিচার করে দেখল না, কোন্ জীবনকে সে গ্রহণ করছে। তাই সে উপলব্ধি করতে পারল না, নিয়তির নির্দেশে এই জীবনে তাকে নিজের সন্তানকে ভক্ষণ করতে হবে এবং অনুরূপ বহু অবর্ণনীয় আতঙ্ককে তার ভোগ করতে হবে। 'কিন্তু সিদ্ধান্তের পরে অবসর-মুহূর্তে যখন সে চিন্তা করে দেখল, কী জীবনকে সে নির্বাচিত করেছে, তখন সে নিজের মূর্খতার জন্য অনুতাপে বিদ্ধ হতে লাগল। নিজের বক্ষে সে করাঘাত হানতে শুরু করল। অথচ এ-দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী অপর কেউ নয়। সে বিস্মৃত হয়েছিল ভাষ্যকারের সতর্কবাণী। ভাষ্যকার বলেছিল, প্রত্যেক আত্মাই তার নিজভাগ্যের নিয়ামক। কাজেই নিজের ভাগ্যের জন্য ভাগ্যের দেবতা কিংবা স্বর্গ কিংবা অপর কাউকে দায়ী করা অর্থহীন। বস্তুত, স্বৈরতন্ত্র নির্বাচনকারী এই আত্মার আগমন ঘটেছিল স্বর্গ থেকে, বিগত জীবন যে যাপন করেছে একটি সুশাসিত রাষ্ট্রে। নির্বিঘ্ন ছিল সে-জীবন। তার যা-কিছু মহত্ত্ব, সে-মহত্ত্ব অর্জন করেছিল সে জ্ঞানের মাধ্যমে নয়, অর্জন করেছিল অভ্যাস এবং প্রথার মাধ্যমে। সে-কারণেই নূতন জীবন-নির্বাচনে তার এই অজ্ঞতা। কেবল এই আত্মাই নয়; যারাই এসেছিল স্বর্গ থেকে তারা দুঃখের পরীক্ষায় পরীক্ষিত না হওয়ার কারণে এই আত্মার মতোই নূতন জীবনের নির্বাচনে ভ্রান্তির দুর্ভোগে নিপতিত হল। কিন্তু যে-আত্মাদের আগমন ঘটেছিল পৃথিবী থেকে, যারা নিজেরা সকল দুর্ভোগকে ভোগ করেছে এবং অপরকে দুর্ভোগ ভোগ করতে দেখেছে এবং নূতন জীবনের নির্বাচনে যারা চিন্তার পরিচয় দিল, ব্যগ্রতার নয়, তাদের নির্বাচন তাদের জন্য মঙ্গলকর হল। এ-কারণেই স্বর্গ এবং মর্ত্যের আত্মার নির্বাচনে কেউ যেমন অমঙ্গলের বদলে মঙ্গলকে নির্বাচন করতে সক্ষম হল, তেমনি আবার কারও ভাগ্যে জুটল মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল। তাই এরের কাহিনী সত্য হলে আমরা বলতে পারি, মর্ত্যে যে-আত্মা বিশ্বস্ততার সঙ্গে জ্ঞানকে অন্বেষণ করে এবং যার বাজির সংখ্যা সর্বশেষ

১. কাহিনীটিতে কিছু পরস্পরবিরোধিতা আছে। পূর্বে বলা হয়েছে, জীবন-নির্বাচনে আত্মার কোনো স্বাধীনতা ছিল না। বাজির সংখ্যানুযায়ী জীবনগ্রহণে তারা বাধ্য। কিন্তু এখানে আবার বলা হচ্ছে, আত্মা যদি জীবন-নির্বাচনে বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে, তা হলে সে সুখী জীবনলাভ করতে পারবে। অর্থাৎ আত্মার জীবন-নির্বাচনে স্বাধীনতা আছে।

সংখ্যা নয়, স্বর্গ মর্ত্যের মধ্যভূমিতে নূতন জীবনের নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার চিন্তার কোনো কারণ নেই। সে যেমন ইহলোকে সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে, তেমনি ইহলোক থেকে পরলোকের যাত্রা তার সুগম হবে এবং পুনরায় যখন সে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তন করবে, তখনও তাকে কঙ্কর-আচ্ছাদিত পথ ধরে প্রত্যাবর্তন করতে হবে না। সে প্রত্যাবর্তন করবে স্বর্গের মসৃণ সড়ক ধরে।

মর্ত্যের মানুষের কাছে পরলোকের বর্ণনা করে এর বলতে লাগল ঃ আত্মাদের পক্ষে জীবন-নির্বাচনের পর্বটি যথার্থই দেখার মতো একটি পর্ব ছিল। এ-দৃশ্য যেমন তার মনে করুণার উদ্রেক করেছে, তেমনি তার মধ্যে হাস্য এবং বিস্ময়েরও সৃষ্টি করেছে। আত্মাদের ক্ষেত্রে দেখা গেল, আত্মারা প্রধানত তাদের পূর্বজীবনের অভ্যাসকেই অনুসরণ করল। তাই এর দেখল, যে-আত্মা তার বিগত জীবনে ছিল অরফিউস, সে বেছে নিল একটি হংসবলাকার জীবন। নারীর গর্ভ থেকে জাত হতে সে অস্বীকার করল। কারণ, এই নারীর হাতেই তার মৃত্যু ঘটেছিল। নারী এখন তার ঘৃণার পাত্র। আবার থামিরিসের আত্মা বেছে নিল একটি বুলবুল পাখির জীবন। কিন্তু এর দেখল, বলাকা এবং সঙ্গীতপ্রিয় পাখিরা বেছে নিল মানুষের জীবন। জীবনবাছাই-এর ক্ষেত্রে বিংশতি আত্মা বেছে নিল সিংহের জীবন। দেখা গেল, এ হচ্ছে টেলামনের পুত্র এ্যাজাক্সের আত্মা। এ্যাজাক্সের আত্মার অস্ত্রের ঝনঝনানির অভিজ্ঞতা কম ছিল না। সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই মানুষের জীবনগ্রহণে তার অনিচ্ছা। এর পরে এল আগামেমননের আত্মা। আগামেমননের আত্মাও তার পূর্বজীবনের অভিজ্ঞতার কারণে মানুষের জীবনকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে এবং সে বাছাই করে নিল ঈগলপাখির জীবন। প্রায় মধ্যবর্তী সময়ে এল আটালান্টার আত্মার নির্বাচনপর্ব। ক্রীড়াবিদদের জীবনের বিপুল সম্মানের আকর্ষণ তার নিকট অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াল। ফলে আটালান্টার আত্মা বেছে নিল ক্রীড়াবিদের জীবন। এর দেখল আটালান্টার পরে এল প্যানোপিউসের পুত্র এপিউসের আত্মা। এপিউসের আত্মা ইতিমধ্যেই একজন দক্ষ নারী-কারিগরে পরিণত হয়ে গেছে। এপিউসের পরে এল ভাঁড় থারসাইটিসের আত্মা। দেখা গেল, থারসাইটিসের আত্মা গ্রহণ করেছে একটি বানরের আকৃতি। সব আত্মারই যখন নির্বাচনপূর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল, তখন সবার শেষে এল বীর অডিসিউসের আত্মা। একদিন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ ছিল না। কিন্তু বিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার মোহ থেকে তাকে মুক্ত করেছে। দীর্ঘ সময় ধরে অডিশিউসের আত্মা চিন্তা করল ঃ কোন্ জীবনকে সে গ্রহণ করবে। সে চারদিকে সন্ধান করতে লাগল একজন সাধারণ মানুষের জীবনকে। বহু অনুসন্ধানের পরে সে দেখতে

পেল, সাধারণ মানুষের জীবন একপ্রান্তে অপর সকলের দ্বারা অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে আছে। সেই অবজ্ঞাত সাধারণ জীবনকেই বীর অডিসিউসের আত্মা পরম আনন্দে বরণ করে নিল এবং ঘোষণা করল ঃ তার ভাগ্যের সংখ্যা যদি সর্বপ্রথমেও নিক্ষিপ্ত হত, তা হলেও এই জীবনকেই সে নিঃসন্দেহে বেছে নিত। এভাবে সেখানে বহু জীবনেরই পরিবর্তন ঘটে গেল ঃ পশুর জীবন মানুষের জীবনে, এক পশুর জীবন অপর পশুর জীবনে, বিগত জীবনের অন্যায়কারীর জীবন হিংস্র পশুর জীবনে এবং ন্যায়বানের জীবন বাধ্য অপর একটি জীবনে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

সকল আত্মার জীবন-নির্বাচনের পর্ব সমাপ্ত হলে আত্মার দল তাদের বাজির সংখ্যার ধারাক্রমে এবার দল বেঁধে একের পর এক ল্যাচেসিসের সম্মুখে উপস্থিত হল। ল্যাচেসিস এবার প্রত্যেক আত্মার নির্বাচিত পথপ্রদর্শক দেবদূতকে আত্মাদের জীবনের পথ প্রদর্শনের আদেশ দিলেন। সেই আদেশক্রমে দেবদূত আত্মাকে প্রথম নিয়ে চলল ক্লথোর নিকট। এভাবে দেবদূত আত্মাকে ক্লথোর পরিচালিত চক্রের আবর্তের মধ্যে আনয়ন করে তাদের নির্বাচিত ভাগ্যকে সুনির্দিষ্ট করে দিল। এই কার্য সমাধা করে দেবদূত ক্লথোকে অভিবাদন জানিয়ে আত্মাকে নিয়ে চলল চক্রের নিরলস চালনাকারী এ্যাটরোপস্-এর নিকট। এ্যাট্রোপস্ এবার নিয়তির সূত্রে আবদ্ধ করে আত্মার নির্বাচিত জীবনকে অপরবর্তনীয় করে দিলেন। এই পর্বের পরে সকল আত্মা এবার পশ্চাৎদিকে কোনো দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে অনিবার্যতার সিংহাসনের সম্মুখে এসে সমবেত হল। অনিবার্যতার সিংহাসনের সম্মুখদিক দিয়ে পর্যায়ক্রমে সকল আত্মা অগ্রসর হয়ে সমবেত হল বৃক্ষ-লতা-গুল্মশূন্য লেথির সমতলভূমিতে। এখানে পৌঁছার পূর্বে তাদের অতিক্রম করতে হল এক দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর তাপের তেজকে।

অপরাহ্নে সকলে এসে শিবির স্থাপন করল বিস্মৃতির নদীতটে। বিস্মৃতির নদীর পানিকে কোনো পাত্রেই ধারণ করা চলে না। নিয়তির নির্দেশে সকল আত্মাকেই পান করতে হল এই বিস্মৃতির নদীর পানিকে। যারা বিজ্ঞতার সঙ্গে নিজেকে রক্ষা করতে পারল না, তারা বিস্মৃতির নদীর পানি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পান করল। বিস্মৃতির নদীর পানি পান করার ফলে সকল আত্মাই পরলোকের সকল অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হয়ে গেল। এবার সকল আত্মা নিদ্রামগ্ন হল। কিন্তু মধ্যরাত্রি যখন আগত, তখন ভূমির কম্পন শুরু হল এবং বজ্র নির্ঘোষিত হল এবং বিচ্ছুরিত তারকার মতো এক বিপুল উৎক্ষেপণে সকল আত্মা পরলোক থেকে উৎক্ষিপ্ত হল ইহলোকে। মর্ত্যলোকে আবার ঘটল তাদের নতুন অস্তিত্বের জন্ম। বিস্মৃতির নদীর পানি পান করা এরের জন্য ছিল নিষিদ্ধ।

কিন্তু এরও বলতে পারেনি, কেমন করে কোন উপায়ে সে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হল তার মৃতদেহের মধ্যে। তার এ-ই মাত্র স্মরণ আছে, হঠাৎ সে জীবন ফিরে পেল। তার চক্ষু উন্মীলিত হল। এবং সে দেখতে পেল প্রত্যুষ হয়ে আসছে এবং সে শায়িত রয়েছে তার সমাধিশয্যায়।

প্রিয় গ্লকন, এভাবেই এরের অভিজ্ঞতা রক্ষা পেল বিনষ্টি এবং বিস্মৃতির হাত থেকে। এবং আমরাও যদি এ-কাহিনীকে বিস্মৃত না হই তা হলে এই কাহিনীর শিক্ষা আমাদেরও রক্ষা করবে এবং আমাদের আত্মাকে কলঙ্কিত না করে অক্লেশে আমরা অতিক্রম করতে সক্ষম হব পরলোকের পথে লেথির সেই নদীকে। কাজেই আমার কথা হচ্ছে ঃ অমরতায় বিশ্বাস স্থাপন করাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত। আত্মা সকল মঙ্গল এবং অমঙ্গলকে অতিক্রম করতে সক্ষম। আত্মাই আমাদের পথপ্রদর্শক। আত্মাই আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপে নিয়ত অগ্রসর করে নিয়ে যায় সম্মুখপানে, এবং উর্ধ্বপানে। ন্যায় এবং জ্ঞানের সাধনায় আত্মাই আমাদের উদ্দীপিত করে। আত্মার অমরতায় বিশ্বাস ইহলোকে এবং পরলোকে আমাদের মনে শান্তিস্থাপন করবে। বিধাতার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করবে। এবং ক্রীড়াশেষে বিজয়ীর ন্যায় সম্মানের শিরোপাসংগ্রহ যখন আমাদের এ-জীবনে সমাপ্ত হবে এবং পরলোকের সহস্র বর্ষের দীর্ঘ যাত্রা যখন আমাদের শুরু হবে, তখন উদ্বেগহীন চিত্তে সে-যাত্রায় পদক্ষেপ করতে আমরা সক্ষম হব।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্ট

অধম রাষ্ট্র ঃ অধম রাষ্ট্র চার প্রকারের ৩৭৬;

অন্যায়—অন্যায়ের লাভ ৩২; অন্যায় সুযোগ লাভে দ্বিধাহীন ৫৫; থ্র্যাসিমেকাসের অভিমত ৩৩; অন্যায়ের চরম রূপ ৭৭; ন্যায় এবং অন্যায়ের মূল রূপ ৭৯; অন্যায় ন্যায়বানকে পরম সুখের লোভ দেখায় ৮৫; অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ২২৪; বিকাররূপে অন্যায় ২২৫; অন্যায়ের প্রশংসা অন্যায়, ন্যায়ের প্রশংসা ন্যায় ৪৫৯,

অনিবার্যতার ঘূর্ণ্যমাণ বৃত্ত ৫০১

অভিভাবক (শাসক)—অভিভাকদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ১০৬; শাসক ও সৈনিক, শাসকের জীবনাচরণ ১৭৭; শাসকের সুখের প্রশ্ন ১৮৬, ২৫৯, ৩৪৫; শাসকের কর্তব্য ১৮৮; নারীরাও শাসক হওয়ার উপযুক্ত ২৪১; শাসককে বীরের সম্মান দেওয়া হবে ২৬৬

অভিজাততন্ত্র সর্বোত্তমের শাসন ২২৬;

আত্মার অমরতার প্রমাণ ৪৯৭-৫০০

অলস মক্ষী—হুলশূন্য এবং হুলপূর্ণ ৪১৩;

পরিহার্য প্রয়োজনের দাস ৪১৩; গণতন্ত্রে অলস মক্ষী ৪২৪

অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের প্রশ্ন ২৮১

আইন—বিস্তারিত আইনের প্রয়োজনীয়তা ১৯৩

আইসোক্রাটিস ২৯০, ৩১২

আদর্শ এবং বাস্তব—আদর্শ বাস্তবায়িত না হতে পারে ২৪৭; আদর্শ এবং বাস্তবের প্রশ্ন ২৫৭

আদর্শ রাষ্ট্র—আদর্শ রাষ্ট্রের পতন ৩৭৫, ৩৮৩; বিকৃত রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ৩৮২; আদর্শ রাষ্ট্র এবং অভিজাততন্ত্র ৩৮৪; আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম পতনের কারণ ৩৮৮; স্বর্গে দীপ্যমান থাকবে ৪৭১

আপেক্ষিকতা ২১৩;
সুখ এবং দুঃখ আপেক্ষিক বোধ ৪৫৭; সুখের অভাবে দুঃখ, দুঃখের অভাবে সুখ ৪৫৯; পরিমাপের আবিষ্কার বিভ্রম থেকে মুক্তির জন্য ৪৮৯

আবেগ—শোকাচ্ছন্নতা বুদ্ধিকে দুর্বল করে ৪৯১

আলো—বস্তু এবং দৃশ্যের সূত্র ৩২৬

আত্মা—আত্মার গুণ ৬৪; আত্মার তিনটি উপাদান ২০৫, ২১৭, ২১৯, ৪৫৩। রাষ্ট্রের গঠন যেরূপ আত্মার গঠন সেরূপ ২১৭; স্বৈরতন্ত্রের হাতে বন্দী ৪৪১, আত্মার অমরতার প্রমাণ ৪৯৭-৫০০; আত্মা অক্ষয় ৪৯৭; আত্মার জীবন নির্বাচনের পর্ব ৫১২-৫১৫; আত্মার পুনর্জন্ম ৫১৪; আত্মা জীবনের পথপ্রদর্শক ৫০৭

আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্য ৯৮

আরিয়নের বাহন ২৩৮

ইউমোলপাস ৮৩

ইউরিপাইডিস ৪৩১, ৪৬২

ইচ্ছা—কেবলমাত্র ইচ্ছা এবং বিশেষ বস্তুর জন্য ইচ্ছায় পার্থক্য ২০৯; আবশ্যক এবং অনাবশ্যক ইচ্ছার পার্থক্য ৪০৫

ইন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান ৩৫১; ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের অলীকতা ৪৮৮

উচ্চাভিলাষতন্ত্র ৩৮৩; বিক্রমের ভিত্তিতে উচ্চাভিলাষতন্ত্র ৩৯০; উচ্চাভিলাষীর চরিত্র ৩৮৩

উত্তম—উত্তমের শ্রেণী বিভাগ ৭৩, ৭৪; বিধাতা কেবল উত্তমের কারণ ১১৩ চরম জ্ঞান উত্তমের জ্ঞান ৩২২, ৩২৩; উত্তম এবং আনন্দ ৩২২; সকল অনুসন্ধানের লক্ষ্য ৩২৩; শাসকের উত্তমের জ্ঞান থাকতে হবে ৩১৯; পরম উত্তম ৩২৫; সূর্যের সঙ্গে উত্তমের তুলনা ৩২৭; উত্তম জ্ঞান সত্য এবং অস্তিত্বের উৎস ৩২৮; দর্শন হচ্ছে উত্তমের উপায় ৩৬৫, ৩৭৫; উত্তমের চেয়ে শ্রেয় কিছু নয় ৪৮৯

এর—এরের কাহিনী ৪৯৭

এ্যারিস্টট্‌ল ৩৪ (ভূমিকা); প্লেটোর একাডেমীতে যোগদান ৩৪ (ভূমিকা)

এলসিবিয়াডিস ৩০৪

এসকাইলাস ৩৫ (ভূমিকা), ৮১, ৩৯৬, ৪৩১

এসলেপিয়াস ১৫৮, ১৫৯

ঐক্য—রাষ্ট্রের সর্বাধিক মঙ্গলের মধ্যে ঐক্য ২৫৫; ঐক্যের চেয়ে উত্তম কি হতে পারে? ২৫৫; শ্রেণী সংঘর্ষে ঐক্যের বিনষ্টি ৩৯৮ কতিপয়তন্ত্র ৩৮৭, ৩৯৬; কতিপয়তন্ত্রী চরিত্র ৩৯৩; শাসনের ক্ষেত্রে সম্পদের সর্ত ৩৮৯; কতিপয়তন্ত্রের ত্রুটি ৩৯৮; কতিপয়তন্ত্রের সংকট ৪০৮ কতিপয়ী চরিত্র ৩৯৫

কবি—দেবতা সম্পর্কে কবিদের বাণী ৮৭; কবিদের হাতে দেবতাদের ভ্রান্ত বর্ণনা ১১৩; নাট্যকাব্যের নাকচ ১৪৩, ৪৩২; কবিদের অসত্য উক্তি যত জনপ্রিয় তত ক্ষতিকর ২২৯; কবিদের পক্ষে সব কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব ৪৭৫; কবিদের সত্যের কোন জ্ঞান নেই ৪৭৭; নিজের সৃষ্টির যথার্থ বিচারক নয় ৪৭৯; কবির সৃষ্টির সত্য মূল্য নগণ্য ৪৮৫; কবিদের উত্তম এবং দেবতাদের প্রশংসা করতে হবে ৪৮৭

কাব্য—কাব্যরীতির আলোচনা ১৩৬; শব্দ এবং ছন্দের সম্পর্ক ১৪৯; মনের উপর কাব্যের ক্ষতিকর প্রভাব ৪৬৯; দর্শনের সঙ্গে কাব্যের বিরোধ ৪৬৭

গণতন্ত্র ৪০৫; গণতন্ত্রের উদ্ভব ৪০১; গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্র ৪১৫; গণতন্ত্রে তিন শ্রেণীর নগরবাসী ৪২৪; গণতান্ত্রিক চরিত্র ৩৯৮, গণতন্ত্র সম্পর্কে প্লেটোর বিদ্রূপ ৪০৩, ৪১১; গণতান্ত্রিক তরুণ বল্গাহীন ইচ্ছার দাস ৪১৬; গণতন্ত্রের দুর্বলতা ৪২২; গণতন্ত্রে দাসরাও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে ৪২৩; গণতন্ত্রে পশুরাও স্বাধীন ৪২৩; চরম থেকে চরম প্রতিক্রিয়া ৪১৭

গাইজেসের উপাখ্যান ৭৭

গণিত ৩৪৯, ৩৫৩; গণিতই একমাত্র বিজ্ঞান ৩৪৯; শাসককে গণিত শিখতে হবে ৩৫৩; গণিতের পাঠ ৩৫৪; গণিতের সমস্যা ও সিদ্ধান্ত ৩৫৫

গুহার রূপক ৩৩৬, ৩৩৮

গ্রীস—গ্রীকরা পরস্পরকে দাসে পরিণত করবে না ২৬৭; গ্রীসের জাতীয় ঐক্য ২৬৭, ২৬৮

গ্লকাস—সমুদ্রতলে নিমজ্জিত দেবতা ৫০১

চরম—চরম থেকে চরমের সৃষ্টি ৪২৩; চরমকে পরিহার করতে হবে ৫১১

চিকিৎসাশাস্ত্র ১৫৯, ১৬৩; চিকিৎসকের প্রয়োজন ভোগের কারণে ১৫৭; চিকিৎসকের আধিক্য নাগরিকের দুর্দশার লক্ষণ ১৫২; পৌরাণিক চিকিৎসক এসলেপিয়াস ১৫৮; বিচারক ও চিকিৎসকের পার্থক্য ১৬০

চিত্রশিল্প—প্রতিরূপের শিল্প ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৬

ছন্দ ১৪৭-১৪৯; শব্দের জন্য ছন্দ, ছন্দের জন্য শব্দ নয় ১৪৯

জন্তু—বহু মাথাবিশিষ্ট জন্তু ৪৫৭

জারাক্সিস ২৬ (ভূমিকা)

জাহাজের উপমা ২৯৩

জ্যামিতি—সরল জ্যামিতি ৩৫৫; ঘনজ্যামিতি ৩৫৫

জ্যোতির্বিজ্ঞান ৩৫৯

জ্ঞান—জ্ঞানী এবং উত্তম লাভের আশা পোষণ করে না ৫৭; জ্ঞান এবং সাহসের স্বভাব ১৯৭; জ্ঞান এবং ধারণা ২৭৭; জ্ঞানের সঙ্গে অস্তিত্বের সম্পর্ক ২৮১; যথার্থ জ্ঞানী কে? ২৮৫; জ্ঞানশূন্য ধারণা অন্ধ ৩২৩; দৃশ্য, চোখ এবং সূর্য ৩২৫; জ্ঞানের চার স্তর ৩৩১ জ্ঞানের রেখার বিভাগ ৩২৯ জ্ঞানের ভাগ ঃ জ্ঞান, বোধ, ধারণা, ভ্রম ৩৩২; গুহার রূপক ৩৩৬; ছায়া এবং আলোর জগৎ ৩৩৯; গুহার রূপকের ব্যাখ্যা ৩৩৭; আত্মাকে জ্ঞান দান করা যায় না ৩৩৯; আত্মাকে আলোতে নিয়ে আসতে হবে ৩৪১; ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ৩৪৭; সঙ্গতির জ্ঞান ৩৫৭; অজ্ঞতা ভ্রমের মূল ৪৫৩

ডায়োমিড ৩০৩

ডিডালাস ৩৬০

ত্রিশের বিপ্লব ২৩ (ভূমিকা)

থ্র্যাসিমেকাস—থ্র্যাসিমেকাসের ন্যায়ের সংজ্ঞা দান ৩৩

থিজেসের সংযম ৩০৭

থুসিডাইডিস ২৭, ৩৫ (ভূমিকা)

দক্ষতা—দক্ষতার বিনিময় চলে না ৪৭

দর্শন—দর্শনের সংজ্ঞা ৪২ (ভূমিকা); কুকুরের স্বভাব এবং দার্শনিকের স্বভাব ১০৭; দর্শনের দুর্নামের কারণ ২৮৫; দর্শনের অক্ষম অনুকারী ৩০১; উচ্চতর শিক্ষায় দ্বান্দ্বিকতা বা দর্শন ৩৬৩; দর্শন সকল জ্ঞানের শীর্ষবিন্দু ৩৬৭; অকাল দর্শনের বিপদ ৩৭১; দর্শন ও কাব্যের বিরোধ ৪৭৫, ৪৯৫

দামন ১৫০

দারায়ূস ২৬ (ভূমিকা)

দার্শনিক—দার্শনিককে শাসক হতে হবে ২৭৫; দার্শনিকের সংজ্ঞা ২৬৯, ২৭৭; যথার্থ দার্শনিক এবং অনুকারীগণ ২৭৯; দার্শনিক চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ২৮৭; দার্শনিক

শাশ্বত জ্ঞানের প্রেমিক ২৯২; দার্শনিক সকল কাল এবং অস্তিত্বের দ্রষ্টা ২৮৯, দার্শনিক চরিত্র দুষ্প্রাপ্য ২৯৫; দার্শনিক একটি চারা গাছের সদৃশ ৩০০; দার্শনিকের প্রয়োজন আদর্শ পরিবেশের ৩০১; দার্শনিককে দূষিত করে প্রতিকূল পরিবেশ ৩০১; দর্শনের অক্ষম অনুকারী ৩০৫; দার্শনিকের শাসক হওয়া অসম্ভব নয় ৩০৯, ৩১১; দার্শনিকের দৃষ্টি শাশ্বত সত্যের প্রতি ৩১৩-৩১৪; দার্শনিক শাসক না হলে রাষ্ট্রের সংকট থেকে মুক্তি নেই ৩১৬; একজন যথার্থ দার্শনিকই যথেষ্ট ৩১৩; দার্শনিক অপরিহার্য সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম ৩৭৫; দর্শন সকল জ্ঞানের শীর্ষবিন্দু ৩৬৭; দার্শনিকের শিক্ষা ৩৬৫; সময়ের আগে দর্শনচর্চা ক্ষতিকর ৩৬৭; অপক্ক তার্কিক এবং ক্রিড়ারত কুকুরছানার সাদৃশ্য ৩৬৯; দার্শনিক সুখ এবং অসুখের পার্থক্য জানে ৪৩৯; দর্শন এবং কাব্যের বিরোধ ৪৭৫

দাসপ্রথা—দাসপ্রথা স্বীকৃত সত্য ৯২, ১২৮; দাসরা অনুকরণের পাত্র নয় ১৪৩; গ্রীক গ্রীককে দাসে পরিণত করবে না ২৬৭

দেশরক্ষা—দেশরক্ষার দায়িত্ব ১০৬

ধর্ম—ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য ৫৭; ডেলফীর দেবতা ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত করবে ১৯৭

ধারণা—ধারণা এবং বিশ্বাস ২৭৯, ২৮১; জ্ঞান এবং ধারণা ২৮০; জ্ঞানশূন্য ধারণা অন্ধ ৩২৪

নাটক—নাটক বা কাহিনী কাব্যের প্রশ্ন ১৩৭; নাট্যকাব্যের ক্ষতিকর প্রভাব ১৩৭-১৪৪, ৪৭৫; চরিত্রের উপর নাটকের প্রভাব ৪৯২

নারী—পুরুষের সমান ২২৯; মেয়েরা সকল কর্মেরই যোগ্য ২৩৫

ন্যায়—'রিপাবলিকে'র মূল আলোচ্য বিষয় ন্যায় ১; ন্যায় সম্পর্কে আলোচনা, ৩৬, ৪১ (ভূমিকা); সিফালাসের অভিমত ঃ সততাই ন্যায় ৭; পলিমারকাসের অভিমত ঃ বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব, শত্রুর প্রতি শত্রুতা ১৬ ঃ ঋণ শোধেই ধর্ম, সিমোনাইডিসের অভিমত ১৯; ন্যায়পরায়ণতা কি তস্করতা? ২৩; ন্যায়ের কি অন্যায় করার অধিকার আছে? ২৭; সক্রেটিসের প্রতি থ্র্যাসিমেকাসের চ্যালেঞ্জ ২৯; থ্র্যাসিমেকাসের অভিমত, ন্যায় হচ্ছে শক্তিমানের স্বার্থ ৩৩; শাসিতের পক্ষে শাসককে মান্য করা ধর্ম ৩৫; অন্যায় ন্যায়ের চেয়ে অধিক লাভজনক ৫৩; ন্যায় এবং অন্যায়ের মূল রূপ ৭৯; ন্যায়ের পরীক্ষা ৮১; কাপুরুষ, বৃদ্ধ এবং দুর্বলরাই ন্যায়ের কথা বলে—থ্র্যাসিমেকাসের অভিমত ৮৯; ন্যায় অন্যায়ের উৎপত্তি কোথায় ১০১; রাষ্ট্রে ন্যায়ের অবস্থান, ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োগ ১৮৩; ন্যায়ের অন্বেষণে অবশিষ্টের পদ্ধতি ১৯৫; যার যা প্রাপ্য তাই পাওয়া, যার যা করণীয় তাই করা ২০৮; রাষ্ট্র এবং ব্যক্তিতে ন্যায় ২২৩; ন্যায় এবং অন্যায়ের লাভ লোকসানের প্রশ্ন ২২৬; ন্যায়ের অন্বেষণেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি ২৬৭; পরম ন্যায়ের উপলব্ধি ২৮৫; পরম ন্যায়, পরম উত্তম ৪৫২; যার যা উপযুক্ত ৪৬৩; অন্যায়ের প্রশংসা অন্যায়, ন্যায়ের প্রশংসা ন্যায় ৪৫৯;

ন্যায়বানই সুখী ৪৯৫
পরিহাস—সক্রেটিসের পরিহাস ২৫, ৪১

পলিমারকাসের গৃহে আলোচনা ৯

পাইথাগোরীয়গণ ৩৬১; পাইথাগোরাস ২৮, ৩৫ (ভূমিকা)

পিলোপনেশীয় যুদ্ধ ২৭ (ভূমিকা)

পুনর্জন্ম—আত্মার পুনর্জন্ম ৫১৫

পুরাণ—পুরাণের সংস্কার করতে হবে ১২৬

পেরিক্লিস ২৭ (ভূমিকা)

প্রজনন—সন্তান প্রজনন যদৃচ্ছার ব্যাপার নয় ২৪৫; অবাঞ্ছিত শিশুদের বিনষ্টির প্রস্তাব ২৫৩; সন্তান উৎপাদনের বয়সসীমা ২৫৩; অননুমোদিত ভ্রূণের গর্ভপাতের প্রস্তাব ২৫৩; উত্তম জন্মের নিয়ামক সংখ্যার রহস্য ৩৮৮

প্রজ্ঞা—রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা ১৯৯, ২২০

প্রবৃত্তি—২১১; পরিহার্য এবং অপরিহার্য প্রবৃত্তি ৪১৩

প্রোটাগোরাস ৩৪ (ভূমিকা), ৪৮৫

প্লেগ—এথেন্সের প্লেগ ২৭ (ভূমিকা);

প্লেটো—প্লেটোর জীবনকাল ২৪ (ভূমিকা); প্লেটোর পরিবার ২৪ (ভূমিকা); প্লেটোর রচনার ইংরেজি অনুবাদ ১৯ (ভূমিকা); প্লেটোর রচনার বাংলা অনুবাদ ১১ (মুখবন্ধ); ইউটোপিয়ার জনক ২২ (ভূমিকা); প্লেটোর সপ্তম পত্র ৩০ (ভূমিকা); প্লেটোর সমকালীন এবং পূর্বকালীন জ্ঞানীগণ ৩৫ (ভূমিকা); প্লেটোর রচনার সংলাপ-রীতি ৩৯ (ভূমিকা); অধিবাসীদের শ্রেণীকরণ ৪৩ (ভূমিকা); প্লেটোর কাব্যনীতি ৪৭৭, ৪৯৫; সাইরাক্যুজের অভিজ্ঞতা ৩৩ (ভূমিকা); একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ৩৩ (ভূমিকা); প্লেটোর সংলাপ ৩০৭; প্লেটোর দুই জগতের তত্ত্ব ৪৩ (ভূমিকা)

বহু এবং একের প্রশ্ন ৩২১

ব্যক্তিগত সম্পত্তি—শাসকের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না ১৭৭, ১৭৮, ২৫৭; ব্যক্তিগত সম্পত্তি অনৈক্যের কারণ ২৫৮; ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আদর্শ রাষ্ট্রের পতনের সূচনা ৩৮৯

বিচারক—উত্তম বিচারক এবং উত্তম চিকিৎসক কে? ১৬৩

বিরোধিতা—পরস্পর বিরোধিতা বা প্রকৃতি ২০৭; ইন্দ্রিয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিরোধিতা ৩৫১

বিক্রম—আত্মার উপর শিক্ষার ফল ১৬৫; রাষ্ট্রের গুণ ২০১; আত্মার উপাদান ২১৭; ব্যক্তির চরিত্রে বিক্রম ২১৯; প্রবৃত্তি এবং জ্ঞান থেকে বিক্রমের পার্থক্য ২১৯

বিধাতা—বিধাতায় বিশ্বাস ১১৫; বিধাতা কেবল উত্তমের কারণ ১৫৫; বিধাতা অপরিবর্তনীয় ১১৮; বিধাতা মিথ্যা বলতে অক্ষম ১২১

বিবাহ—স্ত্রী এবং সন্তানের যৌথ স্বামিত্বের প্রশ্ন ২২৯-২৪৫;

বিবাহের পবিত্রতা ২৪৯; যৌথ বিবাহের উৎস ২৪৭; নিষিদ্ধ মিলনের সন্তান ২৫৩

বিপ্লব—বিপ্লবের কারণ শাসক শ্রেণীর অন্তর্বিরোধ ৩৮৬

বেন্দ্রীস—দেবী বেন্দ্রীস ৮

ভাব—৪৩ (ভূমিকা); ভাবের তত্ত্ব ২৭৪; ভাব এবং বস্তু ২৭৬; ভাবকে আমরা জানি কিন্তু দেখি না ৩২৫; ধারণা থেকে ভাবে উত্তরণ ৩৩১

মধ্যলোক—স্বর্গ, নরক এবং বিশোধনের মধ্যলোক ৫০৭

মিথ্যা—মিথ্যার অর্থ ১১২-১১৩; অবিমিশ্র মিথ্যা ঘৃণ্য ১১৭; দেবতা মিথ্যা বলতে পারে না ১১৯; শব্দগত মিথ্যা এবং যথার্থ মিথ্যা ১২০; মিথ্যা বলার অধিকার কেবল শাসকের ১৩০; ঔষধরূপে মিথ্যা ১৩৩; রাজকীয় মিথ্যা ১৭৫

মুদ্রা—বিনিময়ের মাধ্যম ৯৮

মেয়ে—মেয়ে এবং পুরুষের সমতা ২২৫; স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমষ্টিগত মালিকানা ২২৭; পুরুষ এবং নারীতে কি পার্থক্য? ২৩১; মেয়েদের নগ্ন দেহে শরীরচর্চার প্রশ্ন ২৩৫; শাসক হওয়ার গুণ উভয়েরই আছে ২৩৭; মেয়ে এবং পুরুষের সমতা উত্তম ২৩৯

মোমাস দেব ২৯৫

মৃত্যু—মৃত্যু ভয়ঙ্কর নয় ১২৮

যুক্তি—যুক্তির চেয়ে উত্তম কিছু নেই ৪৪৭;

যুদ্ধ—যুদ্ধের উৎস ১০৫; যুদ্ধ কৌশল ১০৬; সম্পদবান যুদ্ধের অনুপযুক্ত ১৯১, ৪০৮; সন্তানরাও যুদ্ধকে প্রত্যক্ষ করবে ২৫৯; সুন্দরী বীরের প্রাপ্য ২৬১; শত্রুর প্রতি সৈন্যের আচরণ ২৬৩; যুদ্ধের নীতি ২৬৭; যুদ্ধ এবং বিরোধের পার্থক্য ২৬৫; কতিপয় শাসক যুদ্ধে অক্ষম ৪০০

রাজনীতি—রাজনীতির চেয়ে নীরব জীবন শ্রেয় ৩০৩

রাষ্ট্র—রাষ্ট্রের প্রাথমিক গঠন ৯০-৯২; রাষ্ট্রে মানুষের শ্রেণীবিভাগ ৯১; রাষ্ট্র সংগঠনের উপাদান ৮৯; রাষ্ট্রের উদ্ভব কেমন করে ঘটেছে ৯৫; প্রয়োজনের উপর রাষ্ট্রের পত্তন ৯৭; কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীর বিভাগ ৯৯; সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ১০১; রাষ্ট্রের বিকাশ ১০১-১০৬; রাষ্ট্রের লক্ষ্য সমগ্র রাষ্ট্রের সর্বাধিক সুখ ১৮৫, ২৬০, ৩৪৫, ৪৬৯; রাষ্ট্রকে সমগ্র হিসাবে দেখতে হবে ১৮৫; রাষ্ট্রের সংকটের কারণ ১৮১; সাধারণ রাষ্ট্র সম্পদ ও দারিদ্র্যের বিরোধে বিভক্ত ১৮৭; রাষ্ট্রের মূল উপাদান ঃ জ্ঞান, সাহস, সংযম ও ন্যায় ২০৭; রাষ্ট্রের আকার স্থির থাকবে ২৫১; দেহের ন্যায় রাষ্ট্র ২৫১; আদর্শ রাষ্ট্রের বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা ২৭১; রাষ্ট্র চালনার প্রশ্নে জাহাজের উপমা ২৯৭; আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়নের প্রশ্ন ৩০৯;

নিদাগ মানুষ নিয়ে শুরু করতে হবে ৩১১; রাষ্ট্রের সূচনায় বয়স্কদের বহিষ্কার করা হবে ৩৭৬; আদর্শ রাষ্ট্রের পতন ৩৮১; রাষ্ট্রের প্রতিভূ চরিত্র ঃ উচ্চাভিলাষীর চরিত্র ৩৮৯; পাঁচ প্রকার রাষ্ট্র ঃ প্রথম প্রকার অভিজাততন্ত্র ৩৯৩; রাষ্ট্রের অলস মৌমাছি ৩৯৯; কতিপয়ী, চরিত্র ৪০১; কে সুখী ঃ স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র, না দার্শনিক শাসিত রাষ্ট্র? ৪৪৭ রাষ্ট্রের আইনের লক্ষ্য সকল নাগরিকের মঙ্গল সাধন ৪৬১; আদর্শ রাষ্ট্র স্বর্গে দীপ্যমান ৪৬৩

রিপাবলিক—'রিপাবলিকে'র প্রধান আলোচ্য বিষয় ১; রিপাবলিক-এর অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ ৪;

'রিপাবলিক'-এর মূল্যায়ন ২১-৪৬ (ভূমিকা); 'রিপাবলিক'-এর রচনারীতি ৩৮-৪০ (ভূমিকা)

লাইকারগাস ৪৮৩

লিওনটিয়াসের কাহিনী ২১৭; লেথি-লেথির সমভূমি ৫১৪

শরীরচর্চা ১৫৬; ক্রীড়াবিদের বিক্রম ১৬৫

শাসক—শাসককে হতে হবে চিকিৎসকের মত নিঃস্বার্থ ৪১; যে উত্তম সে স্বেচ্ছায় শাসক হতে চায় না ৪৯; উত্তম শাসক না হওয়ার প্রতিযোগিতা করে ৫১; মিথ্যা বলার অধিকার শাসকের ১৩৩; কে শাসক, কে শাসিত ১৬৬ ঃ শাসক বাছাই ঃ তিন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ১৬৮; শাসকের পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা ১৭০; রাজকীয় মিথ্যা ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর গঠনের ধাতুর ভিন্নতা ১৭২; রক্ষিবাহিনী মেষশাবকের কুকুর হবে, নেকড়ে নয় ১৭৪; শাসক হওয়ার গুণ নারী পুরুষ উভয়ের আছে ২৪১; শাসকদের যৌথ পরিবার ২৫৩; শাসকরা সুখী ২৫৯; দার্শনিক শাসক ২৭৪; দার্শনিক শাসক কেবল কল্পনা নয় ৩০৭; শাসককে সত্যের দীর্ঘ পথ গ্রহণ করতে হবে ৩২১; শাসকের উত্তমের জ্ঞান থাকতে হবে ৩২৩; শাসন করা হচ্ছে দায়িত্ব পালন করা ৩৪৩; শাসককে গণিত শিখতে হবে ৩৪৯; পঞ্চাশোর্ধে শাসক ৩৭৫; নারীরাও শাসক ৩৭৬

শ্রম—যার যা কাজ সেইই তাকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করতে পারে ৬৩; শ্রমের বিভাগ ৯৪; সকলের প্রকৃতি এক নয় ৯৬; কৃষক কৃষক হবে, বিচারক হবে না ১৪৫; শ্রমের বিভাগে ন্যায়ের প্রতিরূপ ২০৫, ২২২, 'যার যে কাজ'-এর তাৎপর্য ২৩৮ গুণগত বিভাগ এবং শারীরিক বৈশিষ্ট্যগত বিভাগ এক নয় ২৩৯

শিক্ষা—পুরাতন শিক্ষা ১১১; প্রাথমিক শিক্ষা ১১২; দুরকমের শিক্ষা ১১১; সাহিত্যের শিক্ষা ১১৩; অভিভাবকদের শিক্ষা ১২৫; পুরাণের সংস্কার করতে হবে ১২৯; নাট্য-সাহিত্য ১৩৯; সঙ্গীত শিক্ষা ১৪৬; সঙ্গীত শিক্ষার লক্ষ্য ১৪৭; শিক্ষার লক্ষ্য আত্মার উৎকর্ষ সাধন ১৬৫; বিধানের চেয়ে বড় হচ্ছে শিক্ষা ১৯২; শিক্ষাই প্রধান নীতি ১৯৩; উচ্ছৃঙ্খলতা নিষিদ্ধ করতে হবে ১৯১; নারীদের শিক্ষা ২৩৪; নিদাগ মানুষ নিয়ে শুরু করতে হবে ৩১১; দার্শনিক শাসকের শিক্ষা ৩১৮; প্রাথমিক থেকে উচ্চতর শিক্ষায় উত্তরণ ৩১৮-৩৩২; শিক্ষার ক্রম ৩৩৫-৩৩৮; শিক্ষা আত্মার চোখকে ঘুরিয়ে দেবে ৩৪৫; গণিতের তাৎপর্য ৩৪৯; অঙ্কশাস্ত্রের উচ্চতর শিক্ষা ৩৪৯; শাসককে গণিত শিখতে হবে ৩৪৯;

শিক্ষার পাঠক্রম ৩৫১, ৩৫৬; জ্যোতির্বিজ্ঞান ৩৫৫; দর্শন শিক্ষা ৩৫৯

শিল্প—শিল্পের লক্ষ্য ৪১; অনুকারী শিল্প ১৩৬; চরিত্রের উপর শিল্পের প্রভাব ১৫০; শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ১৪৭; শিল্পের প্রকৃতি ৪৬৭; সত্য থেকে শিল্পের দূরত্ব ৪৭৩; শিল্প এবং আবেগ ৪৮৬

শিশু হত্যা ২৪৭

সম্পদ—সম্পদের যথার্থ শক্তি কি? ১১; যে সৎ সম্পদ তাকে শান্তি দান করে ১৫; সম্পদ ও দারিদ্র্য রাষ্ট্রের অনৈক্যের কারণ ১৮৭

সক্রেটিস—সক্রেটিসের মৃত্যু ২৯ (ভূমিকা); ন্যায়ের প্রশ্নে সক্রেটিস ২; সক্রেটিসের পরিহাস ২৫, ৪০; সক্রেটিসের বিরুদ্ধে শব্দের দাবা খেলার অভিযোগ ২৯১; সক্রেটিসের মধ্যে ঐশ্বরিক হুঁশিয়ারী ৩০৭

সত্য—শয্যা এবং শয্যার প্রতি-সৃষ্টি ৪৭১; সত্য থেকে শিল্পীর সৃষ্টির দূরত্ব ৪৮১

সত্তা—সত্তার ক্ষয়ের কারণ সত্তা নয় ৪৮১

স্বভাব—স্বভাবের লক্ষ্য ৪৯৩

স্বপ্ন—স্বপ্নে প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে ৪৪০

সংযম—রাষ্ট্রের গুণ ১১৯

সংখ্যা—সংখ্যার সংজ্ঞা ৩৫২; অবিভাজ্য সংখ্যার একক ৩৫৪; উত্তম জন্মের নিয়ামক সংখ্যার রহস্য ৩৮১

সফিস্ট ২৯০; জনতাই বড় সফিস্ট ২৯৯, ৩০৩

সফোক্লিস ৪৩১

সলোন ৪৮৪

সঙ্গতি ৩৫৭

সঙ্গীত—সঙ্গীতের যন্ত্র ১৪৯; শিক্ষার শক্তিশালী মাধ্যম ১৪৮; শিক্ষার ক্ষেত্রে সঙ্গীত ১৫১; সঙ্গীতের পরে শরীরচর্চা ১৫০; অত্যধিক সঙ্গীতের কুফল ১৬৪

সহযোগী—সহযোগী এবং শাসক ১৭০; সহযোগীদের জীবন ১৭৬; সহযোগীদের মধ্যে রাষ্ট্রের বিক্রম ২০১

স্পার্টা—উচ্চাভিলাষতন্ত্রের দৃষ্টান্ত ৩৮৩

স্বাধীনতা—সম্মতির ভিত্তিতে শাসনের স্বাধীনতা ২০৩; গণতন্ত্রে চরম স্বাধীনতা ৪১১; গণতান্ত্রিক চরিত্রের স্বাধীনতা ৪১৬; স্বাধীনতার আধিক্য গণতন্ত্রের দুর্বলতা ৪২২

সাপেক্ষ পদের সর্ত ২১১

সাম্যবাদ—সাম্যবাদী নীতির প্রথম উল্লেখ ১৮৯; স্ত্রী এবং সন্তানের উপর সমষ্টিগত মালিকানা ২৩১; যৌথ পরিবার ও বিবাহ ২৪৬; অভিভাবকদের যৌথ বিবাহের উৎসব ২৫১; সকলেই পিতা, সকলেই পুত্র ২৪৯; 'আমার' এবং 'আমার নয়' কথার ব্যবহার ২৫৫; শাসকদের যৌথ পরিবার ২৫৭; শাসকদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না ২৫৮; আদিম সাম্যবাদ ৪০ (ভূমিকা); প্লেটোর সাম্যবাদ এবং আধুনিক সাম্যবাদের তুলনা ৪৪-৪৬ (ভূমিকা)

সুখ—কে সুখী ন্যায়বান, না অন্যায়কারী? ৪৩৭; সুখ এবং দুঃখ-আপেক্ষিক বোধ ৪৪৯; ন্যায়বানই সুখী ৫০৩; চরমের পরিহার সুখ ৫১২

সুদ—সুদের বিরুদ্ধে আইনের আবশ্যকতা ৪০৭

সুন্দর—পরম সুন্দর ২৭৯; সুন্দর এবং উত্তম ৩২৯

স্বৈরতন্ত্র ৪১৮; ৪২১

স্বৈরতান্ত্রিক শাসক—স্বৈরতন্ত্র অন্যায়ের চরম ৪৫; স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ৪১১; স্বৈরতান্ত্রিক শাসক নররূপী নেকড়ে ৪২৫; জনতার ভক্ষক ৪১৯; স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের পরিণাম ৪২১;